প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাণিজ্য **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ECO : 03 : 13-18

	রচনা	সম্পাদনা
একক 72-76	শ্রী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক বিজয় কুমার চক্রবর্তী
একক 77-79	অধ্যাপক কমল কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়	অধ্যাপক শংকর রায়
একক 80-81	অধ্যাপক কেশব চন্দ্র সিন্‌হা	ড. সুভাষ রায়
একক 82-83	অধ্যাপক বিজয় কুমার চক্রবর্তী	ঐ
একক 84-92	ড. যাদব কৃষ্ণ দাস এবং ড. সুধাংশু শেখর মাইতি	অধ্যাপক ভাগবত দাশগুপ্ত

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ

কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ECO - 3

বাণিজ্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
13

একক 72	❑ কারবারের অর্থ—প্রয়োজনীয় উপাদান—কাজ এবং উদ্দেশ্য	7-23
একক 73	❑ দেশীয় কোম্পানি ও ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তির ভারতে ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজনীয় উপাদান—একটি সাধারণ তথ্য	24-30
একক 74	❑ ব্যবসায়ে মূলধনের সংস্থান	31-52
একক 75	❑ কারবারের পরিবেশ	53-66
একক 76 (A)	❑ বেসরকারী ক্ষেত্র—কোম্পানি	67-105
একক 77 (B)	❑ সমবায় কারবার ঃ বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা	106-121
একক 78 (C)	❑ যৌথ ক্ষেত্র	122-127

পর্যায়
14

একক 79	❑ কারবার সংগঠন	128-165
একক 80	❑ কারবারী জোটবদ্ধকরণ	166-201
একক 81	❑ ক্ষুদ্রায়তন কারবার	202-207

পর্যায় 15

একক 82	❑ কারবার সংগঠনের বিধিবদ্ধরূপ	208-219
একক 83	❑ বাজার	220-225
একক 84	❑ সরকার ও কারবার	226-240
একক 85	❑ রুগ্ন ও দুর্বল কোম্পানি এবং তাদের পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবন	241-253

পর্যায় 16

একক 86	❑ রাশিতত্ত্বের উপস্থাপন ও সংক্ষিপ্তকরণ	254-282
একক 87	❑ পরিসংখ্যা বিভাজনের বৈশিষ্ট্য	283-328
একক 88	❑ সহগতি ও নির্ভরন	329-348

পর্যায় 17

একক 89	❑ সূচক ও সংখ্যা	349-367
একক 90	❑ কালীন সারি বিশ্লেষণ	368-390
একক 91	❑ অন্তঃপ্রক্ষেপণ	391-406

পর্যায় 18

একক 92	❑ সেট তত্ত্ব	407-419
একক 93	❑ প্রাথমিক সম্ভাবনা তত্ত্ব	420-448
একক 94	❑ সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক ও তত্ত্বগত বিভাজন	449-472

একক ৭২ ❑ কারবারের অর্থ—প্রয়োজনীয় উপাদান—কাজ এবং উদ্দেশ্য

গঠন

৭২.০ উদ্দেশ্য
৭২.১ প্রস্তাবনা
৭২.২ কারবার কথাটির অর্থ
 ৭২.২.১ কারবারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংজ্ঞা
 ৭২.২.২ কারবারের ক্রিয়াগত সংজ্ঞা
৭২.৩ কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য
৭২.৪ কারবারের প্রয়োজনীয় উপাদান
 ৭২.৪.১ শিল্প
 ৭২.৪.২ শিল্পের বিভিন্ন ভাগ
 ৭২.৪.৩ ব্যবসা
 ৭২.৪.৪ বাণিজ্য
৭২.৫ কারবারের কাজ
৭২.৬ কারবারী কার্যাবলীর উদ্দেশ্য
৭২.৭ সারাংশ
৭২.৮ অনুশীলনী
৭২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭২.০ উদ্দেশ্য

এই অনুচ্ছেদ পড়ার পর আপনারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে সমর্থ হবেন ঃ—

- আধুনিক কারবারের জন্ম কীভাবে হল?
- কারবার কথাটার মানে কী?
- একটি কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
- কারবারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।
- কারবারের বিভিন্ন কাজ।
- কারবারী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য।

৭২.১ প্রস্তাবনা

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ তার অভাবপূরণে ব্যস্ত। পূর্বে সীমিত অভাবপূরণে মানুষ নিজেই নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ হয় উৎপাদন করত বা বিনিময় প্রথা (Barte System)-র মাধ্যমে যোগাড় করত। ঐ সময়ে

মানুষ নিজের একক চেষ্টায় নিজের সীমিত অভাবপূরণে সক্ষম ছিল। পরবর্তীকালে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন শুরু হয়। কালক্রমে ক্রমবর্ধমান অভাব মানুষের একক প্রচেষ্টার দ্বারা সকল পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা এই সময়েই মানুষ অনুভব করল। এই শ্রমবিভাগের মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের অভাবমোচনে সহযোগিতা করল এবং এর মাধ্যমে পরস্পর নির্ভরশীলতা গড়ে উঠল। বাস্তবিক পক্ষে শ্রমবিভাগের প্রবর্তনের সময় থেকেই কারবারের সূত্রপাত হল।

কারবারের এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাবে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) হস্তশিল্প যুগ (Period of Handicraft System) ঃ এই যুগে যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। জমিদারগণ ছিলেন জমির মালিক। 'শ্রমের সচলতা' (mobility of labour) ধারণাটি ছিল অস্পষ্ট।

(খ) সংঘপ্রথার যুগ (Period of Guild System) ঃ মধ্যযুগে হস্তশিল্পের মালিকগণ নিজেদের সংঘবদ্ধ করে সংঘ স্থাপন করল। এই সংঘ ছিল দুই প্রকার ঃ

(অ) কারিগরী সংঘ (Craft guild)

(আ) বণিক সংঘ (Merchant guild)

এই যুগে উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হল। তিনটি পৃথক শ্রেণীর উদ্ভব হল ঃ

(১) শিল্প-শিক্ষক (master)—যারা বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা প্রদান করতেন।

(২) শিক্ষানবীশ (apprentice)—যারা শিল্প-শিক্ষকের অধীনে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষালাভ করতেন।

(৩) ভ্রাম্যমাণ শিল্পী (journey man)—যারা কারিগরী শিক্ষা লাভের পর নিজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন।

(গ) গার্হস্থ্য উৎপাদন ব্যবস্থা (Domestic System or Putting out System) ঃ এই ব্যবস্থায় বণিকগণ কারিগরদের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতেন। কারিগররা নিজেদের বাড়িতে বসে মজুরীর বিনিময়ে পণ্য উৎপাদন করতেন।

(ঘ) কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা (Factory System) ঃ নিজের নিজের চেষ্টায় উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে না পেরে কারিগররা একজোট হয়ে একছাদের নীচে উৎপাদন শুরু করল। এই সময়ে ঃ—

(ক) উন্নতমানের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হল।

(খ) ব্যবসার আয়তন বৃদ্ধি পেল।

এইভাবেই আধুনিক কারবারের জন্ম হল।

৭২.২ কারবার কথাটির অর্থ

প্রস্তাবনা পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে কীভাবে আধুনিক কারবারের জন্ম হল।

এখন প্রশ্ন হল কারবার কাকে বলে? ইংরেজী Business শব্দটির বাংলা প্রতিরূপ হল কারবার। Business শব্দটি Bussyness শব্দ থেকে এসেছে। Busyness কথাটির অর্থ হল ব্যস্ত থাকা। তবে যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকাকেই আমরা কারবার বলব না। সেই কাজ পুনঃপুনঃ উৎপাদন ও বিক্রয়-সংক্রান্ত হওয়া চাই এবং এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হওয়া চাই।

Business শব্দটির বিভিন্ন অর্থ আছে। Business শব্দটির অভিধানগত (Dictionary) অর্থ হল পেশা (occupation)। তত্ত্বগতভাবে (Etymologically) Business শব্দটির অর্থ হল কোনো কিছুতে ব্যস্ত থাকা (the state of being busy)। অর্থনীতির (Economics) দিক দিয়ে (Business) কথাটির অর্থ হল টাকাকড়ি রোজগারের কাজে ব্যস্ত থাকা (the state of being busy in money earning activities)। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে (in commercial sense) Business কথাটির অর্থ হল পণ্য বা সেবার পুনঃপুনঃ ক্রয়বিক্রয়।

অর্থাৎ সাধারণভাবে কারবার বলতে আমরা বুঝি বারবার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সুবিধা লাভের বিষয়টিকে।

কারবারের সংজ্ঞাকে প্রধানত দুইটি দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংজ্ঞা

(খ) ক্রিয়াগত সংজ্ঞা

৭২.২.১ কারবারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞায় কারবারকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক Norman Richard Ownes-এর মতে, যে প্রতিষ্ঠান বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন কাজে লিপ্ত থাকে বা দামের বিনিময়ে সেবা পরিবেশন করে, তাকে কারবার বলে। ("Business means an enterprise engaged in the production and distribution of goods for sale in a market or the rendering of services for a price.")।

৭২.২.২ কারবারের ক্রিয়াগত সংজ্ঞা

এই সংজ্ঞায় কারবারের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও মুনাফা অর্জন সংক্রান্ত কাজকর্মের আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক M.C. Shukla-র মতে কারবার মানুষের সেই সকল কার্যকলাপ বা পণ্য উৎপাদন বা ক্রয় সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত থাকে এবং তা (পণ্য) মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে। ("Functionally, by business, we mean those human activities which involve production or purchase of goods with the object of selling them at a profit.")।

এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কারবারের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। পরিধি বলতে বোঝায় বিস্তৃতি। কারবারের সংজ্ঞা আলোচনা করে কারবারের পরিধি সম্বন্ধে বলা যায় যে ঃ

(ক) প্রকৃতি থেকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কাঁচামাল আনা।

(খ) সেই কাঁচামালগুলোকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্যে রূপান্তরিত করা।

(গ) উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

এই আলোচনা থেকে কারবার কীভাবে সৃষ্টি হল, কারবারের সংজ্ঞা ও পরিধি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা হল। এবার নীচের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

অনুশীলনী—১

১) কোন কোন স্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক কারবারের জন্ম হল? ঐ স্তরগুলির বৈশিষ্ট্য কি?

২) কারবারের প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ও ক্রিয়াগত সংজ্ঞা কি?

৩) খুব সংক্ষেপে কারবারের পরিধি আলোচনা করুন।

৭২.৩ কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য

কারবারের আয়তন যে রকমই হোক না কেন, ছোট, মাঝারী বা বড়; কিংবা কারবার একমালিকী প্রতিষ্ঠানই হোক বা হিন্দু পারিবারিক কারবার, কিংবা অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী কোম্পানী—যে কোনো প্রকার কারবারেরই কিছু মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় কোনো একটি প্রতিষ্ঠান কারবার কিনা তা চেনার কয়েকটি লক্ষণ।

কারবারের মৌলিক সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(১) **যে কোনো কারবারই অর্থনৈতিক কাজ ঃ** যে কোনো কারবারের প্রতিটি কাজই অর্থনৈতিক অর্থাৎ বারংবার ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজই কারবারের অন্তর্গত।

(২) **বারংবার উৎপাদন ও বিনিময় ঃ** কেবলমাত্র একবার ক্রয় বা বিক্রয় করলেই সেই কাজ কারবার বলে গণ্য হবে না। এই ক্রয়বিক্রয়ের কাজ বারবার হওয়া চাই। যদি কোনো ব্যবসায়ী নিজে উৎপাদন না করে তবে তার ক্ষেত্রে দ্রব্য বিক্রি নিয়মিত ও বারবার হওয়া চাই। এই বারবার ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে দ্রব্য বা সেবাকর্মের মালিকানার হস্তান্তর হয়।

(৩) **ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সুবিধা ঃ** কারবারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল এই ক্রয় ও বিক্রয় কাজের মধ্য দিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই কিছু সুবিধা লাভ করবে। বিক্রেতা যেমন দ্রব্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবে সেই রকমই ক্রেতাও দ্রব্য ব্যবহার করে উপযোগিতা লাভ করবে অর্থাৎ ক্রেতা তার অভাব পূরণ করবে।

(৪) **পূর্বানুমান ঃ** পূর্বানুমান বলতে বোঝায় বর্তমান অবস্থা থেকে অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আঁচ করা। ভবিষ্যতের আনুমানিক চাহিদা যদি সঠিকভাবে অনুমান করা যায় তবেই ব্যবসায়ী উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেই অভাব পূরণে সমর্থ হবে।

(৫) **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ঃ** বলা হয় "No risk, no gain"। অর্থাৎ ঝুঁকি না নিলে লাভের মুখ দেখা সম্ভবপর নাও হতে পারে। যেহেতু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত তাই ভবিষ্যতের চাহিদার অনুমানেরও হেরফের হতে পারে। তাই বলা হয় কারবারে ঝুঁকি বর্তমান। ঝুঁকির পরিমাণ আন্দাজ করে যদি কোনো কারবারী উৎপাদন করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারবেন না।

(৬) **সংগঠন ঃ** যে কোনো কারবারের ক্ষেত্রেই সংগঠন অপরিহার্য। সংগঠন ছাড়া কারবার অচল। কারবারের আকার বা আয়তন যাই হোক না কেন, বলিষ্ঠ সংগঠন যে কোনো কারবারের 'হৃদস্পন্দন'। কারবারের ক্ষেত্রে সংগঠনের গুরুত্ব মানুষের ক্ষেত্রে প্রাণের গুরুত্বের মতোই।

(৭) **মূলধন ঃ** প্রয়োজনীয় মূলধন ছাড়া কারবার চালু হতে পারে না। কারবারের আকার বা আয়তন ও গুরুত্ব অনুযায়ী মূলধনের পরিমাণ বিভিন্ন হতে পারে। কারবারে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা, কর্মচারীদের মাইনে দেবার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন কারবারকে সতেজ ও সজীব রাখতে সাহায্য করে।

(৮) **মুনাফা ঃ** বলা হয় মুনাফা যোগ্যতার মাপকাঠি—সাফল্যের মানদণ্ড। মুনাফা সৃষ্টি যে কোনো কারবারেরই একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কারবারের আয় থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশই মুনাফা। মুনাফা কারবারের প্রাণস্বরূপ। মুনাফা না হলে কোনো কারবার বাঁচতে পারে না। কারবারের স্থায়িত্ব লাভের জন্য অবিরাম মুনাফা সৃষ্টি একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ।

(৯) **সেবার মনোভাব ঃ** কারবারের সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে কারণ সমাজের জন্যই কারবার বেঁচে থাকে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট কারবার দায়বদ্ধ। সঠিক মানের, সঠিক মূল্যের দ্রব্য সঠিক সময়ে পরিবেশন করাই কারবারের কাজ।

(১০) **প্রবর্তক ঃ** কোনো কারবার যাদের প্রাথমিক পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে তাদের প্রবর্তক বলে। বাজারের চাহিদা নির্ণয় করে কারবারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করাই প্রবর্তকের প্রধান কাজ।

অনুশীলনী—২

১) কারবারের বারংবার উৎপাদন ও বিনিময় কি অপরিহার্য?

২) পূর্বানুমানের প্রয়োজনীয়তা কি?

৩) কেন বলিষ্ঠ সংগঠন কারবারের 'হৃদস্পন্দন'?

৪) কারবারের সমাজের প্রতি কী কী দায়িত্ব আছে?

৭২.৪ কারবারের প্রয়োজনীয় উপাদান

কাজের দিক দিয়ে বিচার করলে একটি কারবারের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি ঃ

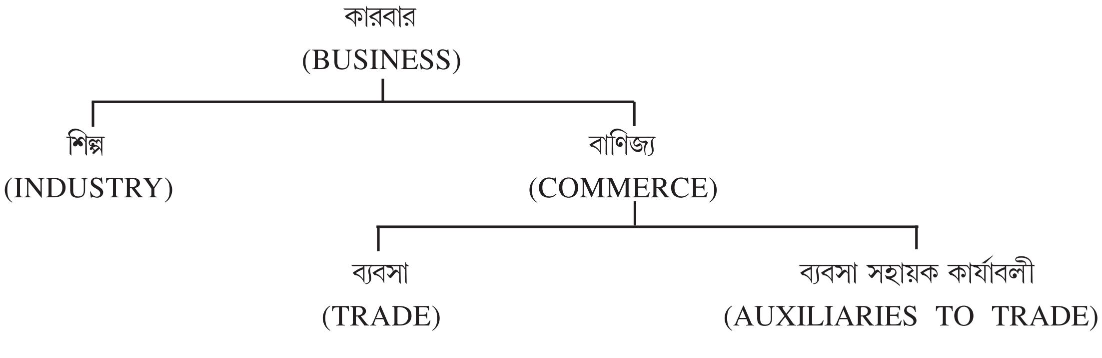

৭২.৪.১ শিল্প

শিল্প বলতে বোঝায় কাঁচামাল থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য তৈরী করা। যেমন, বাঁশ থেকে কাগজের মণ্ড তৈরি করে তারপর কাগজ তৈরি করা হয়। শিল্পের মূল কাজই হল উপযোগিতা সৃষ্টি করা।

শিল্পের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

(ক) শিল্পের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক। কাঁচামাল থেকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করাই এর প্রধান কাজ।

(খ) শিল্প মানুষের অভাব পূরণ করে।

(গ) শিল্প দ্রব্যের উপযোগিতা সৃষ্টি করে।

(ঘ) শিল্প দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি।

(ঙ) দ্রব্যের আকারগত বা রূপগত পরিবর্তন করে।

৭২.৪.২ শিল্পের বিভিন্ন ভাগ

দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে শিল্পকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) প্রাথমিক ও

(খ) গৌণ।

প্রাথমিক শিল্পকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) নিষ্কাশন শিল্প (Extractive Industry)

(২) প্রজনন শিল্প (Genetic Industry)

নিষ্কাশন শিল্প ঃ যে শিল্প প্রচেষ্টায় প্রকৃতি থেকে দ্রব্য আহরণ করা হয় তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে। এই শিল্পে মনুষ্যশক্তি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। এই নিষ্কাশন শিল্পকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক বা সাধারণ ও যান্ত্রিক।

প্রাথমিক নিষ্কাশন শিল্প বলতে গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ, ফল সংগ্রহ ইত্যাদিকে বোঝায়।

যান্ত্রিক নিষ্কাশন শিল্প বলতে যন্ত্রের সাহায্যে খনি থেকে পদার্থ তোলা, মৎস্য শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদিকে বোঝায়। যদিও ওপরের তিন ধরনের কাজ ছোট আকারে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও করা যায়।

প্রজনন শিল্প ঃ এই ধরনের শিল্প বলতে জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি, পশুপাখি পালন এবং গাছপালা, উদ্ভিদ ইত্যাদির চাষ করা বোঝায়। এই শিল্পের পণ্য পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের শিল্পেও মনুষ্যশক্তি এক বড় ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের শিল্পের উদাহরণ হিসাবে দোহশালা (ডেয়ারি), খামার (পোলট্রি), নার্সারি ও মাছের ভেড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

গৌণ শিল্পকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) সর্জন শিল্প (Manufacturing Industry)

(২) নির্মাণ শিল্প (Constructive Industry)

(১) সর্জন শিল্প ঃ শ্রম ও যন্ত্রের দ্বারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করার শিল্প প্রচেষ্টাকে সর্জন শিল্প বলা হয়। সর্জন শিল্পকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) অবিরাম শিল্প (Continuous Industry)

(খ) একত্রীকরণ শিল্প (Assembly Industry)

(গ) বিশ্লেষণাত্মক শিল্প (Analytical Industry)

(ঘ) মিশ্রণ ও যৌগিক শিল্প (Synthetic Industry)

(ঙ) প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প (Processing Industry)

(ক) **অবিরাম শিল্প ঃ** যে শিল্প প্রচেষ্টায় ব্যবস্থার একদিকে কাঁচামাল দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে প্রস্তুত হওয়া দ্রব্য পাওয়া যায় এবং যে পদ্ধতি অবিরামভাবে চলতে থাকে তাকে অবিরাম শিল্প পদ্ধতি বলে। যথা—কার্পাস-বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, গ্লাস শিল্প ইত্যাদি।

(খ) **একত্রীকরণ শিল্প ঃ** এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় একটি দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাঁচামাল দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রথমে তৈরি করা হয়। পরে তৈরি হয়ে যাওয়া বিভিন্ন অংশ একত্রে জুড়ে তৈরি হয় সম্পূর্ণ দ্রব্য। যথা—মেশিনারী তৈরি শিল্প, গাড়ি নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি।

(গ) **বিশ্লেষণাত্মক শিল্প ঃ** এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় একই ধরনের কাঁচামাল থেকে প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়।

যেমন—অপরিশোধিত তেল যখন বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা হয় তখন আমরা নীচের জিনিসগুলো পাই ঃ—

(ঘ) **মিশ্রণ বা যৌগিক শিল্প ঃ** এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল মিশিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন—স্টীল, ড্রাগস, সিমেন্ট ইত্যাদি।

(ঙ) **প্রক্রিয়াভিত্তিক শিল্প ঃ** এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় নতুন কোন দ্রব্য তৈরি হয় না, কেবলমাত্র গুণগত পরিবর্তন হয় মাত্র। যেমন—ছাপার কাজ (প্রিন্টিং), হিট্-ট্রিটমেন্ট, রেফ্রিজারেশন ইত্যাদি।

(২) নির্মাণ শিল্প ঃ যে ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় বাসগৃহ, রাস্তা, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় তাকে নির্মাণ শিল্প বলা হয়। এই ধরনের শিল্প প্রচেষ্টায় মনুষ্যশক্তি একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

৭২.৪.৩ ব্যবসা

ব্যবসা বলতে বোঝায় উৎপাদনের জায়গা থেকে ভোগের জায়গা অথবা উৎপাদকের কাছ থেকে ভোগকারীর কাছে অথবা উদ্বৃত্তের জায়গা থেকে ঘাটতির জায়গায় পণ্য পৌঁছানোর কাজকে। এটা হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিনিময় অথবা বিক্রী অথবা পণ্য হস্তান্তর হয়।

ব্যবসার বিভিন্ন ভাগ ঃ

(ক) কাজের পরিধির ওপর ভিত্তি করে—

কাজের পরিধির ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয়—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যখন একই দেশের মধ্যে উৎপাদন ও বিক্রি হয় তখন তাকে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বলে। এই প্রক্রিয়া খুব একটা জটিল নয়। যখন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পণ্য কেনাবেচা হয় তখন তাকে বহির্দেশীয় ব্যবসা বলে। এই প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল কারণ এখানে সংশ্লিষ্ট দুই দেশেরই নিয়মকানুন মেনে ব্যবসা সংগঠিত হয়। এই ধরনের ব্যবসাকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

(১) আমদানি ও

(২) রপ্তানি।

এছাড়াও কাজের পরিধির ওপর ভিত্তি করে ব্যবসার আরও একটি ভাগ লক্ষ্য করা যায় তাকে পুনরায় রপ্তানি ব্যবসা বলা যেতে পারে। এই ধরনের ব্যবসায় কোনো একটি দেশ পণ্য আমদানি করে এবং তারপর সেই দ্রব্য থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন কোনো দ্রব্য তৈরি করে তা অন্য কোনো দেশে পুনরায় রপ্তানি করা হয়।

(খ) বিক্রির এককের ওপর ভিত্তি করে ঃ

কত পরিমাণ দ্রব্য বিক্রি করা হল তার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা।

পাইকারি ব্যবসাতে পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে একসঙ্গে অনেক দ্রব্য কিনে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বেশি পরিমাণে বিক্রি করা হয়।

খুচরা ব্যবসায়ে সরাসরি ভোগকারীর কাছে চাহিদামত ছোট ছোট অংশে পণ্য বিক্রি করা হয়।

অনেক লেখক আভ্যন্তরীণ ব্যবসাকে পাইকারি ও খুচরা—এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।

এবার আমরা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো এইভাবে আলোচনা করতে পারি ঃ—

(১) ব্যবসা বলতে সাধারণভাবে বিনিময়কে বোঝানো হয়। সংক্ষেপে যাকে ক্রয়বিক্রয় বলে থাকি।

(২) ব্যবসা উপযোগ সৃষ্টি করে।

(৩) এই উপযোগ ব্যক্তিগত বাধা দূর করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

(৪) ব্যবসা উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে পণ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করে।

৭২.৪.৪ বাণিজ্য

যে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির, স্থানের, সময়ের, তথ্যের, অর্থের ও ঝুঁকির বাধা দূর করে পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়, সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার সমষ্টিকে বাণিজ্য বলে। এই বাধাগুলো প্রধানত উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে অবস্থান করে।

বাণিজ্যে যে সকল বাধা দূর হয় সেই বাধাগুলি কী এবং সেগুলি কীভাবে দূর হয় তা এবার দেখা যাক ঃ—

ব্যক্তির বাধা দূর হয় বিনিময়ের মাধ্যমে,

স্থানের বাধা দূর হয় পরিবহণের মাধ্যমে,

সময়ের বাধা দূর হয় গুদামজাতকরণের মাধ্যমে,

তথ্যের বাধা দূর হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে,

অর্থের বাধা দূর হয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে,

ঝুঁকির বাধা দূর হয় বীমার মাধ্যমে।

এবার আমরা দেখব বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) বাণিজ্য ব্যক্তি, স্থান সময়, তথ্য, অর্থ ও ঝুঁকির বাধা দূর করে,

(২) বাণিজ্যের মাধ্যমেও উপযোগ সৃষ্টি হয়,

(৩) বাণিজ্য ব্যবসাকে সহায়তা করে।

বাণিজ্যের সামগ্রিক কার্যকলাপকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন ঃ—

(১) ব্যবসা (Trade) ও

(২) ব্যবসা সহায়ক কার্যাবলী (Auxiliaries to Trade)।

ব্যবসা সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার আমরা জানব ব্যবসা সহায়ক কার্যাবলী বলতে কী বুঝি?

সংক্ষেপে বলতে গেলে যে সমস্ত কার্যকলাপ পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহে ও কাঁচামাল থেকে পণ্য তৈরি হবার পর তা ভোগকারীর কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে তাকে ব্যবসা সহায়ক কার্যাবলী বলে। ব্যবসা সহায়ক কার্যাবলী মূলত সেবামূলক। কারণ, উৎপাদিত পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে ভোগকারীর কাছে পৌঁছে দেবার মধ্যে স্থানগত, কালগত, সময়গত, তথ্যগত, অর্থগত, ঝুঁকিগত ইত্যাদি বাধা অতিক্রম করতে হয়। ব্যবসা সহায়ক কার্যাবলী সেই সমস্ত সেবা পরিবেশন করে থাকে যা এই সমস্ত বাধা দূর করতে সাহায্য করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ব্যবসা (Trade) ও বাণিজ্য (Commerce) একই প্রকার অর্থবহন করে না। সংক্ষেপে এর কারণ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি,

(১) ব্যবসা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বাধা দূর করে, কিন্তু বাণিজ্য ব্যক্তিগত বাধা ছাড়াও স্থানগত, কালগত, অর্থগত, তথ্যগত, ঝুঁকিগত ইত্যাদি বাধা দূর করে।

(২) ব্যবসা পণ্য উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে বিনিময়ের কাজ করে। এই বিনিময় করতে গেলে, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বিজ্ঞাপণ, বীমা প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজের মিলিত রূপই হল বাণিজ্য।

(৩) বাণিজ্যকে যদি একটি মোট বা সমগ্র কার্যকলাপ বলা যায়, তবে ব্যবসা হচ্ছে তার একটা অংশমাত্র।

(৪) বাণিজ্য কারবারের একটি অংশ কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের একটি অংশ।

সুতরাং আমরা বলতে পারি বাণিজ্য = ব্যবসা (অর্থাৎ ব্যক্তিগত বাধা দূর করার উপায়) + উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য বাধা অর্থাৎ স্থানগত, সময়গত, অর্থগত, তথ্যগত, ঝুঁকিগত ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা। সুতরাং আমরা বলতে পারি ব্যবসা ও বাণিজ্য কখনই সমার্থক নয়।

তাহলে কি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই যাতে আমরা বলতে পারি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সব মিলিয়ে কারবার একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অবশ্যই পারি। নীচের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে ঃ

(১) শিল্পের কাজ হচ্ছে পণ্য উৎপাদন। সেই উৎপাদিত পণ্য ভোগকারীর কাছে পৌঁছিয়ে দেয় বাণিজ্য, ব্যবসা যার অন্যতম একটি অঙ্গ।

(২) শিল্প উৎপাদন না করলে বাণিজ্যের প্রয়োজন নেই। আবার ব্যবসা যদি কাঁচামাল শিল্পকে না এনে দেয় তবে উৎপাদনের কোনো প্রশ্ন নেই।

শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য তিনটির একসঙ্গে উপস্থিতিই কারবারকে বাস্তবে রূপ দেয়।

এদের মধ্যে কোনো একটিকে বাদ দিলে কারবারের সামগ্রিক চেহারা ফুটে উঠবে না।

অনুশীলনী—৩

১) কারবারের বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী?

২) শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য বলতে কী বোঝায়?

৩) ব্যবসা ও বাণিজ্য কী সমার্থক?

৪) শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কী?

৭২.৫ কারবারের কাজ

কাজ বলতে কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণকেই বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে কারবারের নিজের কোনো কাজ করার ক্ষমতা নেই। কারবারের হয়ে কারবারী বিভিন্ন কাজ করে থাকে। অর্থনীতিবিদ পিগু (Pigou)-র মতে, অর্থনীতিবিদরা যা করেন তাই অর্থনীতি। এই কথার অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি, কারবারী যা করেন তাই কারবার। এক কথায় আমরা বলতে পারি কারবারীর কাজই হল কারবার করা (Business of business is to do business)।

প্রকৃতপক্ষে কারবারের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) মুখ্য বা প্রধান বা প্রাথমিক কাজ ও

(খ) গৌণ বা সহায়ক কাজ।

কারবারের মুখ্য কাজকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ হল—উৎপাদন ও বিক্রয়। আবার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ হল—ক্রয় ও বিক্রয়।

এখন আমরা এই কাজগুলোকে একে একে আলোচনা করব।

(ক) **উৎপাদন ঃ** উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান হল উৎপাদন। উৎপাদনের মাধ্যমেই উপযোগিতা সৃষ্টি করা হয়। উৎপাদনের প্রধান কাজই হল কাঁচামালকে ভোগকারীর ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা।

(খ) **ক্রয় ঃ** উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই হোক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই হোক কাঁচামাল বা অন্য প্রকার প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করা প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান কাজ। যথাসম্ভব কম মূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করা যে কোনো কারবারেরই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(গ) **বিক্রয় ঃ** ক্রয়ের মত বিক্রয়ও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ। যে দ্রব্য উৎপাদন করা হবে তা উচিত দামে বিক্রি করে বিক্রেতা লাভের মুখ দেখার চেষ্টা করেন। এই লাভের মাধ্যমেই সম্পদ সৃষ্টি হয় যা আবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

এবারে আমরা দেখব কারবারের গৌণ বা সহায়ক কাজ বলতে কী বোঝায়?

এক কথায় আমরা বলতে পারি যে, কারবারের মুখ্য কাজগুলোকে সম্পন্ন করার জন্য যে যে কাজের সাহায্য ছাড়া চলে না তাকেই বলে কারবারের গৌণ বা সহায়ক কাজ। এই কাজগুলোকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(১) **পরিকল্পনা ঃ** প্রফেসর অ্যালেনের মতে পরিকল্পনা হল "ভবিষ্যৎকে ধরার জন্য একটি ফাঁদ।" অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী না চললে কারবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং ভবিষ্যতে কারবার তার লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হবে না।

(২) **অফিস স্থাপন ঃ** কারবারের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রয়োজন। এই কারণে একটি অফিস স্থাপন করা হয় যেখানে কারবারের সমস্ত দরকারী নথিপত্র, চিঠি ও অন্যান্য বিভিন্ন তথ্য সযত্নে রাখা হয়।

(৩) **অর্থের সংস্থান ঃ** কারবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখা দরকার। পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন কারবারে অক্সিজেনের কাজ করে।

(৪) **পণ্য মজুতকরণ ঃ** ভবিষ্যতের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য মজুত করা প্রত্যেক কারবারীর অবশ্য কর্তব্য। এর ফলে কারবার সময়গত বাধা দূর করতে পারে।

(৫) **সুষ্ঠুবণ্টন ঃ** পণ্য উৎপাদন, মজুতকরণের মত সুষ্ঠুবণ্টন ব্যবস্থাও কারবারের অন্যতম কাজ। সুষ্ঠুবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সঠিক ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই কারবার তার উদ্দেশ্য পালনে সমর্থ হয়।

(৬) **কর্মী সম্পর্ক ঃ** কর্মীরাই কারবারের প্রাণ। এরাই কারবারের প্রকৃত সম্পদ। কারবারের স্থায়িত্ব দীর্ঘস্থায়ী করতে গেলে কর্মীদের চাহিদা পূরণের দিকে নজর দেওয়া দরকার। কারবারের উচিত এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে মালিক-কর্মী সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

(৭) **হিসাবরক্ষণ ঃ** কারবারের যাবতীয় আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারবারের বর্তমান আর্থিক অবস্থা জানার জন্য ও ভবিষ্যতের সুষ্ঠু আর্থিক পরিকল্পনার বুনিয়াদ রচনা করার জন্য সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।

(৮) **গবেষণা ঃ** কারবার বাজারে তার দ্রব্যের চাহিদার ভবিষ্যৎ পরিমাণ অনুমান করার জন্য বাজার গবেষণার সাহায্য নিয়ে থাকে। সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বাজার গবেষণা কারবারে সাফল্য এনে দেয়।

শুধুমাত্র বাজার গবেষণা নয়, কারবার তার পণ্যের গুণমান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার জন্যও গবেষণা ইত্যাদি কাজে যুক্ত থাকে।

(৯) **প্রচার ঃ** শুধুমাত্র গবেষণা নয়, উৎপাদিত পণ্য সঠিক ক্রেতার হাতে পৌঁছাতে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রয়োজন। কারবারের উচিত সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে পণ্যকে জনপ্রিয় করে তোলা।

(১০) **ব্যবস্থাপনা ঃ** সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কারবারের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কারবারের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে এবং কারবারের ভবিষ্যৎ পথ প্রশস্ত ও সুগম করে।

অনুশীলনী—৪

১) কারবারের কাজকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

২) সব কারবারের কাজই কী এক প্রকার?

৩) কারবারের গৌণ কাজগুলি কী কী?

৪) তোমাদের মতে কারবারের আর কোনো গৌণ কাজ আছে কী?

৭২.৬ কারবারী কার্যাবলীর উদ্দেশ্য

প্রথমে জানা যাক্ উদ্দেশ্য বলতে আমরা কী বুঝি? উদ্দেশ্য হল কোনো প্রতিষ্ঠানের আগে থেকে ঠিক করে রাখা সেই সমস্ত কাজকর্ম যার দিকে লক্ষ্য রেখে ব্যক্তিগত বা দলীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। উদ্দেশ্য ঠিক করার পেছনে যে সমস্ত কারণগুলো বর্তমান তা হল ঃ

(ক) মানুষ যে কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে চায়।

(খ) উদ্দেশ্য হল একপ্রকার 'মান' যাকে সামনে রেখে হয়ে যাওয়া কাজের পরিমাপ করা হয়।

এটা সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে কারবার কেবলমাত্র লাভের জন্যই তার সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করে। এটা পুরোপুরি সত্য নয়, আংশিক সত্য। কেবলমাত্র লাভ নয়—কারবারকে অন্যান্য কাজের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। হেনরি ফোর্ড তাঁর জীবনীগ্রন্থে বলেছেন, "কেবলমাত্র টাকার পেছনে ছোটাই কারবার নয়।" তিনি তাঁর কারবারে সেবার ভূমিকাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, এমনকি তিনি অল্প আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা মাথায় রেখে তার উৎপাদন-পরিকল্পনা ঠিক করতেন।

তাই বলা হয়, কারবার এমন একটি আর্থিক কাজ যা কোনো ব্যক্তির (উদ্যোক্তা) দ্বারা, কোনো ব্যক্তির (কর্মচারী) সাহায্যে, কোনো ব্যক্তির (ভোগকারী) উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কারবারের উদ্দেশ্য একদিকে তার কাজ ও অন্যদিকে পরিবেশের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ঠিক করা হয়।

উপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে কারবারের উদ্দেশ্যকে এইভাবে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) জৈবিক উদ্দেশ্য, (খ) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য, (গ) সামাজিক উদ্দেশ্য, (ঘ) মানবিক উদ্দেশ্য, (ঙ) জাতীয় উদ্দেশ্য।

এখন আমার এই উদ্দেশ্যগুলোকে এইভাবে আলোচনা করতে পারি ঃ—

(ক) **জৈবিক উদ্দেশ্য ঃ** মানুষের জীবনের মত শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি মুহূর্তগুলো কারবারের জীবনেও বর্তমান। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্যগুলো হল—

(১) অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা

(২) অস্তিত্ব রক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা সফল হয়ে কারবারের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানো ও একই সাথে আয়তন বাড়ানোর চেষ্টা।

(৩) এই প্রচেষ্টা সফল হলে যে পরিবেশে কারবার অবস্থান করে সেখানে সামাজিক মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা ও তার মাধ্যমে সুনাম বাড়ানোর চেষ্টা।

(খ) **অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ঃ** কারবারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যগুলো হল—

(১) মুনাফা অর্জন ঃ এটা ঠিক কথা যে কারবার পরিচালনা করার জন্য মুনাফাই একমাত্র প্রধান রসদ। কেবলমাত্র সেবাপ্রদান নয়, এর পাশাপাশি মুনাফা অর্জনও কারবারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই মুনাফা অর্জনের পরিমাণ কখনই সবচেয়ে বেশি মুনাফা নয়। সেটা হবে কারবার ঠিকমত পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় মুনাফা। কিন্তু প্রশ্ন হল মুনাফা অর্জন কি সত্যিই অতি প্রয়োজনীয়? উত্তর হল, হ্যাঁ। কিন্তু কেন? কারণ—

— এটা কারবারের বেঁচে থাকার রসদ,

— এর কিছু অংশ ব্যবহার করে কারবারের আয়তন ও শ্রীবৃদ্ধি বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে,

— সঠিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন কারবারের যোগ্যতার মাপকাঠি,

— কারবারের বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য এটা পুরস্কার হিসাবেও কাজ করে,

— যদি কোনো কারবার অবিচ্ছিন্নভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে তবে তার সামাজিক প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়,

— সঠিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্রেতা সমাগমে সাহায্য করে।

অতএব দেখা গেল মুনাফার প্রয়োজনীয়তা কারবারের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

(গ) **সামাজিক উদ্দেশ্য ঃ** কারবার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কারবারের যেমন সমাজের প্রতি কিছু আশা আছে, ঠিক সেইরকমই সমাজও কারবারের কাছ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক আচরণ আশা করে। সমাজ আশা করে কারবার তার চিরাচরিত ক্রয়বিক্রয় ছাড়াও তার বাইরে কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। কিথ্ ডেভিস বলেছেন যেখানে আইনগত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় সেখান থেকেই কারবারের সামাজিক দায়বদ্ধতা শুরু হয়।

আলোচনার শুরুতে জেনে নেওয়া যাক্ কেন কারবার সমাজের কাছে দায়বদ্ধ? এর কারণ হল—

— কারবার চায় ক্রেতা সাধারণের কাছে একটা গ্রহণযোগ্য চরিত্র হিসাবে তার উপস্থিতি। এই গ্রহণযোগ্যতা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যদি কারবার তার সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

— কারবার বিপথে চালিত হলে সরকার বিভিন্নরকম নিয়মের বেড়াজালে কারবারকে বেঁধে রাখে। যদি কারবার তার সামাজিক দায়িত্ব সঠিকভাবে মেনে চলে তাহলে সরকার কারবারের কার্যকলাপে অহেতুক নিয়মের অনুশাসন চালাতে পারে না।

— কারবারকে সমাজে চিরস্থায়ী আসন লাভ করতে গেলে সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখালে চলবে না।

— কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহ কারবারের নৈতিকতা ও মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক।

আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম কারবার কেন সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে সমাজের কাছে কারবার দায়বদ্ধ?

কারবার সমাজের কাছে নিম্নলিখিতভাবে দায়বদ্ধ ঃ

— সঠিক মূল্যের সঠিক গুণমান সম্পন্ন পণ্য সঠিক সময়ে সঠিক ক্রেতার নিকট পৌঁছে দেওয়া।

— অতিরিক্ত মুনাফার জন্য প্রস্তুতি না নেওয়া।

— অসামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা।

— কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

— সমাজের উপযোগী দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, স্কুল নির্মাণে সহায়তা করা।

— কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা।

বস্তুতপক্ষে কারবারের সামাজিক দায়িত্ব কারবারের সামাজিক উদ্দেশ্যেরই প্রতিফলন মাত্র অর্থাৎ সঠিকভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনই সামাজিক উদ্দেশ্যের ফল বলে স্বীকৃত হয়।

— কর্মচারীরা নিজেদের কারবারের অঙ্গ হিসাবে ভাবতে শেখে না।

— কারবারের মূলধন জোগানে ঘাটতি হতে পারে।

— ক্রেতারা ব্যবসায়ের প্রতি তাদের আগ্রহ হারাতে শুরু করবে।

— সরকার তার নিয়মের বেড়াজালে কারবারকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবে।

— পাওনাদাররা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যাদি।

এবার দেখা যাক্ কারবারের সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি আছে কিনা? হ্যাঁ তা তো অবশ্যই আছে। তাহলে সেগুলি কী কী?

— প্রথমত হল কারবারের সামাজিক দায়িত্বের সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত আছে।

— কারবার যদি তার দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর মত পর্যাপ্ত মূলধন জোগাড় না করতে পারে তবে সে কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের মত কঠিন দায়ভার বহন করবে?

— প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ছাড়া দায়বদ্ধতা চাপানো নিষ্প্রয়োজন।

— সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান তো বর্তমান, তাহলে কারবারী প্রতিষ্ঠানের এই সঠিক দায়িত্বভার বহন করার যৌক্তিকতা কোথায়?

— এমনও তো হতে পারে যে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়ভার বহন করতে গিয়ে কারবার তার শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বা কারবারের ওপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখাতে পারে।

— এই কাজগুলি একেবারেই অনৈতিক হবে ও কারবারের স্বাভাবিক মূল্যবোধের অবমাননা করা হবে।

অতএব বলা যেতে পারে কারবারের সামাজিক উদ্দেশ্য পালন কিছুটা তার আর্থিক সচ্ছলতা কিছুটা তার সমাজে টিকে থাকার ওপর নির্ভরশীল।

(ঘ) **মানবিক উদ্দেশ্য ঃ** কারবারের কাছে প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার কর্মীরা। কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে কর্মীদের যদি কারবারের প্রতি একাত্ম করে তোলা না যায় তবে কারবার তার লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হবেই। কারবারের দক্ষতা ও সাফল্য মূলত কর্মীদের প্রচেষ্টা ও উৎসাহের ওপর নির্ভর করে। কারবারের বিভিন্ন মানবিক উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি হল ঃ

— কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন।

— কর্মীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান।

— কারবারের কাজে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মতদান।

— কারবারের সামগ্রিক কর্ম-সংস্কৃতির পুনরালোচনা ও প্রকৃত পথ নির্দেশ।

— কর্মীরা যাতে কাজে উৎসাহ পায় তা দেখা।

— কর্মী-সম্পদের বিকাশ, ইত্যাদি।

(ঙ) **জাতীয় উদ্দেশ্য ঃ** সমগ্র জাতির পরিচয় তার সামাজিক আচরণেই স্পষ্ট হয়। কারবার সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে জাতীয় উদ্দেশ্য পালনেও তার ভূমিকা পালন করে। একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক নতুন জাতির উন্মেষ ঘটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কারবারের জাতীয় উদ্দেশ্যগুলো এইভাবে লেখা যায় ঃ—

— সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন পরিকল্পনা স্থির করা,

— সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তি স্থাপন,

— ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের উন্নতিতে সহায়তা,

— জাতির আত্ম-নির্ভরতার প্রতি দায়িত্বশীলতা,

— দক্ষ ও পরিশ্রমী শ্রমিক তৈরির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির সহযোগী দক্ষতার উন্নতিসাধন করা।

— পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

এতক্ষণ আমরা যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করলাম তা যে কোনো কারবারের পক্ষেই প্রযোজ্য। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার উদ্দেশ্যর সামঞ্জস্য বিধান করাই ভালো কারবারের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অনুশীলনী—৫

১) কারবারের উদ্দেশ্য কাকে বলে?

২) কারবারের উদ্দেশ্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

৩) আপনার মতে কারবারের কোন উদ্দেশ্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয়? যুক্তিসহ বুঝিয়ে দিন।

৭২.৭ সারাংশ

এই একক পড়ে যে সকল বিষয়ে অবগত হল সেগুলো হল ঃ

(ক) কারবারের অর্থ,

(খ) কারবারের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য,

(গ) কারবারের শ্রেণীবিভাগ,

(ঘ) কারবারের বিভিন্ন কাজ ও

(ঙ) কারবারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য।

৭২.৮ অনুশীলনী

(১) যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকাকেই কি কারবার বোঝায়?

(২) শিল্পের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করুন।

(৩) কারবারের মূলগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বপ্রধান কোনটি?

(৪) কারবারকে কী সত্যিই সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত?

(৫) কেউ কেউ বলেন, কারবারের সামাজিক দায়িত্ব শতকরা নব্বুই ভাগ ক্রেতা সাধারণের নিকট নিজের ভাবমূর্তি গঠনে সচেষ্ট হওয়া ও বাকি শতকরা দশ ভাগ আত্মপ্রচারে ব্যস্ত থাকা। আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দিন।

(৬) মুনাফা অর্জনই কী কারবারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত?

৭২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Leo Huberman—*'Man's Worldly Goods'* (People's Publishing House, New Delhi)

২। ড. চিত্তরঞ্জন বসু—*'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)*

৩। গুহ-মুখার্জ্জী—*'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার নীতি'* (নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

৪। M.C. Shukla—*'Business Organisation and Management'* (S. Chand & Company Ltd.)

৫। J.P. Bose—*'An Outline of Business Organisation and Management* (Central Educational Enterprises)

একক ৭৩ ❑ দেশীয় কোম্পানী ও ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তির ভারতে ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজনীয় উপাদান—একটি সাধারণ তথ্য

গঠন

৭৩.০ উদ্দেশ্য
৭৩.১ প্রস্তাবনা
৭৩.২ দেশীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়বস্তু
৭৩.৩ ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়বস্তু
৭৩.৪ সারাংশ
৭৩.৫ অনুশীলনী
৭৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে শিক্ষার্থীরা নিম্নবিষয় দুটি জানতে পারবেন ঃ

(ক) ভারতের যদি কোনো দেশীয় কোম্পানী ব্যবসা শুরু করতে চায় তবে তাকে কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে।

(খ) একই রকম ভাবে যদি ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি ভারতে ব্যবসা শুরু করতে চায় (অর্থাৎ কোনো অফিস বা শাখা অফিস বা সংযোগকারী অফিস) খুলতে চায় তাহলে তাকে কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে?

[এই এককে কেবলমাত্র আইনি পদক্ষেপগুলোই আলোচনা করা হয়েছে।]

৭৩.১ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ব্যবসা শুরু করতে হলে দেশীয় ও বিদেশী কোম্পানীর কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনে ভারতবর্ষে কোনও দেশীয় কোম্পানীর ব্যবসা শুরু করার নির্দিষ্ট পদক্ষেপ উল্লেখ করা আছে। আবার নতুন প্রবর্তিত হওয়া ১৯৯৯ সালের বিদেশী মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনে The Foreign Exchange Management Act, 1999 ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি ভারতে তার কোনো অফিস বা কোনো সংযোগকারী অফিস খুললে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তার নিয়মকানুন উল্লেখ করা আছে। ২০০০ সালের ৩রা মে তারিখে “ফেমা ২২/২০০০—আর. বি.” (FEMA 22/200 RB)—এই নামের নোটিফিকেশনে এই সম্বন্ধীয় নিয়মকানুনের কথা বলা আছে। [সূত্র ঃ ভারতীয় রাজপত্র, ৮ই মে, ২০০০ সাল।]

৭৩.২ দেশীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়বস্তু

যে কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রেই ব্যবসা শুরু করতে গেলে তাকে কিছু বাণিজ্যিক ও কিছু আইনি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়। আমরা আগেই বলেছি এখানে কেবলমাত্র আইনি পদক্ষপেগুলোই আলোচনা করা হয়েছে।

দেশীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে আইনি ধাপগুলো এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

(ক) ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে দুজন ও সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে সাতজন সদস্য হলে তবেই কোম্পানী গঠন করা যেতে পারে। [ধারা ১২]

(খ) কোম্পানীর নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে খেয়াল হবে যে সেই নাম যেন কেন্দ্রীয় সরকারের মতে অবাঞ্ছিত না হয়। এও খেয়াল রাখতে হবে যে নতুন কোম্পানীর নাম কোনো প্রতিষ্ঠিত নিবন্ধিত কোম্পানীর নামের সাথে এক হওয়া চলবে না। [ধারা ২০]

(গ) এর পর কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিল তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনীয় দলিল বলতে আমরা স্মারকলিপি (Memorandum) [একে "পরিমেলবন্ধ"-ও বলা যায়] ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী (Articles of Association) [একে "পরিমেল নিয়মাবলী"-ও বলা যায়] বুঝি। স্মারকলিপিতে নাম, অবস্থান, উদ্দেশ্য, দায় ও মূলধনের ধারা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এই স্মারকলিপি ছাপানো, প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে ভাগ ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। আরেকটি প্রয়োজনীয় দলিল হল পরিমেল নিয়মাবলী। ঘরোয়া কোম্পানী তার পরিমেল নিয়মাবলী নিজে তৈরি করে। সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী তৈরি করতে পারে অথবা সিডিউল—১ (Schedule-1)-এর টেবিল 'এ' (Table-A)-এর নিয়মকানুন মেনে চলতে পারে।

(ঘ) কোম্পানীর স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী এর পর নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধনের জন্য উপস্থিত করতে হবে।

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি বা কোনো সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (যিনি কোম্পানী গঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন) অথবা পরিমেল নিয়মাবলীতে নাম আছে এমন কোনো ডিরেক্টর ইত্যাদির কাছ থেকে এই মর্মে একটা শংসাপত্র (Certificate) জোগাড় করতে হবে যে কোম্পানী গঠনের ক্ষেত্রে সমস্ত আইনি নিয়মকানুন মানা হয়েছে।

(চ) এছাড়া নীচের দলিলগুলোও নিবন্ধকের কাছে পেশ করতে হবে ঃ—

- পরিচালক হিসাবে কাজ করার জন্য পরিচালকদের সম্মতিপত্র।
- পরিচালকেরা যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনতে ইচ্ছুক এই বিষয়ে পরিচালকদের সম্মতিপত্র।
- প্রবর্তকদের মধ্যে যারা পরিচালক হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতীয়তা ইত্যাদির বিবরণ।

(ছ) নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সমস্ত কাজই কোম্পানী আইনের বিধি মেনে করা হয়েছে ও সমস্ত দলিলপত্র ঠিকমত পেশ করা হয়েছে তবে তিনি কোম্পানীকে নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র (Certificate of Incorporation) প্রদান করেন। ঘরোয়া কোম্পানী এই সার্টিফিকেট পেলেই কারবার শুরু করতে

পারে। কেবলমাত্র নিবন্ধকের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র পেলেই কোনো সার্বজনিক কোম্পানী কারবার শুরু করতে পারে না। কোনো কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী হিসাবে কারবার শুরু করতে হলে তাকে আরও কয়েকটি ধাপের অনুসরণ করতে হয়। সেই ধাপ Steps-গুলি হল ঃ

(১) শেয়ার বিলি করার জন্য বিবরণপত্র (Prospectus) তৈরি করতে হবে। কোম্পানী আইনের ২ নং শিডিউলে (Schedule-2) বিবরণীতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকা উচিত তা বলা আছে। এই বিবরণীর একটি কপি নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হবে ও তারপর জনসাধারণের কাছে বিলি করার জন্য উপস্থিত করতে হবে।

(২) যদি বিবরণপত্র প্রকাশ করা না হয় তবে বিবরণপত্রের পরিবর্তে একটা বিবৃতি প্রকাশ করতে হয়। কোম্পানী আইনের ৩নং শিডিউলে (Schedule-3) বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতিতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকবে তা বলা আছে।

(৩) বিবরণপত্র (বা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি) প্রকাশিত হবার পর কোম্পানী তার শেয়ার জনসাধারণের কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়ে। যদি কোম্পানী ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) সংগ্রহ করতে পারে তবেই সে শেয়ার বণ্টন (allotment) করতে পারে।

(৪) ডিরেক্টররা যে পরিমাণ শেয়ার কিনেছেন তার মূল্য দিয়েছেন কিনা এও দেখতে হবে।

এইসমস্ত কাজ হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হলে নিবন্ধক কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) প্রদান করেন। তবেই কোনো সার্বজনিক কোম্পানী তার কারবার শুরু করতে পারে।

৭৩.৩ ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়বস্তু

১৯৯৯ সালের বিদেশী মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনে ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি যদি ভারতে কোনো অফিস বা শাখা অফিস বা যোগাযোগরক্ষাকারী কোনো অফিস খুলতে চায় তবে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তার বিবরণ দেওয়া আছে। এই সংক্রান্ত নিয়মকানুন "ফেমা ২২/২০০০—আরবি" (FEMA 22/2000-RB) ও জি. এস. আর. ৪০৮ (ই) [G.S.R. 408 (E)] নম্বরের শংসাপত্রে দেওয়া আছে। এই আইন ২০০০ সালের ১লা জুন থেকে কার্যকর হয়েছে।

এই আইনে কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

এই আইনের ২ (বি) ধারায় 'বিদেশী কোম্পানী' বলতে বোঝায় ভারতের বাইরে নিবন্ধিত হয়েছে এমন কোনো বডি কর্পোরেট যার মধ্যে কোনো ফার্ম বা কোনো ব্যক্তিদের মিলিত সংস্থাকেও ধরা হয়।

২ (সি) ধারায় "শাখা" (Branch) বলতে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ধারা ২ (৯)-এর শাখা অফিসের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাকেই বোঝানো হয়েছে।

যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস বলতে ব্যবসার মুখ্য কার্যালয় বা হেড অফিস ও ভারতে অবস্থিত অফিসের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিসকেই বোঝানো হয়েছে। এই অফিস কোনো প্রকার বাণিজ্যিক বা শিল্পসম্পর্কীয় কাজকর্মে

নিযুক্ত থাকতে পারবে না। কেবলমাত্র সাধারণ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে টাকা বিদেশ থেকে আসবে তার সাহায্যেই এই জাতীয় অফিস তার খরচ চালাবে। [ধারা ২ (ই)]

'প্রজেক্ট অফিস' বলতে বোঝানো হয়েছে ভারতে কোনো প্রজেক্ট (প্রকল্প) চালানোর জন্য যদি কোনো অফিস খোলা হয় তা। তবে এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস ধরা হবে না। [ধারা ২ (এফ)]।

ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোনো প্রকার শাখা অফিস বা যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস বা প্রজেক্ট অফিস বা অন্য কোনো প্রকার অফিস ভারতে খুলতে পারবে না। কেবলমাত্র ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী যদি কোনো ব্যাঙ্কিং কোম্পানী ব্যবসা শুরু করার প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র পেয়ে থাকে তবে তাকে আর অন্য কোনো অনুমতি নিতে হবে না। [ধারা ৩]

এই আইনের ৪ নং ধারায় এও বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, ইরান অথবা চীনে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া উপরে উল্লেখ করা কোনোও প্রকার অফিস খুলতে পারবে না।

যদি ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি ভারতে কোনও শাখা অফিস বা যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস খুলতে চায় তবে তাকে "এফ-এন-সি-১" (FNC-1) নম্বরের ফর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করতে হবে। [ধারা ৫(১)]

যদি ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি ভারতের কোনও কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতে প্রকল্প চালু করার জন্য প্রস্তাব পায় এবং যদি—

(ক) সেই প্রকল্পে সরাসরি বিদেশ থেকে আসা অর্থ লগ্নী করা হয়,

বা

(খ) সেই প্রকল্পে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা [সে বাইল্যাটারাল হোক বা মাল্টিল্যাটারাল হোক] অর্থ লগ্নী করে,

বা

(গ) সেই প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়,

বা

(ঘ) যে ভারতীয় কোম্পানী এই প্রস্তাব দিয়েছে তাকে ভারতের কোনো আর্থিক সংস্থা বা ব্যাঙ্ক টার্ম লোন (Term Loan) অনুমোদন করে, তবে সেই ব্যক্তিকে FNC-1 নম্বরের ফর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আবেদন করতে হবে। [ধারা ৫(২)]

এই আবেদন পরীক্ষা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেবে। [ধারা ৫(৩)]

যদি কোনো ব্যক্তি শাখা অফিস বা যোগাযোগ রক্ষাকারী কোনও অফিস খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পায় [ধারা ৫ অনুসারে] তবে সেই অফিসে যে যে কাজ করতে পারবে তা হল—

(ক) **শাখা অফিসের ক্ষেত্রে ঃ** [সিডিউল ১ ও ধারা ৬ (১) অনুসারে]

(১) পণ্য আমদানী বা রপ্তানী,

(২) কোনও পেশাগত (Professional) বা উপদেষ্টা মূলক (Consultancy) কাজকর্ম,

(৩) মূল-কোম্পানী (Parent Company) যে কাজে নিযুক্ত সেই সম্বন্ধীয় কোনো গবেষণামূলক কাজকর্ম,

(৪) ভারতীয় কোম্পানী এবং মূল (Parent) কোম্পানী বা ওভারসীজ গ্রুপ কোম্পানী (Overseas Group Company)-র মধ্যে কোনো প্রকার কারিগরীমূলক (technical) অথবা আর্থিক (financial) সহযোগিতামূলক কাজকর্ম,

(৫) মূল কোম্পানীর (Parent Company) প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে কাজ করা ও তাদের হয়ে দ্রব্য কেনা বেচা করা,

(৬) ভারতে তথ্য প্রযুক্তি ও সফ্‌টওয়ারের উন্নতিকল্পে কোনও কাজ,

(৭) মূল কোম্পানী বা গ্রুপ কোম্পানী যে দ্রব্য পাঠাচ্ছে তার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা দেবার কাজ,

(৮) বিদেশী উড়োজাহাজ বা জাহাজ (airline/shipping) কোম্পানী হিসাবে কাজ করা।

আবার যদি সেই ব্যক্তি কোনও প্রকল্প বা সাইট অফিস খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পায় তবে সিডিউল ২ ও ধারা ৬ (২) অনুসারে সেই অফিস যে যে কাজ করতে পারবে তা হল—

(১) মূল কোম্পানী (Parent Company) বা গ্রুপ কোম্পানী (Group Company)-র প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে কাজ করা,

(২) ভারতের থেকে বাইরে বা বাইরের থেকে ভারতে যথাক্রমে রপ্তানী বা আমদানী সংক্রান্ত কাজ,

(৩) ভারতীয় কোম্পানী এবং মূল কোম্পানী (Parent Company) বা গ্রুপ কোম্পানীর মধ্যে কোনও প্রকার কারিগরিমূলক অথবা আর্থিক সহযোগিতামূলক কাজকর্ম,

(৪) মূল কোম্পানী (Parent Company) ও ভারতীয় কোম্পানীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী মাধ্যম হিসাবে কাজ করা।

এই আইনের ৫নং ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভারতে শাখা বা প্রকল্প অফিস খোলার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পায় এবং সে যদি এই অফিস থেকে উদ্ভুত লাভ (যথাযথ কর বাদ দেবার পর) বিদেশে পাঠাতে চায় তবে তাকে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনুমোদনকারী প্রতিনিধির কাছে পেশ করতে হবে ও লাভ হয়েছে এই মর্মে তার সন্তুষ্টিবিধান করতে হবে।

শাখা অফিস থেকে উদ্ভুত লাভের ক্ষেত্রে নীচে উল্লেখ করা কাগজপত্র পেশ করতে হবে—

(১) সংশ্লিষ্ট বছরের নিরীক্ষা করা হয়েছে এমন লাভ-ক্ষতি ও উদ্বৃত্তপত্রের শংসাপত্র,

(২) একজন সনদপ্রাপ্ত, গাণনিকের এই মর্মে নিম্নবর্ণিত অভিমতসহ প্রশংসাপত্র যুক্ত থাকবে।

- কীভাবে প্রেরণযোগ্য লাভ হিসাব করা হয়েছে,
- কেবলমাত্র অনুমোদিত কাজকর্মের ফলেই এই প্রেরণযোগ্য লাভ উদ্ভুত হয়েছে,

- এই লাভের মধ্যে শাধা অফিসের সম্পত্তির পুর্নমূল্যায়নজনিত লাভ নেই।

কোনও প্রকল্প সমাধান হলে যদি কোনও উদ্বৃত্ত হয় তার ক্ষেত্রে যে যে কাগজপত্র পেশ করতে হবে, সেগুলি হল ঃ—

- প্রকল্পের হিসাবের সর্বশেষ নিরীক্ষিত শংসাপত্র,
- কীভাবে এই উদ্বৃত্ত উদ্ভুত হল সেই মর্মে একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষকের কাছ থেকে শংসাপত্র,
- প্রয়োজনীয় আয়কর দেওয়া হয়েছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র বা ভারতীয় করের ক্ষেত্রে দায় মেটানোর জন্য যথাযথ ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়েছে—এই মর্মে কোনো সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষকের কাজ থেকে শংসাপত্র।
- প্রকল্পের কোনও আইনগত দায় নেই মর্মে নিরীক্ষকের শংসাপত্র।

FNC-1 ফর্ম চীফ্ জেনারেল ম্যানেজার, এক্সচেঞ্জ কনট্রোল ডিপার্টমেন্ট (ফরেন্ এক্সচেঞ্জ ডিভিসন), রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল অফিস, মুম্বই-৪০০০০১—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

৭৩.৪ সারাংশ

উপরের আলোচনা থেকে শিক্ষার্থীরা জানলেন কীভাবে ভারতে কোনও ব্যবসা চালু করতে গেলে ভারতীয় কোম্পানী ও বিদেশের কোনও ব্যক্তিকে কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলো নিতান্তই আইনি এবং কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম হওয়া কাম্য নয়।

৭৩.৫ অনুশীলনী

একক তো আপনারা মন দিয়েই পড়লেন। এবার তাহলে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যাক ঃ—

(১) কোন ভারতীয় কোম্পানী ভারতে ব্যবসা শুরু করতে গেলে কী কী পদক্ষেপ অনুসরণ করবে?

(২) ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি ভারতে কোনও শাখা অফিস বা যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস বা প্রকল্প অফিস খুলতে ইচ্ছুক হলে তাকে কী কী আইনি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে?

(৩) (ক) FNC-1 কী?

(খ) ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তি ভারতে অফিস খুলতে হলে কোথায় আবেদন করবেন?

(গ) এই অফিস খোলার নিয়মকানুন কোন আইনে বলা আছে?

(ঘ) ফেমা আইনে শাখা অফিস, যোগাযোগ রক্ষাকারী অফিস ও প্রকল্প অফিস বলতে কী বোঝেন?

(ঙ) কোন কোন দেশ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ছাড়া ভারতে কোনও শাখা অফিস খুললে সেই শাখা অফিস কী কী ধরণের কাজ করতে পারে?

(চ) ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি ভারতে কোনও শাখা অফিস খুললে সেই শাখা অফিস কী কী ধরনের কাজ করতে পারে?

(ছ) ভারতের বাইরে বসবাসকারী কোনও ব্যক্তি ভারতে কোনও প্রকল্প অফিস খুললে সেই অফিস কী কী ধরনের কাজ করতে পারে?

(জ) এই শাখা অফিস বা প্রকল্প অফিস থেকে উদ্ভুত লাভ বা উদ্বৃত্ত বিদেশে পাঠাতে হলে কী কী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনুমোদনকারী প্রতিনিধির কাছে পেশ করতে হবে?

৭৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। *Taxmann's Corporate Laws, 1999.*

২। *The Gazatte of India (No. 255), New Delhi. Dated 18th May, 2000.*

৩। ড. চিত্তরঞ্জন বসু—'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা', এ. কে. সরকার এণ্ড কোং।

একক ৭৪ ❑ ব্যবসায়ে মূলধনের সংস্থান

গঠন

৭৪.০ উদ্দেশ্য

৭৪.১ প্রস্তাবনা

৭৪.২ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের উৎস

৭৪.৩ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া, সিকিউরিটিজ্ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইন্ডিয়া

৭৪.৫ ক্রেডিট রেটিং বা সুনাম নির্ধারণ

৭৪.৬ সারাংশ

৭৪.৭ অনুশীলনী

৭৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনারা নিম্নে বর্ণিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারবেন ঃ

- ব্যবসায়ের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ কোথা থেকে পাওয়া যায়।
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া ও সিকিউরিটিজ্ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইন্ডিয়া কীভাবে এই পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে?
- স্টক এক্সচেঞ্জ বা সংভার বিনিময়কেন্দ্র শেয়ার তালিকাভুক্তির নিয়মকানুন কী কী?
- কোনও সংস্থার সুনাম নির্ধারণ কীভাবে হয়ে থাকে?

৭৪.১ প্রস্তাবনা

কারবার স্থাপন করতে গেলে ও সেই কারবার চালাতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে অর্থের। অর্থই যেহেতু মূল চালিকাশক্তি তাই অর্থের জোগান ঠিকমত ও ঠিক সময়ে হওয়া উচিত। সাধারণ ব্যবসায়ে অর্থের জোগান কারবারী নিজে করতে পারেন তিনি ধার করে টাকা আনতে পারেন। তবে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধার করে ব্যবসা করাই না কি ভাল। বিশেষজ্ঞদের কথাকে সম্মান জানাতে গেলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে কোথা থেকে ধার করে টাকা পাওয়া যায়? সেই টাকা কীভাবে পাওয়া যায়? তার কোনো সুবিধা বা অসুবিধা আছে কি? এই একক পাঠ করলে আমরা এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারব। এই ব্যাপারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় আমরা দেখতে পাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া ও সিকিউরিটিজ্ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইন্ডিয়াকে। এদের সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত জানব। যে সমস্ত কোম্পানী সঠিক এক্সচেঞ্জে বা সংভার বিনিময় কেন্দ্রে তাদের শেয়ারকে তালিকাভুক্ত করতে চান তাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। কোম্পানী আইনের ৭৩ (১) ধারায় এই সম্বন্ধে বলা আছে।

এই শেয়ার কেনার সময় অর্থাৎ কোনও কোম্পানীকে কোনও অর্থবিনিয়োগ করার সময় বিনিয়োগকারীরা কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোম্পানীর সুনাম নির্ধারণ (Credit Rating) সংস্থাগুলো। এই ব্যাপারে ক্রিসিল (CRISIL) ও ইকরা (ICRA)-র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭৪.২ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের উৎস

মূলধনের বিভিন্ন উৎসকে আমরা এখানে দুভাগে ভাগ করেছি—

(ক) স্বল্পমেয়াদী ও

(খ) দীর্ঘমেয়াদী

স্বল্পমেয়াদী উৎসের ব্যবহার কেবলমাত্র দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উৎস সাধারণত মূলধন জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী যাই হোক তার সময়সীমা কত? অর্থাৎ কখন আমরা কোনও উৎসকে দীর্ঘমেয়াদী বলব আর কখনই বা স্বল্পমেয়াদী বলব। সাধারণত যে উৎস থেকে কারবারের জন্য টাকা ধার করা হয় তা যদি তিন বৎসর বা তার বেশি সময় পর শোধ করা হয় তবে তাকে আমরা দীর্ঘমেয়াদী উৎস বলব। অন্যথায় আমরা অন্যান্য উৎসকে স্বল্পমেয়াদী উৎস বলব।

বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উৎসকে আমরা এইভাবে ভাগ করতে পারি ঃ—

(ক) **স্বল্পমেয়াদী উৎস ঃ** বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) ব্যবসা ঋণ (Trade Credit)

(২) ব্যাঙ্ক ঋণ (Bank Credit)

(৩) ভোক্তা ঋণ (Consumer Credit)

(৪) ভাড়া-ক্রয় প্রথা (Hire Purchase)

(৫) ইজারা ঋণ (Lease Finance)

(৬) কমার্শিয়াল পেপার (Commercial Paper)

(৭) ফ্যাকটরিং (Factoring)

(৮) জন আমানত

এই স্বল্পমেয়াদী মূলধন কেবল কার্যকরী মূলধনের অভাব মেটায়। সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণের মেয়াদ এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য হয়।

এবার আমরা বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ঋণের উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করব ঃ

(১) **ব্যবসা ঋণ ঃ** স্বল্পমেয়াদী বিভিন্ন ঋণের মধ্যে এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। সাধারণত উৎপাদক পাইকারী ব্যবসাদার, ক্রেতা বা ভোক্তাদের এই ঋণ বিক্রির সময় দিতে থাকে। এই ধরনের ঋণ সাধারণত চলতি রীতি অনুযায়ী দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের ঋণ সংগ্রহমূল্য অত্যন্ত কম বলে এর জনপ্রিয়তা বেশি। সাধারণ দুইভাবে এই ঋণ নেওয়া হয়ে থাকে।

- খোলা হিসাব ঋণ পদ্ধতি—এখানে ক্রেতা কোনো আইনসম্মত দলিলে সই করে ঋণ নেন না।
- স্বীকার্য ঋণ পদ্ধতি—এখানে ক্রেতা আইনসম্মত দলিল অর্থাৎ বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বা প্রমিসরি নোটের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করেন।

এই ঋণের ব্যবহার কতগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—

- ক্রেতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা,
- ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ,
- বিক্রেতার আর্থিক অবস্থা,
- ঋণের অন্যান্য শর্ত।

সুবিধা ঃ (১) এই ঋণ সহজলভ্য,
(২) এই ঋণ পাবার ব্যাপারে কোনও আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন না করলেও চলে,
(৩) এই ঋণ বিরামহীনভাবে পাওয়া যায়,
(৪) যদি খোলা হিসাব ঋণ পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে কোনও জামিন না রাখলেও চলে,
(৫) এর সংগ্রহমূল্য প্রায় নেই বললেই চলে।

অসুবিধা ঃ (১) এই ঋণ পাওয়া যাবে কি না তা ক্রেতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে,
(২) সাধারণত পণ্যক্রয়ের পরিমাণ বেশি হলেই এই ধরনের ঋণ পাওয়া যেতে পারে,
(৩) বিক্রেতা অসাধু উপায় অবলম্বন করে ক্রেতাকে ঠকাতে পারে।

(২) **ব্যাঙ্ক ঋণ ঃ** আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়ে ঋণ দিয়ে থাকে—

- **লোন বা অগ্রিম**—ব্যাঙ্ক সাধারণত টার্ম লোন বা ডিমান্ড লোন দিয়ে থাকে। এই লোন বা অগ্রিম টাকার জন্য কোনও জামিন রাখলেও হয় আবার না রাখলেও হয়। সাধারণত রোকঋণ বা জমাতিরিক্ত ঋণের থেকে এর সুদের হার কম হয়। যে পরিমাণ টাকা অগ্রিম বাবদ দেওয়া হয় সেই পুরো টাকাটার ওপরই সুদ কাটা হয়, তা যিনি লোন নিয়েছেন তিনি পুরোটাই উত্তোলন করুন বা কিছু টাকা উত্তোলন করুন। এই ঋণের ক্ষেত্রেও সংগ্রহমূল্য কম।
- **রোকঋণ বা ক্যাশক্রেডিট**—সাধারণ ব্যাঙ্ক তার খরিদ্দারকে একটা সীমারেখা পর্যন্ত টাকা ধার করার অনুমতি দেয়। এই টাকা ধারের জন্য কোনও বস্তু ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক (hypothecation) রাখতে হয় বা জামানত (Pledge) রাখতে হয়। সাধারণত ঋণগ্রহীতা জামানত রাখার চেয়ে বন্ধক রাখাকেই বেশি পছন্দ করেন, কারণ কোনও বস্তু বন্ধক রাখলে তার মালিকানা ব্যাঙ্কের অধীনস্থ হয় না কিন্তু জামানতের বেলায় বস্তুটির মালিকানা ব্যাঙ্কের হয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতার নামে ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা থাকে এবং ঋণগ্রহীতা তার প্রয়োজনমত চেকের সাহায্যে সেই টাকা তুলতে পারে। কেবলমাত্র যে পরিমাণ টাকা তোলা হয় তার ওপরেই সুদ দিতে হয়।

- **জমাতিরিক্ত ঋণ** (Overdraft) ঃ এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের একটি চলতি হিসাব খুলতে হয়। সেই চলতি হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনমত টাকা তুলতে পারে। সাধারণত এই ক্ষেত্রে কত টাকা অবধি ঋণ পাওয়া যাবে তার একটা সীমারেখা ব্যাঙ্ক বেঁধে দেয়। সাধারণত কী ধরনের জামিন দেওয়া হচ্ছে এবং ঋণগ্রহীতার সুনাম ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই এই সীমারেখা ঠিক করা হয়ে থাকে।

এছাড়া হুণ্ডি (Bill of Exchange) ভাঙিয়েও ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়ে থাকে।

সুবিধা ঃ এই ব্যাঙ্ক ঋণের সুবিধাগুলি হল ঃ—

(১) এই ঋণের তুলনামূলকভাবে সুদের হার কম।

(২) যে কোনো উপায়ে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায় অর্থাৎ এটা নমনীয়।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে পরিচালিত হবার দরুন অতিরিক্ত সুদ দাবি করতে পারে না।

অসুবিধা ঃ এর অসুবিধা হল ঃ

(১) এই ঋণ পাওয়া সময়সাপেক্ষ।

(২) এই ঋণ পেতে গেলে প্রয়োজনমত জামিন রাখার প্রয়োজন আছে।

(৩) **ভোক্তা ঋণ ঃ** সাধারণত খুচরা কারবারীরা এই ধরনের ঋণ দিয়ে থাকেন। এই ঋণকে অনেক সময় কিস্তিবন্দি ঋণও বলা হয়ে থাকে। ভোক্তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস যেমন রেফ্রিজারেটর, টেলিভিসন, ওয়াসিং মেশিন ইত্যাদি কেনার ক্ষেত্রে বিক্রেতা এই ঋণ দিয়ে থাকেন। এখানে যে জিনিস কেনা হল তার দাম একবারে না দিয়ে কিছু সহজ কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিস্তির টাকার মধ্যেই যে পরিমাণ বকেয়া টাকা আছে তার ওপর সুদ ধরা হয়ে থাকে।

(৪) **ভাড়াক্রয় প্রথা ঃ** এই প্রথাতেও জিনিসের দাম সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না। কতগুলো সহজ কিস্তিতে দেওয়া হয়। মোটা কিস্তির টাকা না দিলে দ্রব্যের মালিকানা ক্রেতার হাতে আসে না। দ্রব্য কেনার সাথে সাথেই কিছু নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া হয় যাকে ক্যাশ ডাউন প্রাইস (Cash Down Price) বলে। বাকি টাকা সুদ সমেত কতগুলো সহজ কিস্তিতে দেওয়া হয়। যদি কখনও কিস্তির টাকা দেওয়া না হয় তবে বিক্রেতা সেই দ্রব্যের পুরোটা বা কিছুটা নিয়ে নিতে পারে।

(৫) **ইজারা ঋণ ঃ** এটা ভারতে প্রচলিত এক নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইজারাদার কোনও সম্পত্তি কেনেন ও মাসিক ইজারা ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা গ্রহীতাকে ব্যবহারের জন্য দেন। এই ইজারা ভাড়ার মধ্যে সম্পত্তির দাম ও তার উপর সুদ ধরা থাকে। ইজারার সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে ইজারাদার হয় এটা ইজারাগ্রহীতাকে বিক্রী করে দেয় অথবা আবার কোনও নতুন ইজারাগ্রহীতাকে ইজারায় ভাড়া দেয়।

(৬) **কমার্শিয়াল পেপার ঃ** ভঘাল (Vaghul) কমিটির সুপারিশক্রমে ভারতের অর্থের বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের উৎস হিসাবে কমার্শিয়াল পেপার বা বাণিজ্যিক কাগজ আত্মপ্রকাশ করে। এর মেয়াদকাল তিনমাস থেকে এক বছরের মধ্যে। এই উৎস এরমধ্যেই অনেক জনপ্রিয় হয়েছে কারণ এর সংগ্রহমূল্য অনেক কম। এছাড়াও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে বড় অঙ্কের তহবিল গড়ে তুলতে পারেন যা একটা ব্যাঙ্কের থেকে সম্ভবপর হয় না। সাধারণ কোম্পানী কমার্শিয়াল পেপারের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ

করে। এই কমার্শিয়াল পেপার বিলি করতে হলে ক্রেডিট রেটিং সার্টিফিকেটসহ যে ব্যাঙ্ক এই সুযোগ দেবে তার কাছে প্রস্তাব পেশ করতে হয়। কম করে পাঁচ লাখ টাকার গুণিতকে কমার্শিয়াল পেপার বিলি করা হয়। এক বা একাধিক দিনে [তবে ব্যাঙ্কের অনুমোদন পাবার দুই সপ্তাহের মধ্যে] কমার্শিয়াল পেপার বিলি করতে হয়। তবে বিভিন্ন দিনে কমার্শিয়াল পেপার বিলি করলেও তাদের মেয়াদপূর্তির দিন একই হয়। কমার্শিয়াল পেপারের মেয়াদপূর্তিতে কোনও রেয়াতি দিন গ্রাহ্য হয় না। এটা নবীকরণ করা যায়। এতে স্ট্যাম্প ডিউটির প্রয়োজন হয়। অনাবাসী ভারতীয়েরা এতে বিনিয়োগ করতে পারেন কিন্তু তা আর স্বদেশে পুনঃপ্রেরিত করা যাবে না এই চুক্তিতে। তবে এই কমার্শিয়াল পেপার যাতে অনাবাসী ভারতীয়েরা বিনিয়োগ করেন তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। কমার্শিয়াল পেপার বিলিতে অবলেখকের কোনো ভূমিকা থাকে না।

(৭) **ফ্যাকটরিং ঃ** ভারতবর্ষে ১৯৮১ সালে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। সাধারণত ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোই এই সেবা প্রদান করে থাকে। ক্রেতারা যখন টাকা দিতে দেরি করে তখন ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগকারী সংস্থা এই সেবা প্রদান করে। ফ্যাকটরিং-এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কে পাবে এই বিষয়ে মক্কেলের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, বিক্রির পরিমাণ, তার অন্যান্য রেকর্ড ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৮) **জন আমানত ঃ** কখনও কখনও কোম্পানীগুলো জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে মূলধনের অভাব মেটায়। মুম্বই ও আমেদাবাদের টেক্সটাইল মিলগুলোতে সর্বপ্রথম এই ধরনের আমানত গ্রহণের নিদর্শন মেলে। সাধারণত ছয়মাস থেকে এক বছর সময়সীমার জন্য এই আমানত গ্রহণ করা হত। বিনিয়োগকারী যখন চাইত তখনই টাকা তুলতে পারত। এই আমানতের ওপর ৪ $^{১}/_{২}$% থেকে ৬ $^{১}/_{২}$% পর্যন্ত সুদ দেওয়া হত। মুম্বই ও আমেদাবাদ ছাড়াও শোলাপুরের কার্বন মিল এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানে এই ধরনের আমানত গ্রহণ করা হত। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর [যাদের বিক্রীত মূলধন এক লাখ টাকার বেশি] জন আমানত গ্রহণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করল। এই আইনের বলে আদায়ীকৃত মূলধন ও বিশেষ কাজের জন্য নয় এমন সঞ্চিতির শতকরা ২৫ ভাগের বেশি নন্ ব্যাঙ্কিং ডিপোজিট রাখা যাবে না বলে নির্দেশ জারি করা হয়। কোম্পানী আইনের ৫৮৫ ধারায় এই বিষয়ে নিয়মকানুনের কথা বলা আছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ২৪ মাসের বেশি ও ৬০ মাস সময় পর্যন্ত যে কোনো সময়ের জন্য জন আমানত গ্রহণ করতে পারে।

সুবিধা ঃ
(১) এই পদ্ধতিতে আইনের বিশেষ কড়াকড়ি নেই।
(২) এই পদ্ধতিতে সহজে আমানত গ্রহণ করা যেতে পারে।
(৩) এতে খরচ কম লাগে।
(৪) এতে উচ্চহারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।
(৫) এর ফলে কোম্পানীর সম্পত্তির ওপর কোনও অধিকার কায়েম করা যায় না।

অসুবিধা ঃ
(১) এই উৎস বিশ্বাসযোগ্য নয়। জনগণ তাদের আস্থা হারালে কোম্পানীর পক্ষে এই ধরনের আমানত সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়। এই ব্যবস্থাকে তাই 'সুদিনের বন্ধু' (fair-weather friend) বলা হয়।

(২) এই আমানত সংগ্রহে অসুবিধা হয়।

জন আমানত পদ্ধতিকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় উৎস হিসাবেই ব্যবহার করা যায়। এছাড়া স্বল্পমেয়াদী উৎস হিসাবে—

(১) করের জন্য সংস্থানও

(২) লভ্যাংশের জন্য সংস্থানের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

(খ) **দীর্ঘমেয়াদী উৎস ঃ** অর্থের দীর্ঘমেয়াদী উৎসগুলো এই প্রকার ঃ

(১) শেয়ার

(২) ডিবেঞ্চার

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ

(৪) মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ

(১) **শেয়ার ঃ** কোনও যৌথ মূলধনী কোম্পানী জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন জোগাড় করে। এই মূলধন কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন। কোনও কোম্পানী দুই প্রকার শেয়ার বিলি করতে পারে ঃ—

- সাধারণ শেয়ার ও
- অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার

যে শেয়ারের মালিক লভ্যাংশ অর্জনের ক্ষেত্রে ও শেয়ারের টাকা ফেরত পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভোগ করেন তাকে অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার বলে। এই শেয়ার গ্রহীতারা লাভের একটা নির্দিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসাবে আগে পেতে থাকেন।

সাধারণ শেয়ার বলতে সেই শেয়ারকেই বোঝান হয় যা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার নয়।

অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা বর্তমান। সেগুলো এভাবে আলোচনা করা হল ঃ—

সুবিধা ঃ (১) বিনিয়োগকারীরা এটা পছন্দ করেন কারণ—

- এতে ঝুঁকি কম,
- নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়া যায়,
- টাকা ফেরতের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাওয়া যায়।

(২) যে কোম্পানী এই শেয়ার বিলি করছে তার কাছে সুবিধা হল এই যে—

- এই শেয়ারের মালিকেরা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না,
- লভ্যাংশের হার স্থির হওয়ায় কোনও ভাবে লাভ বেশি হলেও তার ওপর অতিরিক্ত লভ্যাংশ দিতে হয় না,
- কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয় না।

এই ধরনের শেয়ার বিলিকরণের অসুবিধাগুলি হল ঃ

অসুবিধা ঃ (১) বিনিয়োগকারীরা এই শেয়ার বিনিয়োগে অপছন্দ করেন কারণ—

- এতে লাভের অংশ কম পাওয়া যায়,
- বিনিয়োগকারীরা কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(২) কোম্পানীর পক্ষে অসুবিধার কারণ হল—

- লাভ হোক বা না হোক পুঞ্জীভূত অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ারহোল্ডারদের লাভের অংশ অবশ্যই দিতে হবে।
- বিনিয়োগকারী এটা অপছন্দ করে বলে বেশিমাত্রায় অর্থসংগ্রহের সুযোগও কম।

সাধারণ শেয়ারেরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এই সুবিধা ও অসুবিধা এইভাবে লেখা যায় ঃ—

সুবিধা ঃ (১) বিনিয়োগকারীদের এই শেয়ার বাঞ্ছনীয়, কারণ—

- এতে লাভের পরিমাণ বেশি হলে বেশি হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।
- পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা যায়,
- বর্তমান দিনে ব্যাঙ্কে সুদের হার কম হওয়ায় সাধারণ লোকেরাও এই শেয়ার কেনার দিকে ঝুঁকেছে।

(২) কোম্পানীর কাছে এর সুবিধা হল ঃ

- লভ্যাংশ প্রদান বাধ্যতামূলক নয়,
- কেবলমাত্র কোম্পানী না উঠে গেলে মূলধনের টাকা ফেরত দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহের অপর আর একটি উৎস হল ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ঃ

(২) **ডিবেঞ্চার ঃ** ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র বিক্রি করে কোম্পানী তার মূলধন জোগাড় করতে পারে। শেয়ারের মত ডিবেঞ্চার বিলির সময়েও বিবরণপত্র বা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি প্রকাশ করতে হবে ও তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে হবে। যারা ঋণপত্র কেনেন তারা কোম্পানীর পাওনাদার। এই পাওনাদারেরা নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে। কোম্পানীর লাভ হোক বা না হোক ঋণপত্রগ্রহীতা সুদ পেয়ে থাকেন। এই ডিবেঞ্চারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) পরিশোধের ভিত্তিতে ঃ

- পরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার
- অপরিশোধযোগ্য ডিবেঞ্চার

(খ) জামিনের দিক থেকে ঃ

- বন্ধকী ডিবেঞ্চার
- সাধারণ ডিবেঞ্চার

(গ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে

- প্রথম ডিবেঞ্চার
- দ্বিতীয় ডিবেঞ্চার

(ঘ) লিপিবদ্ধকরণের দিক থেকে ঃ

- নিবন্ধিকৃত ডিবেঞ্চার
- বাহকদের ডিবেঞ্চার

শেয়ারের মত মূলধনের উৎস হিসাবে ডিবেঞ্চারেরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। ঐ সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

সুবিধা ঃ (১) ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের দিক থেকে ঃ

- নির্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়,
- জামিনের ভিত্তিতে ডিবেঞ্চার দেওয়া হয় বলে ঝুঁকি কম থাকে।

(২) কোম্পানীর দিক থেকে ঃ

- প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা যায়,
- ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের যে সুদ দেওয়া হয় তা ব্যবসার খরচ হিসাবে দেখানো যায়।

অসুবিধা ঃ (১) ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের দিক থেকে ঃ

- কোম্পানী পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- আয় নির্দিষ্ট।

(২) কোম্পানীর দিক থেকে ঃ

- লাভ হোক বা না হোক সুদ দিতেই হবে।
- কোম্পানীর অবসানকালে ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের শেয়ার হোল্ডারদের আগে পাওনা মিটিয়ে দিতে হয়।

মূলধন সংগ্রহের অপর আর একটি মাধ্যম হল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে সংগৃহীত ঋণ।

(৩) **আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ ঃ** আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েও মূলধনের অভাব মেটানো যেতে পারে। ভারতবর্ষে ঋণ দিয়ে থাকে ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করে থাকে এমন কতগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা এইভাবে করা যেতে পারে—

(ক) **ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India বা IDBI) :**

১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন একহাজার কোটি টাকা। যে উদ্দেশ্যে এই ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়েছে তা হল ঃ

- অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজ পর্যালোচনা ও দেখাশোনা করা,
- প্রয়োজনীয় শিল্পসংস্থাকে ঋণ দেওয়া।

এই সংস্থার কাজ হল—

- শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি অর্থসাহায্য দেওয়া,
- শিল্পসংস্থার শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে বিনিয়োগ করা,
- এই সংস্থা অবলেখক হিসাবেও কাজ করে,
- শিল্পসংস্থা যে সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করে সেখানে জামিন হিসাবে কাজ করা।

১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা ২৪,১০০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে।

(খ) **ভারতের শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation of India বা ICICI) :**

১৯৫৫ সালের ৫ই জানুয়ারি সংস্থা গঠন করা হয়। এর অনুমোদিত মূলধন একশ পঞ্চাশ কোটি টাকা। এর উদ্দেশ্য হল—

- প্রাইভেট সেক্টরের শিল্প প্রবর্তন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে সাহায্য করা,
- ভারতের বিনিয়োগ বাজারের সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান করা।

এই সংস্থার কাজ হল—

- নতুন শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ,
- অবলেখক হিসাবে কাজ করা,
- ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে জামিন হিসাবে কাজ করা,
- দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ প্রদান করা।

১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা ২৫,৫৩০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে।

(গ) **ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation of India বা IFCI) :**

১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই এই সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা বিশেষ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। যে উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠিত হয় তা হল—

- শিল্পসংস্থাকে ঋণ দেওয়া। এই ঋণ সর্বাধিক ২৫ বছর পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।
- ঋণের ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া।
- শিল্পসংস্থার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে অবলেখক হিসাবে কাজ করা।

এই সংস্থার কাজ হল ঃ

- সরাসরি শিল্প সংস্থার শেয়ারে লগ্নী করা।
- শিল্প সংস্থাকে ঋণ দেওয়া, যার সময়সীমা ২৫ বছরের বেশি হবে না।
- ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদার হিসাবে কাজ করা।

- বিদেশ থেকে মূলধনী দ্রব্য কেনার ব্যাপারে জামিনদার হিসাবে কাজ করা।

১৯৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা ১০,৯৮০ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে।

(ঘ) **ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (Industrial Reconstruction Bank of India বা IRBI) :**

১৯৮৫ সালের ১৯শে মার্চ এই সংস্থা গঠিত হয়। এর অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা। যে উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠন করা হয় তা হল—

- দুর্বল শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন করা,
- প্রয়োজনীয় ঋণ ও জামিন প্রদান করা,
- প্রয়োজনীয় কারিগরী, ব্যবস্থাপনাগত বিপণনগত সহযোগিতা প্রদান করা।

এই সংস্থার কাজ হল ঃ

- শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করা,
- ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদার হিসাবে কাজ করা,
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা।

কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন গঠন ও বৃদ্ধি করার অন্যতম একটি পদ্ধতি হল মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ। নীচে তা আলোচনা করা হল ঃ

(৪) **মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ (Ploughing Back of Profit) :**

কোম্পানী তার লাভের সমস্ত অংশটাই শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেয় না। সে মুনাফার কিছুটা অংশ সরিয়ে রাখে। সেই সরিয়ে রাখা মুনাফার কিছুটা বা সমস্ত অংশ কারবারের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য কাজে বিনিয়োগ করে। একেই মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ বলে।

এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে।

সুবিধা হল ঃ

(ক) কোম্পানীর মূলধন তাড়াতাড়ি জোগাড় করা যায়।

(খ) এর ফলে লভ্যাংশ হারে সমতা বজায় রাখা যায়।

(গ) কোম্পানী আর্থিক দিক দিয়ে শক্তসমর্থ হয়।

(ঘ) এই টাকা কোম্পানীর উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু এর অসুবিধা হল ঃ

(ক) একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে।

(গ) এর ফলে অতি মূলধনায়ন ঘটতে পারে।

(ঘ) শেয়ারহোল্ডাররা অসন্তুষ্ট হতে পারে।

(ঙ) ব্যবস্থাপকদের স্বার্থসিদ্ধি।

(চ) সামগ্রিকভাবে সামাজিক অপচয় হতে পারে।

এছাড়া অর্থসংস্থানের দীর্ঘমেয়াদী অন্যান্য উৎস আছে নীচে তাদের উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) অবচয়ের জন্য সংস্থান।

(খ) নন্ ভোটিং শেয়ার বিলি।

(গ) জিরো ইন্টারেস্ট বণ্ড বিক্রি।

(ঘ) সিকিওরড প্রিমিয়াম নোটস্ বিলি।

(ঙ) ডিপ্ ডিসকাউন্ট বণ্ড বিলি।

(চ) জিরো কুপন্ কনভার্টিবেল নোট বিলি।

(ছ) ইনডেক্সড্ বণ্ড বিলি।

(জ) জাংক বণ্ড বিলি ইত্যাদি।

৭৪.৩ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়া

ভারতের অর্থের বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রক হলো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-ই হল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এছাড়াও বর্তমানে সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়া (SEBI বা সেবি) বর্তমানে অর্থের বাজারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে।

আমরা প্রথমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম আলোচনা করব। ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া যে যে কাজগুলো করে থাকে তা এই প্রকার ঃ—

(ক) নগদ অর্থ সৃষ্টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া অধিকার।

(খ) ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অভ্যন্তরীণ মূলস্তরে স্থিতিশীলতা আনার প্রয়াস করে।

(গ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অভিভাবক হিসাবে কাজ করে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতি গ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা।

(ঙ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেমন জনগণের টাকা সঞ্চিত রাখে ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টাকা জমা রাখে।

(চ) সরকারকে প্রয়োজনমত অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া।

(ছ) দেশের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারকে সরক্ষণ করা।

(জ) বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

(ঝ) বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক নয় এমন আর্থিক সংস্থার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ঞ) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে।

আমরা আগের আলোচনা থেকে দেখেছি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ঋণের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রধানত দেশের মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(ক) **পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** যে যে উপায়ে পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা হল ঃ—

(১) ব্যাঙ্ক রেট নিয়ন্ত্রণ করে দেশের বাজারে ঋণের জোগান নিয়ন্ত্রণ করা। ঋণের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে দেয় না হলে ব্যাঙ্ক এই রেট বাড়িয়ে দেয়।

(২) কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে।

(৩) ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বা নগদ সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা সম্প্রসারণ ও সংকোচন করে থাকে।

(খ) **গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত উপায়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

(১) অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে মার্জিন বা জামিন নিয়ন্ত্রণ।

(২) ব্যাঙ্কগুলোকে বিভিন্ন রকমের সদুপদেশ ও নৈতিক প্রণোদন দেওয়া।

(৩) এতে কাজ না হলে প্রয়োজনবোধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইভাবেই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করে।

এবার আমরা সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ আলোচনা করব।

১৯৯২ সালের সিকিউরিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়া আইনের ১১নং ধারায় এই বোর্ডের কাজের কথা বলা আছে। এই ধারায় বলা আছে যে বোর্ড—

(১) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

(২) যে ব্যবস্থা ঠিক, যথার্থ ও সময়োপযোগী বলে মনে হবে তার ভিত্তিতে সিকিউরিটিজ মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারণ করবে।

(৩) বিভিন্ন স্টক এক্সচেঞ্জের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৪) স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার, অবলেখক ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে পরামর্শদাতা ইত্যাদি ব্যক্তিদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৫) বিদেশী বিনিয়োগকারী, সুনাম নির্ধারণ সংস্থা ইত্যাদির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৬) মিউচুয়াল ফাণ্ড, ভেনচার ক্যাপিটাল ও কালেকটিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৭) স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৮) সিকিউরিটিজ মার্কেটের বিভিন্ন অসাধু কাজকর্ম এবং অব্যবসায়িক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

(৯) বিনিয়োগকারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে এবং প্রয়োজনবোধে সিকিউরিটিজ মার্কেটের মধ্যবর্তী কারবারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(১০) সিকিউরিটিজ মার্কেটের 'ইনসাইডার ট্রেডিং' নিয়ন্ত্রণ করবে।

(১১) শেয়ার ক্রয় ও কোম্পানী অধিগ্রহণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখবে।

(১২) মিউচুয়াল ফাণ্ড, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটিজ মার্কেটের বিভিন্ন মধ্যবর্তী কারবারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করা ও তাদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখবে।

(১৩) ১৯৫৬ সালের সিকিউরিটিজ কনট্রাক্ট (রেগুলেশন) আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করবে।

(১৪) প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ফি ইত্যাদি ধার্য করবে।

(১৫) গবেষণামূলক কাজের বন্দোবস্ত করবে।

(১৬) তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য কোনও সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে বা তাদেরকে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য দেবে।

(১৭) প্রয়োজনবোধে সমন জারি করবে।

(১৮) স্টক ব্রোকার, শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টদের বই, রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য দলিল প্রয়োজনবোধে খতিয়ে দেখবে।

৭৪.৪ সংভার বিনিময়কেন্দ্রের তালিকাভুক্তির নিয়মকানুন

সংভার বিনিময়কেন্দ্র বা স্টক এক্সচেঞ্জ শেয়ার ইত্যাদি তালিকাভুক্তি করতে গেলে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোনও কোম্পানীর শেয়ারই আপনা আপনি সংভার বিনিময়কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত হতে পারে না। কোম্পানী আইনের ৭৩ ধারায় এই তালিকাভুক্তির ব্যাপারে নিয়মের কথা বলা আছে। এছাড়াও সিকিওরিটিজ কনট্রাক্টস (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫৬-র ২১নং ধারার কথাও এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে। কোম্পানীটি বিনিময় কেন্দ্রে আবেদন করে ও এই বিষয়ে সংভার বিনিময় কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেয় যে শেয়ার তালিকা-ভুক্তি করা হবে কি না? যদি বিনিময় কেন্দ্র অনুমতি দেয় তবেই কেবলমাত্র কোম্পানী শেয়ার বিনিময়কেন্দ্রে তালিকাভুক্তি হতে পারে। এরপর কোম্পানী তার কাজ করতে পারে।

বিনিময়কেন্দ্রে তালিকাভুক্তির মানে এই নয় যে সেই কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে বা তার শেয়ার জনগণের কাছে বিলি করার জন্য বিনিময়কেন্দ্র আদেশ দান করে। তালিকাভুক্তি বলতে বোঝায় যে কোম্পানীটি আইনি বাধ্যবাধকতা ঠিকঠাক পালন করে নিবন্ধিত হয়েছে ও স্বচ্ছল চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে। কোনও কোম্পানীর শেয়ার সংভার বিনিময় কেন্দ্রে তালিকাভুক্তি করা থাকলে বিনিয়োগকারীরা তার ওপর ভরসা করেন ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করেন। এই তালিকাভুক্তি তাই বিনিয়োগকারীদের কিছু সুবিধা দেয় আবার কোম্পানী এর ফলে তার শেয়ার বাজারের বিস্তার ঘটাতে পারে—এই সুবিধা লাভ করে।

যদি কোন কোম্পানী তার শেয়ার সংভার বিনিময় কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করতে চায় তবে তাকে নির্দিষ্ট ফর্মে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ আবেদন করতে হবে। এই প্রয়োজনীয় দলিলপত্রগুলো হল ঃ—

(১) স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলী, বিবরণপত্র, অথবা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি, পরিচালকের রিপোর্ট, উদ্ধর্তপত্র ও অবলেখকদের সাথে চুক্তিপত্র ইত্যাদি।

(২) শেয়ার, কীভাবে বিলি করা হবে তার একটা বিবরণ।

(৩) নিবন্ধিত হওয়া থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোম্পানীর কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী ইত্যাদি।

(৪) শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের নমুনা, কপি, আইনের প্রতিলিপি ইত্যাদি।

(৫) মূলধন কাঠামো সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য।

(৬) পুরানো কোম্পানীর ক্ষেত্রে শেষ দশ বারের লভ্যাংশ ও নগদ বোনাসের বিবরণ।

(৭) যে শেয়ার ও ডিবেঞ্চার তালিকাভুক্তি করা হবে তার বিবরণ।

আবেদনপত্র খুঁটিয়ে দেখার সময় সংভার বিনিময় কেন্দ্র যে যে বিষয়ের ওপর বিশেষ ধ্যান দেবে তা হল ঃ

(১) পরিমেল নিয়মাবলীতে এই বিষয়ে কোনও নিয়ম আছে কি না যে—

- শেয়ার বিনিময়ে কোনো বাধা থাকবে না,
- যে শেয়ারের জন্য পুরো টাকা দেওয়া হয়েছে তার ওপর কোম্পানীর পূর্বস্বত্ব (lien) নেই,
- যে তলবী অর্থের টাকা আগে পাওয়া গেছে তার ওপর সুদ প্রদান করা হবে, লভ্যাংশ নয়,
- যে লভ্যাংশের ওপর এখনও দাবি করা হয় নি তা অদেয় লভ্যাংশ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে,
- কোম্পানীর সাধারণ সভায় অনুমতি সাপেক্ষে তলবী অর্থ তলব করা যাবে।

(২) কোম্পানীর আয়তন ভাল কিনা, এর সুবিন্যস্ত মূলধন কাঠামো আছে কিনা, ও এর শেয়ারে আবেদন করার জন্য জনগণ যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে কি না?

(৩) যে যে শ্রেণীর সিকিউরিটি বিলি করা হচ্ছে তার প্রত্যেকের অন্তত ৪৯ শতাংশ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে, অন্তত তিন দিন ধরে, বিলি করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আবেদনপত্র খুঁটিয়ে দেখার পর যদি বিনিময় কেন্দ্র সন্তুষ্ট হয় তবে সে কোম্পানীকে একটা তালিকাভুক্তির চুক্তি সম্পাদন করতে বলে। এই চুক্তিতে কতগুলো শর্তের উল্লেখ থাকবে, যেমন—

(১) শেয়ারের জন্য কোনও আবেদনকারীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা যাবে না।

(২) কী হারে লভ্যাংশ দেওয়া হবে ও লভ্যাংশ বণ্টনের কাজ কীভাবে হবে তার সম্বন্ধে বিনিময়কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

(৩) কোম্পানীর সাধারণ প্রকৃতিগত কোনও পরিবর্তন হলে তা বিনিময়কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

(৪) কোম্পানীর বার্ষিক হিসাবের প্রতিলিপি সংভার বিনিময়কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

(৫) কোনও নতুন শেয়ার বিলি [সে রাইট শেয়ার হোক বা বোনাস শেয়ার হোক] করতে হলে বিনিময়কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

(৬) কোম্পানীর মূলধন কাঠামোর কোনও পরিবর্তন হলেও বিনিময়কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

(৭) কোম্পানীকে এই মর্মে জানাতে হবে যে সে কোনও প্রকার অসৎকাজ করবে না।

(৮) কোম্পানীর কোনও শেয়ার বাতিল করতে হলেও বিনিময়কেন্দ্রকে জানাতে হবে।

৭৪.৫ ক্রেডিট রেটিং বা সুনাম নির্ধারণ

বিভিন্ন কারবারী সংস্থা তাদের শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি জনগণের কাছে বিলির উদ্দেশ্যে বাজারে নিয়ে আসে। এই শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রি করে তারা প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করে। কিন্তু প্রশ্ন হল কীসের ভিত্তিতে জনগণ এই শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনবে? এর উত্তর হল কোম্পানীর দাখিলদার ক্রেডিট রেটিং বা সুনাম নির্ধারণের ভিত্তিতে।

এখন প্রশ্ন হল ক্রেডিট রেটিং কি? সহজ কথায় ক্রেডিট রেটিং হল বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার। ক্রেডিট রেটিং সংস্থা কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা, ঠিক সময়ে মূল্য পরিশোধের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে মান নির্ধারণসূচক একটা চিহ্ন দিয়ে থাকে। এই চিহ্ন অক্ষর বা সংখ্যা ও অক্ষরের সমষ্টি হতে পারে। ক্রেডিট রেটিং করার অর্থ এই নয় যে সেই শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কেনা, বেচা বা ধার রাখার ব্যাপারে এটাই শেষ কথা। কোম্পানী যে তথ্য প্রদান করে তার ওপর ভিত্তি করেই ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী মান নির্ধারণ করে। ফলত সেই সব তথ্যের ব্যাপারে ঐ এজেন্সী কোনও প্রকাশ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। ক্রেডিট রেটিং-এর মাধ্যমে কোনও ঋণ দলিলের ঝুঁকির ব্যাপারে জানা যায়। ঋণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নির্ধারণেই ক্রেডিট রেটিং-এর উদ্দেশ্য। বাজারের ঝুঁকি ভবিষ্যৎ দাম নির্ধারণ সম্বন্ধে ঝুঁকি অথবা ঋণদলিলের মূল্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়ে ক্রেডিট রেটিং-এর কোনও ভূমিকা নেই। সাধারণত ঋণ দলিলের ক্ষেত্রেই ক্রেডিট রেটিং-এর কাজ সীমাবদ্ধ। যে কোম্পানী ঋণদলিল বিলি করছে ক্রেডিট রেটিং-এর মাধ্যমে সেই কোম্পানীর মান নির্ধারণ করা হয় না, কেবলমাত্র ঋণ দলিলটার মান নির্ধারণ করা হয়।

এই ক্রেডিট রেটিং-এর সূত্রপাত হয় ১৮৪০ সালে। নিউইয়র্কে ১৮৪১ সালে প্রথম বাণিজ্যিক ক্রেডিট এজেন্সী স্থাপিত হয়। বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী হল—

(১) মুডিজ ইনভেস্টরস্ সারভিস্ ও

(২) স্ট্যানডার্ড এণ্ড পুওরস কর্পোরেশন।

আমেরিকার এই দুটো এজেন্সী ছাড়াও আর যেগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য তা হল—

- ডান এ্যাণ্ড ব্রাডস্ট্রীট,

- ডাফ্ এণ্ড ফেলপ্‌স অব্ শিকাগো,
- জেরক্স কর্পোরেশন,
- ডমিনিকান বণ্ড রেটিং সার্ভিস,
- ক্যানাডিয়ান বণ্ড রেটিং সার্ভিস ইত্যাদি।

ভারতে ১৯৮৭ সালে প্রথম ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী হিসাবে ক্রেডিট রেটিং এ্যাণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Credit Rating and Information Services of India Limited বা CRISIL) আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়াও ভারতে আরও তিনটি এই ধরনের সংস্থা আছে—

(১) ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ক্রেডিট রেটিং এজেন্সী অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড (Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited বা ICRA)।

(২) ক্রেডিট অ্যানালিসিস এ্যাণ্ড রিসার্চ লিমিটেড (Credit Analysis and Research Limted বা CARE)।

(৩) ডাফ্ এণ্ড ফেলপ্‌স ক্রেডিট রেটিং ইণ্ডিয়া (Duff & Philips Credit Rating India বা DCR)।

১৯৯১ সালে IFCI ও অন্যান্য বিদেশী ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ভারতীয় বীমা কোম্পানী ইত্যাদির মিলিত প্রচেষ্টায় ICRA স্থাপিত হয়। ১৯৯২ সালে IDBI, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ইউনিট ট্রাষ্ট অব্ ইণ্ডিয়া, ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর মিলিত প্রচেষ্টায় CARE স্থাপিত হয়। সবচেয়ে নবীনতম সদস্য হিসাবে DCR আমেরিকার ডাফ্ এণ্ড ফেলপ্‌স ও কোলকাতার অ্যালায়েন্স ক্যাপিটাল লিমিটেডের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি যৌথ উদ্যোগ হিসাবে স্থাপিত হয়।

ক্রেডিট রেটিং-এর তথ্য কারা ব্যবহার করেন?

বিনিয়োগকারী, যে কোম্পানী ঋণ দলিল বিলি করছে সে মধ্যবর্তী কারবারী, ঋণ দলিল বিলি নিয়ন্ত্রণকারী—এরাই ক্রেডিট রেটিং-এর তথ্য ব্যবহার করেন।

- ক্রেডিট রেটিং বিশ্বাসযোগ্য কেন?

ক্রেডিট রেটিং বিশ্বাসযোগ্য কারণ—

(১) এজেন্সীর নিরপেক্ষতা।

(২) সরকারী আইনের জটিলতাহীন।

(৩) একের বেশি এজেন্সীর উপস্থিতি।

(৪) অতি সুদক্ষ কর্মচারীর পেশাদারী মনোভাব ইত্যাদি।

ক্রেডিট রেটিং-এর সুবিধা কী?

ক্রেডিট রেটিং-এর সুবিধা এই প্রকার—

(ক) বিনিয়োগকারীর দিক থেকে—

(১) ঝুঁকি নির্ণয়ে সক্ষম।

(২) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৩) অহেতুক দেউলিয়া হবার ভয় নেই।

(৪) সময় ও পরিশ্রমের সাশ্রয়।

(৫) বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা।

(খ) কোম্পানীর দিক থেকে

(১) ঋণ দলিল বিলিতে সুবিধা।

(২) কোনও অপরিচিত কোম্পানিও অর্থের বাজারে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পারবে।

(৩) ঋণ সংগ্রহে খরচ কম।

ক্রেডিট রেটিং-এর তাহলে কোনও অসুবিধা নেই?

ক্রেডিট রেটিং-এর যেমন সুবিধা আছে ঠিক তেমনি অসুবিধাও আছে। অসুবিধাগুলো হল—

(১) কোম্পানী অনেক সময় সমস্ত তথ্য প্রদান করে না।

(২) এজেন্সীর পক্ষপাতমূলক আচরণ।

(৩) কোম্পানীর পরিচালন দক্ষতার ওপর আলোকপাত করে না।

(৪) রেটিং কোনও সময় নীচে নেমে গেলে কোম্পানীর পরিচালকদের মানসিক অস্থিরতা।

বিভিন্ন এজেন্সী ক্রেডিট রেটিং-এর জন্য কী কী চিহ্ন দেয়?

বিভিন্ন এজেন্সী রেটিং-এর জন্য বিভিন্ন চিহ্ন দেয়। যেমন ঃ—

(ক) **CRISIL বা ক্রিসিল-এর বিভিন্ন চিহ্ন ঃ**

(১) **ঋণপত্রের ক্ষেত্রে—**

এএএ (AAA) ⇨ সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ।

এএ (AA) ⇨ ভাল নিরাপদ।

এ (A) ⇨ পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ।

বিবিবি (BBB) ⇨ মাঝারিমানের নিরাপদ।

বিবি (BB) ⇨ পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ নয়।

বি (B) ⇨ উঁচুমানের ঝুঁকি বর্তমান।

সি (C) ⇨ আরো বেশি ঝুঁকি বর্তমান।

ডি (D) ⇨ একদমই নিরাপদ নয়।

CRISIL 'এএ' থেকে 'সি' পর্যন্ত (+) বা (–) চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে।

(খ) **ICRA বা ইক্‌রার বিভিন্ন চিহ্ন ঃ**

(১) **দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঃ—**

এল এএএ (LAAA) ⇨	সর্বোত্তম ভাবে নিরাপদ
এল এএ + (LAA+) ⇨ এল এএ (LAA) ⇨ এল এএ– (LAA–) ⇨	ভাল নিরাপদ
এল এ + (LA+) এল এ (LA) এল এ– (LA–)	পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ

(২) **ফিক্সড্ ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ঃ—**

এফ এএএ (FAAA) ⇨ সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ।

এফ এএ (FAA) ⇨ ভাল নিরাপদ।

এফ এ (FA) ⇨ পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ।

এফ বি (FB) ⇨ পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ নয়।

এফ সি (FC) ⇨ উঁচুমানের ঝুঁকি বর্তমান।

এফ ডি (FD) ⇨ মোটেই নিরাপদ নয়।

(৩) **স্বল্প মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঃ—**

পি১ (P1) ⇨ সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ।

পি২ (P2) ⇨ ভাল নিরাপদ।

পি৩ (P3) ⇨ নিরাপদ।

পি৪ (P4) ⇨ ঝুঁকি পূর্ণ

পি৫ (P5) ⇨ মোটেই নিরাপদ নয়।

CRISIL P1 থেকে P3 পর্যন্ত (+) বা (–) চিহ্ন দিতে পারেন।

এল বিবিবি + (LBBB+) এল বিবিবি (LBBB) এল বিবিবি – (LBBB–)	মাঝারিমানের নিরাপদ

এল বিবি	+	(LBB+)	পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ নয়।
এল বিবি		(LBB)	
এল বিবি	–	(LBB–)	
এল বি	+	(LB+)	ঝুঁকিপূর্ণ
এল বি		(LB)	
এল বি	–	(LB–)	
এল সি	+	(LC+)	ভালরকম ঝুঁকিপূর্ণ
এল সি		(LC)	
এল সি	–	(LC–)	
এল ডি		(LD) ⇨ একদমই নিরাপদ নয়।	

(২) **মাঝারিমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঃ—**

এম এএএ		(MAAA) ⇨	সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ
এম এএ	+	(MAA +)	ভাল নিরাপদ
এম এএ		(MAA)	
এম এএ	–	(MAA–)	
এম এ	+	(MA+)	পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ
এম এ		(MA)	
এম এ	–	(MA–)	
এম বি	+	(MB+)	পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ নয়
এম বি		(MB)	
এম বি	–	(MB–)	
এম সি	+	(MC+)	ঝুঁকিপূর্ণ
এম সি		(MC)	
এম সি	–	(MC–)	
এম ডি		(MD) ⇨ মোটেই নিরাপদ নয়।	

(৩) **স্বল্প মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে** (কর্মাশিয়াল পেপারসহ)

এ১	+	(A1+)	সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ
এ১		(A1)	
এ২	+	(A2+)	ভাল নিরাপদ
এ২	+	(A2)	
এ৩	+	(A3+)	পর্যাপ্তভাবে নিরাপদ
এ৩		(A3)	
এ৪	+	(A4+)	ঝুঁকিপূর্ণ
এ৪		(A4)	

এ৫ + (A5) মোটেই নিরাপদ নয়

(গ) **CARE বা কেয়ার-এর বিভিন্ন চিহ্ন ঃ**

(১) **দীর্ঘ মেয়াদী ও মাঝারি মেয়াদী দলিলের ক্ষেত্রে ঃ**

কেয়ার এএএ (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE AAA (FD) / (CD) (SO)	⇨ সর্বোত্তমভাবে নিরাপদ
কেয়ার এএ (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE AA (FD) / (CD) (SO)	⇨ ভাল নিরাপদ
কেয়ার এ (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE A (FD) / (CD) (SO)	⇨ নিরাপদ
কেয়ার বিবিবি (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE BBB (FD) / (CD) (SO)	⇨ কম ঝুঁকি

কেয়ার বিবিবি (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE BB (FD) / (CD) (SO)	⇨ স্পেকুলেটিভ
কেয়ার বি (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE B (FD) / (CD) (SO)	⇨ ঝুঁকিপূর্ণ
কেয়ার সি (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE C (FD) / (CD) (SO)	⇨ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ
কেয়ার ডি (এফ ডি) / (সিডি) (এস ও)	CARE D (FD) / (CD) (SO)	⇨ মোটেই নিরাপদ নয়।

(২) **স্বল্পমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঃ—**

পি আর ১ (PR1) ⇨ সর্বোচ্চ নিরাপদ

পি আর ২ (PR2) ⇨ ভাল নিরাপদ

পি আর ৩ (PR3) ⇨ নিরাপদ

পি আর ৪ (PR4) ⇨ কম নিরাপদ

পি আর ৫ (PR5) ⇨ মোটেই নিরাপদ নয়।

ক্রেডিট রেটিং-এর জন্য কী করতে হয়?

ক্রেডিট রেটিং-এর জন্য যা যা করতে হয় তা এই প্রকার—

(১) প্রথমে এই বিষয়ে আবেদন করতে হবে।

(২) দুইজন সদস্যের একটা রেটিং টিম বিভিন্ন মুখ্য তথ্য সংগ্রহ করবে।

(৩) গৌণ তথ্য সংগ্রহ।

(৪) ব্যবস্থাপকরা নিজেদের মধ্যে সভা করবে ও কোম্পানী পরিদর্শন করবে।

(৫) প্রিভিউ মিটিং।

(৬) রেটিং কমিটির মিটিং।

(৭) রেটিং বিষয়ে উচ্চতর ব্যবস্থাপককে জানানো।

(৮) রেটিং পুনর্বিবেচনা।

(৯) ক্রেডিট রেটিং-এর নির্দিষ্ট সময়কালে দলিলের ওপর ও কোম্পানীর কাজকর্মের ওপর নজর রাখা।

৭৪.৬ সারাংশ

এই এককটি পড়ে আমরা দেখলাম কোনও যৌথ মূলধনী কোম্পানী স্বল্পমেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। কিছু কিছু উৎস যেমন জনআমানত স্বল্প মেয়াদেও ব্যবহার করা যেতে পারে, আবার দীর্ঘমেয়াদেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যেই উৎসই ব্যবহার করা হোক না কেন তার সুবিধা ও অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই তা করতে হবে। এই ঋণের বাজারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সিকিউরিটিজ এ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়া। আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে ইচ্ছা করলেই কোনও সংস্থার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার সংভার বিনিময়কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত করা যায় না। তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। বর্তমানে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি ঋণ দলিলের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের মনে প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

৭৪.৭ অনুশীলনী

এতক্ষণ আপনারা এককটি পড়ে কিছু জ্ঞান লাভ করলেন। এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করুন।

(১) কোম্পানীর মূলধনের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উৎস কী কী?

(২) এই উৎসগুলির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

(৩) ভারতের আর্থিক বাজারে নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সিকিউরিটিজ এ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব্ ইণ্ডিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(৪) কোনও শেয়ার বা ডিবেঞ্চার সংভার বিনিময় কেন্দ্রে তালিকাভুক্তির নিয়ম কী কী?

(৫) ক্রেডিট রেটিং বলতে কী বোঝেন? ভারতে ক্রেডিট রেটিং সংস্থার নাম উল্লেখ করুন।

(৬) ক্রেডিট রেটিং-এ প্রচলিত চিহ্ন ও তাদের অর্থ সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(৭) ক্রেডিট রেটিং-এর জন্য কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হয়?

৭৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. চিত্তরঞ্জন বসু — 'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)

২। Y. K. Bhusan-*'Fundamentals of Business Organisation and Management'* (Sultan Chand & Sons)

৩। D. J. C. Verma-*'Bharat's Credit Ratingn (Practice and Procedure)* - Second Edition (Bharat Publishing House).

৪। The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi - Continuing Professional Education Directorate - 'Background Material For Continuing Education Programmes on Credit Rating.'

৫। *Taxmann's Corporate Laws, 1999.*

একক ৭৫ ❑ কারবারের পরিবেশ

গঠন

৭৫.০ উদ্দেশ্য
৭৫.১ প্রস্তাবনা
৭৫.২ কারবারী পরিবেশের অর্থ
৭৫.২.১ পরিবেশ কাকে বলে?
৭৫.২.২ কারবারী পরিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি?
৭৫.২.৩ কারবারী পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ
৭৫.৩ কারবারের উপর পরিবেশের প্রভাব
৭৫.৪ কারবারী পরিবেশের সুযোগসুবিধা ও বাধাগুলি চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা
৭৫.৪.১ কারবারী পরিবেশের সুযোগসুবিধা
৭৫.৪.২ কারবারী পরিবেশের বাধা
৭৫.৪.৩ এই সুবিধা ও বাধাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা
৭৫.৫ ভারতে কারবারী পরিবেশ
৭৫.৬ সারাংশ
৭৫.৭ অনুশীলনী
৭৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৭৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভালভাবে পড়ার পর আপনারা নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন ঃ—

- পরিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি?
- কারবারী পরিবেশের অর্থ কী?
- কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আমরা কীভাবে করব? কারবারের ওপর পরিবেশের প্রভাব।
- কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধা অর্থাৎ বাধাগুলি কী কী এবং এগুলোকে চিহ্নিত করলে আমরা কারবারী হিসাবে কী কী ভাবে উপকৃত হবে?
- ভারতে কারবারের পরিবেশ।

৭৫.১ প্রস্তাবনা

কোনও কারবারই একা নিঃসঙ্গভাবে সমাজে অবস্থান করতে পারে না। তাকে সবার সাথে একসঙ্গে চলতে হয়। কারণ মানুষের জন্য কারবার আবার মানুষকে নিয়েই কারবার। এর অর্থ হল বিভিন্ন ব্যক্তির কারবারী কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহ আছে—যেমন, যারা কারবার চালানোর জন্য অর্থের জোগান দেয়, যারা কারবারকে পণ্য বিক্রয় করে, যে সমস্ত শ্রমিকরা কারবারকে সচল রাখে, যে সরকার কারবারকে বিভিন্ন অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করে, যারা কারবারের উৎপন্ন দ্রব্য কিনে কারবারের জোগান ও সমাজের চাহিদার ভারসাম্য রক্ষা করে, এছাড়াও বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যা, সামাজিক আনুকূল্য, রাজনৈতিক সহযোগিতা, আইনগত সাহায্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধা—এদের ছাড়া কারবার চালু থাকতে পারে না। এদের সবাইকে মিলিত ভাবে বলা হয় কারবারের পরিবেশ। বর্তমান এককে আমরা কারবারের পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এর সাহায্যে আপনাদের কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করব।

৭৫.২ কারবারী পরিবেশের অর্থ

আমরা এখন জানব কারবারী পরিবেশের অর্থ। কিন্তু এর আগে আমরা আলোচনা করব পরিবেশ কাকে বলে?

৭৫.২.১ পরিবেশ কাকে বলে?

সহজ কথায় মানুষের চারপাশের অবস্থাকেই পরিবেশ বলে। পরিবেশের সংজ্ঞা দিতে গেলে আমরা বলতে পারি ঃ "মানুষের চারপাশের উপাদানগুলি, তা দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক, যা তার জীবন ও জীবিকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে একসঙ্গে পরিবেশ বলে।" বস্তুতপক্ষে পরিবেশের ওপরই মানুষ নির্ভরশীল। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তার প্রভাবেই মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধি নির্ধারিত হয়।

এই পরিবেশকে সাধারণত আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও

(খ) অপ্রাকৃতিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের সমষ্টিকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি হল—ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, অভ্যন্তরীণ জলভাগ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

অন্যদিকে অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি পরিবেশের সেই সমস্ত উপাদান যা একান্তই মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি এবং সে সমস্ত উপাদানের প্রভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন দ্রুত উন্নতি ও বিস্তার লাভ করে। অপ্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি হল জনবসতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতি, সরকার, ঐতিহ্য ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা জানতে পারলাম পরিবেশ কাকে বলে ও পরিবেশের বিভিন্ন ভাগ। এবার আমরা জানব—কারবারী পরিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি?

৭৫.২.২ কারবারী পরিবেশ বলতে আমরা কী বুঝি?

আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রকারভেদ কোনও দুর্ঘটনা নয়, কেবলমাত্র পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সংঘাতের ফল।

কারবারী পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে যা আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে।

একটি কারবার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় রসদ নেয়, সেগুলিকে বিভিন্ন প্রকার রূপদান করে ও রূপান্তর হওয়া তৈরি পণ্য পরিবেশকে ফেরত দেয়।

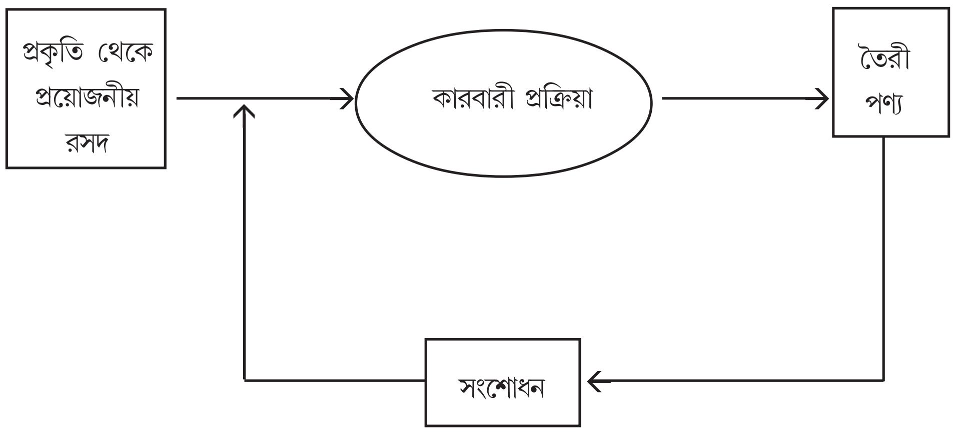

৭৫.২.৩ কারবারী পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ।

কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনযোগ্য উপাদান।

(খ) অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনযোগ্য উপাদান।

কারবারের গণ্ডির ভিতরে যে সমস্ত উপাদান কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে তাই হল নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনযোগ্য উপাদান। এগুলিকে 'নিয়ন্ত্রিত' বলার উদ্দেশ্য হল এই সমস্ত উপাদান ঠিক কারবার যেভাবে চায় সেইভাবেই তাদের রূপ দেওয়া যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়।

অন্যদিকে যে সমস্ত উপাদানের ওপর কারবারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই সেগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত উপাদান বলা হয়। এই উপাদানগুলি কারবারের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে।

যেহেতু নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সমস্ত প্রকার উপাদানই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয় তাই এদেরকে পরিবর্তনযোগ্য বলা হয়েছে।

কারবারের এই উপাদানগুলিকে নীচের মডেলটির সাহায্যে এইভাবে দেখানো যেতে পারে ঃ

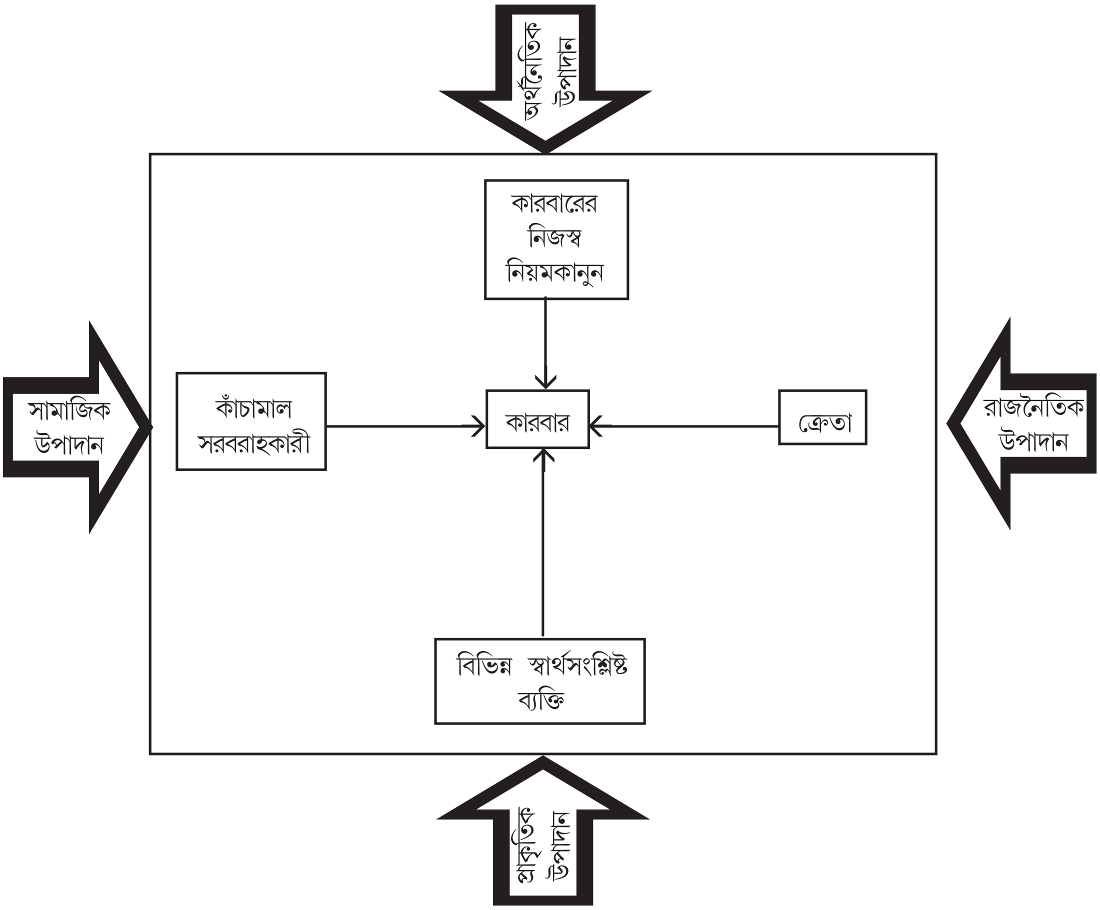

অনুশীলনী—১

১) পরিবেশ কী?

২) পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী?

৩) কারবারী পরিবেশ কাকে বলে?

৪) কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কী কী?

৫) একটি মডেল এঁকে কারবারের বিভিন্ন পরিবেশগুলো চিহ্নিত করুন।

৭৫.৩ কারবারের ওপর পরিবেশের প্রভাব

কারবারের ওপর পরিবেশের প্রভাব বলতে আমরা কারবারের ওপর অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনযোগ্য বিভিন্ন প্রকার উপাদানের কথা অর্থাৎ কারবারের গণ্ডির বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির কথা আলোচনা করব। কোনো

কারবারের সাফল্য কেবলমাত্র তার নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে না, কীভাবে কারবার তার গণ্ডির বাইরের বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনযোগ্য উপাদানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে তার ওপরও নির্ভর করে।

কারবারের ওপর পরিবেশের প্রভাব এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

(ক) **আর্থিক পরিবেশ ঃ** কারবারের ওপর আর্থিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। কারবারের আর্থিক পরিবেশ মানুষের অভাবমোচন ও তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে পরিবেশ মানুষের অভাব মোচন করেও তৃপ্তি সাধনের সাথে সহায়তা করে তাকেই আর্থিক পরিবেশ বলা হয়।

পুঁজির পরিমাণ, মানবিক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদির তারতম্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার আর্থিক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার আর্থিক পরিবেশ কারবারের ওপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে।

উন্নত আর্থিক পরিবেশ নিম্নলিখিতভাবে কারবার ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে—

(১) কারবারে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

(২) প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থান হয়।

(৩) জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক হয়।

(৪) জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যাধুনিক হয়।

(৫) প্রচুর পরিমাণ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করা হয়।

বিকাশশীল আর্থিক পরিবেশ এইভাবে কারবার ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে ঃ

(১) সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ অনুন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করার ফলে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হয় না।

(২) এর ফলে নতুন কর্মসংস্থানের চেষ্টা ব্যহত হয়।

(৩) জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক হয় না।

(৪) তীব্র বেকার সমস্যার জন্য জীবনযাত্রার মান উন্নতমানের হয় না।

অনুন্নত আর্থিক পরিবেশ আবার এইভাবে কারবার ও সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে ঃ

(১) কম পরিমাণে নিম্নমানের ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হয়।

(২) নতুন কর্মসংস্থান হয় না বললেই চলে।

(৩) জনগণ তীব্র দারিদ্র্যের শিকার হয়।

উন্নত, বিকাশশীল ও অনুন্নত—এই তিনভাবে ছাড়াও কারবারের আর্থিক পরিবেশ ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ধনতান্ত্রিক পরিবেশে কারবারের ওপর রাষ্ট্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই পরিবেশে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থাকে ব্যক্তির হাতে। যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মুনাফা সর্বাধিক হয় ব্যক্তি সেই দ্রব্যই উৎপাদন করে থাকে। এই ধরনের পরিবেশে উদ্যোগ ও পেশা নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা এবং শ্রম ও মূলধনের অবাধ গতিশীলতা বর্তমান। দ্রব্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্রেতার অবাধ স্বাধীনতা এই পরিবেশের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ক্রেতার এই প্রকার স্বাধীনতার জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রের মালিকানাও নিয়ন্ত্রণ থাকে। অনেকে একে আদেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে থাকেন। এই ধরনের ব্যবস্থায় ভোগকারীর স্বাধীনতা থাকে না। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ রাষ্ট্র ঠিক করে থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ব্যবসার একচেটিয়া মনোভাব সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দেখা যায় না।

মিশ্র অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার এক সংশোধিত রূপ। মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থায় কারবার পরিচালনায় সরকারী উদ্যোগ, বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থান দেখা যায়। এই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিও বলা হয়। মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় পুষ্ট, কিন্তু এই অর্থনীতি আবার ধনতন্ত্রের মূল কাঠামোর মধ্যে কাজ করে থাকে। এই অর্থনীতিতে একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা ও জনসেবামূলক কাজ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে আবার বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কারবারের কারবারীরা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

(খ) **প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ** প্রকৃতিগত কারণেই প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, মানুষ এই পরিবেশ সৃষ্টি করে না। কোনও দেশের আয়তন, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, জনবসতি, উদ্ভিদ, জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত। প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হওয়ার জন্য কোনও দেশ শিল্পে সমৃদ্ধ, কোনও দেশ আবার কৃষিপ্রধান, কোনও দেশের জনগণ মৎস্যজীবী, তো কোনও দেশের জনগণ প্রধানত পশুপালক। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনও দেশের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের কারবারের বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বিকাশের সহায়ক হয়েছে। যে দেশে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ নয় সেই দেশের কারবারের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

(গ) **সামাজিক পরিবেশ ঃ** সামাজিক পরিবেশ কোনও দেশের জনগণের ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিবেশে সেই সমস্ত দেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সামাজিক পরিবেশ মানুষের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা পূরণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কারবার গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি দেশে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হয় এবং এর ওপর নির্ভর করে সেই সমস্ত দেশে মদ্যশিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু অপরদিকে তুরস্ক মুসলমান প্রধান দেশ হওয়ায় সে দেশে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও মদ্যশিল্প গড়ে ওঠেনি, কারণ ইসলাম ধর্মে মদের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

(ঘ) **রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ** কোনও দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সেই দেশের কারবারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যদি রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থিত ও স্থিতিশীল হয় তবে কারবার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, অপরদিকে যদি দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির হয় তবে কারবারী তার কারবারের স্থায়ী প্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, নচেৎ কারবারী অনেক প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয় ও কারবারের স্থায়ীত্ব নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে পারে।

(ঙ) **কারিগরি পরিবেশ ঃ** বর্তমান দিনে কারিগরি পরিবেশ কারবারের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কোনও দেশের দক্ষ, কুশলী কারিগররাই কারবার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যে দেশ প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি বিদ্যায় যত উন্নত সেই দেশের কারবারও তত উন্নত। প্রধানত শিল্পোন্নত দেশগুলোতেই উন্নত কারিগরি পরিবেশ দেখা যায়।

অনুশীলনী—২

১) ধনতান্ত্রিক পরিবেশে কারবারের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে। (সত্য/মিথ্যা)

২) সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ ধনতান্ত্রিক পরিবেশের এক সংশোধিত রূপ। (সত্য/মিথ্যা)

৩) মিশ্র অর্থনীতি সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় পুষ্ট। (সত্য/মিথ্যা)

৪) বিকাশশীল আর্থিক পরিবেশে নতুন কর্মসংস্থানের চেষ্টা ব্যহত হয়। (সত্য/মিথ্যা)

৫) কারিগরি পরিবেশ অর্থনৈতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। (সত্য/মিথ্যা)

৭৫.৪ কারবারী পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা ও বাধাগুলি চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা

আমরা ওপরের আলোচনা থেকে দেখলাম বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ কীভাবে কারবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু আমরা আবার এটাও জানি যে সর্বত্র পরিবেশ আমাদের অনুকূল নয়। কোথাও কোথাও পরিবেশ যথেষ্ট পরিমাণে কৃপণ। তাহলে আমাদের কী করা উচিত? পরিবেশের প্রতিকূলতা ও সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলাটাই শ্রেয়। কারবারী পরিবেশের সমস্ত প্রতিকূলতা ও সুযোগ-সুবিধা ঠিক ঠিক ভাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সমস্ত প্রতিকূলতা দূর করা ও বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এই এককে আমরা পরিবেশের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বাধা সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং এদেরকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৭৫.৪.১ কারবারী পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা

কারবারী পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা কী কী অথবা কখন কারবারী পরিবেশ অনুকূল বলে বিবেচিত হবে অথবা কোনও কোনও উপাদান কারবারী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে—এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা এই আলোচনা থেকে পাব।

এখন আমরা দেখব কোন কোন উপাদান কারবারী পরিবেশের অনুকূল ঃ

(ক) **প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ** অনুকূল ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষিজ সম্পদ ইত্যাদি কারবারী বিকাশের পক্ষে সহায়ক। কোনও দেশ যদি প্রাকৃতিক সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয় তবে সেই দেশের কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

(খ) **প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ** সঠিক অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের কারবারের উন্নতিতে সহায়তা করে। যদি কোনও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় হয় তবে সেই দেশের কারবারের বিকাশ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়। উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের জাতীয় আয় বাড়ায়, ফলে মাথাপিছু আয়ও বাড়ে। এর ফলস্বরূপ মানুষের জীবনযাত্রার মানও সমৃদ্ধ হয় এবং এর প্রভাবে কারবারের বিকাশ উন্নতমানের হয়।

(গ) **রাজনৈতিক অবস্থা ঃ** স্থিতিশীল সরকার যে কোনো দেশের কারবারী পরিবেশের পক্ষে সহায়ক। স্থায়ী সরকার দেশের কারবার সম্বন্ধে স্থায়ী নীতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে স্থিতিশীল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে কারবারের বিকাশ সুদৃঢ় হয়।

(ঘ) **কারিগরী অবস্থা ঃ** উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি উন্নতমানের কারিগরী অবস্থার অন্যতম উপাদান। উন্নত মানের কারিগরী অবস্থা কারবারী পরিবেশের পক্ষে সহায়ক।

(ঙ) **ভোগকারীর আচরণ ঃ** ভোগকারীর আচরণ কারবারী পরিবেশকে প্রভাবিত করে। ভোগকারীর রুচি, পছন্দ-অপছন্দ কারবারের উৎপাদনও বিক্রির ওপর প্রভাব ফেলে। কারবারী ভোগকারীর আচরণের ওপর নির্ভর করে কারবার পরিচালনা করে থাকে।

(চ) **জনসংখ্যা ঃ** মোট ভোগকারীর সংখ্যাও কারবারী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কারবারী চাহিদা অনুযায়ী জিনিস উৎপন্ন করে ও বাজারে জোগান দিয়ে থাকে। চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যই যে কোনও কারবারীর মূল লক্ষ্য।

৭৫.৪.২ কারবারী পরিবেশের বাধা

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কারবারী পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা, এবার আমরা কারবারী পরিবেশের বাধা নিয়ে আলোচনা করব। যে কোনও কারবারী পরিবেশে সুযোগ-সুবিধা যেমন আছে আবার বাধাও তেমনি আছে। এই বাধাগুলোকে এইভাবে লেখা যায় ঃ

(ক) **প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ঃ** প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব কারবারী পরিবেশ বিকাশের পক্ষে প্রধান বাধা। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব কারবারের বৃদ্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) **পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব ঃ** মূলধন কারবারের চালিকা শক্তি। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে কারবারের বিকাশ ব্যহত হয়। কারবার প্রতিযোগীতার মুখে অসহায় হয়ে পড়ে।

(গ) **প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব ঃ** কেবলমাত্র উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যাই কারবারের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। অদক্ষ শ্রমিক ও অনুন্নত কারিগরিবিদ্যা কারবারের পরিবেশ গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(ঘ) **রাজনৈতিক স্থিরতার অভাব ঃ** আমরা জানি যে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিই কেবলমাত্র অনুকূল কারবারী পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে। অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ কারবারের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।

(ঙ) **নতুন চিন্তাধারার অভাব ঃ** কেবলমাত্র নতুন নতুন চিন্তাধারার সাহায্যেই কারবারের নতুন নতুন দিকের বিকাশ সম্ভব। নতুন উদ্যোগের অভাবে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

(চ) **বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অভাব ঃ** যে কোনও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবহারই কেবলমাত্র অনুকূল কারবারী পরিবেশ গঠন করতে পারে।

৭৫.৪.৩ এই সুবিধা ও বাধাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ আমরা কারবারী পরিবেশের অনুকূল উপাদান ও বাধা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। এই সুবিধা কারবারী পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে ও বাধা কারবারী পরিবেশের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে আমরা যদি

এই সুবিধা ও বাধাগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে না পারি তাহলে কারবার সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারব না। কেন এই সুবিধা ও বাধাগুলোকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে তা আমরা নীচের আলোচনা থেকে বুঝতে পারব ঃ

(১) আমরা জানি অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ কারবার গঠনে সহায়ক হয়। তাই কোথায় কারবারের উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল পাওয়া যায়, কোথায় কারবারের উপযোগী জলবায়ু বর্তমান, কোথায় ভোগ্যপণ্য পরিবহনের সুবিধা আছে, কোথায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার আছে—এই সমস্ত যদি সঠিকভাবে জানা যায় তবে কারবার স্থাপন করতে সুবিধা হয়।

(২) বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার কারবার স্থাপন করা যায়। ব্যবসায়ী যে পরিবেশে কারবার স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হয় সেই পরিবেশের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তার সচেতন হওয়া উচিত নচেৎ অর্থনৈতিক পরিবেশের উপযোগী কারবার গঠনে সে অসমর্থ হবে।

(৩) স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ কারবার গঠনের সহায়ক। কারবারী চায় দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যেন অস্থির না হয়। ফলে যে দেশে ব্যবসায়ী কারবার স্থাপন করতে চায় সেখানকার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে সুবিধা বা বাধাগুলোকে চিহ্নিত করা কারবারীর অবশ্য কর্তব্য।

(৪) কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ উন্নত শ্রমিক কারবার বিকাশের পক্ষে সহায়ক। কারবারীর জানা উচিত যে যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে কি না। যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ শ্রমিক কারবারের বড় ভরসা। এদের মাধ্যমেই কারবারী তার কারবারের উৎপাদনকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

(৫) যে পরিবেশে কারবার স্থাপন করা হচ্ছে সেখানকার বিভিন্ন আইন কারবার স্থাপনের পক্ষে সহায়ক কি না তাও দেখতে হবে। আইনি জটিলতামুক্ত পরিবেশে কারবার স্থাপন করলে তা কারবারের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়।

(৬) সংস্কারমুক্ত সামাজিক পরিবেশে কারবার শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কুসংস্কারের বেড়াজালে কারবারের উন্নতি ব্যহত হয়। তাই কারবারীর সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

অনুশীলনী—৩

১) কারবার স্থাপনে পরিবেশের বিভিন্ন অনুকূল উপাদানগুলি কী কী?

২) কারবার স্থাপন করতে গেলে কারবারী কী কী বাধার সম্মুখীন হতে পারে?

৩) কারবার স্থাপনে এই সুযোগ-সুবিধা ও বাধাগুলো চিহ্নিত করা কি নিতান্তই প্রয়োজনীয়?

৭৫.৫ ভারতে কারবারী পরিবেশ

ভারতের কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা এইভাবে আলোচনা করতে পারি ঃ

(ক) **প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ** ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তার অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অরণ্যসম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এটা সত্যি ভারত বিশ্বের

সুপ্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ও বৈচিত্র্যে ভরা। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

(১) **অবস্থান ঃ** ভারত উত্তর গোলার্ধে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। ৮°৪´ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৭°৬´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৬৮°৭´ দ্রাঘিমা থেকে ৯৭°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে ভারতের অবস্থান।

(২) **আয়তন ঃ** আয়তনে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থানের অধিকারী। ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কি.মি.।

(৩) **জনসংখ্যা ঃ** ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৮৪.৪০ কোটি। বর্তমানে ভারতে জনগণনার কাজ নতুন করে চলছে। ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ভারতে লোকসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ২৬৭ জন।

(৪) **ভূ-প্রকৃতি ঃ** ভারতের উত্তরে বরফে ঢাকা পর্বতশ্রেণী, মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ সমভূমি, দক্ষিণে শিলাযুক্ত মালভূমি, উপকূলভূমি এবং পশ্চিমে মরুভূমি। ভূ-প্রকৃতির দিক দিয়ে ভারতকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায় ঃ—উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, মধ্যভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল, উপকূলের সমভূমি অঞ্চল ও দ্বীপ অঞ্চল।

কাশ্মীরের নাঙ্গা পাহাড় থেকে অরুণাচল প্রদেশের নামাচাবারওয়া পর্যন্ত হিমালয়ের দৈর্ঘ্য ১৫০০ কি.মি. এবং প্রস্থ ১৫০ কি.মি. থেকে ৪০০ কি.মি.। মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল পূর্ব-পশ্চিমে ২৫০০ কি.মি. দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৪০ থেকে ৩২০ কি.মি. পর্যন্ত প্রশস্ত। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অঞ্চল উত্তরে আরাবল্লী পাহাড় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চল পশ্চিমে আরবসাগর থেকে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের দ্বীপ অঞ্চলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ও আরবসাগরের দ্বীপপুঞ্জ।

(৫) **জলবায়ু ঃ** ভারতের জলবায়ুকে কোপেন প্রধান স্বাভাবিক উদ্ভিদের ওপর ভিত্তি করে ভাগ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলগুলি হল ঃ ক্রান্তীয় অতি আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল, ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ু অঞ্চল, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় স্টেপ অঞ্চল, উচ্চ মরুভূমি জলবায়ু অঞ্চল, আর্দ্র উপক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বা মেরু অঞ্চল।

(৬) **অরণ্যসম্পদ ঃ** ভারতের অরণ্য কোথাও বৃষ্টিপাতের ওপর, কোথাও বা মৃত্তিকার ওপর, কোথাও বা ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ভারতে প্রায় ৭৫০ লক্ষ হেক্টর জাগয়া জুড়ে অরণ্য আছে। ভারতের মোট আয়তনের ২২.৮ ভাগ অরণ্য দিয়ে ঢাকা। ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ১.৫ ভাগ অরণ্য থেকে এসে থাকে।

(৭) **খনিজসম্পদ ঃ** ভারতের বেশিরভাগ খনিজদ্রব্য উপদ্বীপের মালভূমি অঞ্চলের প্রাচীন শিলাস্তরে পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে ভারতের মোট খনিজ সম্পদের প্রায় ৬০ ভাগ সঞ্চিত আছে। ভারত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশের শিল্পের উন্নতির মূলে রয়েছে খনিজ

সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। ভারতের বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্যের মধ্যে জ্বালানী খনিজ (যেমন ঃ কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম); ধাতবখনিজ (যেমন ঃ লোহা, তামা, সোনা) অধাতব খনিজ (যেমন ঃ অভ্র, জিপসাম, চুনাপাথর) উল্লেখযোগ্য।

(৮) **কৃষিজ সম্পদ ঃ** ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। ভারতে প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকে। কয়েকটি কৃষিজ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে (যেমন ঃ চা, পাট ইত্যাদি) ভারত বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে কৃষিজ-ফসলের মধ্যে খাদ্যশস্য ও শিল্পশস্য প্রধান।

(খ) **সামাজিক পরিবেশ ঃ** ভারতের সমাজে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন পেশার মানুষের বাস। এদের চিন্তাধারা ভিন্ন, আচার-আচরণ ভিন্ন। এর ফলে ভারতের সামাজিক পরিবেশ বৈচিত্রে ভরা। ভারতের সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

(১) **যৌথ পরিবার ঃ** যৌথ পরিবার প্রথা বা একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ভারতের সমাজের এক মূল বৈশিষ্ট্য। সেই প্রাচীনকাল থেকে ভারতে এই প্রথা চলে আসছে। যে পরিবারে এই প্রথা চালু আছে সেই পরিবারের সদস্যরা একসাথে, একই ছাদের তলায় থাকে, একসাথে খাওয়াদাওয়া করে এবং এরা বিভিন্ন প্রকার সুখদুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই ধরনের পরিবারে কর্তার ওপর পরিবার পরিচালনার ভার থাকে। পরিবারের সদস্যেরা কর্তার প্রতি অনুগত থাকে। এই প্রথায় প্রত্যেকের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে ওঠে, নিয়মানুবর্তিতা থাকে ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই প্রথা ভাঙনের মুখে।

(২) **জাতিভেদ প্রথা ঃ** প্রাচীনকালে বিশেষত কে কী ধরনের কাজে সমাজে ব্যস্ত থাকত তার ওপর ভিত্তি করে চার শ্রেণীতে লোকজনদের ভাগ করা হয়েছিল—এই চারটি শ্রেণী হল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। যদিও কাজের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এই শ্রেণীবিভাগ হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী লোকের ভুল ব্যাখ্যায় এই শ্রেণীবিভাগ মানুষের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করে। ফলে অস্পৃশ্যতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই অস্পৃশ্যতা অনেকাংশে দূর হয়েছে কিন্তু সমাজ এখনও এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয় নি। জাতিভেদ প্রথায় শ্রমের গতিশীলতা বাধা পায় ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

(৩) **ধর্মের গোঁড়ামি ঃ** জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি; অস্পৃশ্যতার কুপ্রভাবের ফলে কিছু শ্রেণীর মানুষ ধর্মকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে চলেছে। ধর্মের গোঁড়ামি বাড়ার সাথে সাথে অস্পৃশ্যতা সমাজের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। বর্তমানে মানুষের সচেতনতার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এই গোড়ামি অনেকাংশে দূর হয়েছে।

(৪) **উত্তরাধিকার প্রথা ঃ** পিতার সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে তার ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভাগ হয়। এর ফলে ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে এর প্রভাব পড়েছে। এর ফলে কৃষিজমি টুকরো টুকরো ভাগে ভাগ হচ্ছে। ফলস্বরূপ আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্র ব্যবহার করা মুশকিল হয়ে পড়ছে।

(৫) **বিবাহ প্রথা ঃ** ভারতের সমাজে বিভিন্ন প্রকার সংস্কারের মধ্যে বিবাহপ্রথা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মৃত্যুর পর পুত্রের হাতের ছোয়ায় স্বর্গলাভ হয়—এই কুসংস্কারের ভিত্তি করে বিবাহ নামক প্রথার মাধ্যমে মানুষ নির্বিচারে পুত্রের জন্ম দেয়। কন্যার জন্ম যেহেতু এই সুখ দিতে পারে না,

তাই পুত্রলাভের আশায় মানুষ সন্তান উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সীমিত আয়ের সংসারে দারিদ্র্য দেখা যায় ও সমাজে তার কুপ্রভাব পড়ে। এদেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকার দরুন প্রজনন সময়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় ও ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও সমাজের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

(গ) **অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ** ভারত প্রকৃতপক্ষে একটি অনুন্নত অর্থব্যবস্থার দেশ। যে যে কারণে ভারত সম্পর্কে এই কথা বলা যায় তা হল ঃ

(১) ভারতে মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা।

(২) আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন।

(৩) জনসংখ্যার অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি।

(৪) কৃষির প্রাধান্য।

(৫) উদ্যোক্তার অভাব।

কিন্তু দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসন ও শোষণে ভারতে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভারতকে এই বিকাশমান অর্থব্যবস্থা বলা হয়। এর কারণগুলো হল ঃ—

(১) জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি।

(২) মূলধনী শিল্পের প্রসার।

(৩) জনসংখ্যার পেশাগত বণ্টন।

(৪) অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজ থেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মিশ্র অর্থব্যবস্থার অপর নাম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। ভারতকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রও বলা হয়।

(ঘ) **রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ** রাজনৈতিক পরিবেশ বলতে সরকারের স্থিতিশীলতা বা অস্থিতিশীলতার দরুন দেশের শান্তি, শৃঙ্খলার অবস্থা, কারবারী কাজকর্ম সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও কারবার পরিচালনায় বিভিন্ন আইনকানুন ইত্যাদিকে বোঝায়। স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতে বেশির ভাগ ব্যবসা ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন ছিল। স্বাধীনতার পর মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য নেওয়ার সাথে সাথে কারবারের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পেল। বেসরকারী কারবারের পাশাপাশি সরকার পরিচালনায় কারবারও প্রতিষ্ঠিত হল। এই ক্ষেত্রে কারবারের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করল সরকারের স্থায়িত্বের ওপর। অস্থির রাজনীতিতে কারবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কারবারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন ঃ

(১) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন।

(২) ১৯৬৯ সালের একচেটিয়া ও বিধিনিষেধমূলক কারবারী আইন।

(৩) ১৯৫৫ সালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইন।

(৪) ১৯৬১ সালের আয়কর আইন।

এছাড়াও শিল্পের বিকাশের জন্য ভারত সরকার সময়ে সময়ে তার শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। ভারত সরকার বর্তমানে ১৯৭৩ সালের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন বদলে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (০১/০৬/২০০০ থেকে চালু হয়েছে) প্রবর্তন করেছেন।

(ঙ) **কারিগরি পরিবেশ ঃ** কারিগরি পরিবেশ বলতে দক্ষ শ্রমিক, উন্নত মানের কারিগরি বিদ্যা এইগুলোকে বোঝায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতে বিজ্ঞান চেতনায় নতুন আন্দোলন দেখা দিয়েছে। বর্তমান দিনে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রায় এক ভাগ (০.৮৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির জন্য খরচ করা হচ্ছে। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ সংসদে বিজ্ঞান বিষয়ক বিবৃতি পাশ হয় যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সরকারের যাবতীয় দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন ভূমিকার কথা মাথায় রেখে ১৯৮৬ সালে ভারত সরকার প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই সময়ে জাতীয় প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদের জোগানের কথাও চিন্তা করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগারের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য ছয়টি বিজ্ঞান বিভাগ (যেমন ঃ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা বিভাগ বায়োটেকনোলজি, সমুদ্র বিষয়ক উন্নতি, আকাশ ও পরমাণু বিষয়ক বিভাগ ইত্যাদি)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও ভারতীয় চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা বিভাগ, ভারতীয় কৃষি গবেষণা বিভাগ, যোগাযোগ বিষয়ক বিভাগ, অচিরাচরিত শক্তি বিভাগ, জলসেচ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ ভারত সরকার চালু করেছেন। বর্তমানে সরকারের উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন দেশীয় শিল্পে জোয়ার না আনতে পারলে উন্নতি সম্ভব নয়। বর্তমান সরকার ‘জয় বিজ্ঞান’ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু বাজেটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সেইরকম আশাপ্রদ টাকার জোগান দেখা যাচ্ছে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভার ৮৫তম অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ পি. রামারাও, জরুরী ভিত্তিতে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় শতকরা দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরেই শিল্পক্ষেত্রের স্থান। ১৯৯৪-৯৫ সালে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে শিল্পক্ষেত্র প্রায় ১৮০৪.৯০ কোটি টাকা খরচ করেছে যা তার মোট বিক্রির ০.৬ শতাংশ। আমাদের দেশে ১১ই মে “জাতীয় কারিগরি দিন” হিসাবে পালন করা হয়। ভারত সরকার তার উদারনীতির অঙ্গ হিসাবে কারিগরি ক্ষেত্রে ৭৪% সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। কারিগরি ক্ষেত্রে আমদানির ওপর সমস্ত বাধা সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। সারা বিশ্বের ব্যবসা সম্পর্কিত মেধা সম্পত্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেটেন্ট আইনে রদবদল করা হচ্ছে।

অনুশীলনী—৪

১) ভারতের সামগ্রিক পরিবেশ সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য করুন ও চেষ্টা করে দেখুন তো আর কোনও নতুন তথ্য জানা যায় কিনা?

৭৫.৬ সারাংশ

এই একক পড়ে আপনারা নীচে উল্লেখ করা বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে পারলেন ঃ

(ক) পরিবেশ কাকে বলে?

(খ) কারবারী পরিবেশ বলতেই বা আমার কী বুঝি?

(গ) কারবারী পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ।

(ঘ) কারবারের ওপর পরিবেশ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

(ঙ) কারবারী পরিবেশের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ও বাধাগুলো কী কী এবং এইগুলোকে চিহ্নিত করার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কী?

(চ) ভারতে বিভিন্ন প্রকার কারবারী পরিবেশের আলোচনা।

৭৫.৭ অনুশীলনী

(১) পরিবেশ কাকে বলে? কারবারী পরিবেশ বলতে কী বোঝেন? পরিবেশের বিভিন্ন ভাগগুলো কী কী?

(২) প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বলতে কী বোঝেন? কারবারের ওপর এই পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(৩) কারবারী পরিবেশের অনুকূল উপাদানগুলো কী কী? এই পরিবেশের উন্নতির পক্ষে বাধাগুলোও বা কী কী?

(৪) আপনি কি মনে করেন এই অনুকূল উপাদান ও বাধাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়োজন আছে?

(৫) ভারতে কারবারের পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৭৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. চিত্তরঞ্জন বসু — *'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা'* (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)

২। গুহ-মুখার্জ্জী— *'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার নীতি'* (নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

৩। M.C. Shukla—*'Business Organisation and Management'* (S. Chand & Company Ltd.)

৪। Y. K. Bhusan-*'Fundamentals of Business Organisation and Management'* (Sultan Chand & Sons)

৫। নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী — *'কারবার সংগঠন'* (মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

একক ৭৬(ক) ❑ বেসরকারী ক্ষেত্র—কোম্পানী

গঠন

৭৬(ক).০ উদ্দেশ্য
৭৬(ক).১ প্রস্তাবনা
৭৬(ক).২ কোম্পানীর সংজ্ঞা
৭৬(ক).২.১ কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য
৭৬(ক).৩ কোম্পানীর প্রকারভেদ—সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানী
৭৬(ক).৪ কোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা
৭৬(ক).৫ কোম্পানী প্রবর্তনের প্রক্রিয়া
৭৬(ক).৫.১ প্রবর্তকের শ্রেণীবিভাগ
৭৬(ক).৬ কোম্পানী পরিচালনা—পরিচালকমণ্ডলী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর—ম্যানেজার—তাদের কাজ
৭৬(ক).৭ সারাংশ
৭৬(ক).৮ অনুশীলনী
৭৬(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭৬(ক).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ও আলোচনা করতে সক্ষম হবেন ঃ—

- কোম্পানী বলতে আমরা কী বুঝি?
- কোম্পানীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
- কোম্পানীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
- সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানী কী? এদের মধ্যে পার্থক্যই বা কী?
- কোম্পানী গঠনে সুবিধা ও অসুবিধা কী?
- কীভাবে কোম্পানী প্রবর্তন করা যায়?
- কোম্পানী কীভাবে পরিচালনা করা হয়? এই পরিচালকদের কাজ কী?

৭৬(ক).১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা সরকারী, বেসরকারী ও যৌথ ক্ষেত্রের সহাবস্থান দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল বেসরকারী ক্ষেত্রের কারবার। যে সমস্ত কারবারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগে ও মালিকানায় গড়ে ওঠে তাদেরকেই বেসরকারী ক্ষেত্রের কারবার বলে। বেসরকারী ক্ষেত্রের মালিকানা দু ধরনের হয় ঃ

(ক) ব্যক্তিগত মালিকানার বেসরকারী ক্ষেত্র—যেমন এক মালিকী কারবার।

(খ) সমষ্টিগত মালিকানার বেসরকারী ক্ষেত্র ঃ—যেমন, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী, সমবায় কারবার।

এই বেসরকারী ক্ষেত্রের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই যেমন ঃ

(১) ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও মালিকানা।

(২) ব্যক্তিগত মূলধন।

(৩) ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত পরিচালনা।

(৪) প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

(৫) ক্রেতা ও শ্রমিক শোষণ।

(৬) ধনবৈষম্য।

(৭) একচেটিয়া প্রতিপত্তি ইত্যাদি।

এই বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) সরকারী ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনগণের সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হল মুনাফা অর্জন করা।

(খ) সরকারী ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মে কাজকারবার চলে। কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রের কাজকারবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ও নিপুণতার সঙ্গে করা হয়।

(গ) সরকারী কারবারে শিথিলতা, উদ্দীপনার অভাবের জন্য উৎপাদিকা শক্তি কম হয়।

কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উদ্দীপনার মেলবন্ধনে উৎপাদিকা শক্তি বেশি হয়।

(ঘ) সরকারী কারবারের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষ পরিচালকের অভাব দেখা যায়।

অন্যদিকে বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নতমানের দক্ষ পরিচালক থাকার দরুণ শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার দেখা মেলে।

(ঙ) ঢিলেঢালা ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাত্রায় বেহিসাবী খরচ ও অপচয় দেখা যায়। অন্যদিকে উন্নতমানের ব্যবস্থাপনার জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রে আয়ব্যয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি থাকে। ফলে অযথা অপচয় রোধ হয়। ভারতের কয়েকটি সরকারী ক্ষেত্রের কারবার ঃ হিন্দুস্থান স্টীল, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন, ভারতীয় হেভী ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড, স্টীল অথরিটি অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ন্যাশানাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, মেটালারজিক্যাল অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সালট্যান্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। ভারত সরকার ১৯৯৭ সালে ১১টা সরকারী ক্ষেত্রের কোম্পানীকে 'নবরত্ন' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। এই ১১ টা কোম্পানী হল BHEL, BPCL, GAIL, HPCL, IOC, IPCL, MTNL, NTPC, ONGC, SAIL ও VSNL। এই কোম্পানীগুলো ১৯৯৮-৯৯ সালে ১২,০৭৩ কোটি টাকা লাভ করেছে।

ভারতে বিভিন্ন প্রকার বেসরকারী ক্ষেত্রের কারবারের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এক মালিকানা ও অংশীদারী কারবার স্থাপনে ও পরিচালনায় বিভিন্ন অসুবিধা থাকার জন্য যৌথ মূলধনী কারবার স্থাপনে বেশি উৎসাহ দেখা যায়।

ভারতে সর্বপ্রথম ১৮৫০ সালে কোম্পানী-সংক্রান্ত আইন রচনা করা হয়। তারপর বিভিন্ন সময়ে যেমন ১৮৬৬ সালে, ১৮৮২ সালে, ১৯১৩ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইনে নতুন নুতন সংযোজন হয়, আবার কোনও কোনও ধারা বাদও পড়ে। বর্তমানে যে আইন প্রচলিত তা ১৯৫৬ সালে রচনা করা ও চালু করা ভারতীয় কোম্পানী আইন। সি.এইচ. ভাবার সভাপতিত্বে এক কমিটির সময়োপযোগী চিন্তাভাবনার ফল হিসাবেই এই আইন রচনা করা হয়। ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইন রচনা ও চালু হবার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ১৮ বার তা সংশোধন করা হয়েছে। সবশেষ সংশোধনটি হয়েছে ১৯৯৯ সালে।

৭৬(ক).২ কোম্পানীর সংজ্ঞা

সাধারণ ভাষায় কিছু ব্যক্তি নিয়ে কোনও সাধারণ উদ্দেশ্য গঠন করা এবং কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধন হওয়া যে কোনও সংস্থাকেই কোম্পানী বলা হয়।

১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইনের ৫৬৬(১) ধারায় যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা এই প্রকার ঃ "যৌথ মূলধনী কোম্পানী বলতে এমন কোম্পানীকে বোঝায় যার স্থায়ী আদায়ীকৃত অথবা অনুমোদিত নির্দিষ্ট মূল্যের শেয়ারে ভাগ করা শেয়ার বাবদ মূলধন আছে এবং নির্দিষ্ট মূল্যের নিজের কাছে রাখা বা হস্তান্তর করা যায় এমন স্টক অথবা নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করা ও অংশত একভাবে ও অংশত অন্যভাবে ধরে রাখা এবং এই নীতি মেনে চলা যাতে কোম্পানীর সদস্যরা এই শেয়ার বা স্টকের ধারক হন এবং অন্য কেউ নয়"।

[A joint-stock company means a company having a permanent paid up or nominal share capital on fixed amount divided into shares, also of fixed amount, or held and transferable as stock or divided and held partly in the one way and partly in the other and formed on the principle of having for its members the holders of those shares or that stock and no other person—Section 566(1) of the Companies Act, 1956.]

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২(১০) ধারায় কোম্পানীর সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে যে কোম্পানী মানে হল একটি কোম্পানী যার সংজ্ঞা ৩নং ধারায় দেওয়া আছে। কোম্পানী আইনের ৩(১)(ক) ধারায় বলা হয়েছে কোম্পানী মানে হল একটি কোম্পানী যা এই আইনের আওতায় গঠন ও নিবন্ধন করা হয়েছে অথবা একটা কোম্পানী যার অস্তিত্ব বর্তমান আছে"।

[Company means a company formed and registered under this Act or an existing Company-See 3.(1)(i).]

এছাড়াও কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি কোম্পানীর সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন ঃ

(ক) হ্যানির মতে কোম্পানী হল আইনের সাহায্যে সৃষ্টি হওয়া এক কৃত্রিম ব্যক্তি যার একটা পৃথক আইনগত সত্তা, চিরন্তন অস্তিত্ব ও একটা সাধারণ শিলমোহর আছে।

(খ) বিচারপতি লিণ্ডলে বলেছেন, কোম্পানী হল অনেক ব্যক্তির সাহায্যে স্বেচ্ছায় গড়ে ওঠা একটা প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে ও সেই অর্থ কারবারে বিনিয়োগ করে এবং সেখান থেকে যে লাভ বা ক্ষতি হয় তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

৭৬(ক).২.১ কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সংজ্ঞা আলোচনা করলে আমার কিছু কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এইভাবে লেখা যায় ঃ

(১) **গঠন ঃ** কোম্পানী হল স্বেচ্ছায় গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠান যাতে অনেক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে কোম্পানী গঠন করা যেতে পারে। কোম্পানী আইন অনুযায়ী ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে অন্তত ২ জন ও সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে অন্তত ৭ জন সদস্য হলে কোম্পানী গঠন করা যায়। [ধারা ১২ (১)]

(২) **আইনত পৃথক সত্তা ঃ** যৌথ মূলধনী কোম্পানী ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠন ও নিবন্ধন করা হয়। কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধন হয়ে গেলে কোম্পানী আইনের চোখে এক কৃত্রিম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে কোম্পানী এক সাধারণ ব্যক্তির মতই আচরণ করতে পারে। কোম্পানীর পৃথক সত্তা থাকার জন্য সদস্যদের স্থায়িত্বের ওপর কোম্পানীর স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। Solomon Vs. Solomon & Co. Ltd. (1897) মামলায় এই নীতির পক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে।

(৩) **সাধারণ শিলমোহর ঃ** নিবন্ধনের ফল হিসাবে কোম্পানী সাধারণ শিলমোহর পায় [ধারা ৩৪ (২)]। এই সাধারণ শিলমোহর কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ। কোনও দলিলে এই শিলমোহর থাকার মানে হল কোম্পানীর সম্মতি সাপেক্ষেই সেই দলিল রচনা করা হয়েছে।

(৪) **চিরন্তর স্থায়িত্ব ঃ** এই চিরন্তর স্থায়িত্বও কোম্পানীর নিবন্ধনের ফল [ধারা ৩৪ (২)]। কোম্পানীর চিরন্তর স্থায়িত্বের অর্থ হল মালিকানার কোনও রকম পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর স্থায়িত্বের কোনওরূপ পরিবর্তন হয় না। কেবলমাত্র আইনের সাহায্যেই কোম্পানীর অবসায়ন হতে পারে।

(৫) **মালিকানা ঃ** শেয়ারহোল্ডাররাই হল কোম্পানীর প্রকৃত মালিক। কোম্পানীর শেয়ার যেহেতু হস্তান্তর করা যায় সেইহেতু কোম্পানীর মালিকানা সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

(৬) **নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ঃ** যদিও শেয়ারহোল্ডাররাই কোম্পানীর প্রকৃত মালিক তবুও প্রতিদিনের কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে না। এই কারণে শেয়ারহোল্ডাররা তাদের দ্বারা নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলীর ওপরেই দৈনন্দিন কাজের ভার দিয়ে থাকে।

(৭) **লাভের অংশ বণ্টন ঃ** কোম্পানীর লাভ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কোম্পানী আইনের ২০৫ নং ধারা অনুসারে কেবলমাত্র লাভ থেকেই লভ্যাংশ দেওয়া যেতে পারে। শেয়ারের মালিকেরা অধিকারের ভিত্তিতে ও শেয়ারের অনুপাতে মুনাফা ভোগ করে।

(৮) **পৃথক মালিকানা ও পরিচালনা ঃ** কোম্পানীর প্রকৃত মালিক শেয়ারহোল্ডাররা। কিন্তু কোম্পানীর কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা অংশগ্রহণ করতে পারে না। শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর কাজকর্ম পরিচালনা করে। এই কারণে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের কাজকর্মের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকতে পারে না।

(৯) **সদস্যদের সীমিত দায় ঃ** কোম্পানীর সদস্য অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। যে পরিমাণ শেয়ার তারা ক্রয় করেন তার মোট মূল্য পর্যন্তই তাদের দায় সীমাবদ্ধ। কোম্পানীতে কোনও অঘটন ঘটলে শেয়ারহোল্ডারদের দায় তাদের শেয়ারের মূল্যের বেশি হতে পারে না।

(১০) **সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ঃ** কোম্পানী পরিচালিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী। কোম্পানী পরিচালনায় এই কারণেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

৭৬(ক).৩ কোম্পানীর প্রকারভেদ—সার্বজনিক ও ঘরোয়া কোম্পানী

কোম্পানীকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এইভাবে ভাগ করা যায় ঃ—

(ক) **নিবন্ধনের দিক থেকে ঃ** নিবন্ধনের দিক থেকে কোম্পানীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **বিশেষ সনদের (Charter) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ঃ** আগে প্রায় সমস্ত কোম্পানী রাজকীয় অনুজ্ঞা বা সনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ্ অষ্ট্রেলিয়া, ইণ্ডিয়া ও চায়না ইত্যাদি। বর্তমানে ভারতে এই ধরনের কোম্পানী দেখা যায় না।

(২) **সংসদের বিশেষ আইনবলে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ঃ** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সংসদের বিশেষ আইনের সাহায্য নেওয়া হয়। এই আইনের দ্বারা গঠিত কোম্পানীকে সংবিধিবদ্ধ কোম্পানী (Statutory Company) বলে। ভারতে এই ধরনের কোম্পানীর উদাহরণ হল—দি এয়ার ইণ্ডিয়া, দি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, দি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব্ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

(৩) **কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ঃ** ১৯৫৬ সালে কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীই বেশি পরিমাণে বর্তমান দিনে দেখা যায়। এই আইনে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করার রীতিনীতি আলোচনা করা আছে। এই কোম্পানীগুলিকে নিবন্ধনকৃত যৌথমূলধনী কোম্পানী বলা হয়। ৩১শে মার্চ ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতে বর্তমানে ৫,৪৫,৭০৭টি কোম্পানী বিভিন্ন কাজে লিপ্ত আছে।

(খ) **দায়ের পরিমাণের দিক থেকে ঃ** দায়ের পরিমাণের দিক থেকে কোম্পানীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী (Companies with unlimited liability) ঃ** একমালিকী বা অংশীদারী কারবারের মত অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী আগেকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এই ধরনের কোম্পানী প্রায় দেখাই যায় না। এই ধরনের কোম্পানীর অবসায়ন হলে সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও প্রয়োজনবোধে পাওনাদারদের দেনা পরিশোধে ব্যবহার করা হত। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতে এই ধরনের কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৪৪৯।

(২) **প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিমিত দায়িত্বযুক্ত কোম্পানী (Company limited by Guarantee) ঃ** কোনও কোনও ক্ষেত্রে সদস্যরা তাদের নির্দিষ্ট শেয়ারের পরিমাণ ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ অর্থ প্রয়োজনবোধে দেবার জন্য প্রতিশ্রুত থাকেন। এই ধরনের অতিরিক্ত অর্থকে প্রতিশ্রুতি (Guarantee) বলা হয় ও যে কোম্পানী এই নীতি দিয়ে গড়ে ওঠে তাকে প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিমিত দায়িত্বযুক্ত কোম্পানী বলে। সাধারণত অমুনাফা সন্ধানী প্রতিষ্ঠানই এই ধরনের নিয়মে পরিচালিত হয়। এই ধরনের কোম্পানীর উদাহরণ হল চেম্বার অব্ কমার্স (Chamber of Commerce)। কত পরিমাণ অর্থ প্রতিশ্রুতি হিসাবে দেওয়া হবে তা স্মারকলিপি বা পরিমেল বন্ধ (Memorandum of Association) বা পরিমেল নিয়মাবলী (Articles of Association)-এ উল্লেখ থাকে। এই ধরনের কোম্পানী শেয়ার দ্বারা মূলধন জোগাড় করতে পারে, আবার নাও

পারে। যেখানে এই ধরনের কোম্পানী শেয়ার দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করে না সেখানে ভর্তি ফি, চাঁদা এইসবের দ্বারা মূলধন জোগাড় করা হয়। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতে এই ধরনের কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২,৮২৪।

(৩) **শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিতি দায়বিশিষ্ট কোম্পানী ঃ** আর এক ধরনের দায় বিশিষ্ট কোম্পানী আছে যার সদস্যদের দায় শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে কোম্পানী শেয়ারের মূল্যের বেশি টাকা শেয়ারহোল্ডারদের থেকে চাইতে পারে না। ভারতে বর্তমানে এই ধরনের কোম্পানীই বেশি পরিমাণে দেখা যায়। এই শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধতা ভারতীয় কোম্পানীর অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতে এই ধরনের কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৫,৪২, ৪৩৪।

(গ) **পরিচালনার গণ্ডির দিক থেকে বিচার করে ঃ**

পরিচালনার গণ্ডির দিক থেকে বিচার করে কোম্পানীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) **দেশীয় কোম্পানী ঃ** যে দেশে নিবন্ধন করা হয়েছে কেবলমাত্র সেই দেশে যে সমস্ত কোম্পানী তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে তাকে দেশীয় কোম্পানী বলে।

যেমন ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রের রাইগাদ জেলার রসায়নী ও হিন্দুস্থান অরগানিক্স কেমিক্যালস লিমিটেড নিবন্ধীকৃত হয়। ভারতে এর দুটি কারখানা আছে—একটা মহারাষ্ট্রের রসায়নীতে ও আর একটা কেরালার কোচিনে।

(২) **বহুজাতিক কোম্পানী ঃ** যে দেশে নিবন্ধন করা হয়েছে সেই দেশে এবং সেই দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে অন্য দেশে কারবার করে যে কোম্পানী তাকে বলে বহুজাতিক কোম্পানী (Multinational Company)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমেরিকার পেপসি, কোকাকোলা, পণ্ডস্, জেনারেল মোটোরস, ইংলন্ডের ব্রুক বণ্ড, জাপানের সোনি, সুজুকি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের টাটা ও বিড়লাদের পরিচালনাধীন কিছু বহুজাতিক কোম্পানী বর্তমান।

(ঘ) **জনগণের অংশগ্রহণ ও জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করে ঃ**

জনগণের অংশগ্রহণ ও জনস্বার্থের দিকে থেকে বিচার করে কোম্পানীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) **ঘরোয়া কোম্পানী ঃ** সবচেয়ে কম ২ জন ও সবচেয়ে বেশি ৫০ জন সদস্য নিয়ে এই ধরনের কোম্পানী গঠন করা যায়। তবে এই সদস্য সংখ্যার মধ্যে কোম্পানীতে আগে কাজ করত বা বর্তমানে কাজ করে এমন কর্মচারীর সংখ্যা ধরা হবে না। এই ধরনের কোম্পানী জনগণের কাছে শেয়ার বিলি করতে পারবে না। এই কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়। এই সমস্ত নিয়ম কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকবে। ২০০০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারতে এই ধরনের কোম্পানীর সংখ্যা ৪,৬৮,৫৭২ এবং তাদের মোট আনুমানিক আদায়ীকৃত মূলধন ৯৫,০১৪.৩৩ কোটি টাকা। কোনও ঘরোয়া কোম্পানী এই সমস্ত নিয়ম না মানলে তাকে সার্বজনিক কোম্পানী বলে ধরা হবে।

(২) **সার্বজনিক কোম্পানী ঃ** ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৩নং ধারার ১(৪) উপধারায় বলা হয়েছে সার্বজনিক কোম্পানী হল সেই কোম্পানী যা ঘরোয়া কোম্পানী নয়। কম করে সাতজন সদস্য হলে সার্বজনিক কোম্পানী গঠন করা যায়। সর্বাধিক সদস্যসংখ্যার কোনও সীমা নেই। এই ধরনের কোম্পানী জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে।

- সার্বজনিক কোম্পানী তিন প্রকারের হতে পারে ঃ
- অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী।
- প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিমিত দায়িত্বযুক্ত কোম্পানী।
- শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী।

এদের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

সার্বজনিক কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

(৩) **সরকারী কোম্পানী ঃ** ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ৬১৭ নং ধারায় সরকারী কোম্পানীর সংজ্ঞা দেওয়া আছে। এই ধারায় বলা আছে যে কোম্পানীর মোট আদায়ীকৃত মূলধনের কমপক্ষে ৫১ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনও রাজ্যসরকার বা রাজ্যসরকারসমূহ বা কিছুটা কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা রাজ্যসরকার বা রাজ্যসরকারসমূহ ভোগ করে তাকেই সরকারী কোম্পানী বলে। এই ধারায় আরও বলা হয়েছে সরকারী কোম্পানী বলতে সরকারী কোম্পানীর কোনও অধীনস্থ কোম্পানীকেও বোঝায়।

এই সরকারী কোম্পানীর কয়েকটি উদাহরণ হল ঃ প্রজেক্ট এ্যাণ্ড ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দি মিনারেলস্ এ্যাণ্ড মেটাল্স ট্রেডিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দি মাইকা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন লিমিটেড, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ন্যাশনাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন ইত্যাদি।

সংক্ষেপে কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগকে এইভাবে দেখান যায় ঃ—

(ক) নিবন্ধনের দিক থেকে—

(১) বিশেষ সংসদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী।

(২) সংসদের বিশেষ আইনবলে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী।

(৩) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী।

(খ) দায়ের পরিমাণের দিক থেকে—

(১) অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী।

(২) প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিমিত দায়যুক্ত কোম্পানী।

(৩) শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী।

(গ) পরিচালনার গণ্ডির দিক থেকে—

(১) দেশীয় কোম্পানী।

(২) বহুজাতিক কোম্পানী।

(ঘ) জনগণের অংশগ্রহণ ও জনস্বার্থের দিক থেকে—

(১) ঘরোয়া কেম্পানী।

(২) সার্বজনিক কোম্পানী।

(৩) সরকারী কোম্পানী।

(ঙ) শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিতি দায় বিশিষ্ট কোম্পানীকেও আবার এইভাবে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) ঘরোয়া কোম্পানী।

(২) সার্বজনিক কোম্পানী।

(৩) সরকারী কোম্পানী।

(চ) যে সমস্ত কোম্পানী ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন দ্বারা নিবন্ধিত তাদেরকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী।

(২) প্রতিশ্রুতির দ্বারা পরিমিত দায়যুক্ত কোম্পানী।

(৩) শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী।

কোম্পানীর বিভিন্ন প্রকার ভাগের জটিলতা আমাদের কোম্পানী চেনার সময় অনেক অসুবিধায় ফেলে। এই অসুবিধা দূর করতে নীচের কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে ঃ

(১) আমরা সাধারণ কথায় যাকে পাব্লিক সেক্টর কোম্পানী (Public Sector Company) বলে থাকি তা হচ্ছে আসলে সরকারী কোম্পানী (Government Company)।

(২) পাব্লিক সেক্টর কোম্পানী ও পাবলিক কোম্পানী এক নয়। পাব্লিক সেক্টর কোম্পানী হল সরকারী কোম্পানী আর পাব্লিক কোম্পানী হল এমন কোম্পানী যার জন্য কম করে ৭ জন সদস্য লাগবে। এই ধরনের কোম্পানীর সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কোম্পানীর মোট শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই কোম্পানী জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে ও এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

(৩) যে সমস্ত কোম্পানীর মোট আদায়ীকৃত মূলধনের কোনও অংশই সরকার ধারণ করে না তাকে বলে প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানী। এই প্রাইভেট সেক্টর কোম্পানীকে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ— প্রাইভেট কোম্পানী ও পাবলিক কোম্পানী। প্রাইভেট কোম্পানীর নামের সঙ্গে P বা Pvt. কথাটি যুক্ত থাকতে হবে।

(৪) কোনও প্রতিষ্ঠান কোম্পানী কিনা তা আমরা কিভাবে চিনব?

কোনও প্রতিষ্ঠান কোম্পানী কি না তা জানতে হলে আমরা দেখব এই প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে লিমিটেড (Ltd.) কথাটা আছে কিনা। যদি থাকে তবেই সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা কোম্পানী বলব।

(৫) যে সমস্ত কোম্পানী শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট তাদেরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

- ঘরোয়া কোম্পানী,
- সার্বজনিক কোম্পানী ও
- সরকারী কোম্পানী।

এই কারণে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ঘরোয়া কোম্পানিকে সীমাবদ্ধ মালিকানার কোম্পানী (Closely owned company) ও সার্বজনিক কোম্পানীকে ব্যাপক মালিকানার কোম্পানী (widely held company) বলা হয়।

এখন ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্যগুলি কী তা জানা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দুই ধরনের কোম্পানীর পার্থক্য বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিতে নীচে আলোচনা করা হল ঃ

ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Private Company and Public Company) ঃ

ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্যগুলি এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

পার্থক্যের বিষয়	ঘরোয়া কোম্পানী	সার্বজনিক কোম্পানী
(১) সংজ্ঞা	১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ধারা ৩(১)(৩) অনুযায়ী ঘরোয়া কোম্পানী হল সেই কোম্পানী যার পরিমেল নিয়মাবলী অনুযায়ী— (ক) শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়, (খ) সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা ৫০, যার মধ্যে আগে বা বর্তমানে কর্মরত কর্মচারী ধরা হবে না, (গ) শেয়ার বা ডিবেঞ্চার জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিলি করা যায় না।	১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ধারা ৩ (১) (৪) অনুযায়ী সার্বজনিক কোম্পানী হল সেই কোম্পানী যা ঘরোয়া কোম্পানী নয়।
(২) সবচেয়ে কম সদস্য সংখ্যা	দুই	সাত
(৩) সবচেয়ে বেশী সদস্য সংখ্যা	পঞ্চাশ	মোট শেয়ারের সংখ্যার দ্বারা সীমিত।
(৪) নামের বিশেষত্ব	ঘরোয়া কোম্পানীর নামের সঙ্গে “প্রাইভেট লিমিটেড” (Pvt. Ltd.) কথাগুলো ব্যবহার করা হয়। [ধারা ১৩ (১) (ক)]	সার্বজনিক কোম্পানীর নামের সাথে কেবলমাত্র “লিমিটেড” (Ltd.) কথাটি ব্যবহার করা হয়। [ধারা ১৩ (১) (৪)]

পার্থক্যের বিষয়	ঘরোয়া কোম্পানী	সার্বজনিক কোম্পানী
(৫) বিবরণপত্র বিলি	বাধ্যতামূলক নয়	বাধ্যতামূলক [ধারা ৬৪]
(৬) শেয়ারের হস্তান্তর যোগ্যতা	নেই	আছে [ধারা ১০৮(বি)]
(৭) ন্যূনতম পুঁজির প্রয়োজনীয়তা	শেয়ার বিলি করতে হলে ন্যূনতম পুঁজির প্রয়োজন নেই।	ন্যূনতম পুঁজির সমপরিমাণ আবেদন পত্র না পেলে শেয়ার বিলি করা যায় না।
(৮) ডিরেক্টরের সংখ্যা	কম করে দুই জন। [ধারা ২৫২ (২)]	কম করে ৩ জন। [ধারা ২৫২ (১)]
(৯) গণপূর্তির সংখ্যা	দুই। [ধারা ১৭৪ (১)]	পাঁচ। [ধারা ১৭৪ (১)]
(১০) কারবার আরম্ভ	নিবন্ধকের কাছ থেকে নিবন্ধনের (Certificate of incorporation) পাবার পর ঘরোয়া কোম্পানী তার কারবার আরম্ভ করতে পারে।	সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) পাবার পরই কারবার আরম্ভ করতে পারে।
(১১) বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান	আবশ্যিক নয়।	আবশ্যিক।
(১২) বিধিবদ্ধ সভার রিপোর্ট	পেশ করা আবশ্যিক নয়।	কোম্পানী নিবন্ধকের কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক ও পরে তা সদস্যের মধ্যে বিলি করতে হয়।
(১৩) সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিলি	কোনো বিধিনিষেধ নেই।	বিধিনিষেধ মেনেই সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিলি করতে হয়।
(১৪) সদস্যদের সূচী	যেহেতু সদস্যপদ সীমাবদ্ধ সেইহেতু সদস্যসূচী (index of members) রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।	যদি সদস্যসংখ্যা ৫০-এর বেশি হয় তবে সদস্যসূচী অবশ্যই রাখতে হবে।
(১৫) ডিরেক্টরদের পাশ্রিমিক	ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কোনও আইনি বিধিনিষেধ নেই।	কোম্পানী আইনের ১৯৮ (১) ধারা অনুসারে সার্বজনিক কোম্পানী বা ঐ সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জন্য ডিরেক্টর বা ম্যানেজার ইত্যাদিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা সংশ্লিষ্ট বছরের নীট লাভের শতকরা ১১ ভাগের বেশি হতে পারবে না।

পার্থক্যের বিষয়	ঘরোয়া কোম্পানী	সার্বজনিক কোম্পানী
(১৬) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি-করণ	ঘরোয়া কোম্পানীর শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত করা হয় না।	সার্বজনিক কোম্পানীর শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকা ভুক্ত করা হয়। [ধারা ৭৩ (১)]
(১৭) ডিরেক্টরদের যোগ্যতামূলক শেয়ার	ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই ধরনের শেয়ার কেনার কোনও নিয়ম নেই।	সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আইনি বিধিনিষেধ আছে ও এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেজিষ্ট্রারের কাছে দাখিল করতে হয়। [ধারা ২৭০, ২৭২]
(১৮) শেয়ার ওয়ারান্ট (আজ্ঞা)	বিলি করতে পারে না।	বিলি করতে পারে। [ধারা ১৪]
(১৯) দলিলপত্র	ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে পরিমেল নিয়মাবলী ও স্মারকলিপি দলিলপত্র হিসাবে কাজ করে।	সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে ও স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী থাকা দরকার। তবে সার্বজনিক কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলীর বদলে ১নং তালিকার টেবিল “এ”-র নিয়মে মেপে চলতে পারে। [ধারা ২৬, ২৮ (১)]
(২০) ডিরেক্টরদের অবসরগ্রহণ	এখানে ডিরেক্টররা আবর্তন প্রথায় (by rotation) অবসরগ্রহণ করেন না।	এখানে ডিরেক্টররা আবর্তন প্রথার অবসর গ্রহণ করেন। [ধারা ২৫৫, ২৫৬]

সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া কোম্পানী কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তা আমাদের আলাদাভাবে জানতে হবে নীচের আলোচনা থেকে ঃ

(ক) যে সমস্ত ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ হিসাবে কাজ করে সেইসব কোম্পানীর ক্ষেত্রে সুবিধাগুলো হল ঃ—

(১) কেবলমাত্র দুইজন সদস্য হলেই ঘরোয়া কোম্পানী গঠন করা যায়।

(২) কেবলমাত্র নিবন্ধনপত্র (Certificate of Incorporation) পেলেই কারবার শুরু করা যায়। [ধারা ১৪৯(৭)]

(৩) শেয়ার বিলি করার আগে নিবন্ধকের কাছে বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করার প্রয়োজন হয় না। [ধারা ৭০(৩)]

(৪) পুনরায় শেয়ার বিলি করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হয় না, বা সভায় বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে হয় না। এমনকি এই ক্ষেত্রে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের কাছেও এই শেয়ার বিলির জন্য উপস্থিত না হলেও চলে। [ধারা ৮৩(৩) (ক)]

(৫) বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই ও শেয়ারহোল্ডারদের কাছে বিধিবদ্ধ রিপোর্ট পেশ করতে হয় না বা নিবন্ধকের কাছে তা পাঠাতেও হয় না। [ধারা ১৬৫ (১০)]

যে সমস্ত ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় তারা উপরের সুবিধাগুলো ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। যেমন ঃ

(১) নিজের বা নিজের অধীনস্থ কোনও কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে পারে। [ধারা ৭৭ (২)]

(২) পরিমেল নিয়মাবলীর নিয়মের সাহায্যে সাধারণ সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এর জন্য ধারা ১৭১ থেকে ধারা ১৮৬ পর্যন্ত আইনের নিয়ম না মানলেও চলে। [ধারা ১৭০ (১)]

(৩) পরিচালকমণ্ডলীর পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও আইনি কড়াকড়ি নেই। [ধারা ১৯৮ (১)]

(৪) দুইজন ডিরেক্টর হলেই চলে। [ধারা ২৫২ (২)]

(৫) ডিরেক্টর পদের জন্য ভোটপ্রার্থী কোনও ব্যক্তিকে বিধিবদ্ধ নোটিশ প্রদান করতে হয় না। [ধারা ২৫৭ (২)]

(৬) ডিরেক্টরদের একটা অংশকে প্রতিবছর অবসর নিতে হয় না [ধারা ২৫৫ (১)]

(৭) ডিরেক্টরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগে না। [ধারা ২৫৯]

(৮) ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক এই মর্মে নিবন্ধকের কাছে কোনও সম্মতিপত্র দাখিল করতে হয় না। [ধারা ২৬৪ (৩)]

(৯) ডিরেক্টরদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার কেনার ব্যাপারে কোনও আইনি কড়াকড়ি নেই। [ধারা ২৬৬ (৫)]

(১০) ব্যবস্থাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ পরিবর্তন করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। [ধারা ২৬৮]

(১১) পূর্ণ সময়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই। [ধারা ২৬৯ (২)]

(১২) ডিরেক্টরদের লোন দেবার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই। [ধারা ২৯৫ (২)]

(১৩) ডিরেক্টরদের রেজিষ্টারে ডিরেক্টরের জন্ম তারিখ না লিখলেও চলে। [ধারা ৩০৩ (১)]

(১৪) ডিরেক্টরদের পারিশ্রমিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি না নিলেও চলে। [ধারা ৩১০]

(১৫) কোনও ম্যানেজিং ডিরেক্টরই একটানা পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ হতে পারেন না। [ধারা ৩১৭ (৪)]

(১৬) নীট লাভ নির্ণয় সংক্রান্ত ও অবচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনের বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়। [ধারা ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৫]

(১৭) অন্য কোম্পানীকে লোন দেবার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই। [ধারা ৩৭০ (২)]

উপরের সুবিধাগুলো ছাড়াও ঘরোয়া কোম্পানী ধারা ৩৭২ (১৪), ৩৪৪ ক, ৪০৯ (৩) ও ৪১৬ (১)-তে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ঘরোয়া কোম্পানীর কিছু বিশেষ সুবিধা থাকলেও কিছু আইনি বিধিনিষেধও একে মেনে চলতে হয়। যেমন ঃ

(১) সমস্ত ঘরোয়া কোম্পানীকে নামের শেষে "প্রাইভেট লিমিটেড" কথা দুটি যোগ করতে হবে। [ধারা ১৩ (১) (ক)]

(২) ঘরোয়া কোম্পানীকে স্মারকলিপির সঙ্গে পরিমেল নিয়মাবলীকেও নিবন্ধিত করতে হবে। [ধারা ২৬]

(৩) কোম্পানী আইনের ধারা ৩ (১) (৩)-এর (ক), (খ) ও (গ) উপধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিবরণ পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ থাকবে। [ধারা ২৭]

(৪) যদি কোনও ঘরোয়া কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের ২৫ শতাংশ বা তার বেশি কোনও এক বা একাধিক কোম্পানী গ্রহণ করে তবে সেই ঘরোয়া কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী বলে গণ্য হবে। [ধারা ৪৩ ক]

(৫) কোনও ঘরোয়া কোম্পানী যদি সার্বজনিক কোম্পানীর রূপ পরিগ্রহ করে তবে তার থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে কোম্পানী নিবন্ধকের কাছে বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি দাখিল করতে হবে। [ধারা ৪৪ (১)]

(৬) যদি কোনও সময় ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে সদস্যসংখ্যা দুই-এর কম হয়ে যায় এবং এইভাবে ছয়মাসের বেশি কোম্পানী কারবার চালিয়ে যায় তবে সেই সময়ের কোনও ঋণের জন্য সদস্যরা যৌথভাবে দায়বদ্ধ হয়। [ধারা ৪৫]

(৭) প্রত্যেক ঘরোয় কোম্পানীকে যার শেয়ার মূলধন আছে, তাকে বার্ষিক হিসাবের সঙ্গে নিবন্ধকের কাছে এই মর্মে বিবরণ দাখিল করতে হয় যে শেষ বার্ষিক সাধারণ সভার থেকে [যখন শেষ বার্ষিক হিসাব পেশ করা হয়েছিল] এই সময় পর্যন্ত এই কোম্পানী অন্য কোনও এক বা একাধিক সার্বজনিক কোম্পানীর ২৫ শতাংশের বেশি আদায়ীকৃত মূলধনের অংশীদার হয়নি। [ধারা ৪৩ ক (৯)]

(৮) ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে উদ্বর্তপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাবের কপি আলাদাভাবে নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হয়। [ধারা ২০০]

কোম্পানীর দুটি মূল্যবান দলিল স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর সম্পূর্ণ ধারণা ও তুলনামূলক আলোচনা আবশ্যক। তাই আমরা সেই আলোচনায় যাই ঃ—

স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী ঃ—

কোম্পানী ঘরোয়া হোক বা সার্বজনিক, স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী দুইক্ষেত্রেই প্রধান দলিল হিসাবে কাজ করে। আমরা এখন এই দুই প্রধান দলিল সম্বন্ধে আলোচনা করব।

স্মারকলিপি ঃ স্মারকলিপি বা Memorandum of Association কোম্পানীর মুখ্য, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় দলিল। কোম্পানী আইনের ধারা ২ (৮৮)-এ স্মারকলিপির নিয়ম অনুযায়ী চলে। কোম্পানী তার তৃতীয় পক্ষের সাথে কীরকম আচরণ করবে তাও এই দলিলে বলা আছে। বিভিন্ন কোম্পানীর স্মারকলিপি কেমন হবে তার নমুনা কোম্পানী আইনের সিডিউল ১-এর 'বি', 'সি', 'ডি' ও 'ই' টেবিলে বলা আছে। এই দলিলে যে সব বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে তা এইরকম ঃ

(ক) কোম্পানীর নাম (সার্বজনিক কোম্পানীর নামের শেষে 'লিমিটেড' ও ঘরোয়া কোম্পানীর নামের শেষে 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথা থাকতে হবে)।

(খ) যে রাজ্যে কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস স্থাপিত তার নাম।

(গ) কোম্পানী সংশোধন আইন, ১৯৬৫ সালের আগে যে সমস্ত কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

(ঘ) যে সমস্ত কোম্পানী, ১৯৬৫ সালের কোম্পানী সংশোধন আইনের পরে প্রতিষ্ঠিত তাদের উদ্দেশ্য।

(ঙ) যদি কোনও কোম্পানী এক রাজ্য ছাড়াও অন্য কোনও রাজ্যে তার কারবার করে তবে সেই সব রাজ্যের নাম।

(চ) যখন কোম্পানীর শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা বা প্রতিশ্রুতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তবে তার উল্লেখ থাকবে।

(ছ) যখন কোম্পানীর মূলধন শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত হবে—

- কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ও শেয়ারের বিভিন্ন ভাগ (অসীম দায়বিশিষ্ট কোম্পানীর ক্ষেত্রে নয়)।
- প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী একটার কম শেয়ার নিতে পারবে না।

এই স্মারকলিপি অবশ্যই

(১) ছাপানো হতে হবে।

(২) প্রয়োজনমত অনুচ্ছেদে ভাগ করতে হবে।

(৩) স্মারকলিপির প্রত্যেক গ্রাহক তাদের সই-এর সঙ্গে তাদের ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি উল্লেখ করবে। এইসব ক্ষেত্রে সাক্ষী অবশ্যই প্রয়োজন।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্মারকলিপিতে কতগুলি ধারা লিপিবদ্ধ করা থাকে। সেগুলি হল ঃ

(১) **নামের ধারা ঃ** স্মারকলিপিতে কোম্পানীর নাম উল্লেখ থাকে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে কোনও দুই নিবন্ধিকৃত কোম্পানীর নাম যেন এক না হয়। কারণ তা হলে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি আসতে পারে। সার্বজনিক কোম্পানী হলে তার নামের শেষে 'লিমিটেড' ও ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে নামের শেষে 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথা থাকতে হবে। কিন্তু কোম্পানী আইনের ২৫নং ধারায় বলা আছে যদি কোনও কোম্পানী বাণিজ্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বা কোনও দাতব্য কাজে লিপ্ত থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে লাভের অংশ বিতরণ না করে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে কোম্পানীর নামের শেষে 'লিমিটেড' বা 'প্রাইভেট লিমিটেড' কথা যোগ নাও করা যেতে পারে।

(২) **অবস্থানের ধারা ঃ** কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস কোন রাজ্যে অবস্থিত তা স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

(৩) **উদ্দেশ্যের ধারা ঃ** স্মারকলিপির বিভিন্ন ধারার মধ্যে এই ধারাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় বলা থাকে কী উদ্দেশ্যের জন্য কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ থাকা উচিত। এর ফলে বিনিয়োগকারী ও পাওনাদারেরা কোম্পানীর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন। এই উদ্দেশ্যের ধারায় যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা বলা থাকবে তার বাইরে কোম্পানীর যে কোনো কাজ অবৈধ বলে গণ্য হবে।

(৪) **দায়ের ধারা ঃ** কোনও নিবন্ধিত কোম্পানীর সদস্যের দায় হয় শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় তো প্রতিশ্রুতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। যদি সদস্যদের দায় শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তবে কোনও সদস্যই শেয়ারের অভিহিত মূল্যের বেশি পরিমাণ টাকার জন্য দায়বদ্ধ হবে না। আর অন্যদিকে যদি সদস্যদের দায় প্রতিশ্রুতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় তবে স্মারকলিপিতে এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে যে কোম্পানীর অবসায়নকালে সদস্যদের দায়ের সীমা কী হবে।

(৫) **মূলধনের ধারা ঃ** কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন কত তা স্মারকলিপিতে উল্লেখ থাকতে হবে। এই মূলধনের ভাগেরও উল্লেখ থাকতে হবে।

(৬) **পরিমেল ও স্বাক্ষরের ধারা ঃ** স্মারকলিপির গ্রাহকেরা প্রথমে শেয়ার ক্রয় করতে সম্মত হবে ও তারপর সাক্ষীর সামনে স্মারকলিপিতে সই করতে হবে ও প্রত্যেককে অন্তত একটি বা তার বেশি শেয়ার কিনতে হবে।

স্মারকলিপি কি পরিবর্তন করা যায়?

কোম্পানী আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী আইনে নির্ধারিত বিধান না থাকলে স্মারকলিপির পরিবর্তন করা যায় না। স্মারকলিপিতে অন্যান্য বিষয়গুলোর যেমন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিয়োগ ম্যানেজিং এজেন্ট ইত্যাদির নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা আইনে বলা আছে এমন উপায় বা কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলীতে বলা আছে এমন উপায়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করতে হলে বিশেষ প্রস্তাব পাশ করতে হবে ও লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু ঘরোয়া কোম্পানীকে সার্বজনিক কোম্পানীতে রূপান্তর বা সার্বজনিক কোম্পানীকে ঘরোয়া কোম্পানীতে রূপান্তর করার সময় যদি নামের কোনও অংশ বাদ দিতে হয় বা কোনও নতুন অংশ জুড়তে হয় তবে এই ধরনের অনুমতি নেবার প্রয়োজন নেই [ধারা ২১]। এই ধারা পরিবর্তন নিবন্ধককে অবশ্যই জানাতে হবে এবং নিবন্ধক এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট প্রদান করবেন। নিবন্ধকও স্মারকলিপিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে দেবেন। তবে এই নাম পরিবর্তনের ফলে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার বা কর্তব্যের কোনও পরিবর্তন হবে না। [ধারা ২৩]

কোম্পানীর নিবন্ধন কার্যালয় যদি বর্তমান রাজ্য থেকে অন্য কোনও রাজ্যে পরিবর্তন করতে হয় তবে বিশেষ প্রস্তাব পাশ করতে হবে। কিন্তু কোম্পানী ল্ বোর্ড যতক্ষণ না এতে সম্মতি দিচ্ছে ততক্ষণ এই পরিবর্তন কার্যকরী হবে না। [ধারা ১৭ (২)]

এছাড়াও কোম্পানী তার উদ্দেশ্য ধারার পরিবর্তন করতে চাইলেও তাকে বিশেষ প্রস্তাব পাশ করে তা করতে হবে।

কোম্পানী নীচের কারণগুলোর জন্য নিবন্ধন কার্যালয় বা উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে ঃ—

(ক) কারবারকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য।

(খ) প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোনও নতুন উপায় অবলম্বনের জন্য।

(গ) কোম্পানী যে স্থানীয় গণ্ডির মধ্যে কারবার করে, হয় তা পরিবর্তনের জন্য বা আরও বাড়াবার জন্য।

(ঘ) অন্য কারবারে লিপ্ত হওয়া যাতে বর্তমান কারবারের সাথে তা সফলভাবে চালানো যায়।

(ঙ) কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্কোচন বা পরিত্যাগ ঘটানো।

(চ) কোম্পানীর কোনও অংশ বা পুরোটাই বিক্রি করা।

(ছ) অন্য কোনও কোম্পানীর সাথে একীভূত হওয়া।

তবে এই প্রকারের যে কোনও পরিবর্তন (নিবন্ধন কার্যালয় বা উদ্দেশ্যের ধারা) তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধন করা উচিত। যদি তা না করা হয় তবে এই তিন মাস অতিক্রান্ত হবার পর এই সম্পর্কিত কোনও কাজ অবৈধ বলে মনে করা হবে।

পরিমেল নিয়মাবলী ঃ কোম্পানীর আর এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল পরিমেল নিয়মাবলী। এটা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দলিল। কোম্পানীর ভিতরে কীভাবে কাজ পরিচালনা হবে তা এই পরিমেল নিয়মাবলীতে বর্ণনা করা থাকে। কোম্পানী আইনের ২ (২) ধারায় পরিমেল নিয়মাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করা আছে। যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদের দায় শেয়ারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ সেই সমস্ত কোম্পানী পরিমেল নিয়মাবলী বা টেবিল 'এ'-র মধ্যে যে কোনও একটা মেনে চলতে পারে। কোম্পানী আইনের ১নং শিডিউলের 'সি', 'ডি' ও 'ই' নম্বর ফর্মে পরিমেল নিয়মাবলীর নমুনা দেওয়া আছে। স্মারকলিপির মত পরিমেল নিয়মাবলীও ছাপানো, প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে ভাগ ও স্বাক্ষরিত হতে হবে। পরিমেল নিয়মাবলীকে অবশ্যই নিবন্ধিত করতে হবে। সাধারণত যে সব বিষয় পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা থাকে সেগুলি হল ঃ—শেয়ার মূলধনের পরিমাণ; কীভাবে বিভিন্ন কিস্তির পরিমাণ আদায় করা হবে; শেয়ার হস্তান্তর ও বাতিল করার রীতিনীতি, শেয়ারকে ষ্টকে পরিবর্তন ও ষ্টককে শেয়ারে পরিবর্তন, শেয়ার আজ্ঞাপত্র বিলি, মূলধনের পরিবর্তন, শেয়ার হোল্ডারদের সাধারণ সভায় নিয়মকানুন; সদস্যদের ভোটদানের পদ্ধতি; ডিরেক্টরদের ক্ষমতা, অধিকার, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা ও কর্তব্য; কোম্পানীর শিলমোহর; ম্যানেজার ও সেক্রেটারি নিয়োগ; লভ্যাংশ সঞ্চিতির পরিমাণ; হিসাবনিকাশ ও অবসায়ন; শেয়ারের ওপর পূর্বস্বত্ব ইত্যাদি।

পরিমেল নিয়মাবলীর বিষয়গুলোকে কি পরিবর্তন করা চলে?

কোম্পানী আইনের ৩১নং ধারা অনুযায়ী কোম্পানী বিশেষ প্রস্তাব পাশ করে তার পরিমেল নিয়মাবলী পরিবর্তন করতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের এক মাসের মধ্যে তা নিবন্ধকের কাছে দাখিল করতে হবে। পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনও সার্বজনিক কোম্পানী ঘরোয়া কোম্পানীতে পরিবর্তিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হবে। পরিমেল নিয়মাবলীর পরিবর্তনের পর যদি পরিবর্তিত প্রতিলিপি বিলি করা না হয় তবে প্রতি প্রতিলিপির জন্য দশ টাকা জরিমানা হতে পারে।

স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর পার্থক্য ঃ

আমরা এখন স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর পার্থক্য আলোচনা করব ঃ—

পার্থক্যের বিষয়	পার্থক্যের বিষয়	পার্থক্যের বিষয়
(১) বিষয়বস্তু	কোম্পানীর নাম, অবস্থান, উদ্দেশ্য, মূলধন ও দায়ের কথা উল্লেখ থাকে।	কোম্পানীর ভিতরের কাজকর্ম কিভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মকানুন বলা থাকে।
(২) সম্পর্ক স্থাপন করে	তৃতীয় পক্ষ ও কোম্পানীর মধ্যে।	শেয়ারহোল্ডার ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে।
(৩) পরিধি	ব্যাপক।	সংকীর্ণ।
(৪) পরিবর্তন	বেশ জটিল পদ্ধতি।	অতটা জটিল নয়।
(৫) গুরুত্ব	অপেক্ষাকৃত বেশি।	অপেক্ষাকৃত কম।
(৬) নিবন্ধন	বাধ্যতামূলক।	বাধ্যতামূলক নয়। প্রয়োজনবোধে টেবিল ‘এ’-র নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।
(৭) বর্ণিত নিয়ম লঙ্ঘনের ফল	কাজটি আইনের চোখে অবৈধ বলে ঘোষিত হবে।	কোনও নিয়মবহির্ভূত কাজ শেয়ার-হোল্ডারদের গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংশোধন করা যায়।
(৮) প্রভাব	পরিমেল নিয়মাবলী গঠনে এর প্রভাব বেশী।	স্মারকলিপি গঠনে এর কোনও প্রভাব নেই।

৭৬(ক).৪ কোম্পানীর সুবিধা ও অসুবিধা

বর্তমান যুগে যৌথ মূলধনী কোম্পানী যথেষ্ট জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে কিছু সুবিধা যা কোম্পানীকে জনপ্রিয় করেছে। যৌথ মূলধনী কোম্পানী গঠনের এই সুবিধাগুলোকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(১) সদস্যসংখ্যা বেশি হবার জন্য প্রচুর পরিমাণে মূলধনের আগমন ঘটে।

(২) আইনের দৃষ্টিতে পৃথক সত্তা থাকার দরুন কোম্পানী এক পৃথক ব্যক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।

(৩) কোম্পানীর কোনও সদস্যের মৃত্যু বা অবসর গ্রহণ করার ফলে কোম্পানী উঠে যায় না।

(৪) দায়ের সীমাবদ্ধতা এক অন্যতম সুবিধা।

(৫) শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হওয়ার দরুন সহজেই বেচাকেনা করা যায়। ফলে সঞ্চয়ে উৎসাহ পাওয়া যায়।

(৬) মালিকানা ও পরিচালনার মধ্যে পৃথকীকরণ থাকার দরুন গণতন্ত্র বজায় থাকে।

(৭) এই ধরনের মালিকানা-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে কর রেহাই পাওয়া যায়।

(৮) মূলধন বেশি পরিমাণে পাবার জন্য কারবার সম্প্রসারণে অসুবিধা হয় না।

(৯) দেশের শিল্প উন্নতিতে সাহায্য করে।

(১০) অনেক প্রকার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে।

(১১) মূলধনের যথেষ্ট সংস্থান থাকায় গবেষণার কাজে সুবিধা পাওয়া যায়।

(১২) সাধারণত এই কারবার বৃহদায়তনের হয় বলে পরিচালন ব্যয় কমে যায়।

(১৩) শেয়ারের দাম কম বলে অল্প আয় সম্পন্ন লোকেরা সহজেই বিনিয়োগ করতে পারে।

যৌথ মূলধনী কোম্পানীর উপরের সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন ঃ

(১) গঠনে আইনগত জটিলতা।

(২) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অযথা দেরি।

(৩) বাস্তবে সমস্ত ক্ষমতাই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে।

(৪) অধিক পরিমাণে আইনের বাধানিষেধ থাকায় নমনীয়তার অভাব দেখা যায়।

(৫) শেয়ারহোল্ডাররা সংখ্যায় অনেক ও সারা দেশে এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন বলে, কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব বেতনভুক কর্মচারীদের হাতে থাকে। ফলে কোম্পানী পরিচালনার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব দেখা যায়।

(৬) সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাধানিষেধ থাকায় দক্ষতার বিকাশ ঘটে না।

(৭) শেয়ারহোল্ডারদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পরিচালকেরা অনেক অন্যায় কাজ করে থাকেন যাতে শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

(৮) মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা থাকায় সমাজে এর কুপ্রভাব পড়ে।

৭৬(ক).৫ কোম্পানীয় প্রবর্তনের প্রক্রিয়া

আমরা এতক্ষণ কোম্পানী গঠনের সুবিধা ও অসুবিধা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এবার আমরা কোম্পানী প্রবর্তনের প্রক্রিয়া আলোচনা করব এই এককটির মাধ্যমে ঃ

এখন প্রশ্ন হল প্রবর্তন কাকে বলে?

প্রবর্তন বা Promotion বলতে বোঝায় সাধারণ কথায় অগ্রসর। অর্থাৎ কোম্পানী প্রবর্তন বলতে আমরা বুঝি যে কারবার নতুনভাবে স্থাপন করা হচ্ছে তার সম্পর্কে উদ্যোক্তার পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেওয়া।

প্রবর্তন মানে শুধু শুরু করা না, এর মধ্যে উদ্যোক্তার কাল্পনিক শক্তি কাজ করবে ও তাকে কাজে রূপ দেওয়াতেই প্রবর্তনের কাজ শেষ। জার্মান ব্যবস্থাপনাবিদ গারস্টেনবার্গ প্রবর্তনের কতগুলি নির্দিষ্ট ধাপের কথা বলেছেন ঃ

(১) নতুন কারবারী প্রচেষ্টার আবিষ্কার।

(২) তাতে মূলধন, অন্যান্য সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্যর সংগঠন।

(৩) নতুন ব্যবসা স্থাপন ও

(৪) মুনাফা অর্জনের উপায় বের করা।

এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে প্রবর্তনের সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে নতুন কারবার স্থাপনের সুযোগ সুবিধা খুঁজে বের করে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, অন্যান্য সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য একসঙ্গে সংগঠিত করে সেই কারবারকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করা।

এই প্রবর্তন কে করে? এই প্রবর্তন প্রক্রিয়াতে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে তাকে প্রবর্তক বলে। কোম্পানী আইনে প্রবর্তকের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নেই। একজন প্রবর্তকের কিছু বিশেষ গুণ থাকা দরকার। যেমন ঃ

(১) কল্পনাশক্তি।

(২) কাজ করার উদ্যম।

(৩) নেতৃত্ব দান ও

(৪) বিচারশক্তি।

সাধারণভাবে একজন প্রবর্তকের কাজ বহুমুখী। যেমন ঃ

(ক) যে কারবার করা হবে তার ধারণা উদ্ভাবন।

(খ) প্রয়োজনবোধে অন্য প্রবর্তকদের সঙ্গে নেওয়া।

(গ) পরিকল্পনামাফিক কাজ এগোনো।

(ঘ) কোম্পানী আইনে বিশেষজ্ঞ এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনে পরামর্শ নেওয়া।

(ঙ) প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরি করা।

(চ) আনুষঙ্গিক প্রাথমিক খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করা।

(ছ) প্রয়োজনীয় আইনি নিয়মকানুন মেনে চলা।

(জ) বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ভরসা আদায়।

৭৬(ক).৫.১ প্রবর্তকের শ্রেণীবিভাগ

কোম্পানীর প্রবর্তকদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ—

(ক) **বিশেষ প্রবর্তক (Particular Promoter)** ঃ একজন বিশেষ প্রবর্তক কেবলমাত্র একটি বিশেষ কোম্পানী প্রবর্তন করেন। সাধারণত ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রবর্তক কাজ করে থাকেন।

(খ) **পেশাদার প্রবর্তক (Professional Promoter)** ঃ একজন পেশাদার প্রবর্তক কোম্পানী প্রবর্তনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তারা তাদের পেশাগত আচরণের জন্য প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন।

সাধারণত তারা কারবারের মালিকানায় বা লাভের অংশ গ্রহণ করায় ইচ্ছুক হন না। ভারতে ম্যানেজিং এজেন্ট এইরকম পেশাদার প্রবর্তক। স্বাধীনতার পর ভারতে এরকম প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেছেন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এই ভূমিকা পালন করে থাকে।

(গ) **সাময়িক প্রবর্তক (Occasional Promoter) ঃ** কিছু কিছু প্রবর্তক আছেন যারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর সম্প্রসারণে তার সহযোগী কিছু কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। তাদেরকেই সাময়িক প্রবর্তক বলা হয়।

কোম্পানী প্রবর্তনের বিভিন্ন ধাপ ঃ

একটি কোম্পানী প্রবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলোকে মোট দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(ক) বাণিজ্যিক দিক, ও

(খ) আইনি দিক।

এদেরকে আমরা এইভাবে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি ঃ

(ক) **বাণিজ্যিক দিক ঃ** কারবার প্রবর্তনের বাণিজ্যিক দিকের বিভিন্ন ধাপগুলোকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

প্রথম ধাপ ঃ ব্যবসা সম্বন্ধে পরিকল্পনা

বাণিজ্যিক দিকের প্রথম ধাপ হল ব্যবসা সম্বন্ধে পরিকল্পনা। এই ধাপের অধীনে বিভিন্ন কাজগুলো হল ঃ—

(১) **নতুন ধারণার উদ্ভাবন ঃ** কারবার করতে হলে প্রথমে ভাবতে হবে কী ধরনের কারবার করতে হবে। প্রয়োজনীয় বাজার গবেষণা ও সরকারী নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই নতুন ধারণার উদ্ভাবন হয়। এই ক্ষেত্রে কারবার নতুন করে গড়ে তোলা যেতে পারে, বা কোনও প্রতিষ্ঠিত কারবারকে প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে বা কোনও দুই প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর সংযুক্তি করা যেতে পারে।

(২) **অনুসন্ধান ঃ** যে কারবার স্থাপন করা হচ্ছে তা আদৌ দীর্ঘস্থায়ী হবে কি না তা বাজার গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। বাজার গবেষণা ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট, প্রতিষ্ঠিত একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারবারের হিসাব ও রিপোর্ট ইত্যাদি নির্ভর করেও অনুসন্ধান কাজ চলতে পারে। এছাড়াও কোথা থেকে কারবারের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ও শ্রমিক ইত্যাদি পাওয়া যেতে পারে তাও বিস্তারিত অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

(৩) **ব্যবসার প্রতিচিত্র (Blue Print) তৈরী ঃ** এর পর মূল ব্যবসার প্রতিচিত্র তৈরি করতে হবে। অনুসন্ধান পর্বে যে সমস্ত হিসাব, রিপোর্ট, তথ্য জোগাড় করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেই এই প্রতিচিত্র তৈরি করতে হবে। অবশ্য এই সঙ্গে সঙ্গে কারবারের আর্থিক পরিকল্পনাও তৈরি রাখতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা

এই পর্যায়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে হবে। যেমন, সরকারের কাছে লাইসেন্স বা অন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য দরবার করা, ব্যবসা বিদেশে সম্প্রসারণ করতে চাইলে বিদেশী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল

প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা করা, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আর্থিক সহায়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয় ধাপ ঃ আর্থিক পরিকল্পনা

ব্যবসা স্থাপনের সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে এই আর্থিক পরিকল্পনা। কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উৎস অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু অর্থই কারবারের মূল চালিকাশক্তি তাই অর্থের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত না করলে কারবার স্থাপন ও পরিচালনায় বড় রকমের অসুবিধা দেখা দেবে।

(খ) **আইন দিক ঃ** বাণিজ্যিক দিকের বিভিন্ন ধাপের নিয়মকানুন মেনে চলার পর কোম্পানী আইনকানুনের বিভিন্ন দিকগুলো নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে চলা উচিত। এই আইনি দিকের বিভিন্ন ধাপগুলো হল ঃ

(১) প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে দুই জন ও সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে কম করে সাতজন সদস্যের প্রয়োজন। [ধারা ১২]

(২) কোম্পানীর নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে সেই নাম যেন কেন্দ্রীয় সরকারের মতে অবাঞ্ছিত না হয়।

এও খেয়াল রাখতে হবে যে নতুন কোম্পানীর নাম কোনও প্রতিষ্ঠিত নিবন্ধিত কোম্পানীর নামের সাথে এক হওয়া চলবে না। [ধারা ২০]

(৩) এর পর কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দলিল তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনীয় দলিল বলতে আমরা স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী বুঝি। স্মারকলিপিতে নাম, অবস্থান, উদ্দেশ্য, দায় ও মূলধনের ধারা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। এই স্মারকলিপি ছাপানো, প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদে ভাগ ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

(৪) কোম্পানীর স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী এর পর নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধনের জন্য উপস্থিত করতে হবে।

(৫) সুপ্রীম কোর্টের বা রাজ্যের হাইকোর্টের কোনও বিচারপতি বা কোনও সেক্রেটারী বা কোনও সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (যিনি কোম্পানী গঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন) অথবা পরিমেল নিয়মাবলীতে নাম আছে এমন কোনও ডিরেক্টর ইত্যাদির কাছ থেকে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে যে কোম্পানী গঠনের ক্ষেত্রে সমস্ত আইনি নিয়মকানুন মানা হয়েছে।

(৬) এছাড়া নীচে দলিলগুলোও নিবন্ধকের কাছে পেশ করতে হবে—

- পরিচালক হিসাবে কাজ করার জন্য পরিচালকদের সম্মতিপত্র।
- পরিচালকেরা যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনতে ইচ্ছুক এই বিষয়ে পরিচালকদের সম্মতিপত্র।
- প্রবর্তকদের মধ্যে যারা পরিচালক হিসাবে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতীয়তা ইত্যাদির বিবরণ।

(৭) নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সমস্ত কাজই কোম্পানী আইনের বিধি মেনে করা হয়েছে ও সমস্ত দলিলপত্র ঠিকমত পেশ করা হয়েছে তবে তিনি কোম্পানীকে নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র

(Certificate of Incorporation) প্রদান করেন। ঘরোয়া কোম্পানী এই সার্টিফিকেট পেলেই কারবার শুরু করতে পারে।

কেবলমাত্র নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র পেলেই কোনও সার্বজনিক কোম্পানী কারবার শুরু করতে পারে না। কোনও কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানী হিসাবে কারবার শুরু করতে হলে তাকে—

(১) শেয়ার বিলি করার জন্য বিবরণপত্র (Prospectus) তৈরি করতে হবে। কোম্পানী আইনের ২নং শিডিউলে বিবরণীতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকবে তা বলা আছে। এই বিবরণীর এক কপি রেজিষ্ট্রারের কাছে দাখিল করতে হবে ও তারপর জনসাধারণের কাছে বিলি করার জন্য উপস্থিত করতে হবে।

(২) যদি বিবরণপত্র প্রকাশ করা না হয় তবে বিবরণপত্রের পরিবর্তে একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে হয়। কোম্পানী আইনের ৩ নং শিডিউলে বিবরণপত্রের বিবৃতিতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকবে তা বলা আছে।

(৩) বিবরণপত্র (বা বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি) প্রকাশিত হবার পর কোম্পানী শেয়ার জনসাধারণের কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে ছাড়ে। যদি কোম্পানী ন্যূনতম চাঁদা (Minimum Subscription) সংগ্রহ করতে পারে তবেই শেয়ার বণ্টন (allotment) করতে পারে।

(৪) ডিরেক্টররা যে পরিমাণ শেয়ার কিনেছেন তার মূল্য প্রদান করেছেন কিনা তা দেখতে হবে।

এই সমস্ত কাজ হয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হলে নিবন্ধক কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) প্রদান করে। তবেই কোনও সার্বজনিক কোম্পানী তার কারবার শুরু করতে পারে।

কোম্পানী প্রবর্তন পদ্ধতি জানার পর কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা থাকা দরকার। আমরা এখন শেয়ার মূলধন নিয়ে আলোচনা করব।

কোম্পানীর শেয়ার মূলধন ঃ আমরা এখন কোম্পানীর শেয়ার মূলধন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা জানব শেয়ার কাকে বলে?

কোম্পানীর মোট মূলধনকে ছোট ছোট সমান এককে ভাগ করা হয়। এই ছোট ছোট সমান এককগুলোকে একেকটা শেয়ার বলে। কোম্পানী আইনের ২ (৪৬) ধারায় শেয়ারের অর্থ বলা আছে। কিছুক্ষেত্র বাদে শেয়ার বলতে ষ্টককেও বোঝায়।

শেয়ারকে দুভাগে ভাগে করা যায় ঃ—

(ক) অগ্রাধিকার শেয়ার,

(খ) সাধারণ শেয়ার (Equity Share) [ধারা ৮৫ ও ৮৬]

অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডাররা নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ পাবার অগ্রাধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের আগে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশে পেয়ে থাকে। কোম্পানীর অবসায়নকালে এই জাতীয় শেয়ারের মূল্য সাধারণ শেয়ারের আগে ফেরত দিতে হয়। [ধারা ৮৫ (১)] অন্যদিকে সাধারণ শেয়ার হল

সেই শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার নয়। [ধারা ৮৫ (২)] এই শেয়ার পূর্বনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় না। অগ্রাধিকার শেয়ারকে আবার কতগুলো ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cumulative Preference Share)** ঃ এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডাররা বর্তমান বছরের আগের বছর বা বছরগুলোর পাওনা লভ্যাংশ দাবি করতে পারে।

(২) **অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Cumulative Preference Share)** ঃ কিন্তু এই শ্রেণীর শেয়ারহোল্ডাররা বর্তমান বছরের আগের বা বছরগুলোর পাওনা লভ্যাংশ দাবি করতে পারে না।

(৩) **পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable Preference Share)** ঃ নির্দিষ্ট সময় শেষে এই শ্রেণীর শেয়ারের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়। [ধারা ৮০]

(৪) **অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Irredeemable Preference Share)** ঃ এই ধরনের শেয়ারের মূল্য কেবলমাত্র কোম্পানীর অবসারনকালেই দেওয়া হয়।

(৫) **অংশগ্রাহী অগ্রাধিকার শেয়ার (Participating Preference Share)** ঃ এই শ্রেণীর শেয়ার পূর্বনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবার পর উদ্বৃত্তের অংশও পেয়ে থাকে।

(৬) **অংশগ্রাহী নয় এমন অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Participating Preference Share)** ঃ এই শ্রেণীর শেয়ার পূর্বনির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবার পর উদ্বৃত্তের অংশ পায় না।

(৭) **পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Convertible Preference Share)** ঃ এই সমস্ত শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তন করা যায়।

(৮) **অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-Convertible Preference Share)** ঃ এই সমস্ত শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে পরিবর্তন করা যায় না।

কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে যে মূলধন পাওয়া যায় তাকে শেয়ার মূলধন বলে। কোম্পানীর শেয়ার মূলধনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। শেয়ার মূলধনের শ্রেণীবিভাগ এখন আমাদের জানা দরকার তাই শেয়ার মূলধনের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ নীচে বলা হল ঃ

(ক) অনুমোদিত মূলধন বা নিবন্ধিত মূলধন।

(খ) বিলিকৃত মূলধন বা বিক্রয়যোগ্য মূলধন।

(গ) বিক্রীত মূলধন।

(ঘ) তলবী মূলধন।

(ঙ) আদায়ীকৃত মূলধন।

(চ) তলবীকৃত বকেয়া মূলধন বা অনাদায়ী মূলধন।

(ছ) অতলবী মূলধন।

(জ) সংরক্ষিত মূলধন।

ঋণপত্র বা Debenture কী? শেয়ার ও ঋণপত্রের পার্থক্য কী তা আমাদের জানা দরকার। এই অংশে আমরা তা আলোচনা করব।

ঋণপত্র ঃ কোনও কোম্পানী যেমন শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মূলধন জোগাড় করে ঠিক তেমনি ঋণপত্র বা Debenture-এর মাধ্যমেও ঋণ মূলধন জোগাড় করে। তবে কোম্পানী আইনের ১১৬ নং ধারা অনুযায়ী কোনও কোম্পানী ভোট দানের অধিকার সম্পন্ন ঋণপত্র বিলি করতে পারে না। কোম্পানীর ঋণপত্র যারা কেনেন তারা কোম্পানীর কাছ থেকে সুদ পেয়ে থাকেন। কোম্পানীর এই পাওনাদারেরা কোম্পানীর লাভ হোক বা না হোক এক নির্দিষ্ট হারে সুদ ভোগ করবে।

এই ঋণপত্রকেও কয় ভাগে ভাগে করা যায়। যেমন ঃ

(১) পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র।

(২) অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র।

(৩) বন্ধকী ঋণপত্র।

(৪) অবন্ধকী ঋণপত্র।

(৫) বাহকদের ঋণপত্র।

(৬) নিবন্ধিত ঋণপত্র।

(৭) মিহর দায়যুক্ত ঋণপত্র।

(৮) মিহর দায়যুক্ত নয় এমন ঋণপত্র।

শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	শেয়ার	ঋণপত্র
(১) মূলধনের প্রকৃতি	কোম্পানীর নিজস্ব মূলধন	কোম্পানীর ঋণমূলধন।
(২) কোম্পানীর সঙ্গে পরিচয়ের ভিত্তি	মালিক	পাওনাদার
(৩) লভ্যাংশ/সুদ	কোম্পানীর লাভের অংশ শেয়ারহোল্ডারদের	ঋণপত্রগ্রহীতারা ঋণপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকেন।
(৪) ভোটাধিকার	আছে [কেবলমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের]	নেই।
(৫) পরিচালনায় অংশগ্রহণ	কেবলমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা পারেন।	ঋণপত্র গ্রহীতারা পারেন না।
(৬) আবশ্যিকতা	শেয়ার বিলি আবশ্যক।	ঋণপত্র বিলি করা আবশ্যক নয়।
(৭) লভ্যাংশ/সুদ পাবার বাধ্যবাধকতা	শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রথমে অগ্রাধিকার শেয়ার নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাবার পর সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা লভ্যাংশ পায়। সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার ছাড়া কেউ বকেয়া লভ্যাংশ পায় না।	কোম্পানীর লাভ হোক বা না হোক ঋণপত্রের ওপর ঋণপত্র গ্রহীতারা সুদ পাবেই।

কোম্পানীর বিভিন্ন দলিলের মধ্যে আমরা স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর আলোচনা করেছি। এখন আমরা কোম্পানীর আরেকটি দলিলের কথা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব। সেই দলিলটি হল বিবরণপত্র (Prospectus)।

কোনও কোম্পানীর শেয়ার বা ঋণপত্র বিলি করা উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন তথ্য সংবলিত পুস্তিকা জনগণের উদ্দেশ্যে বিলি করে তাকেই বিবরণপত্র বলে। এই বিবরণপত্র কবে বিলি করা হয়েছে তার দিন বিবরণপত্রে উল্লেখ থাকবে। বিবরণপত্র বিলি করার সময় প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে হবে। শেয়ার বিলি করার আগে বিবরণপত্র বিলি করতেই হবে। এই বিবরণপত্র বিলি করার আগে তাকে অবশ্যই নিবন্ধিত করতে হবে। বিবরণপত্রে কোনও মিথ্যা বর্ণনা থাকলে তবে যে সব ব্যক্তি বিবরণপত্র বিলির সঙ্গে যুক্ত তাদের দু বছর কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। কোনও কোনও সময় বিবরণপত্র বিলি না করলে 'বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি' বিলি করতে হয়। বিবরণপত্র বা 'বিবরণপত্রের পরিবর্তে বিবৃতিতে' কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকবে তা কোম্পানী আইনের ২ ও ৩ নং শিডিউলে বর্ণনা করা আছে।

আমরা এতক্ষণ কোম্পানীর মূলধন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এখন আমরা কোম্পানী সম্বন্ধীয় কিছু তথ্য সম্বন্ধে জানব।

আমাদের আলোচনায় কোম্পানীর সংখ্যা সম্বন্ধে একটি পরিসংখ্যান জানা দরকার। নীচে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

কোম্পানী—একটি পরিসংখ্যান

১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতে কোম্পানী আইনের অধীনে শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায় বিশিষ্ট কোম্পানী হিসাবে ৩১,২৮৯টি কোম্পানী নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী কোম্পানীর সংখ্যা ২৮ ও বেসরকারী কোম্পানীর সংখ্যা ৩১,২৬১টি। এই ৩১,২৮৯টি কোম্পানীর মধ্যে ২৪৫৩টি সার্বজনিক কোম্পানী যার মোট নিবন্ধিত মূলধন ছিল ১৪,৬৯২.০৯ কোটি টাকা ও ২৮,৮৩৬টি ঘরোয়া কোম্পানী যার মোট নিবন্ধিত মূলধন ৭,০১৯.৪৯ কোটি টাকা। এছাড়া ১৯৯৯-২০০০ সালে মোট ৭২০টি কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেছে যার মধ্যে সার্বজনিক কোম্পানী ১২১টি ও ঘরোয়া কোম্পানী ৫৯৯টি।

৭৬(ক).৬ কোম্পানী পরিচালনা — পরিচালকমণ্ডলী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ম্যানেজার — তাদের কাজ

কোম্পানীর মূলধন সরবরাহ করেন শেয়ারহোল্ডাররা, তাই তারাই কোম্পানীর আসল মালিক। কিন্তু কোম্পানীর দৈনন্দিন কাজ শেয়ারহোল্ডাররা পরিচালনা করতে পারেন না। শেয়ারহোল্ডাররা সাধারণত সংখ্যায় বেশি হন ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। ফলে তারা কোম্পানীর প্রতিদিনের কাজে বা অন্যান্য সকল প্রকার ব্যবস্থাপনার অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের হয়ে তাদেরই নির্বাচিত এক পরিচালকমণ্ডলী এই কোম্পানী পরিচালনার কাজ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রকম সিদ্ধান্তই পরিচালকমণ্ডলী নিয়ে থাকে। যদিও কোম্পানী ব্যবস্থাপনার ধরন গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরেই রচনা করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে এখানে মুষ্টিমেয় তন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। তাই ব্যবস্থাপনা ও মালিকানার মধ্যে দূরত্ব বাড়ার ফলে এদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান অনুভূত হয়।

ভারতে আগে কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় নির্বাহী নিযুক্তক (Managing Agent) এবং কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষরা (Secretaries and Treasurers) নিযুক্ত হতেন। ১৯৭০ সাল থেকে এই নিয়ম উঠে গেছে।

বর্তমান কোম্পানী পরিচালনায় পরিচালকমণ্ডলীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) মুখ্য কার্যনির্বাহক বা Chief Executive-এর মাধ্যমে কোম্পানীর কাজ পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপক পরিচালক (Managing Director) বা ব্যবস্থাপক (Manager) এই মুখ্য কার্যনির্বাহক হিসাবে কাজ করে থাকেন।

এখন আমরা পরিচালকমণ্ডলী সম্বন্ধে তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করব।

কোম্পানী আইনের ধারা ২(৬) অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী বলতে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকেই বোঝায়।

ন্যূনতম সংখ্যা ঃ প্রত্যেক সার্বজনিক কোম্পানীতে (ধারা ৪৩ ক অনুযায়ী যে সমস্ত কোম্পানী সার্বজনিক কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলো ছাড়া) কম করে তিনজন পরিচালক থাকতে হবে। [ধারা ২৫২ (১)] অন্যান্য সমস্ত প্রকার কোম্পানীতে কম করে দুইজন পরিচালক থাকলেই চলবে [ধারা ২৫২ (২)]।

কে পরিচালক হতে পারবে?

২৫৩ ধারায় বলা আছে কেবলমাত্র কোনো ব্যক্তিই কোনও কোম্পানীর পরিচালক হতে পারবে।

২৫৫ ধারায় বলা আছে বিধিমত পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত ব্যক্তিকেই পরিচালক বলে গণ্য করা হয়। [ধারা ২৫৪]

পরিচালক নিয়োগ ঃ সাধারণত কোম্পানীর সাধারণ সভায় পরিচালক নিয়োগ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে কেবলমাত্র কোনো ব্যক্তিই কোম্পানীর পরিচালক হতে পারবে। পরিমেল নিয়মাবলীতে পরিচালকদের অবসর গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা না থাকলেও প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় সার্বজনিক কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে মোট পরিচালকের সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে পর্যায়ক্রমে (by rotation) অবসরগ্রহণ করতে হয়। [ধারা ২৫৫ (১)] বাকি পরিচালকেরাও কোম্পানীর সাধারণ সভায় পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন। [ধারা ২৫৫ (২)] পর্যায়ক্রমে কতজন পরিচালক অবসরগ্রহণ করবেন তার নিয়ম কানুন ২৫৬ (১) ধারায় বলা আছে। কোম্পানীর যে সভায় প্রথম পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে তার পরে যে প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে [সার্বজনিক কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে] এবং তার পরবর্তী সমস্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণ করবেন। যদি সেই সংখ্যা তিন বা তিনের গুণিতক না হয় তবে এক তৃতীয়াংশের নিকটবর্তী সংখ্যার সমপরিমাণ পরিচালকই অবসরগ্রহণ করবেন। এখানে মনে রাখতে হবে, যে পরিচালকেরা শেষবারের মত নিয়োগ হবার থেকে সবচেয়ে বেশিদিন পরিচালকের কাজকর্ম সামলেছেন তারাই পর্যায়ক্রমে প্রথম অবসরের জন্য বিবেচিত হবেন। যদি সেই সংখ্যা তিন বা তিনের গুণিতক না হয় তবে এক তৃতীয়াংশের নিকটবর্তী সংখ্যার সমপরিমাণ পরিচালকই অবসরগ্রহণ করবেন। এখানে মনে রাখতে হবে, যে পরিচালকেরা শেষবারের মত নিয়োগ হবার থেকে সবচেয়ে বেশিদিন পরিচালকের কাজকর্ম সামলেছেন তারাই পর্যায়ক্রমে প্রথম অবসরের জন্য বিবেচিত হবেন। যদি দুজন পরিচালক একই সময়ের জন্য পরিচালকের কাজকর্ম সামলেছেন, এরকম হয় তবে লটারির সাহায্যে ঠিক করা হবে কে অবসরগ্রহণ করবে। এইভাবে অবসরগ্রহণ করার ফলে যে খালি জায়গার সৃষ্টি হবে তা পূরণ করার জন্য কোম্পানী হয় সেই পরিচালক যিনি অবসর নিয়েছেন বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন। যদি কোনও সভায় সেই শূন্য পদে পরিচালক নিয়োগ করা না যায় তবে সেই সভা মুলতুবী হয়ে যায় ও পরের সপ্তাহে ঐ একই

দিনে আবার অনুষ্ঠিত হয়। যদি পরের সপ্তাহের দিনটি ছুটির দিনে হয় তবে তার পরের দিনে সভার আয়োজন করতে হয়। যদি সেই সভাতেও নতুন পরিচালক নিয়োগ করা না যায় তবে যে পরিচালক অবসরগ্রহণ করলেন তাকেই পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় যদি না—

(১) সেই পরিচালক লিখিতভাবে তার পুনর্নিয়োগে অনিচ্ছার কথা জানিয়ে থাকে।

(২) যদি তার পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব হারিয়ে গিয়ে থাকে।

(৩) যদি না সেই পরিচালক পুনর্নিয়োগের জন্য অযোগ্য না হন।

কোম্পানী যদি পরিচালকের সংখ্যা নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে বাড়াতে বা কমাতে চায় তবে সাধারণ সভায় সাধারণ প্রস্তাব পেশের মাধ্যমেই তা করা যায়।

যদি অতিরিক্ত পরিচালক নিয়োগ করা হয় তবে—

(১) মোট পরিচালকের সংখ্যা যেন পরিমেল নিয়মাবলীতে উল্লিখিত সর্বাধিক সংখ্যার বেশি না হয় এবং

(২) সেই পরিচালক পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত পরিচালক পদে আসীন থাকবেন।

পরিচালকদের অন্যান্য যোগ্যতা ঃ

(১) Table 'এ'-র ৬৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে পরিচালক হবার জন্য ব্যক্তিকে অন্ততপক্ষে একটি শেয়ার কিনতেই হবে।

(২) কোম্পানী আইনের ২৭০ (১) ধারায় বলা হয়েছে পরিচালককে যোগ্যতাসূচক শেয়ার কিনতে হবে।

(৩) আইনের ২৭০ (৩) ধারায় এও বলা হয়েছে যে যোগ্যতাসূচক শেয়ারের অভিহিত মূল্য পাঁচ হাজার টাকার বেশি হবে না অথবা একটি শেয়ারের ক্ষেত্রে বেশি হবে না অথবা একটি শেয়ারের ক্ষেত্রে তার মূল্য পাঁচশ টাকার বেশি হবে না। যদি কেউ শেয়ারের পরিবর্তে শেয়ার অনুজ্ঞাপত্র (Share warrant) গ্রহণ করে তবে তাকে শেয়ারের মালিক বলা যাবে না।

(৪) পরিচালক যেন আইন অনুযায়ী অযোগ্য বলে বিবেচিত না হন।

এতক্ষণ আমরা পরিচালকদের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা দেখব কী কী অবস্থায় একজন পরিচালক অযোগ্য বলে বিবেচিত হন?

কোম্পানী আইনের ২৭৪ ধারায় পরিচালকদের অযোগ্যতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে নীচের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একজন পরিচালক অযোগ্য বলে গণ্য হবেন—

(১) যদি তিনি আদালতের কোনও রায়ের দ্বারা বিকৃত মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হন ও সেই ঘোষণা বর্তমান সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

(২) যদি তিনি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হন ও আদালত থেকে সেই ব্যাপারে মুক্তি না পান।

(৩) যদি কোনও ব্যক্তি দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হবার জন্য আবেদন করেন ও তার সেই আবেদন বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবেচনার স্তরে থাকে।

(৪) যদি কোনো নৈতিক অপরাধে তাকে কোনও আদালত অন্ততপক্ষে ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে থাকেন ও সেই ছয় মাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাঁচবছর অতিক্রান্ত হয় নি।

(৫) তিনি কোম্পানীর শেয়ারের তলবী অর্থ দেন নি এবং তলবী অর্থ দেবার শেষ নির্ধারিত সময়সীমার থেকে ছয় মাস সময় পার হয়ে গেছে।

(৬) কোম্পানী আইনের ২০৩ নং ধারা অনুযায়ী কোনও আদালত দ্বারা তিনি যদি পরিচালক হিসাবে নিয়োগ হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই আদেশ বহাল থাকে। যতক্ষণ না আদালতের রায় পাওয়া যাবে ততক্ষণ তিনি পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

২৭৪ (২) ধারায় বলা আছে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ওপরে বলা পরিচালকদের (৪) ও (৫) নং অযোগ্যতার বাধা দূর করতে পারেন।

সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় এমন ঘরোয়া কোম্পানী তার ইচ্ছানুসারে তার পরিমেল নিয়মাবলীতে আইনের ২৭৪ (১) ধারায় বর্ণনা করা অযোগ্যতার কারণ ছাড়াও অন্যান্য কারণ নির্দেশ করতে পারে [ধারা ২৭৪ (৩)]

এখানে অবশ্য একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে কোনও পরিচালক একসাথে কুড়িটার বেশি কোম্পানীতে পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। [ধারা ২৭৫]

কোম্পানী আইনের ২৭৮ ধারায় বলা আছে যে ২৭৫ ধারাতে যে কুড়িটা কোম্পানীর কথা বলা আছে সেই সংখ্যক কোম্পানীর সংখ্যা নির্ধারণ করার সময় নীচের কোম্পানীগুলোর পরিচালকত্ব বাদ দিতে হবে—

(১) সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ বা হোল্ডিং কোম্পানী নয় এমন ঘরোয়া কোম্পানী।

(২) কোনও অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী।

(৩) কোনও প্রতিষ্ঠান যা লাভের উদ্দেশ্যে কারবার করে না বা লভ্যাংশ প্রদান করে না।

(৪) কোনও কোম্পানী যাতে ঐ পরিচালক একজন বিকল্প পরিচালক হিসাবে কাজ করেন।

কোম্পানী আইনে ২৭৯ ধারায় ২৭৮ ধারার কোনও নিয়মে লঙ্ঘনের ফলে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কোনও পরিচালক কুড়িটার বেশি কোম্পানীতে পরিচালক হিসাবে কাজ করেন তবে কুড়িটার পর যতগুলো বেশি কোম্পানীতে তিনি যুক্ত থাকবেন প্রতিটার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা হবে।

এককটির এই অংশে আমরা পরিচালকদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিধানগুলি আলোচনা করব ঃ

পরিচালকদের পারিশ্রমিক ঃ পরিচালকেরা তাদের কাজের জন্য কোম্পানী আইনে নির্ধারিত পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। পরিচালকদের পারিশ্রমিক-সংক্রান্ত কোম্পানী আইনের বিধানগুলো নীচে বলা হল ঃ—

(১) কোনও সার্বজনিক কোম্পানী বা সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও ঘরোয়া কোম্পানী কোনও নির্ধারিত আর্থিক বছরের জন্য তার পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপককে যে পারিশ্রমিক দেন তা সেই আর্থিক বছরের নীট মুনাফার এগারো শতাংশের বেশি হবে না। [ধারা ১৯৮ (১)]

(২) যদি কোনো আর্থিক বছরে কোম্পানীর পর্যাপ্ত মুনাফা না হয় বা যদি মুনাফাই না হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে আগে অনুমতি না নিয়ে কোম্পানী কোনও পারিশ্রমিক দিতে পারবে না, তবে এই পারিশ্রমিকের মধ্যে ৩০৯ (২) ধারার অন্তর্ভুক্ত পারিশ্রমিক ধরা হবে না। [ধারা ১৯৮ (৪)]

(৩) পরিচালকদের কত টাকা পারিশ্রমিক দিতে হবে তা ১৯৮ ও ৩০৯ ধারা অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। হয় এই ব্যবস্থার কথা পরিমেল নিয়মাবলীতে বলা থাকবে, না হয় সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করে তা ঠিক করতে হবে। [ধারা ৩০৯ (১)]

(৪) পরিচালকমণ্ডলীর সভা বা তার কোনও কমিটির সভায় যোগ দেবার জন্য প্রত্যেক সভার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালক ফি পেয়ে থাকেন। [ধারা ৩০৯ (২)]

(৫) সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপক পরিচালক তার পারিশ্রমিক মাসিক ভিত্তিতে নিতে পারেন অথবা নীট মুনাফার এক নির্দিষ্ট শতকরা হিসাবে নিতে পারেন অথবা এই দুই প্রকারের মধ্যে কিছুটা এক উপায়ে ও তার কিছুটা আর এক উপায়ে নিতে পারেন। [ধারা ৩০৯ (৩)]

(৬) পরিচালক যদি সর্বক্ষণের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক পরিচালক এর মধ্যে কোনও একটিও না হন তবে হয় তিনি কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত প্রতি মাসে বা প্রতি তিন মাস অন্তর বা বছরে একবার পারিশ্রমিক পাবেন নয়তো বিশেষ প্রস্তাবের সাহায্যে গৃহীত কোম্পানীর সভায় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোনও কমিশন পাবেন।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, এই পরিচালককে বা যেখানে একের বেশি পরিচালক থাকেন তাদের মোট পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার এক শতাংশের বেশি হবে না (যদি কোম্পানীর ব্যবস্থাপক পরিচালক বা সর্বক্ষণের পরিচালক বা ম্যানেজিং এজেন্ট বা সচিব ও কোষাধ্যক্ষ বা ব্যবস্থাপক থাকে)। অন্যান্য ক্ষেত্রে এই পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট মুনাফার তিন শতাংশের বেশি হবে না। [ধারা ৩০৯ (৪)]

(৭) যদি কোনও পরিচালক, তা তিনি সর্বক্ষণের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক পরিচালক হোন না কেন, কোনও কোম্পানী থেকে কোনও কমিশন পেয়ে থাকেন তবে তিনি সেই কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও কোম্পানী থেকে কোনও প্রকার পারিশ্রমিক পাবেন না। [ধারা ৩০৯ (৬)]

(৮) যদি কোনও পরিচালক নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন তবে তিনি তা কোম্পানীকে ফেরত দেবেন। [ধারা ৩০৯ (৫ক)]

(৯) ধারা ৩০৯ (৪)-এ যে বিশেষ প্রস্তাব পাশ করা হয় তা একটানা পাঁচ বছরের জন্য বহাল থাকে [ধারা ৩০৯ (৭)]

(১০) ৩০৯ ধারায় যে নিয়মগুলো বলা আছে তা কোনও ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যদি না তা সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোনও কোম্পানী না হয়। [ধারা ৩০৯ (৯)]

(১১) পরিচালকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হবে, না হলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। [ধারা ৩১১]

পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিধানগুলি জানার পর পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের বিধানগুলি আমাদের জন্য দরকার তাই এককটির এই অংশে আমরা ক্ষমতা-সংক্রান্ত বিধানগুলি আলোচনা করব ঃ

পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা ঃ

কোম্পানী আইনের ২৯১, ২৯২ ও ২৯৩ ধারায় পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার

বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলোকে সাধারণত তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় ঃ—

(১) পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ ক্ষমতা। (২৯১ ধারা)

(২) কেবলমাত্র সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে ক্ষমতা। (২৯২ ধারা)

(৩) শেয়ার হোল্ডারদের অনুমতিক্রমে ক্ষমতার ব্যবহার। (২৯৩ ধারা)

এদেরকে এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **পরিচালকমণ্ডলীর সাধারণ ক্ষমতা ঃ** সাধারণভাবে পরিচালকদের ক্ষমতার পরিধি স্মারকলিপি ও আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলীর দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) **কেবলমাত্র সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বলে ক্ষমতা ঃ**

(ক) শেয়ারের যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া বাকি আছে শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে তা তলব করা।

(খ) ঋণপত্র বিলি করা।

(গ) ঋণপত্র বিলি না করে অন্য কোনও উপায়ে ঋণ গ্রহণ করা।

(ঘ) কোম্পানীর তহবিল যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা।

(ঙ) ঋণ প্রদান করা।

(৩) **শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতিক্রমে ক্ষমতার ব্যবহার ঃ**

সার্বজনিক কোম্পানী বা সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানী অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি ছাড়া পরিচালকেরা নীচে উল্লেখ করা কাজগুলো করতে পারে না—

(ক) কোম্পানী সমস্ত কারবার অথবা যেখানে কোম্পানী এক বা তার বেশি কারবারে নিযুক্ত তার বা তাদের বিক্রি করা, ইজারা (lease) দেওয়া বা অন্য কোনও উপায়ে বিলিবন্দের করা।

(খ) যদি কোনো পরিচালক কোম্পানীর কাছে ঋণী থাকেন তবে হয় সেই ঋণ মুকুব করা (remit) বা ঋণপ্রদানের জন্য আরও সময় দেওয়া। (তবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই ধরনের নিয়ম খাটবে না)

(গ) কোম্পানী আইন প্রবর্তিত হবার পর বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোম্পানী যে অর্থ লাভ করে তা অছি ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে বিনিয়োগ করা।

(ঘ) কোম্পানী আইন প্রবর্তিত হবার পর যে পরিমাণ অর্থ ধার করা হয়েছিল ও যে পরিমাণ অর্থ ধার করা হবে তার মোট পরিমাণ কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে না এমন সঞ্চিতির মোট অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে এই অবস্থায় নতুন করে টাকা ধার করা।

(ঙ) কোম্পানী আইন প্রবর্তিত হবার পর, কোম্পানীর কারবারের সাথে বা তার কর্মচারীদের কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয় এমন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনও তহবিলে এমন পরিমাণ টাকা কোন আর্থিক বছরে দান করা যা—

- ৫০,০০০ টাকা ও
- ৩৪৯ ও ৩৫০ ধারায় নিয়মানুসারে বিগত তিন বছরে যে নীট লাভ হয়েছে তার শতকরা পাঁচ ভাগ এই দুইয়ের মধ্যে বেশি হবে।

এককটির এই অংশে এবার আমরা পরিচালকমণ্ডলীর বিভিন্ন কাজের ওপর আলোকপাত করতে পারি।

পরিচালকমণ্ডলীর কাজ ঃ পরিচালকমণ্ডলীর বিভিন্ন কাজকে এইভাবে লেখা যায় ঃ

(১) কোম্পানীর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ ও পরিচালনা।

(২) কোম্পানী যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে তাকে বাস্তবে রূপদান করা।

(৩) শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা—যেমন

- প্রতিনিধি বা অছি হিসাবে কাজ।
- লভ্যাংশের হার নির্ধারণ ও ঘোষণা।

(৪) মুখ্য কার্যনির্বাহক নিয়োগ করা।

(৫) কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশদান।

(৬) সমস্ত কাজে প্রয়োজনমত নেতৃত্ব দান।

(৭) তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে চুক্তি করা।

(৮) শেয়ার বিলি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।

(৯) সভাসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ।

(১০) অন্যান্য কাজ।

আইনের দৃষ্টিতে পরিচালকদের প্রকৃত স্থান ঃ

আমরা কোম্পানীর পরিচালকের বিভিন্ন কাজ, দায়িত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে পরিচালকের মাধ্যমে কোম্পানী তার কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে পরিচালকেরা কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আমরা জানি প্রতিনিধি সর্বদাই কারো নির্দেশে (অর্থাৎ প্রিন্সিপাল) কাজ করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি যে কোম্পানীর সমস্ত কাজ করার ক্ষেত্রে পরিচালকেরা শেয়ারহোল্ডারদের পরামর্শ নেন না। অতএব পরিচালকদের সেই অর্থে প্রতিনিধি বলা যাবে না।

আবার পরিচালকেরা কোম্পানীর সম্পত্তি ইত্যাদির দেখাশুনা করেন। এই অর্থে তাদেরকে কেউ কেউ অছিও (trustee) বলেন। কিন্তু পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানী সম্পত্তির মালিক নন। একজন অছি তার অধীনে যে সম্পত্তি আছে তা প্রয়োজন বোধে বিক্রি করতে পারেন ও নতুন সম্পত্তি কিনতেও পারেন। কিন্তু শেয়ারহোল্ডারদের অনুমতি ব্যতীত কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী তা করতে পারে না। তাই পরিচালকমণ্ডলীকে সেই অর্থে অছি বলা যায় না।

তাই কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকে আংশিক প্রতিনিধি ও আংশিক অছি হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে পরিচালকমণ্ডলী যে ক্ষমতারই অধিকারী হোন না কেন তাদের শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ দেখাই জরুরী।

এতক্ষণ আমরা পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা, কাজ, নিয়োগ-সংক্রান্ত বিধানগুলি জেনেছি। এখন তাদের অপসারণ সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের বিধানগুলি জানব। এককটির এই অংশে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব ঃ

পরিচালকদের অপসারণ ঃ

কোম্পানী আইনের ২৮৪ ধারায় পরিচালকদের অপসারণের কথা বলা আছে। এই ধারায় বলা আছে—

(১) ৪০৮ নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিযুক্ত পরিচালক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কোম্পানী সাধারণ প্রস্তাব পাশ করে কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই কোনও পরিচালককে অপসারণ করতে পারেন।

(২) তবে এই অপসারণের আগে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে। অপসারণের ফলে যে খালি জায়গার সৃষ্টি হল তা পূরণের ক্ষেত্রে এই বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করতে হবে।

একথা আগে বলা হয়েছে যে পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর কার্যাবলী মুখ্য কার্যনির্বাহকের মাধ্যমে পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপক পরিচালক (Managing director) বা ব্যবস্থাপক (Manager) এই মুখ্য কার্যনির্বাহকের কাজ করে থাকেন।

আমরা এখন ব্যবস্থাপক পরিচালক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ব্যবস্থাপক পরিচালক ঃ কোম্পানী আইনের ২ (২৬) ধারায় ব্যবস্থাপক পরিচালকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে—ব্যবস্থাপক পরিচালক বলতে বোঝায় একজন পরিচালক যিনি কোম্পানীর সঙ্গে কোনও চুক্তির বলে বা কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোনও প্রস্তাবের বলে বা পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশে বা স্মারকলিপি বা পরিমেল নিয়মাবলীতে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার বলে কারবারের পরিচালনার কাজে বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন যা তিনি অন্যভাবে প্রয়োগ করার অধিকারী নন্। এই ধারায় এও বলা হয়েছে যে ব্যবস্থাপক পরিচালক বলতে কোনও পরিচালককে বোঝায় যিনি ব্যবস্থাপক পরিচালকের পদে আসীন আছেন তা তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন।

এই ধারায় এও বলা হয়েছে যে ব্যবস্থাপক পরিচালক পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে কাজ করবেন।

- এককটি এই অংশে আমরা জানব ব্যবস্থাপক পরিচালক সংক্রান্ত বিধানগুলি। তার নিয়োগ, কাজ, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি সমস্ত আলোচনাটি গুরুত্ব দিয়ে জানবার চেষ্টা করব ঃ

এখন প্রশ্ন হল কোনও ব্যক্তিকে কীভাবে ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে?

ব্যবস্থাপক পরিচালকের নিয়োগের নিয়মকানুন ২৬৯ ধারায় আলোচনা করা হয়েছে। এই নিয়মকানুনগুলো এই প্রকার ঃ

(১) কোম্পানী সংশোধন আইন, ১৯৮৮ পাশ হবার সময় থেকে প্রত্যেক সার্বজনিক কোম্পানী অথবা কোনও ঘরোয়া কোম্পানী যা সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী, যার আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা হয় [রুল ১০ক, ১৭/৪/১৯৯০ থেকে বলবৎ] তবে ২৬৯ (১) ধারা অনুযায়ী সেই কোম্পানীর একজন ব্যবস্থাপক পরিচালক অথবা পুরো সময়ের পরিচালক বা একজন ব্যবস্থাপক অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে।

(২) এই নিয়োগের জন্য অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগবে। [ধারা ২৬৯ (২)]

(৩) এই নিয়োগের ৯০ দিনের মধ্যে তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির জন্য পাঠাতে হবে। [ধারা ২৬৯ (৩)]

(৪) যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে এই নিয়োগ জনস্বার্থের বিরোধী অথবা নিয়োগের শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়োগে অনুমতি দেবেন না।

(৫) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না পেলে যে পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন তিনি পদত্যাগ করবেন। যদি তিনি তা না করেন তবে প্রতিদিনের জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা হবে।

(৬) প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি কোম্পানী আইন পর্ষদকে জানাতে পারেন। কোম্পানী আইন পর্ষদ প্রয়োজনবোধে দরকারি ব্যবস্থা নিতে পারবে।

এই আইনে 'নিয়োগ' বলতে 'পুনর্নিয়োগ'-ও বোঝায়। এবং 'সর্বক্ষণের পরিচালক' বলতে 'সর্বক্ষণের জন্য কাজে নিযুক্ত পরিচালক' বোঝাবে।

অযোগ্যতা ঃ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা হারান। আইনের ২৬৭ ধারায় এই ধরনের অযোগ্যতার কথা বলা আছে। এই অযোগ্যতা বলতে বোঝায় যদি তিনি

(১) দেউলিয়া হন।

(২) পাওনাদারদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধে অসমর্থ হন।

(৩) আদালত কর্তৃক নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হন।

এখন প্রশ্ন হল কোনও ব্যক্তি সর্বাধিক কতগুলো কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারবেন?

ধারা ৩১৬-তে বলা আছে কোনও ব্যক্তি সর্বাধিক দুটি কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারবেন। তবে সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় এমন ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

এবারে আমরা জানব এই ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে কোনও ব্যক্তির কার্যকালের মেয়াদ কত ও এর জন্য তিনি কত পারিশ্রমিক পাবেন?

কার্যকাল ঃ ৩১৭ ধারায় ব্যবস্থাপক পরিচালকের কার্যকালের মেয়াদ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি একসাথে পাঁচবছরের বেশি সময়ের জন্য ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। সার্বজনিক কোম্পানীর অধীনস্থ নয় এমন ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এই ধারায় এও বলা হয়েছে যে পুনর্নিয়োগ বা কার্যকাল বাড়ানোর ব্যাপারে যে সময় থেকে সেই পুনর্নিয়োগ বা কার্যকাল বাড়ার কথা আছে তার থেকে দুই বছরের আগে তা করা যাবে না।

পারিশ্রমিক ঃ আইনের ৩০৯ ধারায় ব্যবস্থাপক পরিচালকের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে—

ব্যবস্থাপক পরিচালক হয় মাসিক কোনও এক নির্দিষ্ট টাকার ভিত্তিতে অথবা নীট মুনাফার এক নির্দিষ্ট শতকরা হিসাবে পারিশ্রমিক নিতে পারেন অথবা এই দুই প্রকারের মধ্যে কিছুটা এক উপায়ে আর বাকিটা অন্য উপায়ে নিতে পারেন।

এই ধারায় এও বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া এই পারিশ্রমিক একজন পরিচালকের ক্ষেত্রে নীট মুনাফার শতকরা পাঁচ ভাগ ও যদি একের বেশি পরিচালক হন তবে সবার জন্য মিলিতভাবে নীট মুনাফার দশ ভাগের বেশি হবে না। [ধারা ৩০৯ (৩)]

এবার আমরা ব্যবস্থাপক পরিচালকের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ব্যবস্থাপক পরিচালকের কাজ প্রধানত তিনটি বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যথা ঃ

(১) স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর শর্তাবলী।

(২) কোম্পানীর সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা।

(৩) কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত।

এই তিনটি বিষয়ের দ্বারা তার কাজ নিয়ন্ত্রিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তার বিভিন্ন কাজকে এইভাবে বলা যেতে পারে—

ব্যবস্থাপক পরিচালক হিসাবে তিনি একজন পরিচালক যা যা করতে পারেন তা করে থাকেন।

যেমন ঃ—

(১) কোম্পানীর উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া।

(২) সকল স্তরের কর্মীদের নেতৃত্ব দান।

(৩) সকল স্তরের কর্মীদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

(৪) শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা।

(৫) তৃতীয় পক্ষের স্বার্থরক্ষা।

(৬) দৈনন্দিন কাজ ঠিকমত পরিচালনা করা।

(৭) সময়মতো হিসাবপত্র পেশ করা।

(৮) ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন ইত্যাদি।

এছাড়া যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়াই ব্যবস্থাপক পরিচালক নিয়োগ করা হয় তার শর্ত, নিয়োগ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি কোম্পানী আইনের ধারা ১৪ নং শিডিউলে বিস্তারিত বলা আছে।

আমরা জানি ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে প্রথম মোট চার প্রকার মুখ্য কার্যনির্বাহকের কথা বলা হয়েছিল। যেমন -

(১) ব্যবস্থাপক পরিচালক (Managing Director)।

(২) নির্বাহী নিযুক্তক (Managing Agent)।

(৩) কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষমণ্ডলী (Secretaries and Treasurers)।

(৪) ব্যবস্থাপক (Manager)।

এদের মধ্যে ১৯৭০ সালের ৩রা এপ্রিল থেকে নির্বাহী নিযুক্তক এবং কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষমণ্ডলী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কেবল ব্যবস্থাপক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক মুখ্য কার্যনির্বাহক হিসাবে কাজ করতে পারেন। এর মধ্যে আমরা ব্যবস্থাপক পরিচালক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ব্যবস্থাপক সম্বন্ধে আলোচনা করব এককটির এই অংশে। ব্যবস্থাপক, তার নিয়োগ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পারিশ্রমিক, কার্যকাল প্রভৃতি বিষয় জানব ঃ

ব্যবস্থাপক ঃ কোম্পানী আইনের ২ (২৪) ধারায় ব্যবস্থাপকের সংজ্ঞা বলা আছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে—কোনও ব্যক্তি যিনি পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে, নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনায় কোম্পানী পরিচালনার সমস্ত বা প্রায় সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকেন তাকে ব্যবস্থাপক বলে। তবে এই ব্যবস্থাপক বলতে ম্যানেজিং এজেন্টকে বোঝাবে না কিন্তু পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এমন ব্যক্তিকে বোঝাবে।

নিয়োগ ঃ ব্যবস্থাপক পরিচালকের মত ব্যবস্থাপকের নিয়োগও কোম্পানী আইনের ২৬৯ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে খেয়াল রাখতে হবে কেবলমাত্র কোনও ব্যক্তিই পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন। (৩৮৪ ধারা) এই ধারায় এও বলা হয়েছে যে কোনও ফার্ম বা কোম্পানী ব্যবস্থাপক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন না।

অযোগ্যতা ঃ ৩৮৫ ধারায় বলা হয়েছে কোনও ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না যদি তিনি—

(ক) একজন দেউলিয়া ব্যক্তি যিনি এখনও দেউলিয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পান নি এবং আগের পাঁচ বছরের মধ্যে কোনও এক সময়ে দেউলিয়া বলে ঘোষিত হয়েছে।

(খ) বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনও পাওনাদারের দায় মেটাননি।

(গ) বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতীয় আদালতের রায়ে নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই অযোগ্যতা দূর করতে পারেন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে একজন ব্যক্তি দুইটির বেশি কোম্পানীতে ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করতে পারেন না। [ধারা ৩৮৬]

পারিশ্রমিক ঃ কোম্পানী আইনের ৩৮৭ ধারায় ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে যে ব্যবস্থাপকের পারিশ্রমিক কোম্পানীর নীট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি হতে পারবে না। এই পারিশ্রমিক মাসিক ভিত্তিতে বা নীট লাভের শতকরা ভাগের ভিত্তিতে বা কিছুটা মাসিক ভিত্তিতে ও কিছুটা নীট লাভের শতকরা ভিত্তিতে পাওয়া যেতে পারে। এই পারিশ্রমিক গণনা করার সময় ধারা ১৯৮, ৩৪৯, ৩৫০ ও ৩৫১-র নিয়ম মেনে চলতে হবে।

এই ৩৮৭ ধারায় এও বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়া পারিশ্রমিকের শতকরা হার বাড়ানো যাবে না।

কার্যকালের মেয়াদ ঃ ব্যবস্থাপক পরিচালকের মত ব্যবস্থাপকের কার্যকালের মেয়াদও একসঙ্গে পাঁচ বছরের বেশি হতে পারে না। [ধারা ৩১৭]

এখানে মনে রাখতে হবে ধারা ৩৮৬, ৩৮৭ ও ৩৮৮ ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। [ধারা ৩৮৮ক]

কাজ ঃ ব্যবস্থাপক সাধারণ কোম্পানী ব্যবস্থাপনার সমস্ত ভার বহন করেন।

৭৬(ক).৭ সারাংশ

এই একক পড়ে আপনারা জানতে পারলেন কোম্পানীর সংজ্ঞা—বৈশিষ্ট্য—প্রকারভেদ—প্রবর্তন—পরিচালনা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়।

- কোম্পানী একটি আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি। এর সাধারণ শীলমোহর আছে। এর স্থায়িত্বও চিরন্তর। এর পৃথক সত্তা আছে।
- কোম্পানী নিবন্ধন, দায়ের পরিমাণে, পরিচালনার গণ্ডি ও জনগণের অংশগ্রহণ এবং জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।
- আইনের দিক দিয়ে সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া কোম্পানী কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে।
- ঘরোয়া কোম্পানীরও আইনের চোখে কিছু বিধিনিষেধ আছে।
- কোম্পানীর মূল দলিল স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলী।
- যৌথ মূলধনী কোম্পানী গঠনে যেমন অনেক সুবিধা আছে, ঠিক তেমনি অনেক অসুবিধাও আছে।
- প্রবর্তক একজন ব্যক্তি। তার কিছু বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশেষ বিশেষ ধাপ অতিক্রম করে কোম্পানী গড়ে তোলেন।
- ঘরোয়া কোম্পানী নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র পেলেই ব্যবসা শুরু করতে পারে। কিন্তু সার্বজনিক কোম্পানী কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পেলে তবেই কাজ শুরু করতে পারে।
- কোম্পানীর মোট মূলধনকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়।
  এই এক একটি ভাগকে এক একটি শেয়ার বলা হয়। শেয়ারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।
- শেয়ার ছাড়া ঋণপত্রের মাধ্যমেও কোম্পানী তার মূলধন জোগাড় করতে পারে।
- শেয়ার বিলি করার আগে কোম্পানীকে প্রয়োজন মতো বিবরণীপত্র বা বিবরণীপত্রের পরিবর্তে বিবৃতি জনগণকে বিলি করতে হবে।
- কোম্পানী আইনের প্রথম সূত্রপাতের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোম্পানী পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে পরিচালকমণ্ডলী ব্যবস্থাপক পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে কোম্পানীর কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

৭৬(ক). অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) কোম্পানী কাকে বলে?

(খ) "কোম্পানীর পৃথক সত্তা আছে"—এই বক্তব্যের অর্থ কী?

(গ) বর্তমান ভারতে ‘বিশেষ সনদের’ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী দেখা যায় কী?

(ঘ) সংসদের বিশেষ আইন বলে প্রতিষ্ঠিত দুটি কোম্পানীর নাম উল্লেখ করুন।

(ঙ) অসীম দায়যুক্ত কোম্পানী বলতে কী বোঝেন?

(চ) প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানী ও শেয়ারের মূল্য দ্বারা পরিমিত দায়বিশিষ্ট কোম্পানীর মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

(ছ) ঘরোয়া কোম্পানী কাকে বলে?

(জ) সার্বজনিক কোম্পানী গঠন করতে হলে কম করে কতজন সদস্যের প্রয়োজন?

(ঝ) দুটি সরকারী কোম্পানীর উদাহরণ দিন।

(ঞ) সীমাবদ্ধ মালিকানার কোম্পানী কাকে বলে?

(ট) সার্বজনিক কোম্পানীকে ব্যাপক মালিকানার কোম্পানী কেন বলা হয়?

(ঠ) কোনও কোম্পানীর নাম দেখে কীভাবে চিনবেন কোনটা ঘরোয়া আর কোনটা সার্বজনিক কোম্পানী?

(ড) ঘরোয়া কোম্পানীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম পুঁজির প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

(ঢ) সার্বজনিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ সভার ও বিধিবদ্ধ রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

(ণ) কোম্পানীর প্রধান দলিলগুলো কী কী?

(ত) স্মারকলিপি পরিবর্তন করা যায় কী?

(থ) পরিমেল নিয়মাবলী কী?

(দ) কোম্পানী গঠনের একটি করে সুবিধা ও একটি করে অসুবিধা উল্লেখ করুন।

(ধ) প্রবর্তন কাকে বলে?

(ন) একজন প্রবর্তকের কী কী বিশেষ গুণ থাকা উচিত?

(প) ঘরোয়া কোম্পানী ও সার্বজনিক কোম্পানী কী একই অবস্থায় কারবার শুরু করতে পারে?

(ফ) সঞ্চয়ী ও অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে মূল্য পার্থক্য কী?

(ব) কোম্পানীর শেয়ার মূলধনের বিভিন্ন ভাগগুলো কী কী?

(ভ) ঋণপত্র কী?

(ম) ঋণপত্রগ্রহীতার ভোটাধিকার আছে কী?

(য) কে কোম্পানী পরিচালনা করেন?

(র) পরিচালক হবার যোগ্যতা কী?

(ল) পরিচালকদের সর্বাধিক পারিশ্রমিক কত?

(ব) পরিচালক অছি না প্রতিনিধি?

(শ) ব্যবস্থাপক পরিচালক কে?

(ষ) ব্যবস্থাপকের অযোগ্যতা কী?

(স) ব্যবস্থাপকের কার্যকালের মেয়াদ কতদিনের?

২। যৌথ মূলধনী কোম্পানীর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৩। কোম্পানীকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? আলোচনা করুন।

৪। ঘরোয়া ও সার্বজনিক কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

৫। সার্বজনিক কোম্পানীর তুলনায় ঘরোয়া কোম্পানী কী কী বিশেষ সুবিধা ভোগ করে? আলোচনা করুন।

৬। কী কী আইনি বিধিনিষেধ ঘরোয়া কোম্পানীকে মেনে চলতে হয়?

৭। স্মারকলিপিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ থাকে তা লিখুন।

৮। স্মারকলিপিতে যে যে বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে বলা আছে তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।

৯। স্মারকলিপির পরিবর্তন কীভাবে করা যায়।

১০। কোম্পানীর নিবন্ধন কার্যালয় পরিবর্তন কী কী কারণে ঘটানো যায়?

১১। পরিমেল নিয়মাবলীতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে?

১২। স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলীর পার্থক্য আলোচনা করুন।

১৩। কোম্পানী গঠনে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

১৪। কোম্পানী প্রবর্তন বলতে কী বোঝেন? প্রবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

১৫। প্রবর্তকদের কতভাগে ভাগ করা যায়? আলোচনা করুন।

১৬। প্রবর্তনের আইনগত আনুষ্ঠানিকতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

১৭। কোম্পানীর শেয়ার কত প্রকারের হয় ও কী কী? শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

১৮। পরিচালকমণ্ডলীর ন্যূনতম সংখ্যা, নিয়োগ, অযোগ্যতা, পুনর্নিয়োগ, যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

১৯। একজন ব্যক্তি সর্বাধিক কতগুলো কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে কাজ করতে পারেন? এই বিষয়ে কোম্পানী আইনের বিধান কী কী?

২০। পরিচালকদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের বিধানগুলো আলোচনা করুন।

২১। পরিচালকমণ্ডলীর ক্ষমতা সবিস্তারে আলোচনা করুন।

২২। পরিচালকমণ্ডলীর কাজ কী কী? কীভাবে এদের অপসারণ ঘটানো যায়?

২৩। ব্যবস্থাপক পরিচালকের নিয়োগ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের নিয়মকানুন আলোচনা করুন।

২৪। ব্যবস্থাপকদের যোগ্যতা, নিয়োগ, অযোগ্যতা, পারিশ্রমিক ও কার্যকালের মেয়াদ সম্বন্ধে কোম্পানী আইনের বিধানগুলো আলোচনা করুন।

২৫। কোম্পানী আইনের যে বাধাগুলোর সঙ্গে আপনি পরিচিত হলেন তার মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিতে কোনগুলোর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়?

৭৬(ক).৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। ড. চিত্তরঞ্জন বসু — *'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা'* (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)

২। *Taxmann's Corporate Laws, 1999.*

৩। Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India—Publication Division—*'India 2001'* (A Reference Manual).

একক ৭৭(খ).২ ❑ সমবায় কারবার ঃ বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা

গঠন

৭৭(খ).০ উদ্দেশ্য
৭৭(খ).১ প্রস্তাবনা
৭৭(খ).২ সমবায়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও নীতি
৭৭(খ).৩ সমবায় কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য
৭৭(খ).৪ গঠন ও নিবন্ধন
৭৭(খ).৫ শ্রেণীবিভাগ
৭৭(খ).৬ সমবায় সংগঠনের সুবিধা
৭৭(খ).৭ অসুবিধা
৭৭(খ).৮ কোম্পানী ও সমবায় কারবারের মধ্যে পার্থক্য
৭৭(খ).৯ সমবায় কারবারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
৭৭(খ).১০ সারাংশ
৭৭(খ).১১ অনুশীলনী
৭৭(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭৭(খ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে সমর্থ হবেন ঃ—

- সমবায় বলতে আমরা কী বুঝি?
- সমবায় কারবারের উদ্দেশ্য ও নীতি;
- সমবায় কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য;
- সমবায় কারবারের নিবন্ধনের প্রকৃতি ও ফলাফল;
- কত প্রকারের সমবায় কারবার বর্তমান?
- সমবায় কারবারের সুবিধা ও অসুবিধা;
- কোম্পানী ব্যবসার সঙ্গে সমবায় কারবারের পার্থক্য;
- সমবায় কারবারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

৭৭(খ).১ প্রস্তাবনা

শিল্পবিপ্লবের ফলে আমাদের দেশেও কৃষি, শিল্প ও পরিবহণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই সময় কুটির শিল্পের স্থান দখল করল কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা। হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের যুগে অসমভাবে সম্পদ বণ্টন হত। আবার কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাতেও সম্পদ প্রধানত কিছু লোকের হাতে চলে আসল। এর ফলে মুনাফাবাজীর সৃষ্টির হল এবং সুদের হারও বেশ চড়া হল। অবশ্য বাজার ব্যবস্থা স্থানীয় গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছাল। এর ফলে উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে মধ্যস্থ কারবারীর উদ্ভব হল। যার

ফলস্বরূপ উৎপাদনকারীর পণ্যের দাম ও ভোগকারীর সেই পণ্য কেনার দামের মধ্যে বিশাল ফারাক দেখা গেল। এই সমস্ত অসুবিধার সামনে পড়ে ভোগকারীরা সংঘবদ্ধ হল এবং সমবায় প্রথার সূচনা করল। ব্রিটেনে সর্বপ্রথম ক্রেতা সমবায় সমিতির এবং জার্মানিতে সর্বপ্রথম ঋণদান সমবায় সমিতির গঠন হল। সমবায় সমিতির সাধারণ নীতি হল ঃ

- সাধারণ ক্রেতাদের সুরক্ষা।
- সেবামূলক মনোভাব।
- ঐক্যবোধ।
- সাম্য।
- গণতন্ত্র।
- সততা।
- সমান অধিকার।
- স্বাবলম্বন।
- সমিতির অধিকার।
- সমিতির সভ্যগণের স্বার্থসংরক্ষণ।
- ব্যয়সংক্ষেপ প্রভৃতি।

এককটির এই অংশে আমরা সমবায়ের অর্থ, উদ্দেশ্য ও নীতির সম্বন্ধে জানব।

৭৭(খ).২ সমবায়ের অর্থ, উদ্দেশ্য, নীতি

সমবায়ের অর্থ ঃ

সমবায় শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল মিলন (an assemblage)। প্রকৃতপক্ষে গঠনমূলক কাজের জন্য মিলনকেই সমবায় বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বড় পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য একই শ্রেণীর লোকজনদের ব্যক্তিগত পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাকেই সমবায় আন্দোলন বলে। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন বসুর মতে, "কল্যাণকর জীবনযাত্রা, বিশেষ কারবার, উন্নত কৃষি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাধারণ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য সাম্যের ভিত্তিতে যখন কিছু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে সমবায় বলা হয়।"

সি. আর. ফে (C. R. Fay) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (International Labour Organisation) সমবায় সমিতির তাৎপর্য এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"সমবায় সমিতি কারবার করার উদ্দেশ্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি যৌথ সংগঠন। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিঃস্বার্থভাবে সমবায় সমিতি পরিচালনা করেন। একই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা নিজেদের ইচ্ছায়

মিলিত হন। প্রয়োজনীয় মূলধন তারা সমানভাবে কাজে লাগান এবং ঝুঁকি ও সুযোগ সুবিধা ন্যায্যভাবে ভাগ করেন।”

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মালিকেরা ব্যক্তিগত মুনাফার উদ্দেশ্যে কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করে। এই ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য পণ্যের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে পার্থক্য হয় এবং তার ফলে দামের ওঠানামা হয়। কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সদস্যদের ক্ষেত্রে চাহিদার সুনির্দিষ্ট হিসাব করার সুবিধা থাকার জন্য জোগানও নির্দিষ্ট হয় এবং তার ফলে চাহিদা ও জোগানের পার্থক্যের জন্য লাভ বা লোকসানের অবকাশ নেই। সমবায়ের ক্ষেত্রে যদি বাড়তি লাভ হয় তবে তা সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সমবায় ও সমাজতন্ত্র উভয়ই চায় যে ধনতন্ত্র এমন এক প্রণালীতে রূপান্তর হোক যেখানে লাভ নয় সেবাই বড় হবে। সমাজতন্ত্রের প্রধান নীতি হল—প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুসারে শ্রম দেবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভোগ্যদ্রব্য পাবে (“From each according to his ability to each according to his needs.”)

সমবায় তার আন্দোলনের নতুন ধারায় মালিকানাকে গুরুত্বহীন করেনি, আবার সমাজের কল্যাণকেও ছোট করে দেখেনি। ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’—এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমবায় ধীরে ধীরে তার আন্দোলনকে মজবুত করে তোলে।

উপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে আমরা এখন সমবায়ের সংজ্ঞা এইভাবে দিতে পারি ঃ—

(১) হেনরি কালভার্টের মতে, “সমবায় হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যাতে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে একসঙ্গে মিলিত হন।”

(Co-operative is a form of organisation wherein the persons voluntarily associate together as human being on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves.)

(২) অধ্যাপক পল ল্যামবার্টের মতে, “সমবায় সমিতি হচ্ছে তার ব্যবহারকারীদের সংঘ দ্বারা গঠন করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এমন প্রচেষ্টা যাতে গণতন্ত্রের নিয়ম বর্তমান এবং তাতে একসঙ্গে সভ্যদের ও সমাজের সরাসরি সেবা করার ইচ্ছা বর্তমান।”

(A Co-operative society is an enterprise formed and directed by an association of users applying within itself the rules of democracy and directly intented to serve both its own members and the community as a whole.)

সমবায়ের উদ্দেশ্য ঃ সহজ কথায় শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ, দারিদ্র্য মোচন, সমাজ কল্যাণ ও সমাজসেবাই সমবায়ের উদ্দেশ্য। সমবায়ের উদ্দেশ্যগুলিকে আমরা মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ—

(ক) **মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ**

সমবায় সমিতির মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

(১) সদস্যদের প্রকৃত চাহিদা পরিমাপ করে পণ্যের যথাযথ জোগান দেওয়া।

(২) সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো।

(৩) তাদের মধ্যে একতা ও পারস্পরিক সান্নিধ্যের মনোভাব গড়ে তোলা।

(৪) তাদের মধ্যে আয় ও উদ্বৃত্ত যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করা।

(৫) ধনিক শ্রেণীর শোষণ থেকে সদস্যদের রক্ষা করা।

(৬) সমাজের সার্বিক কল্যাণসাধন।

(৭) সদস্যদের মধ্যে সাম্যের মনোভাব বজায় রাখা।

(৮) তাদের সমান অধিকার দেওয়া।

(৯) তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

(১০) তাদের পারস্পরিক স্বার্থসংরক্ষণ।

(খ) **গৌণ উদ্দেশ্য ঃ**

মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়াও সমবায় সমিতির গৌণ উদ্দেশ্যও বর্তমান। যেমন ঃ

(১) সীমিত মুনাফা অর্জন।

(২) সদস্যদের সমবায় শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা।

(৩) ব্যবস্থাপনার মধ্যে সততা বজায় রাখা।

(৪) ব্যয় সংক্ষেপের আদর্শ বজায় রাখা।

সমবায়ের নীতি ঃ

প্রকৃত অর্থে সমবায় হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যেখানে সাম্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমান স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছায় এক জায়গায় মিলিত হয়। সমবায়ের সাফল্য কতগুলো মৌলিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিগুলো মেনে চললে সমবায়ের উদ্দেশ্য সফল হয়। নীতিগুলো সংক্ষেপে এইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

(১) **শোষণের হাত থেকে রক্ষা ঃ** শোষক শ্রেণীর হাত থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল জনসাধারণকে রক্ষা করা সমবায়ের মূল মন্ত্র।

(২) **স্বেচ্ছায় যোগদান ঃ** এখানে সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় যোগদান করে। এখানে সদস্য হওয়াও সহজ। আবার সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়াও সহজ।

(৩) **সাম্য ঃ** এখানে যে সমস্ত সদস্য যোগদান করেন তাদের প্রত্যেকের অধিকার ও মর্যাদা সমান।

(৪) **পারস্পরিক বিশ্বাস ঃ** সাধারণত আগে থেকে পরিচিত ব্যক্তিরাই এখানে সদস্য হতে পারেন। এর ফলে তাদের মধ্যে সহজেই পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা গড়ে ওঠে।

(৫) **একতা ঃ** সদস্যদের মধ্যে সমান অধিকার, মর্যাদা থাকার জন্য এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের শক্ত ভিত থাকার জন্য সদস্যদের মধ্যে একতার লক্ষণ ফুটে ওঠে। এর সাহায্যেই তারা একসঙ্গে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায় ও অবশেষে জয়ী হয়।

(৬) **সেবা ঃ** সমিতির সদস্যদের সেবার মাধ্যমে মঙ্গলসাধন সমবায়ের অন্যতম নীতি।

(৭) **স্বার্থ ঃ** এখানে সদস্যরা সবাই সমস্বার্থ বিশিষ্ট।

(৮) **সমান ভোটাধিকার ঃ** সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে সমবায়ে প্রত্যেকের ভোটাধিকার সমান। শেয়ার কেনার পরিমাণের ওপর ভোটের পরিমাণ নির্ভর করে না।

(৯) **পরিচালনা ঃ** সদস্যদের সমান ভোটের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহক কমিটি গণতান্ত্রিকভাবে সমবায় পরিচালনা করে।

(১০) **শেয়ারের উর্ধ্বসীমা ঃ** সাধারণত কোনও সদস্যের ১০০০ টাকার বেশি শেয়ার কেনার নিয়ম নেই। এতে প্রকৃত পক্ষে আয় ও মুনাফার বণ্টনে খুব বেশী হেরফের হয় না।

(১১) **উদ্বৃত্ত ঃ** সমবায় সমিতি সেবার মনোভাবকে প্রাধান্য দিলেও সীমিত মুনাফাও অর্জন করে। এই মুনাফা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই মুনাফার শতকরা পঁচিশ ভাগ সঞ্চিত তহবিলে রাখা সাধারণ নীতি।

(১২) **রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ঃ** সমবায় সমিতির রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা প্রত্যেক সদস্যের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি।

ওপরের নীতিগুলো মেনে চললে সমবায় সমিতি তার লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হয়।

৭৭(খ).৩ সমবায় কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য

সমবায় সমিতির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা করলে আমরা সমবায় কারবারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারি। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা এভাবে এককটির এই অংশে আলোচনা করতে পারি।

(১) **মালিকানা ঃ** সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে গেলে অন্তত দশজন সদস্যের প্রয়োজন। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যা অনির্দিষ্ট। সমবায় সমিতির একজন সদস্য সমিতির এক বা একাধিক শেয়ার কিনতে পারেন। কিন্তু সাধারণত কোনও একজন সদস্য একহাজার টাকার বেশি শেয়ার কিনতে পারে না। এখানে শেয়ার হস্তান্তর করা যায় না। সমিতি যে কোনও সময় নতুন সদস্য গ্রহণ করতে পারে।

(২) **নিয়ন্ত্রণ ঃ** এখানে সদস্যেরা একটা পরিচালকমণ্ডলী (Managing Committee) নির্বাচন করে। এই পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে থেকেই চেয়ারম্যান ও কর্মসচিব নির্বাচিত হন। নির্বাচিত কর্মসচিব দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন। প্রকৃত অর্থে সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সমবায় সমিতির ওপরেই নস্ত থাকে। একজন পরিচালক সর্বাধিক তিন বছর ঐ পদে বহাল থাকেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালকমণ্ডলী বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করার পর পেশ করেন ও পরিচালন সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন।

(৩) **আইনগত মর্যাদা ঃ** সমবায় আইনে সৃষ্টি হওয়া এই সমিতির পৃথক অস্তিত্ব যৌথ মূলধনী কারবারের মতই স্বীকার করা হয়। এই সমিতিকে আইনের চোখে কৃত্রিম ব্যক্তি বলে মানা হয়। ফলে সদস্যদের থেকে আইনত পৃথক সত্তা থাকায় সদস্যের পরিবর্তন হলেও সমিতির অস্তিত্ব বিলোপ হয় না।

(৪) **ঝুঁকি ঃ** সমবায় সমিতি

— সীমাহীন দায় ও

— সীমাবদ্ধ দায়, এই দুই প্রকারের গঠন করা যায়। সীমাহীন দায়যুক্ত সমিতির ঝুঁকির মাত্রা স্বভাবতই বেশি। অন্যদিকে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমিতির সদস্যদের ঝুঁকির মাত্রা সীমাবদ্ধ। তবে ঝুঁকির মাত্রা সীমাবদ্ধ হওয়ায় সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত সমিতিই বেশি পরিমাণে জনপ্রিয়।

(৫) **স্থায়িত্ব ঃ** আইনগত পৃথক সত্তা থাকায় সমবায় সমিতিতে কোনও সদস্য পদত্যাগ করলে বা কোনও সদস্যের মৃত্যু হলে সমিতির স্থায়িত্বের ওপর কোনোরূপ প্রভাব পড়ে না।

(৬) **মুনাফায় অংশগ্রহণ ঃ** যদিও সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য সেবা তবুও সমিতির মুনাফা সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তবে প্রতি বছর মুনাফার শতকরা পঁচিশ ভাগ সঞ্চয় তহবিলে জমা করা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত এই তহবিল আদায়ীকৃত মূলধনের সমান না হয়। স্থানীয় জনকল্যাণের জন্য সবচেয়ে বেশি দশ শতাংশ মুনাফা খরচ করা যেতে পারে। এর পরে মুনাফার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তার ওপর সদস্যরা শেয়ারের মূল্যের অনুপাতে সুদ পেতে পারেন অথবা সমবায় ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে সদস্যের যে পরিমাণ জিনিসপত্র কেনেন সেই অনুপাতে তাকে বাট্টা দেওয়া হতে পারে।

৭১.(২).৪ এককটির এই অংশে আমরা সমবায় প্রতিষ্ঠানের গঠন ও নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারি ঃ

৭৭(খ).৪ গঠন ও নিবন্ধন

গঠন ঃ যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মত সমবায় সমিতির গঠনপ্রণালী জটিল নয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য একই এলাকায় বসবাস করে ও একই পেশায় নিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক অন্তত ১০ জন (ক্ষেত্রবিশেষে ৭ জন) ব্যক্তির যৌথ সম্মতির প্রয়োজন হয়। ভারতে ১৯১২ সালের সমবায় আইন দ্বারা এই সমিতির গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিবন্ধন ঃ সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রণালী নীচে বর্ণনা করা হল—

(১) কম করে ১০ জন (ক্ষেত্রবিশেষে ৭ জন) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ফর্মে সই করে নিবন্ধকের কাছে পেশ করতে হয়।

(২) এই ফর্মে সমিতির নাম ও ঠিকানা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানা, সমিতির উদ্দেশ্য, পুঁজির পরিমাণ ও শেয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করতে হয়।

(৩) নিবন্ধনের আবেদনপত্রের সাথে সমিতির উপবিধির (Bye-laws) দুটি কপি পেশ করতে হয়।

(৪) আবেদনপত্র ও উপবিধি পাবার পর নিবন্ধক সেগুলি পরীক্ষা করে দেখেন।

(৫) পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি সমিতিকে নিবন্ধনভুক্ত করেন এবং আবেদনকারীকে নিবন্ধনপত্র (Certificate of Registration) পাঠিয়ে দেন।

নিবন্ধিত হলেই সমিতি শেয়ার বিলি করতে পারে।

নিবন্ধন সংক্রান্ত কোনও উপবিধির সংশোধন প্রয়োজন হলে নিবন্ধকের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সমিতি নিবন্ধিত হলে কতগুলো সুবিধা যেমন ভোগ করে তেমনি কিছু বাধ্যবাধকতাও মেনে চলতে হয়। সমিতিকে শেয়ার বিলির জন্য বিবরণপত্র (Prospectus) প্রচার করতে হয় না। সংবাদপত্রে একটি ছোট বিজ্ঞাপন অথবা শুধু নোটিশ বোর্ডে একটি নোটিশ দিলেই কাজ হয়ে যায়।

সমবায় সমিতির নিবন্ধনের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ অফিসারকে সমবায় সমিতির নিবন্ধক (Registrar of Co-operative Societies) বলা হয়। তবে তিনি প্রধানত বড় বড় সমিতি ছাড়া অন্যগুলোর নিবন্ধন করেন না। সাধারণত নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলায় একজন করে সহকারী নিবন্ধক থাকে। ইনিই নিবন্ধিত করে থাকেন এবং তার পরেই সমিতিটি গঠন করা হল বলে ধরে নেওয়া হয়। নিবন্ধিত সমিতির নিজস্ব শীলমোহর থাকে।

নিবন্ধনের ফলাফল ঃ—

(১) নিবন্ধিত সমিতি তার সভ্যদের ছাড়া অন্য কাউকে ঋণ দিতে পারে না। যদি বা দেয় তবে নিবন্ধকের অনুমতি লাগে।

(২) নিবন্ধিত সমিতি তার অর্থ সমবায় ব্যাঙ্ক, সরকারী ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও অনুমোদিত ব্যাঙ্কে জমা রাখতে পারে।

(৩) নিবন্ধিত সমিতির মুনাফার পঁচিশ শতাংশ সঞ্চয়ী তহবিলে জমা রাখতে হয় এবং দশ শতাংশ পর্যন্ত দাতব্য বা জনকল্যাণমূলক সংস্থায় দান করা যেতে পারে।

(৪) যদি উপবিধিতে উল্লেখ থাকে তবে সভ্য ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ সমিতি জমা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

(৫) যদি কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করে তবে আয়কর, স্ট্যাম্প ডিউটি ও নিবন্ধনের ব্যয় থেকে সমিতিকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

(৬) অপরের কাছ থেকে পাওনা আদায়ের ব্যাপারে সমিতি সরকারের পরেই অগ্রাধিকার ভোগ করে।

(৭) নিবন্ধিত সমিতির কাছ থেকে পাওনার জন্য সমিতির শেয়ার ক্রোক করা যায় না।

প্রাঃ সমবায় সমিতির উপবিধিতে কী কী বিষয়ের উল্লেখ থাকে?

উঃ সমবায় সমিতির উপবিধিতে নীচের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকে—

(ক) সমিতির নাম।

(খ) সমিতির ঠিকানা।

(গ) সমিতির লক্ষ্য।

(ঘ) সমিতি যে এলাকায় কাজ করবে তার উল্লেখ।

(ঙ) সমিতির তহবিল গঠন।

(চ) সমিতির তহবিল বিনিয়োগ।

(ছ) সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার।

(জ) পুঁজি সংগ্রহের উপায়।

(ঝ) সমিতির পরিচালক নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব।

(ঞ) সমিতির সভার নিয়মকানুন।

(ট) কর্মচারীদের নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদি।

(ঠ) হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।

(ড) নিরাপত্তা।

সমবায় প্রতিষ্ঠানের কি বিভিন্ন শ্রেণী হতে পারে না একই ধরনের, তা নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার। এককটির এই অংশে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব।

৭৭(খ).৫ শ্রেণীবিভাগ

প্রধানত উদ্দেশ্য ও কাজের ধারার ওপর ভিত্তি করে সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তাদের মধ্যে যেগুলো এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(ক) উৎপাদক সমবায় সমিতি (Producers' Co-operative Society) ঃ এই ধরনের সমিতি পণ্য উৎপাদন করে। বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা যেমন ঃ দরিদ্র কৃষক, কুটির শিল্পের কারিগর, মৎস্যজীবী প্রভৃতি একত্রিত হয়ে এই ধরনের সমিতি গঠন করে। এরা নিজেরাই মালিক ও শ্রমিক বলে বিবেচিত হয়। এরা নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই পরিচালনা করে ও লাভের পুরোটাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই ধরনের সমবায় সমিতির উদাহরণ হল—পাট সমবায় সমিতি, ইক্ষু সমবায় সমিতি।

(খ) সম্ভোগকারী বা ভোক্তা সমবায় সমিতি (Consumers' Co-operative Society) ঃ অসাধু পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী যারা অতি মুনাফার লোভে সাধারণ ক্রেতাদের শোষণ করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নানা রকম ভোগ্য জিনিসপত্রের ক্রেতারা একত্রে মিলিত হয়ে এই ধরনের কারবার গ্রামে বা শহরে গড়ে তোলে। এই সমিতি একচেটিয়া কারবার ও মুনাফাবাজী বন্ধ করার চেষ্টা করে। এই সমিতি কম দামে উৎপাদনকারী ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাইকারদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে সমিতির সদস্যদের কাছে কম দামে বিক্রি করে। এই অবস্থায় মধ্যস্থ কারবারীরা লাভের অংশে ভাগ বসাতে পারে না। কোনও কোনও সময় সদস্য নয় এমন ক্রেতাও এই সমিতি থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারে, তবে এক্ষেত্রে সদস্যদের অনুমোদন লাগে। কিন্তু এই সমিতি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দরিদ্র সদস্যরা বহন করতে সক্ষম হয় না।

(গ) সমবায় ক্রয় সমিতি (Co-operative Purchasing Society) ঃ প্রধানত দ্রব্যমূল্য সঠিক মূল্যে ও সুবিধাজনক শর্তে ক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের সমিতি গড়ে উঠেছে। দরিদ্র কৃষক, কুটির শিল্পের কারিগর তাদের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, সার, বীজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার উদ্দেশ্যে নিজেরা একত্র হয়ে এই ধরনের সমিতি গঠন করে।

(ঘ) সমবায় বিক্রয় সমিতি (Co-operative Marketing Society) ঃ নিজেদের উৎপন্ন করা জিনিস ন্যায্য দামে সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই ধরনের সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রধানত গরীব চাষি তাঁতী এরাই এই ধরনের সমিতি গঠন করে। এর ফলে মধ্যস্থ কারবারীদের অহেতুক উপস্থিতি রোধ করা যায়। তাঁতশিল্পে এই ধরনের সমিতি দেখা যায়।

(ঙ) **সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Society) ঃ** এই ধরনের সমিতি প্রধানত সহজ শর্তে ঋণ দেয়। দরিদ্র উৎপাদকদের সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই ধরনের সমিতি গড়ে উঠেছে। অন্যান্য কাজে কর্মব্যস্ত মানুষ যাতে এই সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে ও প্রয়োজনমত সুবিধা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য এই সমিতিগুলো বেশিরভাগ সন্ধ্যাবেলায় খোলা থাকে। এই ধরনের সমিতি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। আমরা ভারতের বিভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় যে সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Bank) দেখতে পাই তা ঋণদান সমিতির পর্যায়ে পড়ে। এই সমবায় ব্যাঙ্ক কোনও সমবায় সমিতির সদস্যকে ঋণ দেয় না, প্রধানত সমবায় সমিতিকে প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়—এর ফলে অবশ্য সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যরাই পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়।

(চ) **শিল্পসংক্রান্ত সমবায় সমিতি (Industrial Co-operatives) ঃ** ছোট ছোট শিল্প মালিকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বড় শিল্পের সুযোগসুবিধা গ্রহণ করার জন্যই এই ধরনের সমিতির জন্ম হয়েছে। এই ধরনের সমিতির প্রধান কাজই হল সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করা ও উৎপন্ন হওয়া জিনিস সঠিক দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা।

৭৭(খ).৬ সমবায় সংগঠনের সুবিধা

সমবায় সমিতি যে ধরনেরই হোক না কেন তার গঠনে কিছু সুবিধা বর্তমান। এই সুবিধাগুলো এইভাবে আলোচনা করা যায় ঃ—

(ক) **সংগঠন সংক্রান্ত সুবিধা ঃ—**

(১) **সহজে গঠন ঃ** এই ধরনের কারবার গঠনে কোনও জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। কেবলমাত্র দশজন সদস্য হলেই এই ধরনের কারবার গঠন করা যেতে পারে।

(২) **স্থায়িত্ব ঃ** সদস্যদের থেকে আইনগত পৃথক সত্তা থাকায় মালিকানার (সদস্যের) পরিবর্তন হলেও এর অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। এই সমিতি চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তি।

(৩) **গণতান্ত্রিক পরিচালনা ঃ** সমিতির ব্যবস্থাপনার ভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এক পরিচালকমণ্ডলীর ওপর থাকে। পরিচালকমণ্ডলী ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’—এই নীতিতে নির্বাচিত হয়।

(খ) **আর্থিক দিক সংক্রান্ত সুবিধা ঃ—**

(১) **সঠিক মূল্যে কেনার ব্যবস্থা ঃ** সমবায় সমিতির মাধ্যমে সঠিক মূল্যে জিনিসপত্র কেনা যায়। এর ফলে মধ্যস্থ কারবারীর প্রকোপ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

(২) **সঠিক মূল্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা ঃ** শুধুমাত্র কেনাই নয় বিক্রির সময়েও সমবায় সমিতির মাধ্যমে সঠিক দামে উৎপন্ন করা জিনিস বিক্রি করা যায়। ফলে অসাধু মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি রোধ করা যায় ও অহেতুক জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়া রোধ করা যায়।

(৩) **সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা ঃ** সমবায় সমিতি থেকে সদস্যরা সহজ শর্তে কম সুদে কম সময়ের জন্য ঋণ পেয়ে থাকে। তার ফলে অসাধু সুদখোর মহাজনীদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(গ) **সামাজিক সুবিধা ঃ—**

(১) **মধ্যস্থ কারবারীর অনুপস্থিতি ঃ** এখানে সমিতির সদস্যরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমবায়ের মাধ্যমে কেনে ও নিজেদের উৎপন্ন জিনিসপত্র সমবায়ের মাধ্যমে সঠিক দামে বিক্রি করে। ফলে মধ্যস্থ কারবারীর ওপর নির্ভর করতে হয় না ও সমাজও মধ্যস্থ কারবারীর উপস্থিতি না থাকার জন্য উপকৃত হয়।

(২) **অধিক লাভের অপচেষ্টা বন্ধ ঃ** যেহেতু এখানে মধ্যস্থ কারবারীরা থাকে না সেইহেতু জিনিসপত্রের দামও অহেতুক বাড়ে না। চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমতা রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয় ও সঠিক দামে জিনিসপত্রের জোগান দেওয়া হয়, এর ফলে অধিক লাভের অপচেষ্টা বন্ধ হয়।

(৩) **সেবা প্রদান ঃ** সমবায় সমিতির সদস্যরা অনেক সময় বিনা বেতনেও সেবা প্রদান করে থাকেন। ফলে সমাজ উপকৃত হয়।

(ঘ) **অন্যানা সুবিধা ঃ—**

(১) **নৈতিক গুণের বিকাশ ঃ** সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি নৈতিক গুণ বিকাশ লাভ করে।

(২) **সমাজতন্ত্রের পথপ্রদর্শক ঃ** সমবায়ের নীতি ও পদ্ধতি সমাজতন্ত্রের পথপ্রদর্শক।

(৩) **মর্যাদা ঃ** সমবায় সমিতিতে সদস্যরা সমান মর্যাদা পেয়ে থাকেন, ফলে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতা অটুট থাকে।

৭৭(খ).৭ অসুবিধা

সমবায় কারবারের যেমন অনেক প্রকার সুবিধা আছে ঠিক তেমনি এই ধরনের কারবার চালাতে গেলে কিছু কিছু অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়। এই অসুবিধাগুলো নীচে আলোচনা করা হল ঃ—

(ক) **সংগঠন সংক্রান্ত অসুবিধা ঃ—**

(১) **সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব ঃ** সাধারণ অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকেদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। ফলে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তার (ব্যবস্থাপকের) অভাব দেখা যায়।

(২) **স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ ঃ** যেহেতু সমিতির সদস্যদের অধিকাংশই দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ সেইহেতু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সমিতিকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

(৩) **রাজনৈতিক প্রভাব ঃ** সমবায় সমিতি রাজনীতির প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই নিঃস্বার্থ পরিচালনায় রাজনৈতিক দলাদলি বাধার সৃষ্টি করে।

(৪) **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ঃ** প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধনের অভাব থাকায় সমবায় সমিতিকে সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশী মাত্রায় দেখা যায়। সরকারী আইনের জটিলতার প্রবেশের ফলে সমবায় সমিতির কাজকর্মে অহেতুক অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

(খ) **আর্থিক দিক সংক্রান্ত অসুবিধা ঃ**

(১) **সীমিত মূলধন ঃ** সদস্যদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হবার ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন জোগাড় করা সম্ভব হয় না। ফলে এই ধরনের কারবার বড় আকারের হতে পারে না।

(২) **বড় কারবারের সুবিধা না পাওয়া ঃ** সীমিত মূলধনের জন্য সমবায় সমিতি বড় কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) **ঋণের টাকা শোধে দেরি ঃ** সমবায় সমিতি যে সমস্ত সদস্যদের ঋণ দেয় তাদের বেশির ভাগই ঋণের টাকা সময়মত শোধ দেয় না। ফলে সমবায় সমিতির আর্থিক অবস্থা দুর্বল থেকে আরও দুর্বলতর হতে থাকে। স্বজনপোষণের জন্যই ঋণের টাকা পরিশোধে দেরি হয়ে থাকে।

(গ) **অন্যান্য অসুবিধা ঃ-**

(১) **কাজে অমনোযোগ ও উদ্যোগের অভাব ঃ** সমিতির জিনিসের চাহিদা নির্দিষ্ট থাকায় জোগানও নির্দিষ্ট। ফলে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না। জিনিস বিক্রির ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকার দরুণ কাজে ঢিলেঢালা মনোভাব দেখা যায়।

(২) **স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ ঃ** সমিতির সদস্যরা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে খুবই দুর্বল। ফলে কিছু সদস্যের বেপোরোয়া মনোভাবের জন্য সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা যায় ও ফলে সমিতির সার্বিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

কোম্পানী সংগঠন ও সমবায় সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর এখন এই দুই সংগঠনের তুনলামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। এই এককটির বর্তমান পর্বে আমরা তা আলোচনা করব ঃ

৭৭(খ).৮ কোম্পানী ও সমবায় কারবারের মধ্যে পার্থক্য

কোম্পানী ও সমবায় কারবারের মধ্যে পার্থক্যগুলো এইভাবে লেখা যায় ঃ—

পার্থক্যের বিষয়	কোম্পানী	সমবায় কারবার
(১) সংশ্লিষ্ট আইন	১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন।	১৯১২ সালের ভারতীয় সমবায় আইন।
(২) ন্যূনতম সদস্য	প্রাইভেট কোম্পানীর ক্ষেত্রে ২ জন ও পাবলিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৭ জন।	দশজন
(৩) সদস্যদের বিস্তৃতি	সারা পৃথিবী ব্যাপী	স্থানীয়
(৪) নিবন্ধন পদ্ধতি	জটিল	সরল
(৫) সাধারণ নীতি	(ক) প্রতিযোগিতার ভিত্তি	(ক) সহযোগিতার ভিত্তি

পার্থক্যের বিষয়	কোম্পানী	সমবায় কারবার
	(খ) কাজের ভিত্তিতে ঐক্য।	(খ) ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ।
	(গ) মুনাফা প্রধান	(গ) সেবাই প্রধান।
(৬) দায়	যৌথ মূলধনী কারবারের দায় সীমাবদ্ধ	সমবায় সমিতি সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত ও অসীমদায়যুক্ত দুইই হতে পারে।
(৭) ব্যবস্থাপনা	মুষ্টিমেয়তান্ত্রিক (Oligarchic)	গণতান্ত্রিক (Democratic)
(৮) ভোটাধিকার	শেয়ারের অনুপাতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়।	প্রত্যেক সদস্যের একটি মাত্র ভোট থাকে। শেয়ারের অনুপাতে ভোটাধিকার নির্দিষ্ট হয় না।
(৯) শেয়ার বিক্রি	জনসাধারণের যে কেউ শেয়ার কিনতে পারে।	সাধারণ সদস্যদের কাছেই শেয়ার বিক্রি করা হয়।
(১০) করের বোঝা	কোম্পানীকে তার আয়ের ওপর কর দিতে হয়।	এই ধরনের কারবার আয়কর, স্ট্যাম্প ফী ইত্যাদি থেকে রেহাই পেয়ে থাকে।
(১১) মূলধনের পরিমাণ	জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানী অনেক মূলধন জোগাড় করতে পারে।	মধ্যবিত্ত ও সাধারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্র সদস্যরা বেশি মূলধনের জোগাড় দিতে পারে না।
(১২) ভোটে প্রক্সির ব্যবহার	আছে	নেই।
(১৩) শেয়ারের হস্তান্তর যোগ্যতা	শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।	শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়।
(১৪) লাভের অংশ বণ্টন	লাভের অংশ প্রথমে প্রেফারেন্স শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় ও পরে অবশিষ্ট অংশ ইকুইটি শেয়ারহোল্ডাররা পেয়ে থাকে।	শেয়ারের ওপর সবচেয়ে বেশি শতকরা ১২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। লাভের কিছু অংশ সামাজিক কল্যাণ-মূলক কাজে ব্যয় করা হয়। মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় তহবিলে রাখা হয়। এছাড়াও জিনিস কেনার পরিমাণের ওপর বাট্টা দেওয়া হয়।

সমবায় বিভিন্ন দিক আলোচনা করার পর আমাদের জানা দরকার সমবায় সংগঠন ভারতে কি অবস্থায় আছে। তাদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এককটির এই পর্বে আলোচনা করব ঃ

৭৭(খ).৯ সমবায় কারবারের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

ভারতে সমবায় কারবারের বয়স প্রায় ৯০ বছর পার হল। ভারতে সমবায় আন্দোলন খুবই উঁচু আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শুরু হয়েছিল। ১৯০৪ সালে ভারতে সমবায় ঋণ সমিতি আইন পাশ হয় ও এই সময়কেই ভারতে সমবায় আন্দোলনের শুরু বলে ধরা হয়। হেনরি ডব্লিউ. উলফ্-এর মতে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের মতে এই পথ চলা ছিল দরিদ্র অবস্থা থেকে প্রাচুর্যের অবস্থার দিকে।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রুরাল সার্ভে কমিটি নিয়োগ করে ও এই কমিটি সমবায় কারবারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে অভিমত জানায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে সবপ্রকার সমবায় সমিতির মিলিত সংখ্যা ছিল ১,৮১,০০০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,৪০,০০০ ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে এর সংখ্যা ছিল ৩,৩২,০০০। ১৯৯৪-৯৫ সালের ভারত সরকারের কৃষি ও সমবায় বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, সেই সময় ভারতে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লাখ, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭৫ মিলিয়নের ওপর (১০ লাখে ১ মিলিয়ন) এবং চলতি মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭৬,০০০ কোটি টাকা। ভারতে সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে উচিতমূল্যের দোকান ছিল ৪,৬১,০৭৯টি যার মধ্যে ৯৬,৫৪০টি দোকান সমবায়ের অধীনে (প্রায় ২০.৯৪%)। এই সমবায়ের অধীনে দোকানের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় দোকানের সংখ্যা ৭৬,৭০৯টি (৭৯.৪৫%) ও শহরাঞ্চলে এর সংখ্যা ১৯,৮৩১টি (২০.৫৪%)। [সূত্র : ইণ্ডিয়া ২০০১ পৃ. : ৪৫৩]

ভারতে সমবায় কারবারের ধীরে বেড়ে চলার পেছনে কিছু কারণ আছে, যেমন ঃ

(১) আগে এই সমবায় আন্দোলন ছিল প্রধানত সরকারী প্রচেষ্টার ফল। ফলে সাধারণ মানুষ এতে বেশি উদ্যোগ নেয় নি।

(২) যদিও সাধারণ মানুষ এতে অংশ নিল, তাদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা কারবার চালানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

(৩) কারবারের সীমাহীন দায়বদ্ধতার ফলেও অনেকে এতে অংশগ্রহণ করতে চায় না।

(৪) সমিতির সদস্যরা সাধারণত কম শিক্ষিত হন। এই সদস্যদের মধ্যে থেকেই কারবার চালানোর জন্য পরিচালক নির্বাচিত করা হয়। ফলে কারবারের ব্যবস্থাপনাও নিম্নমানের হয়।

(৫) কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজনীতির অশুভ প্রভাব থাকায় সাধারণ মানুষ কারবারের দিকে আসার প্রেরণা পায় না।

(৬) সুদখোর মহাজনদের স্বার্থে ঘা পড়ার জন্য তারাও এই ধরনের আন্দোলনের বিকাশ যাতে না হয় তার চেষ্টা করেন।

এই আন্দোলন মজবুত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। সাধারণভাবে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে সেগুলো হল ঃ

(১) এই ধরনের কারবার কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়ে চলবে না। বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে এই কারবারের চলা উচিত।

(২) জনসাধারণের মনে এর উপকার সম্বন্ধে চেতনা জাগাতে হবে।

(৩) সব সময়ের জন্য মাইনে করা পরিচালক নিয়োগ করতে হবে।

(৪) সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিতে হবে।

(৫) সমিতির আকার বড় হতে হবে যাতে বেশি মাত্রায় মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

(৬) সদস্যদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৭) স্থানীয় সঞ্চয়কে উৎসাহ দিতে হবে ও সেই সঞ্চয়কে সমিতির কাজে লাগাতে হবে।

(৮) সদস্যরা যাতে সেবামূলক কাজের জন্য নিজের ইচ্ছায় আরও সময় দেয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৯) নিরপেক্ষ নিরীক্ষককে দিয়ে সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষা করাতে হবে।

(১০) সদস্যদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

বিভিন্ন সময়ে গঠন করা হয়েছে এমন বিভিন্ন কমিটি সমবায় সমিতির স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছে। ১৯৯১ সালে চৌধুরী ব্রহ্মপ্রকাশের সভাপতিত্বে যোজনা কমিশন যে কমিটি নিয়োগ করেন সেই কমিটি একটা মডেল সমবায় আইন রচনা করেন। সেই মডেল আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো এই রকম ঃ

(১) নিবন্ধকের ভূমিকাকে কেবলমাত্র নিবন্ধন, কারবার বন্ধ করা ও প্রয়োজন বিশেষে অনুসন্ধানের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।

(২) সমবায় সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য একজন সনদপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক (Chartered Accountant) নিয়োগ করতে হবে।

(৩) সাধারণ সদস্য ও সমিতির বোর্ড মেম্বারদের আরও বেশি পরিমরাণে দায়িত্ব নিতে হবে।

(৪) সদস্যদের থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

এছাড়াও (ক) সমবায় ঋণসমিতিগুলোকে বাজারে ভোটের অধিকার নেই এমন শেয়ার, ঋণপত্র, বণ্ড ইত্যাদি খোলা বাজারে বিক্রি করে সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল সমিতিগুলোকে হয় বন্ধ করে দিতে হবে বা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সমিতির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে।

(গ) সরকারের শেয়ারকে ১৫-২০ বছরে ফেরতযোগ্য ঋণে পরিবর্তন করতে হবে।

(ঘ) আর্থিক সংস্থাগুলো কেবলমাত্র যোগ্য সমিতিকেই অনুদান দেবে।

(ঙ) অর্থসংক্রান্ত লেনদেনে [যেমন তপশিলভুক্ত ব্যাঙ্কে আমানত জমা দেওয়া, প্রয়োজনে নিবন্ধকের প্রাথমিক অনুমতি ছাড়াই বাড়ি বা জমি কেনা ইত্যাদি] সমিতিগুলোকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

(চ) বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করার ব্যাপারে সমিতিকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

(ছ) জনস্বার্থে সমিতির পরিচালন কমিটিতে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

এই মডেল আইন সমবায় সমিতিকে স্বায়ত্তশাসন দেবার পক্ষে জোর সওয়াল করেছে। এই আইন চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা হল কেন্দ্রীয় সরকার এখনও এই আইন চালু করার ব্যাপারে নিজেরাই উদ্যোগ নেয়নি। কেবলমাত্র বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা তাদের সমবায় আইন সংশোধন করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ এই মডেল আইনের সমান্তরাল একটা আইন তৈরি করেছে ও চালু করেছে। তবে এর জন্য হায়দ্রাবাদের সমবায় উন্নয়ন সংস্থার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। ভি. কুরিয়েন, মোহন ধারিয়া ও এল. সি. জৈন কোঅপারেটিভ ইনশিয়েটিভ প্যানেলের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলোকে তাদের দৈন্যদশা থেকে বের করে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৭৭(খ).১০ সারাংশ

আমরা সমবায় কারবারের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানলাম। সমবায় আন্দোলনের মূল চিন্তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে। এছাড়া একতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি গুণের বিকাশ, এই ধরনের সমিতি গড়ে তুলতে গেলে ঘটে থাকে। কিন্তু সদস্যদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এছাড়া সার্বিকভাবে মূলধনের অভাব এই ধরনের সমিতির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমানে এই ধরনের সমিতিকে টিকে থাকতে হলে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭৭(খ).১১ অনুশীলনী

এতক্ষণ আপনারা সমবায় কারবার সম্বন্ধে জানলেন। এবার দেখুন তো আপনারা নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারেন কি না?

(১) কোনগুলো সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করুন ঃ

(ক) সমবায় সমিতি কেবলমাত্র লাভের উদ্দেশ্যেই গড়ে ওঠে।

(খ) সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে গেলে সবচেয়ে কম দশজন সদস্যের প্রয়োজন হয়।

(গ) সমবায় সমিতির শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

(ঘ) সমবায় সমিতিতে ভোটের অধিকার শেয়ার কেনার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে।

(ঙ) সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে গেলে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন মেনে চলতে হয়।

(চ) সমবায় সমিতি সদস্যদের কেবলমাত্র ঋণ দেয়।

(ছ) সমবায় সমিতির লাভ পুরোটাই সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

(২) নীচের প্রশ্নগুলোর খুব সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) সমবায় কাকে বলে?

(খ) সমবায় সমিতি কোন উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে?

(গ) সমবায় সমিতি কত প্রকারের হয়?

(ঘ) কোন ধরনের সমবায় সমিতি সদস্যদের ঋণ দেয়?

(ঙ) সমবায় সমিতিতে সদস্যদের দায়ের বিস্তৃতি কতটা?

(চ) সমবায় সমিতিতে শেয়ার কাদের বিক্রি করা যায়?

(ছ) সমবায় সমিতি লাভের কী পরিমাণ টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে থাকে?

(জ) সমবায় সমিতিকে তার আয়ের ওপর কত কর দিতে হয়?

(ঝ) সমবায় সমিতিতে ভোটে প্রক্সির ব্যবহার আছে কি?

(ঞ) সমবায় সমিতির উপবিধিতে (Bye Laws) উল্লেখ আছে এমন চারটি বিষয়ের নাম লিখুন।

(ট) সমবায় সমিতির ধীরে গড়ে ওঠার কারণ কী? যে কোনও চারটি কারণ লিখুন।

(ঠ) সমবায় সমিতির অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও অসুবিধা আছে কি? থাকলে যে কোনও দুটি লিখুন।

(৩) নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

(ক) সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(খ) সমবায় সমিতি ও কোম্পানীর মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কী?

পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করে যে কোনও ছয়টি পার্থক্য লিখুন।

(গ) সমবায় সমিতি গঠন করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

(ঘ) সমবায় সমিতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

(ঙ) বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার পেছনে কারণগুলো আলোচনা করুন।

(চ) সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

(৪) সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৭৭(খ).১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Y. K. Bhusan-*'Fundamentals of Business Organisation and Management'* (Sultan Chand & Sons)

২। M.C. Shukla—*'Business Organisation and Management'* (S. Chand & Company Ltd.)

৩। ড. চিত্তরঞ্জন বসু — *'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা'* (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)

৪। গুহ-মুখার্জ্জী—*'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার নীতি'* (নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

৫। পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়—'কারবার সংগঠন' (দে বুক কনসার্ন)

একক ৭৮(গ) ❑ যৌথক্ষেত্র

গঠন

৭৮(গ).০ উদ্দেশ্য
৭৮(গ).১ প্রস্তাবনা
৭৮(গ).২ যৌথক্ষেত্রের অর্থ—উদাহরণ
৭৮(গ).৩ যৌথক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য
৭৮(গ).৪ যৌথক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ
৭৮(গ).৫ যৌথক্ষেত্রের কার্যক্ষেত্র
৭৮(গ).৬ যৌথক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতি
৭৮(গ).৭ সারাংশ
৭৮(গ).৮ অনুশীলনী
৭৮(গ).৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮(গ).০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনারা নীচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ও আলোচনা করতে সমর্থ হবেন ঃ—

- যৌথক্ষেত্র বলতে আমরা কী বুঝি?
- কয়েকটি যৌথক্ষেত্রের উদাহরণ।
- যৌথক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য।
- যৌথক্ষেত্র কীভাবে গড়ে উঠল?
- যৌথক্ষেত্রের কার্যক্ষেত্র।
- যৌথক্ষেত্র কেন প্রয়োজনীয়?
- যৌথক্ষেত্র সম্বন্ধে সরকারী নীতি কী?

৭৮(গ).১ প্রস্তাবনা

আমাদের দেশে কারবারের তিন ধরনের রূপ দেখতে পাই। যেমন সরকারী কারবার, বেসরকারী কারবার ও যৌথ কারবার। সরকারী কারবার বলতে আমরা সেই ধরনের কারবারকেই বুঝি যেখানে অর্থের জোগান ও পরিচালনার ভার সরকারের হাতে থাকে। আবার বেসরকারী কারবারে এই অর্থের জোগান পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা থাকে বেসরকারী হাতে। অর্থাৎ এতে সরকারের কোনও রকম ভূমিকা থাকে না। এই সরকারী ও বেসরকারী দুই ধরনের কারবারেই বিশেষত পরিচালনা ও অর্থের জোগানের ক্ষেত্রে নানা রকম অসুবিধা দেখা যায়। এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই যৌথক্ষেত্রের সূচনা হল।

সাধারণ ভাষায় যৌথক্ষেত্র হল বেসরকারী ক্ষেত্র ও সরকারের মধ্যে এক অংশীদারী কারবার।

৭৮(গ).২ যৌথক্ষেত্রের অর্থ—উদাহরণ

যৌথ কারবারের অর্থ বুঝতে হলে আমাদের দত্ত কমিটি ও মাননীয় শিল্পপতি জে. আর. ডি. টাটার যৌথ কারবারের বিষয়ে মতামত আলোচনা করতে হবে।

দত্ত কমিটি তার রিপোর্টে প্রথম 'যৌথক্ষেত্র' কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং যৌথ সম্বন্ধে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ঃ

(১) বর্তমানে বেসরকারী মালিকানায় যে সমস্ত বড় বড় শিল্প রয়েছে তাদের ঋণকে ইকুইটিতে পাল্টে যৌথক্ষেত্রের রূপ দিতে হবে। এই ঋণকে ইকুইটিতে রূপ পরিবর্তন করার দায়িত্ব থাকবে সার্বজনিক আর্থিক সংস্থার হাতে। এর ফলে সংস্থাগুলোকে আর বেসরকারী ক্ষেত্রের সংস্থা না বলে যৌথক্ষেত্রের সংস্থা বলা যাবে।

(২) সেই ক্ষেত্রের শিল্পগুলোকেই যৌথক্ষেত্রের শিল্প বলা যাবে যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয়েরই বিনিয়োগ রয়েছে এবং রাষ্ট্র তার পরিচালনায় স্বয়ংক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

(৩) 'খ' 'গ' তালিকাভুক্ত বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের যৌথক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই ধরনের শিল্পকে আমরা সার্বজনিক ক্ষেত্রের বলেই মনে করব যেখানে বেসরকারী অংশগ্রহণও থাকবে।

দত্ত কমিটির সুপারিশগুলো কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

শিল্পপতি জে. আর. ডি. টাটা যৌথক্ষেত্রের একটা অন্তত গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে,

(১) যৌথক্ষেত্র হবে বেসরকারী ক্ষেত্র ও সরকারের মধ্যে একটা অংশীদারী কারবার।

(২) সরকারের শেয়ার ২৬ শতাংশের কম হবে না।

(৩) দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার ভার থাকবে বেসরকারী ক্ষেত্রের হাতে।

(৪) এই কাজকর্ম পরিচালনা করবে এক পরিচালকমণ্ডলী যেখানে সরকার যথাযথ পরিমাণে তার মনোনীত সদস্য রাখবেন।

যৌথক্ষেত্রের উদাহরণ ঃ আমাদের ভারতবর্ষে যৌথক্ষেত্রে যে সমস্ত কারবার পরিচালনা করা হয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল ঃ কোচিন রিফাইনারিস, গুজরাট স্টেট ফার্টিলাইজার কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিমিটেড, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি।

যৌথক্ষেত্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রধানত নীচে লেখা কারণগুলোর জন্যই যৌথক্ষেত্রের উত্থান হয়েছিল ঃ

(ক) বেসরকারী ও সরকারী কারবারের ব্যর্থতা।

(খ) অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের পরিমিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার।

(গ) বেসরকারী ও সরকারী কারবারের মিলিত শক্তির ব্যবহার।

(ঘ) আয় ও সম্পদের পরিমিত ও সুষ্ঠু বণ্টন।

(ঙ) শিল্পের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

(চ) বড়ধরনের উদ্যোগের সম্ভাবনা।

(ছ) শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার প্রকৃত ব্যবহার ইত্যাদি।

৭৮(গ).৩ যৌথক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য কারবারী ক্ষেত্রের মত যৌথক্ষেত্রেরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেইগুলোকে এইভাবে আলোচনা করা হল ঃ

(ক) **যৌথ মালিকানা ঃ** যৌথক্ষেত্রের মালিকানা যৌথ। এই মালিকানা যৌথভাবে বেসরকারী ও সরকারী ক্ষেত্রের।

(খ) **মূলধন বিভিন্ন পক্ষের অংশ ঃ** এই ব্যাপারে কোনো স্থির নীতি নেই। দত্ত কমিটি এই ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার চিত্র দেয় নি। কিন্তু টাটা স্মারকলিপি যৌথক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণের একটা সীমারেখা বেঁধে দেয়। তাতে বলা হয় যে যৌথক্ষেত্রে সরকারের অংশ হবে ৫১ শতাংশ। কিন্তু যেখানে সরকার অধিকাংশ মূলধন সরবরাহ করবে সেখানে সরকারের বাকি বিনিয়োগ হবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনের ২৬ শতাংশ দেবে সরকার, ২৫ শতাংশ দেবে কোম্পানীর অন্য অংশীদার ও বাকি ৪৯ শতাংশ দেবে জনগণ।

(গ) **ব্যবস্থাপনার ধরন ঃ** যৌথক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় দুই ধরনের কাজ দেখা যায় ঃ

— সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ ও

— দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা।

সাধারণত পরিচালকমণ্ডলী এই সিদ্ধন্ত গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার ভার থাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ওপর।

(ঘ) **অনুমতি ঃ** যৌথক্ষেত্র গড়ে তুলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে। এই অনুমতি গ্রহণ অতি আবশ্যক হয়ে পড়ে যদি বেসরকারী উদ্যোগ কোনো বড় শিল্পপতি বা বিদেশী বড় কোম্পানী হয়।

(ঙ) **সামাজিক দায়িত্ব পালন ঃ** কেবলমাত্র বেসরকারী হাতে কারবারের রাশ না দিয়ে সরকার নিজে বেসরকারী সংস্থার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কারবার পরিচালনায় সম্মত হবার দরুন কারবার সামাজিক দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনে সক্ষম হচ্ছে।

এখন আমরা যৌথক্ষেত্রের বিকাশ সম্বন্ধে এই এককটির এই পর্বে আলোচনা করব ঃ

৭৮(গ).৪ যৌথক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ

দেশ স্বাধীন হবার আগে মহীশূর ও হায়দ্রাবাদে জনগণের সহযোগিতায় কিছু শিল্প গড়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার ঠিক পরেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও টাটার মিলিত সহযোগিতায় এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গড়ে ওঠে।

এই সমস্ত উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে ভারতে স্বাধীনতার আগে ও পরে যৌথক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতে যৌথক্ষেত্রের প্রাণ নিহিত ছিল মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেল। আসলে এক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ স্থাপনের লক্ষ্যেই এই ধরনের শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই শিল্পনীতিতে শিল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল যাতে রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা সঠিকভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। এই তিনটি ভাগ হল ঃ

(১) **'ক' বিভাগের অধীনে শিল্প ঃ** এখানে সেইসব শিল্পকেই রাখা হল যার দায়িত্ব পুরোপুরি রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। এই বিভাগের অধীনে মোট ১৭টি শিল্পকে রাখা হয়েছিল।

(২) **'খ' বিভাগের অধীনে শিল্প ঃ** এখানে সেইসব শিল্পকে রাখা হল যা রাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী উদ্যোগকেও স্থান দেওয়া হবে। এখানে মোট ১২টি শিল্পকে স্থান দেওয়া হল।

(৩) **'গ' বিভাগের অধীনে শিল্প ঃ** এখানে বাদবাকি সেই সব শিল্পকে রাখা হল যা বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হবে।

এই শিল্পনীতি ঘোষণা হবার পর ভারত সরকার বেসরকারী সহযোগিতায় কিছু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ ফার্টিলাইজার, ১৯৬৩ সালে কোচিন রিফাইনারিস্, ১৯৬৫ সালে গুজরাট স্টেট ফার্টিলাইজার কোম্পানী ইত্যাদি। এই সব প্রতিষ্ঠানেই কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জনগণ ও বিদেশী কোম্পানীর মালিকানার অংশ বিভিন্ন রকম ছিল। যেমন, ১৯৫৬ সালে যে মাদ্রাজ ফার্টিলাইজার গড়ে ওঠে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ ছিল ৫১ শতাংশ এবং সহযোগী বিদেশী কোম্পানীর অংশ ছিল ৪৯ শতাংশ।

এর পর ১৯৬৯ সালে সুবিমল দত্তর সভাপতিত্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেনসিং পলিসি ইনকোয়ারি কমিটি (যা দত্ত কমিটি নামেই অধিক পরিচিত) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির অনুসরণে যৌথক্ষেত্রের সুপারিশ করে। দত্ত কমিটির মতে একমাত্র যৌথক্ষেত্রের মাধ্যমেই বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে যে অর্থ ও ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার আছে তা খর্ব করা যেতে পারে।

জে. আর. ডি. টাটা যৌথক্ষেত্রের একটা গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

দত্ত কমিটি ও টাটার যৌথক্ষেত্রের ধারণার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দত্ত কমিটির মতে যৌথক্ষেত্রে সরকারী অধিকার বেশি থাকা উচিত কিন্তু টাটার মতে যৌথক্ষেত্রে বেসরকারী অধিকারই বেশি থাকা উচিত।

যাই হোক না কেন ভারতের মতে মিশ্র অর্থনীতিতে যৌথক্ষেত্রের সূচনা অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে। যৌথক্ষেত্রের আদর্শ মিশ্র অর্থনীতির আদর্শেরই এক প্রতিফলন। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট এক সমাজকেই আমরা দেখতে পাই।

৭৮(গ).৫ যৌথক্ষেত্রের কার্যক্ষেত্র

কোনও কোনও ক্ষেত্রে যৌথক্ষেত্রের সূচনা ফলপ্রসূ হবে তা মোটামুটিভাবে আমরা আগের আলোচনা থেকে জেনেছি। সহজ কথায় বলতে গেলে যৌথক্ষেত্র হল সরকার ও বেসরকারী ক্ষেত্রের এক অংশীদারী কারবার।

যেখানে সরকারী মূলধনের জোগান কম সেখানে বেসরকারী সহযোগিতা অবশ্যই গ্রহণ করা যেতে পারে। আবার যেখানে দক্ষতা সরকারের তুলনায় বেসরকারী ক্ষেত্রের বেশি সেখানেও বেসরকারী সহযোগিতা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেখানে দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন সেখানে নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সাধারণত যে সমস্ত ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ কার্যকরী হতে পারে তা হল ঃ মেশিন টুলস, ফার্টিলাইজার, স্থলপথ পরিবহণ, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, ইলেকট্রনিক্স, পেট্রোকেমিক্যালস ইত্যাদি।

৭৮(গ).৬ যৌথক্ষেত্র সম্পর্কে সরকারী নীতি

প্রকৃতপক্ষে হাজারী কমিটি রিপোর্ট-এর পর শ্রী সুবিমল দত্তর সভাপতিত্বে ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে শিল্প লাইসেন্স প্রথা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে। এই কমিটিই প্রথম যৌথক্ষেত্রের সুচনার কথা বলে।

এই যৌথক্ষেত্রের স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সাধারণ নীতি মেনে চলতে হবে সেগুলি হল ঃ

(ক) যৌথক্ষেত্র গঠনের সময় সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

(খ) যৌথক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্য সেইসব শিল্পকে বাছতে হবে যেখানে বেসরকারী ক্ষেত্র চলতি নীতি অনুযায়ী প্রবেশ করতে পারে না।

(গ) নতুন ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এই যৌথক্ষেত্র একটি এগিয়ে চলার মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকার যৌথক্ষেত্রের কারবারের নীতি নির্ধারণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা—ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করবে।

যে সমস্ত যৌথ কর্ম-পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার ও রাজ্য উন্নয়ন সংস্থা বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন। যেমন ঃ—

(১) যে যৌথ উদ্যোগ বা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তাতে বেসরকারী সংস্থা যদি বড় শিল্পগোষ্ঠী বা বিদেশের কোনও বড় সংস্থা—এদের কেউ হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রথমে অনুমতি নিতে হবে।

(২) যদি যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদেশী কোনও সংস্থা অংশগ্রহণ করে সেখানে মূলধনের ২৫ শতাংশ সরবরাহ করবে রাজ্য সরকার বা রাজ্য সংস্থা, ২০ শতাংশ সরবরাহ করবে ভারতীয় উদ্যোক্তা ও বিদেশী বিনিয়োগকারী ও সাধারণ জনগণ ৩৫ শতাংশ সরবরাহ করবে।

(৩) যদি যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদেশী কোনও সংস্থা অংশগ্রহণ করবে না সেখানে প্রয়োজনীয় মূলধনের ২৬ শতাংশ বহন করবে রাজ্য সরকার বা রাজ্যের শিল্প উন্নয়নমূলক সংস্থা, ২৫ শতাংশ বহন করবে বেসরকারী উদ্যোক্তা, ৪৯ শতাংশ বহন করবে সাধারণ জনগণ ও অর্থলগ্নীকারী সংস্থা।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না নিয়ে যৌথক্ষেত্রের কোনও একজন অংশীদার মোট আদায়ীকৃত মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশী সরবরাহ করতে পারবে না।

৭৮(গ). সারাংশ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, যৌথক্ষেত্রের—মালিকানা—সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উভয়ের, পরিচালনার ভার—প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগের, কোনও কাজের জন্য জবাবদিহি করার দায়িত্ব—সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উভয়েরই। অর্থাৎ একথা ঠিক যে যৌথ উদ্যোগ হল সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের একটি অংশীদারী ব্যবসা। ভারতের মতো এক মিশ্র অর্থনীতির দেশে যৌথ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। পুরোপুরি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও পুরোপুরি মুক্ত অর্থনীতি—এদের মাঝামাঝি এক অবস্থান হল যৌথক্ষেত্র। সরকারী ও বেসরকারী কারবারের ব্যর্থতার বিকল্প রূপেই যৌথক্ষেত্রের জন্ম। এই যৌথক্ষেত্রের দ্বারাই সরকারী ও বেসরকারী কারবারের মিলিত শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের পরিমিত ও সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব। কেবলমাত্র এই ভাবেই শিল্পের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৭৮(গ).৮ অনুশীলনী

এতক্ষণ আপনারা যৌথক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানলেন। এবারে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করুন ঃ

(১) (ক) ভারতবর্ষে যৌথক্ষেত্রের ধারণার সূচনা কবে হয়?
(খ) যৌথক্ষেত্র কি আদৌ প্রয়োজনীয়?
(গ) যৌথক্ষেত্রের কারবারের সরকারের ভূমিকা কী?
(ঘ) দুইটি যৌথক্ষেত্রের কারবারের উদাহরণ দিন।
(ঙ) যে কোনও কারবারের ক্ষেত্রেই কি যৌথ পরিচালনা কাম্য?

(২) যৌথক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) ভারতবর্ষে যৌথক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ আলোচনা করুন।

(৪) যৌথক্ষেত্র সম্বন্ধে সরকারী নীতি আলোচনা করুন।

৭৮(গ). গ্রন্থপঞ্জী

১। S. A. Sherlekar & V. S. Sherlekar—*'Business Organisation and Management—* Systems Approach' (Himalaya Publishing House)

২। ড. চিত্তরঞ্জন বসু—'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা' (এ. কে. সরকার এণ্ড কোং)

৩। গুহ-মুখার্জী—'কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার নীতি' (নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

৪। নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—'কারবার সংগঠন' (মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড)

৫। Ruddar Datt and K. P. M. Sundharam—*'Indian Economy'* (S. Chand & Co. Ltd.)

একক ৭৯ ❑ কারবার সংগঠন

গঠন

৭৯.০ উদ্দেশ্য

৭৯.১ প্রস্তাবনা

৭৯.২ সংগঠনের প্রকৃতি

৭৯.৩ কারবারী সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

- ৭৯.৩.১ একমালিকী কারবার
- ৭৯.৩.২ অংশীদারী কারবার
- ৭৯.৩.৩ হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার
- ৭৯.৩.৪ যৌথ মূলধনী কারবার
- ৭৯.৩.৫ সমবায় সমিতি
- ৭৯.৩.৬ রাষ্ট্রীয় কারবার

৭৯.৪ কারবারী সংগঠনের আর্থিক কার্যক্ষেত্র

- ৭৯.৪.১ উৎপাদন বা সৃজন-শিল্প সংক্রান্ত কার্যক্ষেত্র
- ৭৯.৪.২ বিপণন সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ
- ৭৯.৪.৩ আর্থিক কার্যক্ষেত্র
- ৭৯.৪.৪ কারবারী কার্যক্ষেত্র

৭৯.৫ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

৭৯.৬ সারাংশ

৭৯.৭ অনুশীলনী

৭৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল কারবার সংগঠন সম্বন্ধীয় অর্থাৎ কারবার সংগঠনের প্রকৃতি, বিভিন্ন রূপ, আর্থিক কার্যক্ষেত্রাবলী এবং তাদের বিভিন্ন সুবিধা, অসুবিধা, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করা।

৭৯.১ প্রস্তাবনা

মানুষ সামাজিক জীব। আদিম কাল থেকে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন তিনটি। (১) খাদ্য ও পানীয়, (২) বস্ত্র ও (৩) বাসস্থান। এক কথায় বলা যায় এই সব প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্যই নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কারবারের উৎপত্তি। সুতরাং কারবার সমাজের মধ্যে অবস্থিত এবং সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমাদের প্রথম পুস্তকে কারবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তন কিভাবে ঘটেছে তা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। মানব সভ্যতার একেবারে গোড়ার স্তরে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনওরকম অস্তিত্ব ছিল না। আদিম মানুষ ছিল

অনেকাংশে আত্মনির্ভর। খাদ্য-সংগ্রহ থেকে বাসস্থানের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করত। অর্থাৎ পণ্যের জন্য অন্যের উপর তারা নির্ভরশীল ছিল না। যা কিছু প্রয়োজন প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করত।

মানব সভ্যতা ক্রমবিবর্তিত হতে থাকলে মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ জটিল হতে থাকে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পণ্যের জন্য মানুষের অভাববোধ ঘটতে থাকে। ক্রমে বিনিময় প্রথা চালু হয়। মহেঞ্জোদারো হরপ্পা সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে টাইগ্রীস, ইউফ্রেটিস্ নদীর অববাহিকায় এবং মিশরের যে সভ্যতাগুলি গড়ে ওঠে সব জায়গায় আমরা বিনিময় প্রথা দেখতে পাই। এই বিনিময় প্রথা, জীবন-যাত্রা যখন জটিল থেকে জটিলতর হয় কিছু সমস্যার চাপে পড়ে অচল হয়ে পড়ে। ক্রমে মুদ্রার প্রচলন হয়। মানুষ বিনিময় প্রথা বন্ধ করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে 'মুদ্রা'-কে গ্রহণ করে। মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পর ক্রেতা ও উৎপাদকের কিছু কিছু অসুবিধা দূর হয়। প্রাচীনকালে ধাতুর মুদ্রা ক্রমশ জায়গা দেয় বর্তমানে কাগজের মুদ্রাকে।

এই পুস্তকে বিভিন্ন এককে কারবার সংগঠনের প্রকৃতি ও বিভিন্ন রূপ কারবারি জোট-বন্ধন এবং ক্ষুদ্র শিল্প আলোচিত হয়েছে। পাঠকগণের সুবিধার্থে অনুশীলনীগুলি বিষয়মুখী প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অন্তত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বিষয়গুলি এমনভাবে সংযোজন করা হয়েছে যাতে তাঁরা এই পুস্তক-পাঠের মাধ্যমে নিজ নিজ অনুসন্ধানের জবাব পেয়ে যেতে পারেন। যাঁদের জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হলো তাঁরা যদি কিছুমাত্র উপকৃত হন তাহলে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হল বলে মনে করব।

৭৯.২ সংগঠনের প্রকৃতি

সংগঠন শব্দের ভাষাগত অর্থ হল সম্যকরূপে গঠন। অর্থনীতিবিদদের মতে সংগঠন উৎপাদনের প্রধান চারটি উপাদানের অন্যতম। কিন্তু কারবারীদের মতে ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকেই সংগঠন বলা হয়।

সংগঠনের প্রকৃতি :

সংগঠন কারবারের কাঠামো ও ভিত্তি সংগঠন : বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন কর্তব্য ও বিভিন্ন কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একটি বেড়াজাল সৃষ্টি করে। এতে সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণে একটা সুসংহত দলগত উদ্যোগ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য যে পন্থা বা উপায়ের সাহায্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বেশি কার্যকর হয় সংগঠন সেই পন্থা বা উপায়। সংগঠন বিভিন্ন ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের মধ্যে কাজ নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে। এর ফলে কোনও প্রতিষ্ঠানের কাজ ধারাবাহিকভাবে নিশ্চয়তা ও দ্রুততার সাথে সম্পাদিত হয়। সংগঠন এমন এক কাঠামো সরবরাহ করে যার সাহায্যে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রকার কার্য (পরিকল্পনা, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ) সম্পাদিত হয় এবং এই কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-পূরণ সম্ভবপর হয়। অর্থাৎ সংগঠন এমন এক ভিত্তি তৈরি করে যার ওপর ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাঠামো গড়ে ওঠে। এই ভিত্তি গড়ে না উঠলে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজগুলি (সম্পাদনা, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ) সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হত না।

সংগঠন উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক : কোনও প্রতিষ্ঠানের কাজ উদ্দেশ্য থেকেই স্থির করা হয় এবং সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই কাজগুলি পরিচালনা করা হয়। সংগঠন এই সকল কাজগুলিকে সুসংহত ও সমন্বিত করে, একটি

সামগ্রিক কাজে পরিণত করে। এই যোগসূত্র সংগঠন স্থাপন করে সাংগঠনিক কাঠামোর কর্তৃত্ব সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। সংগঠন দুই বা ততোধিক সমান্তরাল বিভাগের মধ্যে অনুভূমিক সম্পর্ক এবং কোনও বিভাগের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উল্লম্ব সম্পর্ক স্থাপন করে কোনও প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো সুসংহত করে। এর ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলি সহজেই পূরণ হয়।

সংগঠন সামগ্রিক কাজকে বিভিন্ন এককে ভাগ করে : সংগঠন কারবারের বিভিন্ন কাজকে ভাগ করে এবং সেই ভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কারবারের কাজগুলিকে প্রথমে বিভিন্ন এককে এবং এই এককগুলিকে বিভিন্ন উপ-এককে ভাগ করা হয়। কারবারের এইরূপ কাজগুলিকে বিভিন্ন একক ও উপ-এককে ভাগ করে দেওয়ার পিছনে কিছু কারণ আছে। সেই কারণগুলি :

(i) একটি কারবারের আয়তন হয় বিশাল। ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিমাণও হয় বিশাল। দু-একজন বা কয়েকজনের দ্বারা সমগ্র কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সামগ্রিক কাজগুলিকে বিভিন্ন এককে ভাগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়।

(ii) একজন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার কাজে সিদ্ধহস্ত হন না। কেউ ব্যবস্থাপনার কাজে সিদ্ধহস্ত হন, কেউ বা নিয়ন্ত্রণের কাজে আবার কেউ বা পরিকল্পনার কাজে। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ায় বিশেষায়ণের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজগুলিকে ভাগ করলে কর্মীপূরণের কাজটিও বাস্তবমুখী হয়।

(iii) একজনের ওপর সমগ্র ভার অর্পণ না করে অনেকের ওপর তা ছড়িয়ে দিলে কাজটি দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

(iv) কারবারের কাজগুলিকে ভাগ করে দেওয়ায় কোন্ কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তা ধারণা করা যায়। এর ফলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে একটি এককের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করে দায়িত্ববান ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার সুবিধা হয়। আর প্রয়োজনমতো কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে বিভিন্ন উপএককে ভাগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা হয়।

মানবিক সংগঠন : সংগঠন যে কেবলমাত্র কাঠামোগত কার্য (যেমন—কাজ বণ্টন, উদ্দেশ্য পূরণ) করে তা নয়, বিভিন্ন প্রকার মানবিক কার্যাবলীও করে। সংগঠন শ্রমিক-কর্মীদের মনোভাব, আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ ও অপছন্দ, কারবারী সংস্থাকে উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল সংস্থা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগঠন কর্মীদের কর্তব্য-জ্ঞান বাড়ায় ও উৎসাহ জোগায়, না হলে কারবার একটি শ্বাসরোধকারী অবস্থায় পরিণত হত। বিভিন্ন কাজের বিভাজন, ব্যক্তিগত কর্তব্যের বণ্টন, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান প্রভৃতি করতে সংগঠন সাহায্য করে।

এইভাবে সংগঠন কোনও কারবারকে সাংগঠনিক এবং মানবিক কাঠামো দান করে। সেইজন্য আধুনিক কালে বস্তুগত উপাদানগুলি যেমন, কাঁচামাল, অর্থ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোয় যেভাবে গুরুত্ব পায়, মানবিক উপাদান তার থেকে কম গুরুত্ব পায় না। এই মানবিক উপাদানই হল সাংগঠনিক কাঠামোর মূল বিষয়বস্তু। এই উপাদানগুলি না থাকলে কোনও কারবার কখনোই সুষ্ঠভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

৭৯.৩ কারবারী সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

কোনও দেশের কারবারী ক্ষেত্র দু-প্রকারের। বেসরকারি কারবারী ক্ষেত্র এবং সরকারি কারবারী ক্ষেত্র। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করে যে কারবারী সম্প্রদায় গঠিত হয় তাকে বেসরকারি কারবারী ক্ষেত্র বলে। এই ধরনের কারবারী ক্ষেত্র ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের জন্য গঠিত হয়।

অনেক কারবারের মালিকানা সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও সরকার কর্তৃক বা রাষ্ট্রীয় সংস্থা কর্তৃক অধিকৃত ও পরিচালিত হতে পারে। এইরূপ কারবারী সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে যে কারবারী ক্ষেত্র গড়ে তোলে তাকে সরকারি কারবারী ক্ষেত্র বলে। এই জাতীয় কারবারী ক্ষেত্র জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়।

বেসরকারি কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকারের। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকের সংখ্যা, ব্যবস্থাপনার ও পরিচালনার দায়-দায়িত্ব, ব্যবসায়ে মূলধন জোগান, ব্যবসায়ের মুনাফায় অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপ স্থির করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত প্রকারের হয়।

(ক) একমালিকী কারবার

(খ) অংশীদারী কারবার

(গ) হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার

(ঘ) যৌথ মূলধনী কারবার

(ঙ) সমবায় সমিতি

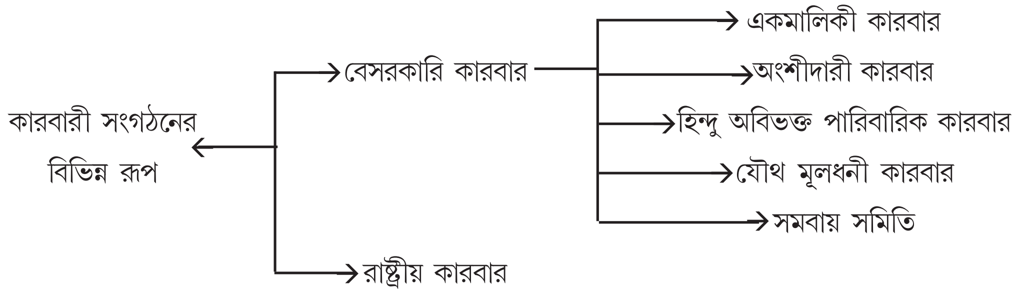

৭৯.৩.১ একমালিকী কারবার

এই জাতীয় কারবার একজন মালিকের অধিকারাধীন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মুনাফা মালিকের। প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব একা মালিককেই বহন করতে হয়। দায়-দায়িত্বের পরিমাণ হয় সীমাহীন। আজ পৃথিবীর সব দেশেই এই জাতীয় কারবারী প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। তবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এই জাতীয় কারবারের প্রচলন সর্বাধিক।

(i) **একমালিকী কারবারের বৈশিষ্ট্য :**

(১) **ব্যক্তিগত মালিকানা :** এই কারবারের একজন মাত্র মালিক থাকে।

(২) **একক নিয়ন্ত্রণ :** ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি মালিক নিজেই স্থির করে এবং পরিচালনা কেবলমাত্র তার হাতেই থাকে।

(৩) **মুনাফা ও ক্ষতি :** কারবারে মুনাফা হলে তার একমাত্র আধিকারী হল মালিক। আবার কারবারে লোকসান হলে তার সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয় মালিককেই।

(৪) **অসীম দায় :** এই ব্যবসায়ের মালিকের দায় অসীম। এর অর্থ, ব্যবসায়ের সম্পত্তির পরিমাণ যদি ব্যবসায়ের দায়ের তুলনায় অপ্রতুল হয় তখন মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে পাওনাদারদের অর্থ পরিশোধ করতে হয়।

(৫) **ব্যক্তিগত মনোযোগ :** একমালিকী কারবারে মালিক ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিকে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন এবং তাতে ব্যবসা দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয়।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **গঠনে সুবিধা :** একমালিকী কারবার গঠন-পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ কারণ এই কারবার গঠনে কোনরকম আইন-কানুন মেনে চলতে হয় না।

(২) **কর্মচারী ও ক্রেতার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক :** এই জাতীয় কারবারে মালিক নিজেই কারবার পরিচালনা করে, ফলে কর্মচারী ও ক্রেতাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে। ক্রেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে বলে ক্রেতার রুচি, পছন্দ প্রভৃতি অনুযায়ী দ্রব্য তৈরি ও সরবরাহ করতে সুবিধা হয়।

(৩) **নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা :** একক মালিকানা থাকায় এই জাতীয় কারবারে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা চূড়ান্ত। অন্যের সাথে আলোচনা প্রয়োজন নয়, তাই সহজেই যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

(৪) **মুনাফা বৃদ্ধি :** কারবারের সম্পূর্ণ মুনাফা মালিক একাই ভোগ করে বলে, সযত্নে কারবার পরিচালনা করে মালিক মুনাফা বৃদ্ধি চেষ্টা করে।

(৫) **বিরোধ কম :** এই কারবারে মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় কর্মচারীদের অভাব অভিযোগ সহজেই মেটানো সম্ভব হয়। এতে মালিক শ্রমিকের বিরোধের সম্ভাবনা কমে যায়।

(৬) সামাজিক দিক থেকে সুবিধা :

(ক) এটি স্বাধীন জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।

(খ) এটি কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি করে বেকারত্ব দূর করতে সাহায্য করে।

(গ) এটি ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের প্রেরণা জোগায় এবং মূলধনের সৃষ্টি করে।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **সীমিত মূলধন :** মালিক একজন হওয়ায় অনেক সময়ই বৃহৎ শিল্পের অনুরূপ মূলধন সংগ্রহ করতে মালিকের অসুবিধা হয়। ফলে কারবারের সম্প্রসারণ ঘটে না।

(২) **অসীম দায় :** এই জাতীয় কারবারের মালিকের দায় অসীম।

(৩) **ধারাবাহিকভাবে অভাব :** যদি মালিক অসুস্থ হয়ে পড়েন অথবা কিছুদিনের জন্য বাইরে থাকেন তবে তাঁর ব্যবসা বন্ধ থাকায় ধারাবাহিকতার অভাব দেখা দেয়।

(৪) **অনুপযুক্ত উত্তরাধিকারী :** এই জাতীয় কারবার একক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় গড়ে ওঠে। উত্তরাধিকারী অনুরূপ দক্ষ বা অভিজ্ঞ নাও হতে পারে। ফলে ব্যবসার ক্ষতিসাধন ও লোকসান হতে পারে।

(৫) **একাধিক কারবার :** যদি একই মালিকের একাধিক কারবার থাকে এবং সেগুলি নিজ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে তাহলে একটিতে কোনরূপ বিপর্যয় ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যগুলোর ওপরও পড়বে। এতে কারবারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একমালিকী কারবারের যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে। কিন্তু সকল প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও যদি কারবারের মালিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে অসুবিধাগুলির মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে একমালিকী কারবারই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কারবারে পরিণত হবে। মালিক যদি কর্মচারী ও ক্রেতাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে, তাহলে একমালিকী কারবার সাফল্য লাভ করবে।

(iv) **প্রযোজ্যতা :** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে একমালিকী কারবার প্রযোজ্য :

(১) যে ক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা কম এবং একজন ব্যক্তির পরিচালন-ক্ষমতাই যথেষ্ট। যেমন—মুদির দোকান, চায়ের দোকান প্রভৃতি।

(২) যেখানে প্রতিটি খরিদ্দারের ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—বিশেষ ধরনের আসবাবপত্র তৈরি, শৌখিন জামা-কাপড় তৈরি ইত্যাদি।

(৩) যে ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা ক্ষণস্থায়ী। যেমন—শাক-সবজী বা ফলের স্থানীয় অথবা মরশুমি চাহিদা।

৭৯.৩.২ অংশীদারী কারবার

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সকলের বা সকলের পক্ষে যে কোনও একজনের দ্বারা পরিচালিত কোনও কারবার স্থাপন করলে, সেই কারবারকে অংশীদারী কারবার বলে। অংশীদারী কারবারে ন্যূনতম ২ জন অংশীদারের প্রয়োজন। ব্যবসা করবার উদ্দেশ্যে এইরূপ কারবার গঠিত হয় এবং কারবারের মুনাফায় সকলে অংশগ্রহণ করে। যে সকল ব্যক্তি একত্রিত হয়ে অংশীদারী কারবার গঠন করে তাদের ব্যক্তিগতভাবে অংশীদার বলে এবং কারবারী প্রতিষ্ঠানকে অংশীদারী কারবার বলে।

(i) **অংশীদারী কারবারের বৈশিষ্ট্য :**

(১) **দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রয়োজন :** এই কারবার গঠনে সর্বনিম্ন ২ জন ব্যক্তি থাকা দরকার। সর্বোচ্চ অংশীদারের সংখ্যা ব্যাঙ্কিং কারবারের বেলায় ১০ জন এবং অন্যান্য কারবারের বেলায় ২০ জন।

(২) **চুক্তি :** এইরূপ কারবার কেবল চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয়। চুক্তি লিখিত, মৌখিক অথবা ধারণামূলক হতে পারে। রেজিস্ট্রেশন এই কারবারে বাধ্যতামূলক নয়।

(৩) **ব্যবসা :** ব্যবসা ছাড়া কোনও অংশীদারী কারবার হয় না।

(৪) **প্রতিনিধিত্ব :** প্রত্যেক অংশীদারই একাধারে মালিক ও প্রতিনিধি। এই কারবারে সকল অংশীদারই প্রত্যক্ষভাবে পরিরচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে এক বা একাধিক অংশীদারও সকলের প্রতিনিধি হয়ে কারবার পরিচালনা করতে পারে।

(৫) **মুনাফা অর্জন ও মুনাফায় অংশগ্রহণ :** মুনাফা অর্জনের জন্য অংশীদারী কারবারের উদ্ভব হয়। মুনাফায় অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনও ব্যক্তি অংশীদার হয় না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা বণ্টিত হয়। চুক্তিতে মুনাফা বণ্টনের হার সম্পর্কে উল্লেখ না থাকলে মুনাফা সমান হারে বণ্টিত হয়।

(৬) **অংশীদারগণের দায় সীমাহীন :** কারবারের দেনা পরিশোধের জন্য অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে দায়ী থাকে। যদি দেনা পরিশোধের জন্য উপযুক্ত অর্থ না থাকে তবে অংশীদারদের সম্পত্তি বিক্রয় করে তা শোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

(৭) **স্থায়িত্ব :** এই জাতীয় কারবারের স্থায়িত্ব অংশীদারদের ওপর নির্ভর করে। তাদের ইচ্ছানুযায়ী বা চুক্তি অনুযায়ী কারবার স্থায়ী হয়। অনেক সময় একজন অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা মৃত্যু হলে তার পরিবর্তে অন্য অংশীদার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নূতন অংশীদারী কারবার হয়।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **গঠনের সুবিধা :** স্বল্প সময়ে ও পরিমিত অর্থব্যয়ে এই জাতীয় কারবার গঠন করা যায়। এটি গঠনে কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে না। এতে নিবন্ধনও বাধ্যতামূলক নয়। অংশীদারী কারবার গঠনের সময় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্ত অথবা ধারণামূলক চুক্তি থাকে।

(২) **মূলধন সংগ্রহে সুবিধা :** এই কারবারে একাধিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করা যায় বলে একমালিকী কারবারের তুলনায় এখানে সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ বেশি। এখানে মালিক অনেকজন হওয়ায় প্রত্যেকেই আলাদাভাবে ঋণ সংগ্রহ করে মূলধনের জোগাড় করতে পারে।

(৩) **কারবারের সম্প্রসারণ :** প্রয়োজন মতো নতুন অংশীদার গ্রহণ করে নতুনভাবে মূলধন নিয়োগ করে অংশীদারগণ কারবারের সম্প্রসারণ করে থাকে।

(৪) **পরিবর্তনশীলতা :** কারবার ব্যবস্থাপনার নীতি, অর্থসংস্থান, কার্যধারার পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন মূলধনের পরিবর্তন সহজেই করা যায়।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **ব্যবস্থাপনায় মতানৈক্য :** কারবার পরিচালনায় সকলের সমান অধিকার থাকায় প্রত্যেক অংশীদারের একমত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অংশীদারগণের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত স্থাপনে বদ্ধপরিকর থাকে। ফলে কারবারে অচলাবস্থার সৃষ্ট হয়।

(২) **সীমাহীন দায় :** প্রত্যেক অংশীদারের দায়-দায়িত্ব সীমাহীন। অর্থাৎ অংশীদারগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কারবারের সমস্ত লোকসানের জন্য দায়ী থাকে। যদি তারা দায় পরিশোধে ব্যর্থ হয় তবে তাদের সম্পত্তি বিক্রয় করে তারা সেই দায় শোধে বাধ্য থাকে।

(৩) **কারবারে স্থায়িত্বের অভাব :** কোনও অংশীদারের মৃত্যু, দেউলিয়া বা অবসর গ্রহণের ফলে কারবার উঠে যেতে পারে। কেবল তাই নয়, খেয়ালখুশি বা মত-বিরোধের পরিণামেও কারবার উঠে যায়।

(৪) **স্বত্ব হস্তান্তরে বাধা :** একাধিক অংশীদার থাকার ফলে সকল অংশীদার একমত না হলে কোনও অংশীদারী কারবারের স্বত্ব অন্য কাউকে হস্তান্তর করতে পারা যায় না।

(৫) **মূলধনের অপ্রাচুর্যতা :** এই কারবারের সংগৃহীত মূলধন একমালিকী কারবারের তুলনায় বেশি। কিন্তু তা বৃহদাকার উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ফলে কারবার বৃহদায়তন হয় না।

(৬) **আস্থার অভাব :** এই কারবার গঠনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হওয়ায় এই জাতীয় কারবার জনগণের আস্থাভাজন হয় না।

একমালিকী কারবারের ন্যায় অংশীদারী কারবারেরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। সেই সকল অসুবিধাকে দক্ষতার সাথে দূর করে যদি অংশীদারগণ কারবার পরিচালনা করতে পারে, তাহলে সাফল্যের সাথে এই জাতীয় কারবার পরিচালনা করা সম্ভব।

(iv) **প্রযোজ্যতা :**

মধ্যম আকারের ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদারী ব্যবসার উপযুক্ত। যেমন পাইকারী ব্যবসা, ক্ষুদ্র সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পরিবহণ সংস্থা), গুদামঘর ইত্যাদি।

৭৯.৩.৩ হিন্দু অবিভক্ত পরিবারিক কারবার

একান্নবর্তী হিন্দুদের মধ্যে একপ্রকার পারিবারিক কারবারের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। একেই হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার বলে। এই জাতীয় কারবার উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পরিবারের পুরুষ সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়। এই কারবারের মালিকানা, স্বত্ব ও সম্বন্ধ, মিতক্ষরা ও দায়ভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(i) **বৈশিষ্ট্য :**

(১) এই জাতীয় কারবার পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সভ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনিই হলেন কর্তা। কর্তা কর্মাধক্ষ্য হিসাবে কাজ করে।

(২) কারবারের আয়-ব্যয়ের হিসাব কর্তাই দেখাশোনা করেন।

(৩) কর্তা কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণ করে। তবে অন্যান্য শরিকগণ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বা আলোচনা করবার দাবি করতে পারে।

(৪) এই কারবারের মুনাফা কর্তার হেপাজতে থাকে। মুনাফা বণ্টনের রীতি প্রচলিত নাই। পরিবারের কোনও সদস্যের মৃত্যু হলে জীবিত সদস্যগণের প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার নূতন সদস্যের জন্ম হলে এই পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৫) কারবারের শরিকগণ যদি মালিকের সাথে একমত হতে না পারেন এবং কর্তার সাথে যদি মতবিরোধ দেখা যায় তবে কারবারের সম্পত্তি বণ্টনের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। তবে গত কোন বৎসরের মুনাফার হিসাব দাবি করতে পারেন না।

(৬) কারবার পরিচালনার জন্য কর্তা একাই প্রয়োজনীয় ঋণ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কর্তা একা ঋণ গ্রহণ করলেও কারবারের শরিকগণ তাহাদের নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী ঐ ঋণ শোধ করবার জন্য দায়ী থাকে।

(৭) এই জাতীয় কারবারে কর্তার ক্ষমতা প্রচুর। তিনি কারবার পরিচালনার জন্য যেমন ঋণ গ্রহণ থেকে শুরু করে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া ইত্যাদি করতে পারেন, তেমনি তিনি কারবার বিক্রয়ও করে দিতে পারেন, আবার তিনি মনে করলে কারবার তুলে দিতেও পারেন।

(৮) কারবার সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সই করা, মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি কারবার অধিকার সমস্তই কর্তার ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তিনি কারবারের কোনও পাওনা মকুব করতে পারেন না।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **পরিচালনার সুবিধা :** পরিবারের সদস্যদের কারবার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয় না, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কারবার থেকে এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ আয় পেয়ে থাকে।

(২) **মোট আয় বৃদ্ধির সুবিধা :** পরিবারের কর্তা কারবার পরিচালনা করায়, কারবারের অন্য সদস্যরা চাকুরি বা অন্য প্রকার কাজ করে প্রত্যেকেই আলাদাভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারে। এতে পরিবারের মোট আয় বৃদ্ধি পায়।

(৩) **কার্য শিক্ষা :** পরিবারের সকল সদস্যরাই পরিবারের উন্নতিকল্পে কাজ করতে শেখে। পরিবারে বালকরা ছোট থেকেই বয়স্কদের কাছ থেকে কারবার পরিচালনার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৪) **শ্রমবিভাগের সুবিধা :** পরিবারের প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দমতো কাজ বেছে নেবার সুযোগ পায়। এতে তারা কারবার শ্রমবিভাগের সম্পূর্ণ সুযোগ ভোগ করতে পারে।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **কর্মবিমুখতা :** কাজ না করেও যখন এক স্থির আয়ের ব্যবস্থা হয়, তখন পরিবারে সদস্যদের মধ্যে কর্মবিমুখতা দেখা যায় এবং তারা অলস হয়ে পড়ে।

(২) **মতবিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি :** এই কারবারে কারবার পরিচালনার জন্য নীতি-নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র কর্তা করে থাকেন, ফলে শরিক বা অংশীদারদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এতে মতবিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

(৩) **উৎসাহের অভাব :** এই কারবারে সব সদস্যই কাজের সুযোগ পায়। কিন্তু কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায় না। ফলে কাজে তাদের উৎসাহের অভাব দেখা যায়।

(৪) **স্থায়িত্বের অভাব :** অনেক সময়ই কর্তার সাথে অন্যান্য শরিকদের কলহের সৃষ্টি হয়। আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে পারিবারিক কলহ হয়ে থাকে এবং কলহ থেকে কারবার বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ বলা যায় যে কারবারের স্থায়িত্ব বেশিদিন নাও হতে পারে।

(৫) **উদ্দমহীনতা :** কারবারের সকল প্রকার দায়িত্ব কর্তার ওপর ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ কর্তা কারবারে কর্তৃত্ব স্থাপন করে থাকেন। এর ফলে কর্তার কর্তৃত্বের সাথে অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দিতে পারে। এর ফলে অনেক সময়ই সদস্যদের কাজের প্রতি উদ্দামহীনতা দেখা যায়।

৭৯.৩.৪ যৌথ মূলধনী কারবার

একমালিকী এবং অংশীদারী কারবারে যে সকল অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রধান অসুবিধা হল এই দুই কারবারে প্রচুর মূলধনের অভাব হয় এবং তার ফলে কোনও বৃহদায়তন কারবার গড়ে উঠতে পারে না। এই মূল অসুবিধাগুলি দূর করে বৃহদায়তন কারবার চালানোর জন্য যে কারবার গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় যৌথ মূলধনী কারবার। যার মূলধন হস্তান্তরযোগ্য নির্দিষ্টমানের শেয়ারে বিভক্ত, যা আইনের দ্বারা কৃত্রিম ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত, যার অস্তিত্ব চিরন্তন—মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত কতিপয় ব্যক্তির এরূপ স্বেচ্ছামূলক পরিমেলকে যৌথ মূলধনী কারবার বা কোম্পানী বলা হয়।

(i) **বৈশিষ্ট্য সমূহ :**

(১) **আইনগত সত্তা :** এটি কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত কৃত্রিম আইনানুগ ব্যক্তি প্রত্যেক কোম্পানীকেই নিবন্ধিত হতে হয়। এই কারবারী প্রতিষ্ঠান আইন দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোম্পানী এবং কোম্পানী সৃষ্টিকারী ব্যক্তিগণ পৃথক ব্যক্তি। কোম্পানী গঠিত হবার পর সমস্ত কার্য কোম্পানীর নামেই হয়ে থাকে। কোম্পানীর সদস্যদের নামে হয় না।

(২) **শেয়ার মূলধন :** কোম্পানীর মূলধন কতিপয় শেয়ারে বিভক্ত। শেয়ার দুই প্রকারের—প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ইকুইটি শেয়ার। শেয়ার যারা ক্রয় করে তাদের কোম্পানীর সদস্য বা শেয়ারহোল্ডার বলা হয়। এই শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য।

(৩) **সীমাবদ্ধ দায় :** এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দায় সীমিত। কোম্পানীর যাবতীয় দেনা ও দায়-দায়িত্বের জন্য সদস্যগণ দায়ী থাকে না। সদস্যদের ক্রয় করা শেয়ার অথবা তাদের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ হয়।

(৪) **স্থায়িত্ব :** এই কারবারের স্থায়িত্ব চিরন্তন। অর্থাৎ আইনত এই কারবার গঠিত হলে সহজে এর অবসান ঘটানো সম্ভব হয় না। যতদিন না এটির আইনত অবসান ঘটে ততদিন এই কারবারের বিলোপসাধন করা যায় না।

(৫) **সাধারণ সীলমোহর :** কোম্পানীর নাম সীলে খোদিত করা হয়। সীলমোহরের দ্বারা কোম্পানীর কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীর প্রত্যেকটি দলিলে এই সীল লাগানো হয়।

(৬) **মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পৃথকীকরণ :** এই জাতীয় কারবারে কারবারের সদস্যগণ দৈনন্দিন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সদস্যদের মনোনীত প্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত থাকে। তাই এই জাতীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানকে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বলা হয়। মনোনীত সদস্যকে পরিচালক এবং সদস্যগণকে সম্মিলিতভাবে পরিচালকমণ্ডলী বলা হয়।

(৭) **মালিকানার পরিবর্তনশীলতা :** যারা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তারা কোম্পানীর মালিক হয় আবার শেয়ার বিক্রয় করলে আর মালিকানা থাকে না। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য, তাই মালিকানা পরিবর্তনশীল।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **মূলধনের প্রাচুর্যতা :** এই জাতীয় কারবারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি শেয়ারের খুব অল্প দাম থাকে বলে বেশি সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। এর ফলে স্বল্প সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকেও মূলধন সংগ্রহ করা হয় এবং মূলধনের পরিমাণ হয় অনেক বেশি।

(২) **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা :** যে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা হয় সেই শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য হয়। ফলে শেয়ার হোল্ডারগণ সহজেই শেয়ার হস্তান্তর করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

(৩) **সীমাবদ্ধ দায় :** এই জাতীয় কারবারে দায় সীমাবদ্ধ বলে সহজেই সঞ্চয়কারীদের ঝুঁকি কমে যায়। ফলে অনেক বেশি পরিমাণে সঞ্চয়কারীরা শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

(৪) **সুদক্ষ পরিচালনা :** এই জাতীয় কারবার পরিচালনার ভার সুদক্ষ পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকে। এই পরিচালক পর্ষদ সুদক্ষ পরিচালকগণদের নিয়ে গঠিত হয়। আবার প্রয়োজনবোধে পরিচালক পরিবর্তন করে নূতন দক্ষ পরিচালক নিযুক্ত করা যেতে পারে। ফলে অদক্ষ পরিচালকের হাতে পড়ে কারবার নষ্ট হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

(৫) **জনগণের আস্থা :** যৌথ মূলধনী কারবারের গঠন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী স্বীকৃত বলে এই জাতীয় কারবারে আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে। এর ফলে এই জাতীয় কারবারে জনগণের আস্থা লক্ষ্য করা যায়।

(৬) **ব্যয়-সংকোচ :** এই জাতীয় কারবার বৃহদায়তন উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধা ভোগ করে। প্রচুর মূলধন সংগৃহীত হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য একসাথে উৎপাদন ও বণ্টন করা হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-সংকোচ ঘটে।

(৭) **চিরন্তন অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব :** আইনের বাধ্যবাধকতায় এই জাতীয় কারবার সৃষ্টি হয় বলে সহজে এই কারবার লোপ পায় না। মালিকানার পরিবর্তন ঘটলেও কারবারের বিলোপসাধন ঘটে না। কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমেই এই সকল কারবারের অবলুপ্তি ঘটে। তাই বলা যায় এই কারবার স্থায়ী হয়।

(৮) **পৃথক সত্তা :** আইন দ্বারা এই জাতীয় কারবার পৃথক সত্তা লাভ করে। ফলে আইনত ব্যক্তিসত্তা লাভ করায় যতদিন না কারবারের বিলোপসাধন হয় ততদিন এই কারবার কাজ চালিয়ে যায়।

(৯) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ :** এই জাতীয় কারবারে সমাজের বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থজড়িত থাকে বলে এই জাতীয় কারবার সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১০) **সামাজিক দায়িত্ব পূরণ :** এই কারবার বহুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে ক্রেতাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটায়, সমাজের উন্নয়নে সাহায্য করে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে।

(১১) **পরীক্ষা ও গবেষণার সুযোগ :** নূতন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় কারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাকার্যে অর্থব্যয় করতে পারে।

(১২) **সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্য :** পরিচালনার দক্ষতা ও প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকায় এর সম্প্রসারণের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও কারবার বহুবিধ উৎপাদন ও কার্যে নিযুক্ত থেকে ব্যবসায়ে বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য আনতে পারে।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **ক্রেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব :** এই জাতীয় কারবারের পরিচালনা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হাতে ন্যস্ত থাকে বলে এরা সরাসরি সাধারণ ভোগকারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। ফলে যে সকল ব্যবসায় ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী উৎপাদন পরিবর্তিত হয় সেই সকল ব্যবসা যৌথ মূলধনী পদ্ধতিতে গড়ে উঠলে লাভের তুলনায় লোকসান হয় বেশি।

(২) **অসাধু পরিচালনা :** অনেক সময়ই এই জাতীয় কারবারে অসাধু ও অযোগ্য ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত করে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে এবং অসাধু উপায়ে বিনিয়োগকারীদের অর্থ আত্মসাৎ করে। এতে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ইচ্ছা কমে যায়।

(৩) **বেতনভুক কর্মচারী দ্বারা পরিচালনা :** এই জাতীয় কারবারে পরিচালনার ভার পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তারা দৈনন্দিন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে বেতনভুক কর্মচারীদের ওপর তাদের পরিচালনার ভার ছেড়ে দিতে হয়। এই কর্মচারীদের নিজের স্বার্থ ও কারবারের স্বার্থ এক এই মনোভাবের অভাব দেখা যায়। ফলে পরিচালনায় গাফিলতি আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, অপচয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ত্রুটি দেখা যায়।

(৪) **স্বজন-পোষণ :** পরিচালকগণের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আত্মীয় ও স্বজন-পোষণ ব্যাপারে প্রবণতা দেখা যায়।

(৫) **মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় সরাসরি যোগাযোগের অভাব :** এই জাতীয় কারবারে শেয়ারহোল্ডাররা সরাসরি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বিরাট ফারাক লক্ষ্য করা যায়।

(৬) **শ্রমিক ও মালিক বিরোধ :** এই জাতীয় কারবারে কারবার পরিচালনার ভার পেশাদার পরিচালকগণের হাতে থাকায়, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। ফলে অনেক সময়ই শ্রমিক ও মালিকের বিরোধ দেখা যায়।

৭৯.৩.৫ সমবায় সমিতি

যখন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় আর্থিক উন্নতি ও মঙ্গল লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্প বিত্তসম্পন্ন এবং বিত্তহীন ব্যক্তিরা ঐচ্ছিকভাবে আর্থিক ও ব্যবসায়িক সংগঠন গড়ে তোলে তখন তাকে সমবায় সংগঠন বলে। সাধারণত অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত অধিবাসীরা নিজেদের অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের ইচ্ছায় এইরকম সংগঠন সৃষ্টি বা স্থাপন করে থাকে।

(i) **বৈশিষ্ট্য :**

(১) এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

(২) এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে আত্মনির্ভরতা, পারস্পরিক সাহায্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা এবং সামাজিক সেবা প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(৩) যৌথ মূলধনী কারবারের মতো এখানেও শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। তবে এখানে শেয়ারের মূল্য খুবই কম এবং তা সাধারণভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয়। কোনও ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে।

(৪) যৌথ মূলধনী কারবারের মতো এখানেও কাজ পরিচালনা করার জন্য একটি পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। সাধারণত সমবায় সমিতির সদস্যরা ভোট দিয়ে এই পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের নির্বাচিত করে। এই পরিচালক পর্ষদের ওপর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ এবং তা রূপায়ণ করার সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(৫) সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় সীমাহীন বা সীমাবদ্ধ দুই প্রকারেরই হতে পারে। তবে দায় সীমাবদ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যদের ঝুঁকি কম থাকে বলে এই জাতীয় সমবায় সমিতি বেশি গড়ে উঠতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ দায় সীমাহীন সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়।

(৬) সমবায় সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সেবা পরিবেশন করা, মুনাফা অর্জন করা নয়। যে সকল সমবায় সমিতি আর্থিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকে,তাদের যে উদ্বৃত্ত আয় হয় তার এক-চতুর্থাংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা রেখে বাকি উদ্বৃত্ত সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই লভ্যাংশ ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করা হয়।

(৭) এই জাতীয় কারবারেরও পৃথক স্বাধীন সত্তা আছে। অর্থাৎ কারবার ও সদস্যরা দুটি পৃথক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হয়।

(৮) সমবায় প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনভুক্ত হলে যতদিন না বিলোপ হয় ততদিন প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ সম্পাদন করা যায়।

(৯) এই প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়, সমিতির কাছে বিক্রয়যোগ্য।

(১০) ১৯৪০ সালের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী সর্বনিম্ন ১০ জন সদস্য না হলে কোনও সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে না।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ :** এই জাতীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকরা একত্রিত হয়ে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে বলে উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের আলাদাভাবে কোনও বেতন বা মজুরি দিতে হয় না। এতে উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ঘটে।

(২) **ক্রেতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ :** সমবায় সমিতি কোনও মধ্যস্থকারবারীর সাহায্য নেয় না। এখানে সদস্যরাই দ্রব্য উৎপাদনের পরে তা ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে দেয়। অর্থাৎ উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ফলে ক্রেতারা কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

(৩) **ক্রেতারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করে :** মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না বলে এই জাতীয় কারবারী প্রতিষ্ঠানে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয় না। ফলে ক্রেতারা কমমূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য লাভ করে।

(৪) **জীবনযাত্রার মান উন্নত করে :** দরিদ্র কৃষক বা কুটিরশিল্পে জীবিকা-নির্বাহী দরিদ্র শ্রমিকরা এইরকম সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি করতে পারে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৫) **পারস্পরিক বিশ্বাস, সততা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় :** সমবায় সমিতিতে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ হয়ে থাকে। এতে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সততা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এর ফলে সমিতির সদস্যদের নৈতিক মান উন্নত হয়।

(৬) **বেকারত্ব দূর হতে সাহায্য করে :** সমবায় সমিতির নামে কুটির শিল্প ও কৃষি-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়। এতে অনেকাংশে বেকার সমস্যা দূরীভূত হয়।

(৭) **সামাজিক সেবা :** সাধারণত সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় সমবায় সমিতিগুলি গড়ে ওঠে। এরা ধনতান্ত্রিক বণ্টন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক দুর্দশা লাঘব করতে সাহায্য করে।

(৮) **সরকারি সুবিধা :** সাধারণত সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত না হয়ে, সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণত আয়কর, বিক্রয়কর এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি দিতে হয় না।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **মূলধনের অপ্রাচুর্যতা :** সমবায় সমিতির মূলধন সংগ্রহের ক্ষমতা সীমিত। ফলে এই সমিতি কোনওরকম বৃহদায়তন শিল্প বা কারবার স্থাপনে প্রয়াসী হতে পারে না। অথবা কারবার সম্প্রসারণের ইচ্ছা থাকলেও মূলধনের অভাবে তা করা সম্ভব হয় না।

(২) **অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারীর অভাব :** এই জাতীয় সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক সামর্থ খুব অল্প। ফলে অর্থের অভাবে এরা অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে না।

(৩) **শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা :** এই প্রতিষ্ঠানগুলির খুব বেশি সুনাম থাকলে, পরিচালকবর্গের মধ্যে শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা দেখা দেয়।

(৪) **মতবিরোধ ও কলহ :** কোনও সমবায় সমিতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সেবার মনোবৃত্তি ও পারস্পরিক আস্থা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা লক্ষ্য করা যায়। এতে সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ও কলহের সৃষ্টি হয়।

(৫) **দুষ্ট ও কুচক্রী সদস্য :** এই জাতীয় সমবায় সমিতির বেশিরভাগ সদস্যই স্বায়ত্তশাসনের নীতি কাজে পরিচালনায় প্রয়োগ করতে অজ্ঞ। ফলে সমিতির ব্যবস্থাপনা দুষ্ট ও কুচক্রী সদস্যদের হাতে পড়ে।

৭৯.৩.৬ রাষ্ট্রীয় কারবার

যে সকল কারবার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালনায় এবং মালিকানায় গড়ে ওঠে তাকে রাষ্ট্রীয় কারবার বলে। এইরূপ কারবারী সংস্থাগুলি একত্রিত হয়ে যে সম্প্রদায় গড়ে তোলে তাকে রাষ্ট্রীয় কারবারী ক্ষেত্র বলা হয়। এই জাতীয় কারবারী ক্ষেত্র জাতীয় সমষ্টিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য গঠিত ও পরিচালিত হয়। শিল্প ও কারবারের মালিকরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার অন্যায় কার্য করে থাকে। অন্যায়ের অবসান ও জনসাধারণকে পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তাই পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে রাষ্ট্রের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় কারবার গড়ে উঠতে দেখা যায়।

(i) **বৈশিষ্ট্য :**

(১) বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই রাষ্ট্রীয় কারবারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়।

(২) বেসরকারি উদ্যোগে দেশে একচেটিয়া কারবার প্রভাব বিস্তার করলে তার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রীয় কারবার গড়ে তোলা হয়।

(৩) জনসাধারণের স্বার্থে কোনও ভোগদ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন বোধ করলে সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় কারবার-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়।

(৪) রাষ্ট্রীয় কারবারের মাধ্যমে মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রার মান স্থির রাখা হয়। ফলে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

(৫) জনসাধারণের স্বার্থে কোনও সেবা-প্রদায়ী শিল্প-সংস্থান যেমন—ডাক, তার, রেলপথ ইত্যাদি সর্বদাই রাষ্ট্রের অধীনে থাকে।

(৬) বাণিজ্য চক্রের এক অনিবার্য ফল হল বেকার সমস্যা। শিল্প ও কারবারকে সরকারি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে কর্মের সংস্থান করা হয়। এই কারণে বহু শিল্প ও বাণিজ্যকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়।

(৭) দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যকেও রাষ্ট্রীয় কারবার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(ii) **সুবিধা :**

(১) **জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন :** রাষ্ট্রীয় কারবার স্থাপনের ফলে জাতীয় আয়ের বণ্টনের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় তা দূর করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কারবার আয়ের সুষম বণ্টনে সাহায্য করে।

(২) **সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহার :** বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় সম্পদের ব্যবহার সুপরিকল্পিতভাবে করা হয় না। কারণ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কারবার জাতীয় সম্পদ সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে।

(৩) **উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা :** বেশির ভাগ সময় দেখা যায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয় অথবা উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে কোনও সমতা বিধান করে না। রাষ্ট্রীয় কারবার উৎপাদনের হার নির্দিষ্ট রেখে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

(৪) **নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা :** দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকলে দেশের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

(৫) **মূলধনের জোগান :** অনুন্নত দেশে বেসরকারি কারবার মূলধন জোগাড় করতে অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু সরকার রাষ্ট্রীয় কারবারকে মূলধনের জোগান দেয় বলে অনুন্নত দেশেও রাষ্ট্রীয় কারবারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়।

(৬) **করের বোঝা হ্রাস :** রাষ্ট্রীয় কারবারের আয় বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণের ওপর করের বোঝা কম হয়।

(iii) **অসুবিধা :**

(১) **ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাব :** সরকারের কর্ণধার ও কর্মচারীদের ব্যবসায়িক জ্ঞানের অভাব থাকবার কারণে সরকারি কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত নয়।

(২) **অপচয় বেশি :** সরকারি কর্মচারীদের কারবারের প্রতি একাত্মবোধ লক্ষ্য করা যায় না, ফলে তারা কারবারের সাফল্যের জন্য খুব একটা উদ্যোগী হন না। এর ফলে কারবারের অপচয় ঘটে।

(৩) **দুর্নীতি প্রবণতা :** রাষ্ট্রীয় কারবারের কর্মচারীদের মধ্যে স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতি-প্রবণতা খুব বেশি দেখা যায়।

(৪) **নীতি পরিবর্তনের ফলে কাজে অগ্রগতি কম :** বিভাগীয় মন্ত্রী ও কারবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের পরিবর্তনের ফলে কারবারের কার্য পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তন ঘটে। ফলে কারবারের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

৭৯.৪ কারবারী সংগঠনের আর্থিক কার্যক্ষেত্র

কারবারী সংগঠনের কার্যের ওপর ভিত্তি করে এর কার্যক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেই ভাগগুলি হল :

(১) উৎপাদন বা সৃজন-শিল্প সংক্রান্ত কার্যক্ষেত্র।

(২) বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্ষেত্র।

(৩) আর্থিক কার্যক্ষেত্র।

(৪) কারবারী কার্যক্ষেত্র।

- কারবারী সংগঠনের কার্যক্ষেত্র
  - উৎপাদন বা সৃজন-শিল্প সংক্রান্ত
  - বিপণন সংক্রান্ত
  - আর্থিক
  - কারবারী কার্যক্ষেত্র

৭৯.৪.১ উৎপাদন বা সৃজন শিল্প সংক্রান্ত কার্যক্ষেত্র

শ্রম ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য করবার যে প্রচেষ্টা তাকে উৎপাদন বা সৃজন-শিল্প বলে। এই কার্যাদি নানাপ্রকার জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই সৃজন-শিল্প বা উৎপাদনের বিভিন্ন দিক (Different aspects) আছে। সেগুলি হল :

১। **কারিগরি দিক :** সৃজন-শিল্পে কারিগরি দিক বলতে বোঝায় পণ্য উৎপাদন ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয়, ব্যবস্থা যথাযথভাবে গ্রহণ করা বা প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির যথাযথভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। এই উপাদানগুলির মধ্যে যন্ত্রপাতি, শক্তি ও জ্বালানী, মালমশলা, প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি-বিদ্যা, গুণগত মান, মোড়ক ও মোড়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) **যন্ত্রপাতি :** যন্ত্রপাতি না হলে সৃজন-শিল্পের কাজ চালানো সম্ভব নয়। আবার ভাল এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করলে দ্রব্যের উৎপাদন বা উৎকর্ষ কোনও কিছুই বৃদ্ধি পায় না। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগের জন্য এবং উৎপাদনের প্রতিটি প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়ে থাকে। অতি অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে বেশি পরিমাণে উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করার জন্যই যন্ত্রের প্রয়োজন। বর্তমানে বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতিও তত আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে উৎপাদিত না হলে সেই দেশ অন্য দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। যন্ত্র ব্যবহার করলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি উৎপাদনও হয় প্রচুর পরিমাণে। দৈহিক শক্তি দিয়ে যে কাজ করা সম্ভব হয় না, যন্ত্রপাতি দিয়ে তা সহজেই করা যায়। ভারতের মত শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি অনেক সময়ই শিল্পোন্নত দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে। তবে যন্ত্রের ব্যবহারে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, শ্রমিকদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং কাজে একঘেয়েমি আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃজন-শিল্পের উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপরিহার্য।

(খ) **শক্তি ও জ্বালানী :** সৃজন-শিল্প কেবলমাত্র হলেই চলে না, সেই যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য প্রয়োজন হয় শক্তির। পূর্বে যন্ত্রচালনার জন্য পেশীশক্তি, পশুশক্তি, বাতাস, জল প্রভৃতি শক্তিও জ্বালানীর উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানকালে এগুলির সাথে যন্ত্রাদি চালাতে কয়লা, খনিজ তৈল, জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ, আণবিক শক্তিও অধিক মাত্রায় জ্বালানীর উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(গ) **প্রযুক্তি-বিদ্যা :** কেবলমাত্র ভাল যন্ত্র হলে এবং তাতে শক্তি ব্যবহার করলেই পণ্যের উৎপাদন বা তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় না, তার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তিবিদ্যার। সৃজন-শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্র এবং প্রযুক্তি-বিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে সৃজন-শিল্পে প্রযুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের (যেমন—হাতের কাজ, যান্ত্রিক, একত্রীকরণ, অবিরাম প্রক্রিয়া প্রভৃতি) প্রয়োগ হতে পারে। হাতের কাজ-এর কুশলতা কুটিরশিল্পে লক্ষ্য করা যায়। যান্ত্রিক কুশলতা পণ্যের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে সাহায্য করে। আবার মোটর গাড়ি, টাইপ মেশিন, রেডিও প্রভৃতি শিল্পে একত্রীকরণের কুশলতা প্রয়োজন। অবিরাম প্রক্রিয়ার ফলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাজগুলি পর পর হয়ে থাকে। রাসায়নিক বা খনিজ তৈল শোধনে যার বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির কারণে সকল দেশ এই শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার অনেক সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পলিটেকনিক, মুদ্রণ, বস্ত্রবয়ন, পাট, কাগজ, চর্ম, স্থাপত্য প্রভৃতির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায়, সৃজন শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী উহার প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ ভিন্ন কোনও শিল্পকার্য চলতে পারে না।

(ঘ) **কাঁচামাল :** সৃজন-শিল্পে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালমশলা প্রয়োজন হয়। শিল্প-পরিচালনার প্রধান মাল হচ্ছে শিল্পোপযোগী কাঁচামাল। যেমন—পাটশিল্পের জন্য প্রয়োজন কাঁচা পাট, বস্ত্রশিল্পের জন্য কার্পাস প্রভৃতি। কাঁচামাল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হবার আগেই কাঁচামাল সরবরাহ করতে হয়। নতুবা যন্ত্রের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আবার কাঁচামালের গুণগত মান যদি ভাল না হয়, তবে যন্ত্রের উৎকৃষ্টতা নষ্ট হতে পারে। ফলে বলা যায় নির্দিষ্ট সময়ে কাঁচামাল সরবরাহ করে সৃজন-শিল্পের উৎপাদন-কার্য অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঙ) **প্রক্রিয়া :** সৃজন-শিল্পে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় তা শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী এক বা একাধিক প্রক্রিয়ার বা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হয়। অর্থাৎ শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থির করা এবং সেই অনুযায়ী যন্ত্রপাতির ব্যবহার নির্দেশ করা হল এই শিল্পের একটি প্রধান কাজ। শিল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী এই ধরনের প্রক্রিয়া স্থির করা হয় এবং এর জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার অবশ্যই প্রয়োজন হয়। আবার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালকে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেন এতে পণ্যের বা কাঁচামালের গুণগত মান বজায় থাকে। কারণ সৃজন-শিল্প প্রক্রিয়া উৎপাদনের একটি বিশেষ রূপ। এর সাহায্যে বিভিন্ন কাঁচামালের রূপান্তরের মাধ্যমে নানারকম পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়।

(চ) **গুণগত মান :** সৃজন শিল্পে যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্য হল উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা। কারণ দ্রব্যের গুণগত মানের ওপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে। যদি উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় না থাকে তবে দ্রব্যের চাহিদা থাকবে না, বিক্রয় হবে না এবং কারবারের ব্যয়-নির্বাহ বা লাভ কোনওটাই সম্ভব হবে না। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বলতে বোঝায় তার আকার, আয়তন, বর্ণ, শক্তি, সহনশীলতা প্রভৃতি এক বা একাধিক গুণকে, আর সেই গুণ অনুযায়ী দ্রব্যকে ব্যবহারোপযোগী করা হয়। পণ্যের গুণগত মান সাধারণত দুই উপায়ে নির্ধারিত হয়।

(i) **প্রত্যক্ষ পদার্থগত পরীক্ষা :** এই পরীক্ষার দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের অংশ ও সমগ্র কাজগুলিকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং কোনও ত্রুটি ধরা পড়লে তা বাতিল করা হয়। মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং বৃহৎ আকারের দ্রব্যাদি এইভাবে পরীক্ষা করা হয়।

(ii) **পরিসংখ্যান মান নিয়ন্ত্রণ :** যে ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে একই সঙ্গে প্রচুর পণ্য উৎপাদিত হয়, সেক্ষেত্রে পরিসংখ্যান মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গৃহীত হয় এবং এই পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষা দ্বারা দ্রব্যের গুণগত মান স্থির করা হয়।

গুণগত মান নির্ধারিত মান অনুযায়ী দ্রব্যটির উৎপাদন হচ্ছে কিনা তা সুনিশ্চিত করে। নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদিত হলে দ্রব্যের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, কর্মীরা তাদের কাজের স্বীকৃতি পায়, ফলে কাজে তাদের উৎসাহ বাড়ে, পণ্যের সুনাম বৃদ্ধি পায়, অপচয় দূর হয় এবং দেশে ও বিদেশে খরিদ্দার বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায়।

(ছ) **মোড়ক ও মোড়াই** : উৎপাদিত পণ্য-কে বিক্রয়ের উপযোগী করে তোলার জন্য সৃজন-শিল্পে মোড়ক ও মোড়াই উভয়ই বিশেষভাবে প্রয়োজন। মোড়ক বলতে উৎপাদিত পণ্য তার প্রকৃতি অনুযায়ী শিশি, বোতল, কাঁচের পাত্র বা টিনে ভর্তি বোঝায়। তেল, আলতা, ঘি, বনস্পতি, বেবীফুড প্রভৃতিকে মোড়কের দ্বারা আবদ্ধ না করলে বিক্রয় করা চলে না। আবার পণ্যের গুণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মোড়ক যাতে ক্ষণভঙ্গুর না হয়, মোড়কটি যাতে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়, মোড়কের মধ্যে যাতে পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারবারী ক্ষেত্রে মোড়কের গুরুত্ব যথেষ্ট কারণ মোড়কটি যদি তার আকার, আয়তন, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির দ্বারা ক্রেতার মন জয় করতে পারে তবে উৎপাদিত পণ্যটি বিক্রয়ের সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে মোড়কের গায়ে লিখিত পণ্যের নাম, কারবারী প্রতিষ্ঠানের নাম পণ্যের এবং কারবারের তরফ থেকে বিজ্ঞাপনেরও কাজ করে। ক্রেতারা সাধারণত মোড়কের গায়ে লেখা দামই বহন করে। ফলে সেই দাম যাতে অতিরিক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং বলা যায় এই সকল নিয়মগুলি মেনে চললে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে এবং কারবারও লাভের সম্মুখীন হবে।

উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সময়, একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠাবার জন্য বা মজুত রাখার জন্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই জন্য বাঁধাই, জড়ানো বা বাক্সে ভর্তি করাকে বলা হয় মোড়াই। মোড়াই-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যদ্রব্যকে অবিকৃত বা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় গন্তব্যস্থলে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং পথমধ্যে যাতে ক্ষয়ক্ষতি, চুরি, ভাঙচুর, বিকৃতি প্রভৃতি যাতে না হয় সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা। মোড়াই-এর কাজ কোন্ জিনিস দ্বারা সম্পন্ন হবে তা পণ্যের সংখ্যা, পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। সাধারণত ভাল মোড়াই-এর ওপরও পণ্যের বিক্রয় নির্ভর করে।

২। **মানবিক দিক** : কারিগরি দিক ছাড়াও সৃজন-শিল্পে মানবিক দিকও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যন্ত্র, শক্তি, কাঁচামাল প্রভৃতি জড়পদার্থ। তারা নিজেরা সক্রিয় হয়ে কোনও উৎপাদন (পণ্য) করতে পারে না। তাদের সক্রিয় করতে মানবিক শক্তির প্রয়োজন। Urwick-এর মতে, "Management has two aspects, mechanic and dynamic. It has to build the machinery with all its cogs, gears and countershafting. But it is also concerned with the power behind the machinery, the wills of the individual men and woman who co-operate in the task, which are the stream or electricity, with make the machine go at all."

মানুষের কর্মদক্ষতা, ইচ্ছাশক্তি, মনোবল প্রভৃতি যথোপযুক্ত বিকাশ এবং উৎপাদনের ব্যাপারে তাদের প্রয়োগ ছাড়া কোনও যন্ত্রই কিছু উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরা যাতে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কর্মে আত্মনিয়োগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনও কর্মীর আশাপূরণের জন্য তার দৈহিক চাহিদা, নিরাপত্তা, স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা আত্মোপলব্ধি প্রভৃতি পূরণের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এগুলি পূরণ হলে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োগ করবে।

সাধারণত দক্ষ কর্মী ছাড়াও সৃজন-শিল্পের আর একটি মানবিক উপাদান হচ্ছে পরিচালকবর্গ। শ্রমিকরা শ্রম দিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে পরিচালকবর্গের কাজ। এই পরিচালকবর্গের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সৃজন-শিল্পের অন্যতম কাজ।

শ্রমিকবৃন্দ এবং পরিচালকবর্গ ছাড়াও অন্য আর একটি মানবিক উপাদান হল খরিদ্দার। সৃজন-শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলিকে ন্যায্যদামে বিক্রয় করতে হবে। এতে খরিদ্দারগণ সন্তুষ্ট হবেন। অন্যদিক থেকে বলা যায়

যে, খরিদ্দারদের প্রতি দৃষ্টি না দিলে জিনিস ঠিকমতো বিক্রয় হবে না এবং তার ফলে কারবারও লাভের সম্মুখীন হবে না। তাই বলা যায় সৃজন-শিল্পে কারিগরি এবং মানবিক উভয় দিকই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বহনকারী।

৩। **ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা :** সৃজন-শিল্পে ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সঠিক পণ্য উৎপাদন করতে হলে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করতে হবে। আবার যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করা হবে তা বিক্রয়ের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ দ্রব্য যত বিক্রয় হবে কারবারের আয় তত বৃদ্ধি পাবে, কারবার মুনাফা লাভ করবে এবং কারবারের উন্নতি সাধিত হবে। কিন্তু যদি উৎপাদিত দ্রব্যগুলি গুদামঘরে মজুত পণ্য হিসাবে পড়ে থাকে তবে কারবারে বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কি পরিমাণ এবং কতটা দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে বিক্রয়ের পরিমাণের ওপর। বিক্রয় যদি কম হয় তবে উৎপাদনের হারও কম হবে আবার বিক্রয় যদি বেশি হয় তবে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায় ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হলে উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয়ের সীমা সহজেই নির্দেশ করা যায়। এতে অপচয় বন্ধ হয় এবং মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়। ফলে কারবার সমৃদ্ধি লাভ করে।

৪। **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন :** সৃজন-শিল্পে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। বাজারে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তার চাহিদা কতটা তা জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যদি যোগান বেশি হয় তবে পণ্য অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে থাকবে। এর ফলে কারবার লোকসানের সম্মুখীন হবে। আবার যদি চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণ কম হয় তাহলেও কারবার খুব বেশি একটা মুনাফার সম্মুখীন হবে না। তাই মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৫। **কারখানার স্থান নির্বাচন :** কোনও স্থানে কারখানা স্থাপন করলে কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করা যাবে সেই বিষয় বিচার-বিবেচনা করে কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন করতে হবে। কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন করার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হবে তা নীচে আলোচনা করা হল।

(ক) **কাঁচামাল :** স্থান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে যেখানে কারখানাটি স্থাপিত হচ্ছে সেই স্থানে কাঁচামাল সহজলভ্য কিনা। যদি কারখানা এক জায়গায় স্থাপিত হয় আর কাঁচামাল অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হয় তবে কারবারীকে প্রচুর পরিমাণে পরিবহণ-বাবদ খরচ বহন করতে হয়। তাছাড়া অনেক দূর থেকে কাঁচামাল আনার জন্য কাঁচামালের অপচয় বেশি হয়। তাই দেখা যায় যেখানে লৌহ আকরিক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে।

(খ) **শক্তিসম্পদ :** কারখানা চালনার জন্য প্রয়োজন শক্তিসম্পদ। কোনও কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কারখানার কাছাকাছি শক্তিসম্পদ পাওয়া যায়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিকটবর্তী বা কোনো বড় নদীর ধারে কারখানাগুলি গড়ে ওঠে। এর ফলে সহজেই শক্তিসম্পদের সাহায্য পাওয়া যায়। না হলে অন্য জায়গা থেকে শক্তিসম্পদ এনে কারখানা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কাছে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানাগুলি গড়ে ওঠে আর গঙ্গানদীর দু-তীরে পাটশিল্পের কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে।

(গ) **শ্রমিক :** কারখানা করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ শ্রমিকের। তাই কারখানার স্থান নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কারখানার কাছে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। তবে অনেক সময় অনেক দূর থেকেও

শ্রমিক নিয়ে আসা হয় যদি তারা আসতে ইচ্ছুক হয়। তবে এতে শ্রমিকদের যাওয়া আসা বাবদ অতিরিক্ত খরচ পড়ে যায়। ফলে তাদের মজুরিও বেশি হয়। আর কারখানার কাছেই প্রচুর শ্রমিক থাকলে অল্প মজুরিতেও প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘন জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে কারখানাগুলি গড়ে ওঠে।

(ঘ) **পরিবহণ :** যে অঞ্চলে পরিবহণ-ব্যবস্থা উন্নত সেখানে কারখানা গড়ে উঠলে কাঁচামাল নিয়ে আসতে কিংবা উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। এতে পরিবহণ ব্যয় কম হয়। কিন্তু অনুন্নত পরিবহণ ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলে কারখানা গড়ে উঠলে পরিবহণ-ব্যয়ও হয় প্রচুর, আবার পণ্য বাজারে নিয়ে যেতে অসুবিধাও হয়। তাই কারখানার স্থান নির্বাচন করার সময় উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঙ) **বাজার :** কোনও কারখানা স্থাপনে সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কারখানাটি যেন বাজারের নিকটবর্তী হয়। কারণ ক্ষণভঙ্গুর, পচনশীল জাতীয় পণ্য-সামগ্রীকে যেমন অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তেমনি বৃহদায়তন ও ভারী পণ্য-সামগ্রীকে বহন করাও সম্ভব নয়। এতে পরিবহণ-ব্যয়ও অত্যধিক পড়ে যায়। আবার পণ্যগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বলা যায় যে কারখানা স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাজার কারখানাটির নিকটবর্তী হয়।

(চ) **জলবায়ু :** কৃষিজাত কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেও অনেক সময় কারখানাগুলি গড়ে ওঠে। এরূপ কারবার স্থাপনের ওপর জলবায়ু বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—কার্পাস উৎপাদনের জন্য আর্দ্র জলবায়ু আর ময়দাশিল্পের জন্য শুষ্ক জলবায়ুর প্রয়োজন। তাই আর্দ্র আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে কার্পাস শিল্প বা বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু যদি শুষ্ক জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন শিল্প গড়ে ওঠে তাহলে সেখানে পর্যপ্ত কাঁচামালের অসুবিধা হবে। তখন অন্য জায়গা থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হবে। এতে পরিবহণ-ব্যয় অধিক হবে। তাছাড়া যদি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে কারখানাগুলি গড়ে ওঠে তাহলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কাজে তাদের মনোযোগ ঘটে। আবার যদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে শ্রমিকরা সুস্থ থাকে না, কাজে তাদের মনোযোগ ঘটে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাই বলা যায় কোনও কারখানা স্থাপনের আগে অবশ্যই তার অনুকূল জলবায়ুর কথা চিন্তা করতে হবে।

(ছ) **মূলধন :** মূলধন ছাড়া শিল্প-কারখানা চলতে পারে না। সুতরাং এমন জায়গায় কারখানা স্থাপন করতে হবে যেখানে মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন করার সময় অর্থ বা মূলধন প্রাপ্তি যাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(জ) **জমির মূল্য :** কারখানার জন্য জমির প্রয়োজন। জমির মূল্য যদি কম হয় তবে সহজেই অনেকটা জমি ক্রয় করা যায়। আবার জমির মূল্য যদি অধিক হয় তাহলে বেশি জমি ক্রয় করা যায় না, ফলে কারখানাটি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ভবিষ্যতে সুবিধা অনুযায়ী তাকে সম্প্রসারণ করা যায় না। সুতরাং কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের সময় কারবারীকে জমির মূল্য, খাজনা, কর প্রভৃতির দিক লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঝ) **পরিপূরক শিল্প :** পরিপূরক শিল্পগুলি কোনও কারখানায় উৎপাদিত পণ্যকে নানাভাবে সাহায্য করে। অনেক সময় শিল্প উৎপাদনের জন্য অর্ধপ্রস্তুত কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। পরিপূরক শিল্প এই অর্ধপ্রস্তুত কাঁচামালকে কারখানায় যোগান দেয়। এর ফলে প্রধান শিল্পে ব্যয়-সংকোচ ঘটে। তারা সহজেই অল্প ব্যয়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করতে পারে। অর্থাৎ কারখানার স্থান নির্বাচনের সময় পরিপূরক শিল্পের উপস্থিতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(ঞ) **সম্প্রসারণ :** এমন জায়গায় কারখানা স্থাপন করতে হবে যেখানে ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতো কারখানাটিকে সম্প্রসারিত করা যায়। সুতরাং ভবিষ্যতে কারখানার সম্প্রসারণের কথা মাথায় রেখে কারখানার স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(ট) **স্থানের সুনাম :** এক একটি স্থানের এক একটি বিষয়ের ওপর সুনাম। সেই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যদি সেই স্থানে কোনও কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে কারখানাটি সেই অঞ্চলের সুনাম ভোগ করে। এর ফলে কারখানাটি স্বল্পকালের মধ্যেই খ্যাতি লাভ করে এবং তার নাম দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং কারখানার স্থান নির্বাচনের সময় সুনামের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

(ঠ) **সরকারি নীতি :** যে কোনও স্থানে যে কোনও শিল্প স্থাপন করা যায় না। সরকারি নীতি মেনে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট শিল্প স্থাপন করতে হয়। সুতরাং নিজ স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কোনও কারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচনের সময় সরকারি নীতির কথা মনে রাখতে হবে।

৭৯.৪.২ বিপণন সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ

(i) **বিপণনের সংজ্ঞা :** মূল্য বা দামের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও সেবাগ্রহণ করাকে বলা হয় ক্রয়। আর মূল্যের বা দামের বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ ও সেবা পরিবেশনকে বলা হয় বিক্রয়। এই ক্রয় ও বিক্রয়কে একত্রে বিপণন বলা হয়। বিপণন সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কারও মতে বিপণন হচ্ছে একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা পণ্য বা সেবা বিনিময় হয় এবং তাদের মূল্য টাকার মূল্যে স্থির হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন বিপণন হচ্ছে যা প্রায়ই কারবারী কর্তৃক বণ্টন সম্পর্কে উল্লেখ করে, যার দ্বারা জিনিসের আকার পরিবর্তন বা অন্য কথায় প্রস্তুতকরণ ও কৃষি যার ফলে স্পর্শযোগ্য দ্রব্যে পরিণত হয় এবং এই দ্রব্য সম্ভোগকারীর হাতে স্থাপন করা পর্যন্ত সকল কার্যাবলী।

আবার কারও মতে খরিদ্দারের গ্রহণযোগ্য পণ্য সহজভাবে হস্তান্তরের জন্য সকল কার্য পরিচালনা করাই বিপণন।

অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় বিপণন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলীকে বোঝায়।

(ii) **বিপণনের গুরুত্ব :** কারবারী ক্ষেত্রে বিপণনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপণন হচ্ছে কারবারের প্রাণ। প্রাণ না থাকলে যেমন জীবন থাকে না তেমনি বিপণন না ঠিকমতো পরিচালিত হলে কারবার থাকে না। বিপণন হচ্ছে কারবারের সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র। কারণ কারবারের অধিকাংশ ঝুঁকি এই বিপণনের সঙ্গে জড়িত। সাধারণভাবে বিপণনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) বিপণন কারবারে সরলতা ও সজীবতা সৃষ্টি করে : বিপণনের কাজ সুষ্ঠভাবে চললে বিক্রেতা জানতে পারেন ক্রেতা কি চায় এবং ক্রেতাও জানতে পারে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কোথায় পাওয়া যেতে পারে। পণ্য বিপণনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাওয়া যায় যে যেখানে পণ্যের চাহিদার সূচনা হয়, সেখানে পণ্যের উপস্থিতি ঘটে। এভাবে বিপণন কারবারে সজীবতা ও সরলতা আনে।

(২) বিপণন বিরাট চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে : বর্তমানে নানাবিধ পণ্য বিরাট আকারে উৎপাদিত হয়। ফলে এই পণ্য বিরাট আকারে বিক্রয় হওয়া প্রয়োজন। ফলে দেখা যায় একদিকে যেমন উৎপাদক নানাবিধ পণ্য উৎপাদনের কাজে লিপ্ত থাকে তেমনি নানা ক্রেতাও এই যোগান পাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। বিপণন এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। অর্থাৎ একদিকে অগণিত উৎপাদক ও তাদের বিরাট যোগান আর অন্যদিকে অগণিত ক্রেতা ও তাদের বিরাট চাহিদা, এদের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন ও ভারসাম্য রক্ষা বিপণনই করে থাকে।

(৩) **বিপণন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পণ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করে :** উৎপাদক নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, ওই পণ্য কীভাবে ক্রেতারা পেতে পারেন বা ঐ পণ্য কী কাজে লাগবে তার ব্যবস্থা করতে হয়। বিপণন এই ব্যবস্থা করে। ফলে উৎপাদক নিশ্চিন্তভাবে তার কাজ করতে পারে। এবং ক্রেতারাও পণ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকেন। অর্থাৎ উভয়েরই কাজ বিপণনের সাহায্যে ঠিকভাবে চলে বলে উৎপাদনিক ও ক্রেতার মধ্যে একটা নিশ্চিত ভাব দেখা যায়।

(৪) **বিপণন বিভিন্ন মানুষের জীবিকা ও অভাব পূরণের কাজ সম্পন্ন করে :** বিপণনের কাজে বিভিন্ন ব্যক্তিরা নিযুক্ত হয়ে নিজেদের জীবিকা-নির্বাহ করে। বিপণনে কেউ উৎপাদক, কেউ পাইকার, কেউ দালাল, কেউ খুচরা দোকানদার প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হয়ে অর্থোপার্জন করে নিজেদের জীবিকা-নির্বাহ করে আর নানারকম দ্রব্যের ভোক্তা হয়ে নিজেদের অভাব পূরণ করে।

(৫) **বিপণন চাহিদা সৃষ্টির দ্বারা সম্ভোগ-স্পৃহা পূরণ করে :** বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটায় পণ্য উৎপাদনও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যারা এই সকল পণ্য উৎপাদন করে তাদের এই আশা থাকে যে এই সকল উৎপাদিত পণ্য লোকের নানাবিধ ভোগস্পৃহা পূরণে সমর্থ হবে। অর্থাৎ বিপণন এদিকেও হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং চাহিদা সৃষ্টির দ্বারা ক্রেতাদের সম্ভোগ-স্পৃহা পূরণে সাহায্য করে।

(৬) **বিপণন ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে :** পণ্য উৎপাদন ঝুঁকির কাজ। যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা বিক্রয় হবে কিনা তার আশায় উৎপাদক পণ্য উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। বিপণনই উৎপাদককে এই ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা প্রদান করে এবং বিপণনের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে কারবারের ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৭) **বিপণন জীবনযাত্রার মান উন্নত করে :** অতীতে যখন মানুষের চাহিদা ছিল সীমিত তখন উৎপাদনের হার ছিল কম। আর জীবনযাত্রার মানও ছিল অনুন্নত। উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনও বিভিন্নমুখী হতে পারে। বিপণন এই চাহিদা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং বিভিন্নমুখী পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে, তাতে লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকারের বিপণন দ্বারা জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

(৮) **বিপণন চাহিদা পর্যবেক্ষণের কাজ সুগম করে :** শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে কলকারখানায় পণ্য উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হবে কিনা তা বিপণনই স্থির করে দেয়। ফলে পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা পর্যবেক্ষণের কাজ সুগম করাও বিপণনের একটি বিশেষ দিক।

(iii) **বিপণনের কাজ :** অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন—সকল উৎপাদনের একমাত্র সমাপ্তি ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভোগ। কিন্তু উৎপাদকের কাছ থেকে সম্ভোগকারীর কাছে পণ্য পৌঁছাতে হলে অনেকগুলি কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এই সকল কার্যকলাপই বিপণনের কার্যাবলী। এই কার্যাবলী সম্পর্কে কোনও লেখকই একমত নন। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মতকে একত্রিত করে যে সকল কার্যগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল :

(১) **ক্রয় :** ক্রয় বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উৎপাদককে উৎপাদন কার্যে লিপ্ত থাকতে হলে উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হয়। আবার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত থাকতে হলে তারা যে পণ্য বিক্রয় করবে তা তাদের ক্রয় করতে হবে। সুতরাং ক্রয় বিপণনের একটি কাজ। ক্রয়ের ওপর কারবারের মুনাফা নির্ভর করে। পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করবার সময় কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা, মান উৎকর্ষ পরিমাণ, মূল্য প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে তবেই কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে, নতুবা প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচামাল ক্রয় করলে তা নষ্ট হবে এবং তার ফলে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত

হবে। আবার প্রতিযোগিতার বাজারে কোন্ উৎস থেকে কোন্ কাঁচামাল ক্রয় করলে কম মূল্যে ভাল জিনিস পাওয়া যাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া কাঁচামাল ক্রয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পণ্য অধিক পরিমাণে গুদামজাতকরণ না করা হয়। কারণ অতিরিক্ত পণ্যের গুদামজাতকরণ কারবারে ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্যই সকল বিষয় চিন্তা করে পণ্য ক্রয় করতে হবে। যাতে অল্প মূল্যে সহজেই সুলভ পণ্য পাওয়া যায়।

(২) **একত্রীকরণ :** অনেক সময় উৎপাদন কার্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একাধিক জায়গা থেকে বা একাধিক সরবরাহকারীর কাছ থেকে ক্রয় করতে হয়। ফলে বিভিন্ন স্থান ও সরবরাহকারীর কাছ থেকে ক্রয় করা দ্রব্যাদি একস্থানে সংগ্রহ ও একত্রীকরণ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই একত্রীকরণ করার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে স্বল্পব্যয়ে সহজে এ কাজ করা যায়। তাছাড়া উৎপাদকও যে পণ্য বিক্রয় করবে তা একস্থানে থাকলে বিক্রয়ের কাজ সহজে তৎপরতার সঙ্গে করা সম্ভব হবে। পাইকার বা খুচরা ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন উৎস থেকে পণ্য সংগ্রহ করে তা একত্রিত করে। এতে কারবারের বিপণনের কাজ বিশেষভাবে সফল হয়।

(৩) **বিক্রয় :** বিক্রয় বিপণনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কারণ বিক্রয়ের সাফল্যের ওপর কারবারের সাফল্য নির্ভর করে। বিক্রয়কার্য তাই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনীয়। যে পণ্য বিক্রয় হবে, তা খরিদ্দারের প্রয়োজনীয় কিনা, তা তার পছন্দ-মাফিক কিনা এই সকল দিক থেকেই বিচার্য। কারবারের সাফল্যের জন্য বাজার সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণার মাধ্যমে চাহিদার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় এবং কোন্ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে, তাও জানা যায়। চাহিদার পূর্বানুমান কারবারের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। এছাড়া বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমও বিক্রয়ের সাফল্য আনে। দর্শন, নমুনা এবং বর্ণনার ভিত্তিতে দোকান থেকে এবং ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় উদ্যোগীর মারফতও বিক্রয় হয়। বিক্রয় যে ধরনেরই হোক না কেন, বিক্রয় বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন খরিদ্দার সৃষ্টির দিকে মনোযোগ রাখতে হবে। তাতেই কারবারে সাফল্য।

(৪) **পরিবহণ :** বিপণনের কাজ চালাতে পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাঁচামাল ক্রয় করে নির্দিষ্ট স্থানে আনার জন্য বা যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তা বাজারে আনার জন্য উন্নত ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। পণ্যের বাজার দেশে বা বিদেশে হতে পারে। তাই দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক পণ্য চলাচলের জন্য প্রয়োজন যানবাহন। আর যানবাহন যত উন্নত হবে পণ্য তত দ্রুত তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছাতে পারবে। মোটের ওপর বলা যায় পরিবহণ বিভিন্ন প্রকারের উপযোগিতা সৃষ্টি করে, পণ্য স্থানান্তরের দ্বারা এটি স্থানের উপযোগিতা সৃষ্টি করে, মালিকের নিকট মাল পৌঁছে দিয়ে স্বাধিকারের উপযোগিতা সৃষ্টি করে। দ্রুত পরিবহণের মাধ্যমে এটি সময়ের উপযোগিতাও সৃষ্টি করে। আবার বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহণ দ্বারা এটি পণ্য প্রচারের উপযোগিতা সৃষ্টি করে।

(৫) **গুদামজাতকরণ :** বিপণনের ব্যাপারে পণ্য গুদামজাতকরণ একটি বিশেষ কাজ। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করেই তা কাজে লাগে না বা উৎপাদিত পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথেই বিক্রয় হয়ে যায় না। প্রচুর পরিমাণে পণ্য সংগ্রহ বা উৎপাদন করলে তা ক্রমে ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়া হয়। যোগান দেবার আগে ঐ পণ্যসামগ্রীকে গুদামজাতকরণ করে রেখে দেওয়া হয়।

(৬) **অর্থসংস্থান :** উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য মালমশলা সংগ্রহ করতে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে পৌঁছে দিতে প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। উৎপাদনের জন্য যেমন অর্থ প্রয়োজন তেমনি পণ্য ধরে রাখা, খরিদ্দারদের কাছে পণ্য বিক্রয় করা, পরিবহণ-ব্যয় নির্বাহ করা, বিজ্ঞাপন-ব্যয় নির্বাহ করা, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া প্রভৃতি কাজে অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ-কারবারীরা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বা অর্থ-সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং পরে তা শোধ করে দেয়। সুতরাং দেখা গেল বিপণন কাজ চালানোর জন্য অর্থ-সংস্থান কত প্রয়োজন।

(৭) **পণ্যের মান নির্ণয় :** বিপণনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পণ্যের মান নির্ণয়। বিক্রয়ের পূর্বে উৎপাদিত পণ্যের মান উৎকৃষ্ট কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ মানের ওপর চাহিদা নির্ভর করে. মান যদি উন্নত ধরনের হয় তবে খরিদ্দার আকৃষ্ট হয় এবং চাহিদা বৃদ্ধি হয়। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও কারবার সমৃদ্ধ হয়।

(৮) **পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ :** কোনও উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার পূর্বে তা ক্রেতার ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা তা দেখা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর মাধ্যমে ক্রেতার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের উপযুক্ত পণ্য প্রস্তুত করা হয়। এতে ক্রেতা উৎসাহিত হয় ও পণ্য ক্রয়ে আগ্রহ দেখায়।

(৯) **মোড়কজাতকরণ :** উৎপাদিত পণ্য দূরে পাঠাতে মোড়কের প্রয়োজন। মোড়কটি তার আকার, আয়তন, সৌন্দর্য প্রভৃতির দ্বারা ক্রেতার মন জয় করলেই ক্রেতা পণ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয়, দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মোড়কের উপযুক্ততার দিকে দৃষ্টি দেওয়া বিপণনেরই কাজ। প্রকৃতি ও গুণাগুণ অনুযায়ী পণ্যের মোড়ক করা হয়।

(১০) **বণ্টন :** পণ্য-বণ্টন সাধারণত কোনও দোকান বা কারবার বা মধ্যস্থ কারবারীদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পণ্য বণ্টন-এর কাজ সুষ্ঠু হবে, কার মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করলে লাভ বেশি হবে তা স্থির করে বিপণনই।

(১১) **বিজ্ঞাপন :** বিজ্ঞাপন পণ্য-সামগ্রীর সাথে ক্রেতা সাধারণের পরিচয় ঘটায়। এর ফলে কোনও পণ্যের উপযোগিতা সম্পূর্কে সাধারণ মানুষ অবহিত হয় এবং দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে তার উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এতে কারবার সাফল্য লাভ করে।

(১২) **বীমাকরণ :** উৎপাদিত পণ্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাবার সময় বা গুদামে থাকার সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বীমা করা থাকলে ক্ষতি পূরণ হয়। সাধারণত আগুনে পুড়ে যাওয়া, জলে ডুবে যাওয়া, চুরি হয়ে যাওয়া প্রভৃতির ওপর বীমা করা হয়। তাই বিপণনকে পণ্যের বীমাকরণ দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

(১৩) **ঝুঁকিগ্রহণ :** বিপণনকে নানাধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়। এইগুলো যে কোনও সময়ে চাহিদার পরিবর্তন, স্থানের গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতার তীব্রতা, সরকারি আইনকানুনের আকস্মিকতা প্রভৃতি। তাছাড়া পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান, সেই সময়ে মূল্যের পরিবর্তনও পণ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সফল বিপণন ব্যবস্থা এই সকল ঝুঁকি অতিক্রম করে কারবারের উন্নতির পথ সুগম করে।

(১৪) **গবেষণা :** সাফল্যের জন্য বিপণনকে বাজার সম্পর্কে নানারকম তথ্য গবেষণার মাধ্যমে জানতে হয়। গবেষণা নানা প্রকারের। সম্ভোগকারীদের চাহিদার স্বরূপ কি, পণ্যের চাহিদা, পণ্যের মূল্যের গতিপ্রকৃতি, পণ্যের মানের উৎকর্ষ কিরূপে সম্ভব এইগুলি গবেষণার মাধ্যমে জানা গেলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিপণন কার্য সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। বিপণনের কাজ বহুমুখী। সাফল্যের সাথে এই কার্যগুলি নিষ্পন্ন হলেই কারবার ও তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

৭৯.৪.৩ আর্থিক কার্যক্ষেত্র

(i) **আর্থিক ব্যবস্থাপনা :** আর্থিক ব্যবস্থাপনার পরিধি খুবই বিস্তৃত। কোনও কারবার স্থাপন, মূলধন সংগ্রহ, সমস্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা, সংগঠনের কাঠামো যার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন হবে তা স্থির করা, প্রদান কর্মাধ্যক্ষদের

নির্বাচন-সংক্রান্ত সকল কর্তব্য ও কাজ, সাধারণ কর্মীদের নিয়োগ প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ এই ব্যবস্থাপনার মারফত হয়ে থাকে। এই সকল কাজকর্ম সাধনের মাধ্যমে কারবারের উদ্দেশ্য সাধন করাই এই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য। আর্থিক ব্যবস্থাপনা কি, তার পরিধি ও প্রকৃতি কি তা বোঝবার জন্য বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মত।

কোনও কোনও লেখকের মতে, অর্থ হচ্ছে প্রশাসনের এমন ক্ষেত্র অথবা এমন কতকগুলি প্রশাসনিক কার্য যা নগদ টাকা ও ঋণ সংস্থানের সঙ্গে জড়িত, যাতে প্রতিষ্ঠানটির যতদূর সম্ভব সন্তোষজন্কভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্থির করে নিতে পারে।

আবার কেউ বলেছেন, কারবারী অর্থ হচ্ছে সেই ধরনের কার্যকলাপ যা কারবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে এবং সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণে যে সকল মূলধনী তহবিল আবশ্যক সেগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে।

আবার অনেকের মতে আর্থিক ব্যবস্থাপক হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি সেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার ওপর লাভের পরিমাণ অথবা অর্থের সরবরাহ প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় 'অর্থ' এবং 'আর্থিক' ব্যবস্থাপনা একসূত্রে বাঁধা। আর্থিক ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন—কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্য উৎপাদন, শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরি প্রদান, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়, যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতিতে সেই অর্থের সুষ্ঠু প্রয়োগ। সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপরই কারবারের সাফল্য নির্ভর করে।

(ii) **আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও পরিধি :** আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আগে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজ খুব একটা বিস্তৃত ছিল না, কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন প্রথম আর্থিক ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত হয় তখন তার প্রকৃতি ছিল টাকা পয়সার হিসাব রাখা, তাদের বিবরণ প্রস্তুত করা, অর্থসংস্থানের উপায় বলে দেওয়া, নগদ অর্থের অবস্থা কিরূপ তা নির্ধারণ করা এবং কোনও পণ্য বা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অন্যান্য কর্মচারীদের হাতে অর্থ তুলে দেওয়া প্রভৃতি। কর্মচারীগণ সেই অর্থ কিভাবে খরচ করল তার দিকে আর্থিক ব্যবস্থাপক লক্ষ্য করতেন না। অর্থসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই ছিল আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল কাজ। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন কেবলমাত্র টাকা কিভাবে সংগ্রহ হচ্ছে তা দেখলেই চলবে না সেই অর্থ কিভাবে কোথায় কতটা খরচ হচ্ছে তারও হিসাব রাখতে হবে। কেবলমাত্র কর্মচারীর হাতে টাকা তুলে দিলেই হবে না, সেই কর্মচারী টাকার সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার করছে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারবারের স্বার্থেই এরূপ করতে হয়।

প্রকৃতি পরিবর্তনের সাথে সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনার কাজের পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রধান দুটি কাজ হচ্ছে—

(ক) প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অর্থের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বণ্টন।

(খ) অর্থের সংস্থানের ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সুবিধাজনক শর্ত আদায়।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কাজগুলি হচ্ছে :

(গ) নগদ অর্থ যাতে সহজে পাওয়া যায় তার জন্য নগদ অর্থ প্রবাহের অনুমান, অর্থসংগ্রহ ও আভ্যন্তরীণ তহবিলের সুষ্ঠু হিসাবনিকাশ।

(ঘ) লাভ যাতে সর্বাধিক হয় সেজন্য ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যৎ লাভের অনুমান, মূলধনের ব্যয় হিসাবরক্ষণ।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা ব্যয় যাতে সর্বনিম্ন হয় তার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাপকদের সাথে হাত মিলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাতে মুনাফা সর্বাধিক হয় এবং সকলের কাছ থেকে অর্থ সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করা।

সুতরাং আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও পরিধি পূর্বের তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনাকে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সবকিছুই করতে হচ্ছে আবার সাংগঠনিক ব্যাপারেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

(iii) **আর্থিক পরিকল্পনা :** কারবার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে স্থায়ী, চলতি, স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি প্রভৃতি নানারকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাই অর্থ। এই অর্থের যোগান মালিককেই করতে হয়। একক মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের দায় থাকে সীমিত। মালিকরাই মূলধনের যোগান দেয়। কিন্তু কারবারের আকার বড় হলে, বিশেষ করে যৌথ মূলধনী কারবারে কারখানা স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, সম্পত্তি ক্রয়, চলতি ব্যয় নির্বাহ, কারবারের উৎকর্ষ সাধন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তখন কেবলমাত্র মালিকরা এই অর্থ যোগান দিতে পারে না। অতীতে যখন শিল্প-বাণিজ্যের গণ্ডী ছিল সীমিত তখন মূলধন সংগ্রহে খুব একটা জটিলতা ছিল না। কিন্তু কারবারের আয়তন, প্রকৃতি ও পরিধির বিস্তৃতির সাথে সাথে মূলধনের যোগান বা মূলধন সংগ্রহ পদ্ধতিও জটিলতর হয়েছে। কিন্তু মূলধন যোগানের জন্য তাই প্রতিটি কারবারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। মূলধনের বিনিয়োগ ও সংগ্রহ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান ভিন্ন কোনও কারবারই স্থায়ী উন্নতিলাভ করতে পারে না। সুতরাং কারবার পরিচালনা করবার জন্য উপযুক্ত মূলধন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবমুখী এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(ক) **মূলধন কাঠামোর পরিকল্পনা :** মূলধন কাঠামো বলতে বোঝায় শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি নিয়ে যে মূলধন গঠিত হয় তার মোট মূল্য। অতিরিক্ত বা স্বল্প মূলধন কোনওটাই কারবারের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। মূলধন অতিরিক্ত হলে মূলধনের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ঘটে না। তার ফলে মূলধনের ওপর মুনাফার হার কম হয় এবং শেয়ারে মূল্য হ্রাস পায়। কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার স্বল্প মূলধন হলে কোনও কারবারকে কখনোই লাভজনকভাবে চালানো সম্ভব হয় না এবং কারখানার সম্প্রসারণে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং স্বাভাবিক মূলধন থাকাই কারবারের পক্ষে কাম্য। সুতরাং এমনভাবে মূলধন কাঠামো স্থির করতে হবে যাতে স্বাভাবিক মূলধনেরই যোগান হয়, অতিরিক্ত বা স্বল্প মূলধন না হয়ে যায়।

(খ) **মূলধনের প্রয়োজন স্থির করতে হবে :** কারবারের প্রবর্তন, স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়, কারবার পরিচালনার চলতি ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয়, সম্প্রসারণ ব্যয় প্রভৃতি খরচ চালানোর জন্য কি পরিমাণ এবং কতটা অর্থ প্রয়োজন তা স্থির করতে হবে। পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ দর্শন, গাণিতিক হিসাব প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে মূলধন নির্ণয় করতে হয়। আবার একই আকারের এবং একই প্রকৃতির বিভিন্ন চলতি কারবারের মূলধনের পরিমাণ বিচার-বিবেচনা করার সময় তুলনামূলক পদ্ধতিতে হিসাব করতে হয়। এইভাবে নানারকমভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে স্থির করতে হয় কতটা মূলধন প্রয়োজনীয়।

(গ) **মূলধন সংগ্রহ করবার পদ্ধতি :** কোনও কারবারের মূলধন বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়, যেমন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়, জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ, ব্যাঙ্ক বা বিভিন্ন অর্থ লগ্নি-সংস্থা থেকে ঋণ

সংগ্রহ কারবারের গতিপ্রকৃতির ওপর মূলধন সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ভর করে। যদি কারবারের অবস্থা উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় তবে ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করা যায়, আবার যদি মূলধনের বাজারে ফাটকা কারবারের প্রাধান্য দেখা যায় তবে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করা বেশি সুবিধাজনক। কেবলমাত্র একটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ যুক্তিযুক্ত নয়। বেশির ভাগ কারবারেই ডিবেঞ্চার ও শেয়ারের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত স্থির করে কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তা সংগ্রহ করলে কারবারের সুবিধা হয়।

(ঘ) **শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় :** কারবার স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় মালিকরাই বহন করে। কিন্তু তারপর যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তা তারা শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। শেয়ার ক্রেতারা যে অর্থ লগ্নি করে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তার পরিবর্তে তারা কারবারের মুনাফার একটি অংশ লভ্যাংশ হিসাবে পেয়ে থাকে। সাধারণ অর্থলগ্নী করতে ইচ্ছুক মানুষরাই শেয়ার ক্রয় করে আর ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ তাদের টাকার বিনিময়ে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে। সুতরাং কারবার শেয়ার বিক্রয় না ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করবে তা পরিকল্পনার মাধ্যমে কারবারের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী স্থির করতে হবে।

(iv) **মূলধনের উৎস :** কারবার পরিচালনার জন্য প্রধানত দুই ধরনের মূলধন প্রয়োজন। স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন। স্থায়ী মূলধনকে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন এবং চলতি মূলধনকে স্বল্পমেয়াদী মূলধনও বলা হয়। কারবার স্থাপন করার সময় জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি কেনবার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তা কোম্পানীর স্থায়ী মূলধন। আর কারবারী কাজ-কারবারগুলি পরিচালনা করবার জন্য যে মূলধনের প্রয়োজন তা চলতি মূলধন। যৌথ মূলধনী কারবারগুলি যে যে পদ্ধতিতে মূলধন সংগ্রহ করে সেগুলি ঃ

(১) **শেয়ার বিক্রয় :** যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ার বিক্রয় মূলধন সংগ্রহের প্রাথমিক সূত্র। কোম্পানীর মূলধনকে কতকগুলি শেয়ারে ভাগ করে প্রত্যেকটি শেয়ারের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা হয়। জনসাধারণ নিজেদের সামর্থ্য মত এই শেয়ার ক্রয় করে। এই শেয়ার ক্রেতাগণই কোম্পানীর মালিক। অন্যান্য কারবারে যেমন মালিকরা মূলধন সরবরাহ করে তেমনি এক্ষেত্রে কোম্পানীর অধিকাংশ মূলধন শেয়ার-গ্রহীতারাই সরবরাহ করে। ব্যাপক মালিকানার কোম্পানী বর্তমানে দুই ধরনের শেয়ার বিলি করতে পারে। যেমন—প্রেফারেন্স শেয়ার এবং ইকুইটি শেয়ার। প্রতি বৎসর প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিতে হয়। ইকুইটি শেয়ারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট থাকে না।

(২) **ডিবেঞ্চার বিক্রয় :** মূলধন সংগ্রহে শেয়ার বিক্রয়ের পরেই ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের স্থান। কোনও যৌথ কোম্পানী যখন কারও কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তার পরিবর্তে কোম্পানীর সীলমোহরাঙ্কিত দলিল ঋণদাতাকে দেয় সেই দলিলপত্রকে ডিবেঞ্চার বলে। ডিবেঞ্চার গ্রহীতারা তাদের অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। এরা কোম্পানীর উত্তমর্ণ, শেয়ার-গ্রহীতাদের মতো কোম্পানী মালিক নয়। কোম্পানীর মুনাফা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে এদের কোনও ভূমিকা থাকে না।

(৩) **ব্যাঙ্ক থেকে দাদন গ্রহণ :** কোনও কোম্পানীর জন্য যদি স্বল্প সময়ের জন্য মূলধনের অভাব ঘটে তবে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দাদন নিয়ে কোম্পানীর সে অভাব পূরণ করা যায়। স্বল্পমেয়াদি দাদন দেওয়া ব্যাঙ্কের অন্যতম ব্যবসা ও কাজ। ব্যাঙ্ক এইরকম দাদনের নিরাপত্তার জন্য জামিন হিসাবে শেয়ার, কোম্পানির কাগজ বা কাঁচামাল প্রভৃতি দাবি করে থাকে। যে দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা যত উন্নত সেই দেশে শিল্প-প্রচেষ্টা তত দ্রুত প্রসার লাভ করে। কারণ ব্যাঙ্ক এইভাবে দাদন দিয়ে শিল্প-প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেয়।

(৪) **আমানত :** বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক কোম্পানী জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে মূলধনের অভাব পূরণ করে থাকে। সাধারণত জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এই মূলধনের অভাব পূরণ করা হয়ে থাকে। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই ও আমেদাবাদে কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এভাবেই শিল্পের অনেকটা প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে।

(৫) **মূলধনী সংস্থা :** ব্যাঙ্ক ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা আর্থিক, বীমাকারী, অর্থ লগ্নীকারী, প্রভৃতিও মূলধন সরবরাহ করে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি মূলধনী সংস্থাগুলি যৌথ কোম্পানীগুলির প্রয়োজনে মূলধন বাবদ ঋণ প্রদান করে। কোনও কোম্পানী তার স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সকল মূলধনী সংস্থাগুলি থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। এই সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায়, বর্তমানে শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মূলধনের যোগান পাওয়া অনেক সহজ।

(৬) **সংরক্ষণ তহবিল :** যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারগ্রহীতাদের মধ্যে ভাগ করে দেয় না। মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ তারা রেখে দেয় সংরক্ষণ তহবিল হিসাবে। ভবিষ্যতে যদি কোনও সময়ে হঠাৎ মূলধনের অভাব লক্ষ্য করা যায় তাহলে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান এই সংরক্ষণ তহবিলকে মূলধনে রূপান্তরিত করে। এইভাবে সংরক্ষণ তহবিলও যৌথ মূলধনী কারবারে মূলধনের উৎস।

(৭) **ঋণ গ্রহণ :** অনেক সময় যৌথ মূলধনী কোম্পানী তার স্থায়ী সম্পত্তির কিছুটা অংশ বন্ধক রেখে জনসাধারণ বা ব্যাঙ্ক বা কোনও অর্থলগ্নীকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে এবং এর সাহায্যে মূলধনের অভাব পূরণ করে থাকে। সাধারণত পুরাতন কোনও কোম্পানী বা কোনও সুনামযুক্ত কোম্পানীই এই ধরনের ঋণ পেয়ে থাকে। এই ঋণের বিনিময়ে কোম্পানীকে ঋণদাতাকে অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়ে থাকে।

৭৯.৪.৪ কারবারী কার্যক্ষেত্র

শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যগুলিকে বাজারে নিয়ে গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় কারবার। অর্থাৎ কারবারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ভোক্তা বা ভোগকারীদের নিকট পৌঁছে যায়। এই ক্রয় বিক্রয় দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাইরেও হতে পারে। অর্থাৎ পণ্য বিক্রয় দেশের অভ্যন্তরে হচ্ছে না বিদেশে হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে কারবারকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আভ্যন্তরীণ কারবার, (২) বৈদেশিক কারবার।

(১) **আভ্যন্তরীণ কারবার :** পণ্য ক্রয়-বিক্রয় যখন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে আভ্যন্তরীণ কারবার বলা হয়। দেশের এক অঞ্চল থেকে পণ্য ক্রয় করে সেই দেশেরই অন্য কোনও অঞ্চলে বিক্রয় করা আভ্যন্তরীণ কারবার। আভ্যন্তরীণ কারবার আবার দুই প্রকার। (ক) পাইকারী কারবার, (খ) খুচরা কারবার।

(ক) **পাইকারী কারবার :** যখন কোনও কারবারী কাঁচামাল বা উৎপাদিত পণ্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করে উৎপাদনকারীদের বা খুচরা ব্যবসায়ীদের বিক্রয় করে তখন তাকে বলা হয় পাইকারী কারবার। অনেক পাইকারী কারবারী পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় করে রাখে এবং পরে উৎপাদনকারীর নিকট বিক্রয় করে আবার অনেক পাইকারী কারবারী উৎপাদিত পণ্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে পরে খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে। এই ধরনের কারবারে কারবারীরা পাইকারী হারে পণ্য ক্রয় করলেও সব দ্রব্য যে একসাথে বিক্রয় করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বাজারের অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী এরা আস্তে আস্তে বিক্রয়ও করতে পারে। সাধারণত পাইকারী কারবার মধ্যস্থকারবার হিসাবে কাজ করে।

(i) **পাইকারী কারবারের উপযোগিতা :**

(১) বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন কারবার লক্ষ্য করা যায়। এই কারবারে প্রচুর পরিমাণে পণ্য একসাথে উৎপাদিত হয়। সেই উৎপাদিত পণ্য সত্বর বিক্রয় করতে না পারলে পরবর্তী উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার উৎপাদন কমে গেলে মূলধনের আবর্তনও কমে যায়। ফলে কারবার বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। পাইকারী কারবার মধ্যস্থ কারবার হিসাবে উৎপাদিত পণ্য কিনে নেওয়ায় উৎপাদনকারীরা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুফল ভোগ করতে পারে।

(২) পাইকারী কারবারীগণ উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করে তা গুদামজাত করে রাখে। অর্থাৎ উৎপাদনকারীদের দ্রব্য উৎপাদন করার পর তা গুদামজাত করে রাখার কথা চিন্তা করতে হয় না। গুদাম তৈরির জন্য তাদের যে অতিরিক্ত খরচ করতে হত তা করতে হয় না। সেই অতিরিক্ত টাকা উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে পারে। এতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়।

(৩) পণ্য উৎপাদনের সাথে সাথে পাইকারীরা তা ক্রয় করে নেওয়ার ফলে উৎপাদিত পণ্য কোথায়, কিভাবে বিক্রয় হবে তা চিন্তা না করেই উৎপাদনকারীরা নিশ্চিন্তভাবে উৎপাদনের কাজে মনোনিবেশ করতে পারে। ফলে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ দুটিরই উন্নতি ঘটে।

(৪) পাইকারী কারবারীরা সবসময় বাজারের অবস্থা, চাহিদা এবং চাহিদার গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনা করে থাকে, ফলে বাজারের অবস্থা, ভোগকারীর রুচি ইত্যাদি বিষয়ে কারবারীরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকে। ফলে উৎপাদনকারীরা সহজেই মানুষের রুচি, চাহিদা প্রভৃতি বিষয় জানতে পারে এবং পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

(৫) উৎপাদনকারীরা পণ্য উৎপাদনের সময়ই যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে থাকে। আবার যে পণ্য উৎপাদিত হল তা বিক্রয় হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। পাইকারী ব্যবসায়ীরা পণ্য উৎপাদনকারীগণের ঝুঁকি নিজেদের ওপর টেনে নেয়। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই পাইকারী কারবারীগণ পণ্য ক্রয় করে নেয়, ভবিষ্যতে বিক্রয়ের অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনা পণ্য উৎপাদনকারীকে ভোগ করতে হয় না।

(৬) পাইকারী কারবারীগণ বাজারের অবস্থা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনকারীকে পণ্য উৎপাদন করতে পরামর্শ দেয়। তাই উৎপাদনকারী চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে এই সামঞ্জস্যের জন্য বাজারে মূল্যের সমতা বজায় থাকে।

(৭) পাইকারী কারবারীগণ পণ্য উৎপাদকের কাছ থেকে দ্রব্য ক্রয় করে রাখে এবং খুচরা কারবারীদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ফলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় ভোগকারীগণ তাদের প্রয়োজনমত দ্রব্য পেতে পারে।

(৮) বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াতে হলে এবং নূতন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করতে হলে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের প্রয়োজন হয়। পাইকারী কারবারীগণ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য করে থাকে। ফলে উৎপাদনকারীকে বা খুচরা ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের ব্যয় বিশেষ করতে হয় না।

(৯) বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে বাড়ান যায় এবং নূতন দ্রব্যের চাহিদা কিভাবে সৃষ্টি করতে হয়, সেই সকল বিষয়ে গবেষণা-সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যয় পাইকারী ব্যবসায়ীগণ করে থাকে।

(ii) **পাইকারী কারবারের শ্রেণীবিভাগ :** পাইকারী কারবারের প্রকৃতি অনুযায়ী পাইকারী কারবারকে প্রধানত ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **এক পণ্যের পাইকারী কারবার :** একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে।

(২) **সাধারণ পণ্যের পাইকারী কারবার :** বহুবিধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে।

(৩) **জাতীয় পাইকারী কারবার :** যখন কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি মাত্র পাইকারী কারবারী থাকে, তখন তাকে আঞ্চলিক পাইকারী কারবারী বলা হয়। সাধারণত একটি অঞ্চলে একটির বেশি পাইকারী কারবারী থাকে না। এই কারবারীরা এক পণ্যের পাইকারী কারবারী অথবা সাধারণ পণ্যের পাইকারী কারবারী হতে পারে।

(৪) **আঞ্চলিক পাইকারী কারবার :** যখন কোনও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি মাত্র পাইকারী কারবারী থাকে, তখন তাকে আঞ্চলিক পাইকারী কারবারী বলা হয়। সাধারণত একটি অঞ্চলে একটির বেশি পাইকারী কারবারী থাকে না। এই কারবারীরা এক পণ্যের পাইকারী কারবারী অথবা সাধারণ পণ্যের পাইকারী কারবারী হতে পারে।

(৫) **নগদান পাইকারী কারবার :** যে পাইকারী কারবার ধারে ক্রয়ের সুযোগ দেয় না, কেবলমাত্র নগদ বিক্রয় করে, সেই পাইকারী কারবারকে নগদান পাইকারী কারবার বলা হয়।

(৬) **ক্ষুদ্র পাইকারী কারবার :** যখন কোনও পাইকারী কারবার আয়তনে খুব ছোট হয় এবং অল্প মূলধনে গঠিত হয় তখন তাকে ক্ষুদ্র পাইকারী কারবার বলা হয়। এই কারবারে সাধারণত একটি মাত্র পণ্যই ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং একজন মাত্র উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করা হয়।

পাইকারী কারবারী উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে মধ্যস্থকারবারীর কাজ করে। এরা প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় এবং বাজারে তা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাজারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে বলে পাইকারীরা অনেক সময়ই দুর্নীতির সাহায্য নিয়ে থাকে। এরা অন্যায়ভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। এর ফলে তাদের মুনাফা অধিক হারে হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের ঘাটতি সৃষ্টি করে সরবরাহ হ্রাস করেও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাইকারী কারবারীরা দ্রব্যে ভেজাল মেশায়। অর্থাৎ খাঁটি দ্রব্য বা আসল দ্রব্য ক্রেতারা পাচ্ছে না। এতে উৎপাদক ও ক্রেতারা দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অর্থাৎ কিনা বলা যায় পাইকারী কারবারের যেমন সুফল বা উপযোগিতা থাকে তেমনি কিছু কুফলও থাকে। এই কুফলের ফলে ক্রেতাদের যেমন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তেমনি উৎপাদকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই উৎপাদন ও বণ্টন উভয়কেই রাষ্ট্রায়ত্ত করে এই মধ্যস্থকারবারীদের বিলোপসাধন করতে হবে। নতুবা এরা সমাজের অপরিহার্য পরগাছা হিসাবে স্বীকৃত হতেই থাকে। তাছাড়া এই কারবারের হাত থেকে বাঁচার জন্য আরও বেশি পরিমাণে বহুশাখা বিপণি, সমবায় বিপণি, বিক্রয় সংঘ প্রভৃতি চালু করতে হবে। অর্থাৎ কারবারে যতই মধ্যস্থকারবারীর হস্তক্ষেপ রোধ করা যাবে ততই কারবারের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং ক্রেতা ও উৎপাদকের মঙ্গল।

(খ) **খুচরা ব্যবসায়ী :** যে সকল ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পাইকারের কাছ থেকে অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয় করে সাধারণ ভোগকারীদের কাছে বিক্রয় করে তাদের খুচরা ব্যবসায়ী বলা হয়। সভ্যতার প্রথমে লগ্নীর সুযোগ ছিল কম তখন উৎপাদন ও বণ্টন একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। তখন এই খুচরা কারবারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেত।

বর্তমানেও খুচরা কারবার লক্ষ্য করা যায়। তবে পূর্বের মত এরা সরাসরিভাবে উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে সংযোগ-স্থাপন করতে পারে না। কারণ বর্তমানে উৎপাদক ও ভোগকারীদের মধ্যে পাইকারী কারবার এসে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

(i) **প্রয়োজনীয়তা :** ক্রেতারা বা ভোগকারীরা যাতে সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খুব কাছে এবং কোন-অসুবিধা ছাড়া পেতে পারে সেই জন্যই খুচরা কারবার ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে-গ্রামে বা পাড়ায়-পাড়ায় খুচরা কারবার রয়েছে। অনেক সময় খুচরা কারবারীরা ধারে মাল ক্রয় করতে পারে পাইকারীদের কাছ থেকে। আবার তারা ধারে মাল বিক্রয়ও করে থাকে। তবে ধারের মেয়াদ খুব কম হয়।

ক্রেতার রুচি ও পছন্দ অনুসারে দ্রব্য সরবরাহ করবার ক্ষমতার ওপর খুচরা কারবারের পক্ষে সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থাই কেবল নয় খুচরা কারবারীগণ যদি ব্যবহার দ্বারা ক্রেতাদের মুগ্ধ করতে পারে তাহলে কারবার বেশিমাত্রায় সাফল্য পাবে।

খুচরা কারবার কেবলমাত্র ছোট ছোট দোকানই করে থাকে না, বড় দোকানও খুচরা কারবার করতে পারে। দোকান বড় হলেও এরা অল্প পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে এবং ক্রেতার কাছেও অল্প পরিমাণে বিক্রয় করে। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়েও খুচরা কারবার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

খুচরা কারবারের কার্য ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ ঃ

(১) খুচরা কারবারীগণ উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সেতু রচনা করে।

(২) খুচরা কারবারী স্থানীয় চাহিদা মেটায় এবং ভোগকারীর পছন্দমত দ্রব্য সরবরাহ করে।

(৩) খুচরা কারবারীরা বিভিন্ন শ্রেণী ও গুণাগুণের এবং রকমারি পণ্য ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে ও তাদের প্রয়োজন মেটায়।

(৪) এরা গ্রামে বা শহরে সর্বত্র দোকান বা বিপণী স্থাপন করে ক্রেতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে।

(৫) ক্রেতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় এরা চাহিদা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে পাইকারী কারবার মারফত উৎপাদককে খবরাখবর দেয় ও উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে।

(৬) খুচরা কারবারী অনেক সময় জানাশোনা ক্রেতাকে ধারে পণ্য বিক্রয় করে ও ক্রেতাদের সাময়িক অসুবিধা দূর করে।

খুচরা কারবারের সংগঠন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেগুলি হল :

স্থান নির্বাচন : খুচরা কারবারীর দোকান ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়। কারণ এতে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। সাধারণত পল্লী অঞ্চলে বাজারে বা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এবং শহরে বড় রাস্তার মোড়ে এই প্রকার দোকান খোলা হয়।

পণ্যের যোগান : খুচরা কারবারীরা পাইকারী কারবারীদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে। এরা ভোগকারীর পছন্দ ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে পণ্য ক্রয় করে। যেখানে পণ্যের যোগান বেশি সেখানে খুচরা কারবার গড়ে ওঠে।

পণ্য বিক্রয় : খুচরা বিক্রয়ের সময় ক্রেতার সাথে ভাল ব্যবহার করলে ক্রেতারা খুশি হয়। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য আধুনিক সজ্জার দ্বারা দোকান সাজান হয়। এতে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

মূলধন : সাধারণত খুচরা কারবারে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। আবার বড় বড় বিভাগীয় বিপণিতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। এটি খুচরা কারবারের আয়তনের ওপর নির্ভর করে।

মালিকানা : খুচরা কারবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একমালিকী কারবার হয়ে থাকে। অনেক সময় অংশীদারী, একান্নবর্তী পারিবারিক কারবার এবং কোম্পানী অথবা সমবায় সমিতি হিসাবেও এর মালিকানা দেখা যায়।

(iii) **খুচরা কারবারের ভাগ :** খুচরা কারবারকে তার প্রকৃতি ও আয়তন অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **একক খুচরা কারবার :** মালিক যখন একটি মাত্র দোকান স্থাপন করে নানাবিধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাকে একক খুচরা কারবার বলে। পাড়ায় পাড়ায় যে সকল মুদি, মশলা ও মনোহারীর দোকান দেখা যায় তা একক খুচরা কারবারের উদাহরণ।

(২) **বিশিষ্ট খুচরা কারবার :** যখন কোনও খুচরা কারবারে একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তখন তাকে বিশিষ্ট খুচরা কারবার বলা হয়। এতে খুচরা কারবারীরা একটি মাত্র পণ্য বিভিন্ন পাইকারের কাছ থেকে ক্রয় করে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে তা বিক্রয় করে। এই কারবারের বিভিন্ন উৎপাদকের তৈরি একই প্রকার দ্রব্য একটি দোকানেই পাওয়া যায়। ফলে ক্রেতা তার রুচি ও পছন্দমতো দ্রব্য বেছে নেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ছিটকাপড়ের দোকান, শিশুদের পোশাক তৈরির দোকান প্রভৃতি বিশিষ্ট খুচরা কারবারের উদাহরণ।

(৩) **বিভাগীয় বিপণি :** যখন একটি কারবারের মধ্যে কয়েকটি বিভাগ তৈরি করে এক-একটি বিভাগ থেকে এক-একটি প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করা হয়, তখন তাকে বিভাগীয় বিপণি বলা হয়। বর্তমানে বড় বড় শহরে এই ধরনের বিপণি দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কলকাতার কমলালয় ষ্টোর্স। এখানে প্রায় ৩০টির বেশি বিভাগ ছিল। এবং এক একটি বিভাগ থেকে এক-একটি দ্রব্য বিক্রয় করা হত। এই জাতীয় বিপণির ফলে ক্রেতারা একই দোকান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে।

(৪) **বহু শাখা বিপণি :** উৎপাদনকারীরা যখন নিজেরাই দেশের বিভিন্ন অংশে এবং শহর ও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় খুচরা দোকান খুলে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে, তখন তাকে বহু শাখা বিপণি বলে। সাধারণত উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রয় করতে পারে না। ফলে ভোগকারীর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুবই কম ঘটে। ফলে তারা খুব একটা বেশি মুনাফা লাভ করতে পারে না। কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য যদি তারা সরাসরিই বিক্রয় করতে পারে তাহলে তাদের মুনাফাও বেশি হয়। ফলে উৎপাদকরা একত্রিত হয়ে কিছু কিছু অঞ্চলে এই ধরনের বিপণি গড়ে তোলেন। যেমন :—কলিকাতা শহরের প্রায় প্রত্যেকটি এলাকায়ই এক বা একাধিক বাটার জুতার দোকান দেখা যায়। এটি বহু শাখা বিপণির উদাহরণ।

(৫) **বৈদেশিক কারবার :** কোনও দেশ যখন তার ভৌগোলিক সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয় অথবা সেবা বিনিময় করে, তখন তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারত ও গ্রেট ব্রিটেন—এই দুই দেশের মধ্যে যে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় অথবা আদান প্রদান হয়, তা হল বৈদেশিক বাণিজ্যের উদাহরণ।

(i) **বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রেণীবিভাগ :** বাণিজ্যের বা কারবারের গতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী বৈদেশিক কারবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(১) আমদানি বাণিজ্য, (২) রপ্তানি বাণিজ্য, (৩) পুনঃরপ্তানী অথবা আড়তদারী বাণিজ্য।

(১) **আমদানি বাণিজ্য :** যখন কোনও দেশ অন্য কোনও দেশ থেকে দ্রব্য নিজ দেশে নিয়ে আসে তখন তাকে আমদানি বাণিজ্য বলা হয়। যেমন—বিদেশ থেকে ভারত যে ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য আমদানি করে তা আমদানি বাণিজ্যের উদাহরণ।

(২) **রপ্তানি বাণিজ্য :** যখন কোনও দেশ তার নিজ দেশে উৎপাদিত পণ্য অন্য কোনও দেশে বিক্রয় করে বা সেবা পরিবেশন করে তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। যেমন—দেশে উৎপাদিত কার্পাস-বয়নশিল্প বিদেশে রপ্তানি করা হল রপ্তানি বাণিজ্যের উদাহরণ।

(৩) **পুনঃরপ্তানী বাণিজ্য :** যখন কোনও দেশ অন্য কেটি দেশ থেকে পণ্য আমদানী করে তা অপর কোনও দেশে রপ্তানি করে, তখন তাকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য বলে। এই বাণিজ্যে যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তা সেই দেশে উৎপাদিত হয় না। অন্য দেশ থেকে কিনে অপর দেশে বিক্রয় করা হয়।

(ii) **বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য :**

(১) বৈদেশিক বাণিজ্যে একটি দেশ অপর একটি দেশ থেকে পণ্যসামগ্রী সেবা আমদানি অথবা রপ্তানি করে।

(২) পণ্যটি যে দেশে উৎপাদিত হয়, সেই দেশে বিক্রয় করা হয় না, অন্য দেশের অধিবাসীরা তা ভোগ করে।

(৩) এই বাণিজ্য সাধারণত সমুদ্রপথে ও আকাশপথে চলে।

(৪) বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই রপ্তানি ও আমদানি ব্যবসা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৫) আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী উভয় দেশের আইন কানুন ও রীতিনীতি এই বাণিজ্যের ওপর প্রযোজ্য।

(৬) বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বৈদেশিক বাণিজ্যিক হুণ্ডি অথবা স্বর্ণের মাধ্যমে মুল্যপ্রদান করা হয়।

(৭) বৈদেশিক বাণিজ্যে শ্রম ও মূলধনের গতাগতি সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

(৮) লেনদেন হয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে।

(৯) সীমান্ত অতিক্রম করে এই ব্যবসা চলে।

(১০) এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারীরা পাইকারী কারবারী।

৭৯.৫ বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

আমদানী প্রণালী (Import Procedure) : যে প্রকার পণ্য বা মালই হোক না কেন সমুদ্রপথে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হলে সাধারণভাবে কতকগুলি পন্থা ও আইনকানুন মেনে চলতে হয়। সেগুলি হল :

(i) **লাইসেন্স :** বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সাধারণভাবেই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দেশেও বৈদেশিক বাণিজ্য করতে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। তবে পণ্য দ্রব্য সাধারণ লাইসেন্সের (O.G.L) অন্তর্ভুক্ত হলে লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না।

(ii) **অর্ডার :** লাইসেন্স পাবার পর রপ্তানিকারকের কাছে মালের বিস্তৃত বিবরণসহ মালের অর্ডার পেশ করতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইলে অর্ডারে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করে চলে। মালের জন্য অগ্রিম দিতে হবে কিনা, কবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে সে বিষয়ে পত্র-বিনিময় দ্বারা মীমাংসার প্রয়োজন।

(iii) **ঋণের নির্দেশপত্র :** মালের মূল্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে রপ্তানিকারকের সংশয় দূর করার জন্য তাকে ব্যাঙ্কের মারফত “ঋণের নিদর্শনপত্র” দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) **বিনিময় হার বুকিং :** মালের অর্ডার দেওয়া সম্পূর্ণ হলে তার সাথে মুদ্রার বিনিময় হার স্থির করে নিতে হবে। এতে ভবিষ্যতে বিনিময় হারের রদবদল হলে কারও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

(v) **বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তি :** প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করতে হবে। সুতরাং কেবলমাত্র বিনিময় হার স্থির করলেই চলবে না, তা প্রয়োজনমতো পাওয়া যাবে কিনা তার অনুমোদনও লাভ করতে হবে।

(vi) **দলিল প্রাপ্তি :** উপরের সকলপ্রকার কাজ সমাপ্ত হলে মাল পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া মাল খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল-পত্রাদি যেমন—চালান, চালানী রসিদ, বাণিজ্য হুণ্ডি প্রভৃতি রপ্তানিকারকের কাছ থেকে পেতে হবে।

(vii) **মাল খালাস :** দলিল পত্রাদি পাবার পর মাল বন্দরে পৌঁছালে জাহাজ থেকে মাল খালাসের জন্য তৎপর হতে হবে। মালের আমদানি শুল্ক প্রথমেই শুল্ক অফিসে জমা দিতে হবে। আমদানিকৃত জিনিসের বিস্তৃত বিবরণ শুল্ক অফিসে জমা দিতে হবে। শুল্ক-নির্ধারণ ও শুল্ক-প্রদান শেষ হলে জাহাজে চালানি রসিদ দেখিয়ে মাল খালাস করে আমদানিকারকের গুদামে মাল রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(viii) **বন্ধকী গুদামে মাল :** মাল খালাসের সময় শুল্ক দেওয়া সম্ভব না হলে গুদাম ভাড়া দিয়ে শুল্ক বিভাগের "বন্ধকী গুদামে" মাল সাময়িকভাবে রাখতে হয়। পরে শুল্ক-প্রদান করে মাল গুদাম থেকে নিয়ে যাওয়া যায়।

(ix) **ব্যাঙ্কের সাহায্য :** শুল্ক ইত্যাদি দিতে না পারলে অনেক সময় ব্যাঙ্ক "বন্ধকীপত্রের" বিনিময়ে মাল খালাস করে নেয়। পরে ব্যাঙ্ক টাকা শোধ করে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে মাল নিজের হেফাজতে নেওয়া যায়।

(x) **মালখালাস প্রতিনিধির সাহায্যে :** যদি আমদানিকারক মালখালাস-এর হাঙ্গামা নিতে না চায় তবে মালখালাস প্রতিনিধির সাহায্যে তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

(xi) **লেনদেনের পরিসমাপ্তি :** অর্ডার অনুযায়ী মাল পেয়ে গেলে এইরকম কোনও নির্দিষ্ট মাল আমদানি কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্ডার অনুযায়ী মাল না পেলে, ওজনের হেরফের হলে বা মাল নিকৃষ্ট শ্রেণীর হলে তা সমাধানের জন্য রপ্তানিকারকের সাহায্যে পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হয়।

(i) **ক্ষতিপূরণ দাবি :** যদি মাল আমদানি করার সময় আকস্মিক বিপদে জাহাজের মালের ক্ষতি হয় এবং মালের জন্য যদি বীমা করা থাকে তাহলে বীমাকারী কোম্পানীর কাছে ক্ষতিগ্রস্ত মালের দাবি উপস্থিত করে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে হয়।

রপ্তানি প্রণালী (Export Procedure)

কোনও রপ্তানিকারক দ্রব্য রপ্তানি করতে চাইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসরণ করতে হয় :

(i) **অর্ডার :** প্রথমে আমদানিকারকের কাছ থেকে মালের বিস্তৃত অর্ডার পেতে হবে। অর্ডার মনের মতো হলে মাল পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা পত্র দ্বারা অর্ডার প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

(ii) **ঋণের নিদর্শন-পত্র :** মালের মূল্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক মারফত ঋণের নিদর্শনপত্র পাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) **বিনিময় হার নির্ধারণ :** কোনও কারণে মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের জন্য যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য পূর্বেই দ্রব্যের বিনিময় হার নির্ধারণ করে নিতে হবে।

(iv) **জাহাজে স্থান সংরক্ষণ :** নির্দিষ্ট সময়ে যাতে মাল প্রেরণের কোনও অসুবিধা না হয়, সেজন্য জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে পূর্বেই জাহাজে স্থান সংরক্ষণ করে রাখতে হয়।

(v) **পণ্য মোড়াই :** সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে গেলে পণ্য মোড়াই ও বাছাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়। মোড়াইয়ের ওপর প্রাপকের নাম, ঠিকানা প্রভৃতি পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। এরপর জাহাজে মাল বোঝাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা রপ্তানিকারক নিজে কিংবা কোনও ঠিকাদারকে দিয়েও করাতে পারেন। মাল বাছাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় কয়েক কপি ও চালান প্রস্তুত করে রাখা উচিত।

(vi) **শুল্ক বিভাগীয় চালনা :** মাল জাহাজে বোঝাই করবার পূর্বে শুল্ক অফিসের কাছ থেকে অনুমতিপত্র গ্রহণ করতে হবে। এজন্য রপ্তানিকারককে শুল্ক বিভাগীয় একখানা চালান পূরণ করতে হবে।

(vii) **ওজনের প্রমাণপত্র :** মাল জাহাজে বোঝাই করবার পূর্বে মালগুলি ওজনের প্রয়োজন। ঐ মাল ওজনের জন্য শুল্ক বিভাগের পৃথক ব্যবস্থা আছে। মাল ওজনের পর ওজনের প্রমাণপত্র পাওয়া যায়, এতে মালের মাশুল, শুল্ক প্রভৃতি স্থির করতে সুবিধা হয়।

(viii) **শুল্ক প্রদান :** মাল ওজন করবার পর শুল্ক বিভাগে মালের উপযুক্ত বিবরণ দেখিয়ে প্রয়োজনীয় 'রপ্তানী শুল্ক' এবং জাহাজঘাটায় ভাড়া দেওয়ার পর জাহাজে মাল বোঝাই করবার ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

(ix) **সহ-অধ্যক্ষের রসিদ :** উক্ত নিয়মানুযায়ী সব কিছু করার পর জাহাজের 'সহ অধ্যক্ষের রসিদ' পাওয়া যায়। এটি হল জাহাজে মাল বোঝাইয়ের স্বীকারপত্র। জাহাজে মাল বোঝাই সম্পূর্ণ হলে তবেই এটি পাওয়া যায়।

(x) **চালানী রসিদ :** সহ অধ্যক্ষের রসিদ ও চালান দেখিয়ে মালের মাশুল অর্থাৎ মাল বোঝাইয়ের খরচ দিয়ে দিলে চালানী রসিদ পাওয়া যায়। এটিই জাহাজের মালবহনের চুক্তিপত্র।

(xi) **নৌ-বীমা :** আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনায় মাল যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে যাতে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তার জন্য নৌ-বীমা করা প্রয়োজন। চালানী রসিদ ও মালের চালান দেখিয়ে নৌ-বীমা করা হয়। নৌ-বীমার অফিস থেকে মালের ওজন ও অন্যান্য তথ্যাদি পরীক্ষা করে বীমা মাশুলের বিনিময়ে নৌ বীমাপত্র পাওয়া যায়।

(xii) **অন্যান্য দলিল :** অনেক সময় প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যদূতের চালান সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়াও টাকা প্রাপ্তির জন্য বাণিজ্য হুন্ডি প্রস্তুত করতে হয়। বাণিজ্য হুন্ডি স্বীকৃতি সাপেক্ষ এবং পরিশোধ সাপেক্ষ যে কোনও ধরনের হতে পারে।

(xiii) **মাল বা পণ্য প্রেরণ :** উপরিউক্ত সমস্ত কার্য সম্পাদন হয়ে গেলে মাল বা পণ্য আমদানিকারকের কাছে প্রেরণ করা হয়। এই সময় মালের সাথে রসিদ, নৌ-বীমা পত্র, চালানী রসিদ প্রভৃতি আমদানিকারককে পাঠিয়ে দিতে হয়। এগুলি সাধারণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

(xiv) **বাণিজ্য হুন্ডি ভাঙ্গানো :** বাণিজ্য হুন্ডি ভাঙানো হচ্ছে রপ্তানিকারকের শেষ কাজ। রপ্তানিকারকের দেশস্থ ব্যাঙ্ক মালের স্বত্বের দলিলসহ বাণিজ্য হুন্ডি আমদানিকারকের দেশস্থ শাখা ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো হয়। সেই ব্যাঙ্ক আমদানিকারককে মালের স্বত্বের দলিল দিয়ে মালের মূল্য গ্রহণ করে। হুন্ডি স্বীকৃতি সাপেক্ষ হলে হুন্ডি স্বীকারের পর এবং পরিশোধ সাপেক্ষ হলে হুন্ডির টাকা দেওয়ার পর আমদানিকারককে স্বত্বের দলিল দেওয়া হয়। কোনও কারণে যদি আমদানিকারক টাকা পরিশোধ না করে তবে ব্যাঙ্ক মালের বন্ধকীপত্র আদায় করে, মাল বিক্রয় করে টাকা আদায় করে নেয়।

এইভাবে কোনও পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করার জন্য উপরে উল্লিখিত নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। এই সকল নিয়মের কোনও একটির ব্যতিক্রম ঘটলে আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য সম্পূর্ণ হয় না। ফলে এই সকল নিয়মাবলী মেনে চলতেই হয়।

৭৯.৬ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে কারবারের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রূপ। কারবার সংগঠনের বিভিন্ন রূপ যেমন—একমালিকী কারবার, হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথ মূলধনী কারবার, সমবায় সমিতি কাদের বলা হয়, এগুলির সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে এই এককে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও এই এককে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রগুলি—যেমন উৎপাদন বা সৃজন শিল্প সংক্রান্ত, বিপণন সংক্রান্ত, আর্থিক ক্ষেত্র সংক্রান্ত, কারবারী কার্যক্ষেত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য কি এবং কিভাবে গড়ে ওঠে এর প্রয়োজনীয়তা কি সে সম্পর্কেও পাঠকদের সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়মাবলীও এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এই এককে কিভাবে সংগঠন গড়ে ওঠে, কিভাবে সেগুলি বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে নিজেদের কার্যকলাপ বিস্তার করে, কিভাবে তারা আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হয় সেই বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা হয়েছে।

৭৯.৭ অনুশীলনী

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্নগুলির উত্তর দিন :

(১) সংগঠনের প্রকৃতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(২) সংগঠনের বিভিন্ন রূপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(৩) একমালিকী কারবার কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

(৪) যৌথ মূলধনী কারবার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

(৫) হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার এবং সমবায় সমিতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লিখুন।

(৬) অংশীদারী কারবার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৭) কারবারী সংগঠনের বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্ষেত্রগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

(৮) সৃজন-শিল্পের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লিখুন।

(৯) বিপণন কাকে বলে? বিপণনের গুরুত্ব ও কাজ সম্পর্কে লিখুন।

(১০) আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি ও পরিধি লিখুন।

(১১) আর্থিক পরিকল্পনা কী? মূলধনের উৎসগুলি বিস্তৃতভাবে লিখুন।

(১২) কারবারী কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(১৩) আভ্যন্তরীণ কারবার কাকে বলে? এর ভাগগুলি কী কী? এই ভাগগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।

(১৪) বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর উল্লেখ করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(১) খুচরা কারবারের বিভিন্ন ভাগগুলি কী কী?

(২) বৈদেশিক কারবার কাকে বলে? এই বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(৩) পাইকারী কারবার কাকে বলে? এর উপযোগিতা লিখুন।

(৪) সৃজন-শিল্পে কারখানা স্থাপনের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে কী জানেন?

(৫) সমবায় সমিতি কাকে বলে?

(৬) কারবারের প্রকৃতি কাকে বলে?

(গ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

(১) একমালিকী কারবার।

(২) অংশীদারী কারবার।

(৩) হিন্দু অবিভক্ত পারিবারিক কারবার।

(৪) যৌথ মূলধনী কারবার।

(৫) রাষ্ট্রীয় কারবার।

(৬) বিপণনের গুরুত্ব।

(৭) মূলধনের উৎস।

(৮) আভ্যন্তরীণ কারবার।

(৯) বৈদেশিক কারবার।

(১০) বিভাগীয় বিপণি।

(১১) বহুশাখা বিপণি।

(১২) আমদানি বাণিজ্য।

(১৩) রপ্তানি বাণিজ্য।

(ঘ) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(১) সংগঠনের একটি প্রকৃতি সম্পর্কে লিখুন।

(২) মানবিক সংগঠন কী?

(৩) উৎপাদনের কারিগরি দিক কী?

(৪) "বিপণন কারবারে সরলতা ও সজীবতা সৃষ্টি করে"—উক্তিটি খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(৫) বিপণনের কাজ হল "একত্রীকরণ"—এর অর্থ কী?

(৬) শেয়ার বিক্রয় কিভাবে মূলধনের উৎস তা লিখুন?

(৭) সংরক্ষণ তহবিল কী?

(৮) এক পণ্যের পাইকারী কারবার বলতে কী বোঝেন?

(৯) নগদান পাইকারী কারবার বলতে কী বোঝেন?

(১০) বহু শাখা বিপণি কী?

(১১) বিভাগীয় বিপণি কী?

(১২) বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করার সময় ঋণের নিদর্শন পত্র বলতে কী বোঝেন?

একক ৮০ ❑ কারবারী জোটবদ্ধকরণ

গঠন

৮০.০ উদ্দেশ্য

৮০.১ প্রস্তাবনা

৮০.২ কারবারী জোটবদ্ধকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৮০.৩ জোটের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ

৮০.৩.১ পূর্বাপর জোট

৮০.৩.২ সমান্তরাল জোট

৮০.৩.৩ পার্শ্বিক জোট

৮০.৩.৪ আঞ্চলিক জোট

৮০.৩.৫ বৃত্তাকার জোট

৮০.৩.৬ তির্যক জোট

৮০.৩.৭ ঐচ্ছিক এবং বাধ্যতামূলক জোট

৮০.৪ জোটের গঠনসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ

৮০.৪.১ সমিতিসমূহ

৮০.৪.২ কারবারী সংঘ

৮০.৪.৩ আংশিক সংহতি

৮০.৪.৪ পূর্ণ সংহতি

৮০.৫ ভারতে কারবারী জোটবদ্ধকরণ

৮০.৬ বহুজাতিক কোম্পানী

৮০.৭ ভারতে জোটবদ্ধকরণে সরকারি নীতি

৮০.৮ সারাংশ

৮০.৯ অনুশীলনী

৮০.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল কারবারী জোটবদ্ধকরণ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ কারবারী জোটবদ্ধকরণ কাকে বলে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, জোটের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ, জোটের গঠনসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ, প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের বৈশিষ্ট্যসমূহ, সুবিধা, অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করা। এছাড়াও ভারতে কারবারী জোটবদ্ধকরণ এবং সেই কারবারী জোটবদ্ধকরণে সরকারি নীতিসমূহ সম্পর্কে পাঠকদের একটি সম্যক ধারণা দেওয়াই হল এই এককের উদ্দেশ্য।

৮০.১ প্রস্তাবনা

যখন কতকগুলি একই স্বার্থবিশিষ্ট পৃথক পৃথক কারবারী সংস্থা কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়

তখন তাকে "কারবারী জোটবন্ধন" বলে। যে সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কারবারী জোটবন্ধন গড়ে ওঠে সেগুলি হল—প্রতিযোগিতা হ্রাস, ব্যয়সংকোচ, মূল্যস্থিরতা, বিক্রয়ের সুনিশ্চয়তা, অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন প্রভৃতি।

একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি কারবারী জোটবন্ধনের অর্থনৈতিক ফল। এই সকল জোট বিভিন্ন প্রকারের। কখনো বা এই জোট অলিখিত বা মৌখিক চুক্তি মাত্র। এই জোট অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ জোট। আবার কখনো এই জোট চূড়ান্তভাবে সুসংবদ্ধ। কারবারী জোটগুলি সাধারণত ঐচ্ছিক এবং আবশ্যিক দুরকমের হতে পারে। অধুনা কারবারী জগতে জোটগঠনের মানসিকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৮০.২ কারবারী জোটবদ্ধকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। কারবারী জোটগঠনের ফলে কারবার বৃহদায়তন হয়। চলতি পুঁজিও পরিমাণে বেশি হয় এবং ঋণ সংগ্রহ করা সহজ হয়।

২। চলতি পুঁজির পরিমাণ বেশি থাকায় জোটগুলিতে অত্যন্ত উচ্চমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হয়।

৩। কারবারী জোটগুলির মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকায় একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে (ক) কাঁচামাল ক্রয়, (খ) তৈরী পণ্য পরিবহণ ও বিক্রয়, (গ) অল্প দামে কাঁচামাল ক্রয়, (ঘ) অল্প ভাড়ায় পরিবহণ, (ঙ) বিজ্ঞাপনের গড়পড়তা ব্যয় হ্রাস—এই সুবিধাগুলি ভোগযোগ্য হয়।

৪। কারবারী জোটগঠনের ফলে ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা—কার্যে দক্ষতা বাড়ে এবং কারবারের স্থির খরচও হ্রাস পায়।

৫। কারবারী জোটের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং সহযোগিতার সূত্র সৃষ্টি হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সমস্যাগুলি সমাধানের সুবিধা এবং কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

৬। কারবারী জোটে উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার দাম কম হয়।

৭। প্রতিযোগিতার কারণে অনেক সময়েই কিছু দুর্বল প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বেকার সমস্যার আধিপত্য দেখা যায়। কারবারী জোটগঠনের ফলে এই সমস্যাগুলি কিছুটা এড়ানো সম্ভব হয়।

৮। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যেমন রেল পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতিতে প্রতিযোগিতা ক্ষতিকর। এখানে জোটবন্ধন দ্বারা একটি এলাকায় একটি প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকে। সুতরাং জনহিতকর কার্যে জোটবন্ধন বিশেষ উপকার সাধন করে থাকে।

৯। জোটগঠনের দ্বারা কারবারগুলি বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে যোগানের অনিশ্চয়তা কিছুটা হ্রাস পায়, বাজারে স্থিরতা আসে এবং উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে।

১০। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কারবারের মধ্যে জোটগঠন কারিগরি জ্ঞান ও পেটেন্ট বিনিময়ের জন্য লাভজনক।

১১। কারবারী জোটের আর্থিক সঙ্গতি বেশি থাকায় ব্যয়বহুল গবেষণার মাধ্যমে নতুন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং নতুন পণ্য উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

৮০.৩ জোটের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ

কারবারী জোট বিভিন্ন প্রকারের। এই জোট ঢিলেঢালা ধরনের শিথিল জোট থেকে একেবারে পূর্ণ সংহতি বা একীভূত জোট নানা প্রকারের হয়ে থাকে।

১। পূর্বাপর জোট।

২। সমান্তরাল জোট।

৩। পার্শ্বিক জোট।

৪। আঞ্চলিক জোট।

৫। বৃত্তাকার জোট।

৬। তির্যক জোট।

৭। ঐচ্ছিক জোট।

৮। বাধ্যতামূলক জোট।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন জোটগুলির মধ্যে পূর্বাপর জোট ও সমান্তরাল জোট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার ঐচ্ছিক জোট ও বাধ্যতামূলক জোটসমূহের মধ্যে অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হল—

৮০.৩.১ পূর্বাপর জোট

যে সকল ক্ষেত্রে পরিপূরক সম্পর্কযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পণ্য উৎপাদক অথবা একই পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিযুক্ত দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান সংঘবদ্ধ হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রের জোটকে পূর্বাপর জোট বলে। একে ভিন্নশিল্প জোটও বলে। অধ্যাপক রবিনসনের কথায়, পূর্বাপর জোট হল একই শিল্পে, পরপর বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির জোট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় উৎপাদিত হতে পারে। এবং ঐ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিক ও কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যোগান দিতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় যদি একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বা মালিকানায় থাকে তবে তাকে পূর্বাপর জোট বলা যায়। অর্থাৎ যদি লৌহ আকরিক, কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন একই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় এবং লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনও যদি সেই একই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় থাকে, তবেই তাকে পূর্বাপর জোট বলা হবে।

পূর্বাপর জোট আবার দু-প্রকারের :—

(ক) **সম্মুখগামী** (Forward) এবং (খ) **পশ্চাৎগামী** (Backward)।

(ক) যদি কোনও পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা কাঁচামাল উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে সম্মুখগামী পূর্বাপর জোট বলা হয়।

(খ) যদি কোনও কাঁচামাল উৎপাদনকারী সংস্থা, কোনও পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তাকে পশ্চাৎগামী পূর্বাপর জোট বলে।

ভারতের দৃষ্টান্ত :—ভারতের টাটা লৌহ-ইস্পাত কোম্পানী এই জাতীয় জোটের একটি নিদর্শন।

(i) **বৈশিষ্ট্য** :

(১) এই জোটে একটি গোটা শিল্পের পরপর কয়েকটি স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একই ছাদের নীচে, একই ব্যবস্থাপনায় বা একই মালিকানার অধীনে একত্রিত হয়ে থাকে।

(২) এই জোটের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির একের মোট উৎপাদিত পণ্য অন্যের সেটি কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) এই জোট যাদের দ্বারা গঠিত হয়, তারা কখনোই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অন্যের পরিপূরক।

(ii) **উদ্দেশ্য** :—এই জোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে আত্মনির্ভর হওয়া যাতে তার প্রাপ্তি বা মূল্য সম্পর্কে কোনও অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

(iii) **সুবিধা** :—

(১) পৃথক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের কাজগুলি পৃথকভাবে সম্পাদন করার জন্য যে অপচয় ঘটে, এই জোটের দ্বারা তা দূর করা সম্ভব হয়।

(২) একটি স্তরের যেটি কাঁচামাল অপর স্তরের সেটি উৎপাদিত পণ্য। ফলে এই জোটের কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য কোনও মধ্যস্থ কারবারীর প্রয়োজন হয় না। এছাড়া কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য খরচ এবং পরিবহণ খরচও হ্রাস পায়।

(৩) এই জোটের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় আবার বিক্রয় ব্যয় এবং বিজ্ঞাপনবাবদ ব্যয়ও কম হয়।

(৪) এই জোটের দ্বারা নির্দিষ্ট মানের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা সহজ হয়।

(৫) এই জোটের দ্বারা পুঁজিও বাঁচানো যায় আবার মজুতকরণের খরচও কম হয়।

(৬) পূর্বাপর কারবারী জোট মন্দা ও সংকটের আঘাত সহ্য করার মত শক্তি সংগ্রহ করতে পারে।

(iv) **অসুবিধা** :—

(১) এই জোটে খুব বেশি পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন। সবসময় কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ মূলধন যোগাড় করা কঠিন।

(২) সাধারণত বৃহদায়তন শিল্প ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে এই জোট সফল হয় না।

(৩) এই জোট বৃহদায়তন আকারের হওয়ার ফলে এর পরিচালনার জন্যও দক্ষ ও সফলভাবে চালনা করা সম্ভব হয় না। বিশেষত অধীন সংস্থাগুলি একজাতীয় না হওয়ায় এই সমস্যা আরও প্রকট হয়।

(৪) এই জোটের কোনও স্তরে গোলমাল দেখা দিলে তা সমুদয় কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

(৫) এটি বৃহদায়তন হলেও বৃহৎ কারবারের সুবিধা খুব একটা পায় না, কারণ এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বিভিন্ন প্রকারের।

৮০.৩.২ সমান্তরাল জোট

একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে বা সেবা সৃষ্টিতে কর্মরত দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয়ে যৌথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে সমান্তরাল জোট বা “সমশিল্প” জোট বলা হয়। সাধারণত একই শিল্পে নিযুক্ত বা সেবায় নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হয়ে এই জোট গড়ে তোলে। কয়েকটি কয়লাখনি বা চিনির কল, ইস্পাত কারখানা বা কাপড় ব্যবসায়ী একত্রিত হয়ে জোট গঠন করে তবে তাকে সমান্তরাল জোট বলা হয়।

ভারতে দৃষ্টান্ত : এ.সি.সি. বা অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী, ইন্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন, কোকিং কোল এবং অবলুপ্ত কানপুর সুপার সিন্ডিকেট প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত জোটের উদাহরণ।

(i) **বৈশিষ্ট্য** :—(১) একই শিল্পে বা স্তরে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলি এতে যোগ দেয়।

(২) আগে যারা ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, এই জোটের অধীনে এসে, একই ব্যবস্থাপনার অধীনে তারা জোটবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলি এই জোটের অধীনে পাশাপাশি সহাবস্থান করে।

(৩) এই জোট স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে গঠিত হতে পারে। এটি এক ধরনের শিথিল জোট হতে পারে, আবার পূর্ণ সংহতির জোটও হতে পারে।

(ii) **উদ্দেশ্য** : প্রতিযোগিতা নির্মূল করাই এই জোটের প্রধান উদ্দেশ্য। বাজার ভাগাভাগি, বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস করা, উৎপাদন বা সেবা নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যের পরিমাণে ও মূল্যে স্থিরতা আনয়নও এই জোটের উদ্দেশ্য।

(iii) **সুবিধা** :

(১) নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়ে জোটবদ্ধ সংস্থার প্রতিযোগিতা শক্তি বাড়ে।

(২) বিদেশি পণ্যের সঙ্গেও এই জোটের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে প্রবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এরা আত্মরক্ষার সুযোগ পায়।

(৩) বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সুবিধাগুলি বেশি পরিমাণে ভোগ করার ফলে এদের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় ব্যয়, পরিবহণ খরচ, বিজ্ঞাপন ব্যয় প্রভৃতি হ্রাস পায়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের মূল্যে ও পরিমাণে স্থিরতা দেখা যায় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় সহজসাধ্য হয়।

(৪) যৌথ আর্থিক মূলধনের দ্বারা গবেষণার উন্নতি সম্ভব হয়।

(৫) মন্দা বা সংকটের বাজারেও এই জোটের বিপন্ন হবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(৬) একচেটিয়া কারবার এবং তার জন্য প্রচুর পরিমাণে মুনাফালাভের সুযোগও এই জোটের বেশি পরিমাণে থাকে।

(৭) উৎপাদন ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে উৎপাদিত পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে মুনাফার হারও বৃদ্ধি করা সহজ হয়।

(৮) এই জোটের স্বার্থ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকলে এরা সংঘবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

(৯) পূর্বাপর জোটের তুলনায় এই জোট গঠন করা অনেক বেশি সহজ।

(iv) **অসুবিধা :**

(১) এই জোটের ফলে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্রেতা এবং শ্রমিক দুজনেরই স্বার্থ বিপন্ন হয়। এই অবস্থায় ক্রেতাকে বেশি দাম দিয়ে জিনিস ক্রয় করতে হয় আর শ্রমিককে কম মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে হয়।

(২) এই জোটের দ্বারা যে বাজার সুনিশ্চিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আবার কাঁচামাল যোগানেও নিশ্চয়তা নেই।

(৩) এই জোটের ফলে বেআইনী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং শোধন নীতির আধিপত্য দেখা যায়। এই জোটের ফলেই কালোবাজারীর সৃষ্টি হয়।

(৪) মিলিত প্রয়াস দ্বারা এই জোট কোনও দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সরকারের ওপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(৫) কাঁচামাল যোগানে কোনও নিশ্চয়তা না থাকার জন্য এদের প্রচুর পরিমাণে মাল মজুত করে রাখতে হয়। ফলে এতে প্রচুর পরিমাণে মূলধন আটক হয়ে থাকে।

৮০.৩.৩ পার্শ্বিক জোট

কোনও প্রতিষ্ঠান তার কাজের জন্য সম্পর্কযুক্ত কিন্তু ভিন্ন জাতীয় পণ্য উৎপাদনে বা কাজে নিযুক্ত অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে পার্শ্বিক জোট বলে। এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের সাথে কোনও না কোনও সম্পর্ক থাকে। আবার একই কাঁচামাল থেকে বিভিন্ন পণ্যাদি উৎপাদন বা বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা একটি পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তিও পার্শ্বিক জোট। কাঁচামাল চামড়া উৎপাদনের কারখানার সাথে জুতা, স্যুটকেশ, ব্যাগ ও নানাপ্রকার শৌখিন দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানার জোট পার্শ্বিক জোটের উদাহরণ।

পার্শ্বিক জোট দু-প্রকারের :—(ক) একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট, (খ) বহুপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট।

(ক) **একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট :** যদি একটিমাত্র পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থার সঙ্গে তার বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদনকারী জোটগুলি বা প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হয়, তাহলে তাকে একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে চামড়া তৈরির কারখানার সাথে যদি ব্যাগ জুতা, স্যুটকেশ, ফুটবল প্রভৃতি পণ্য উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হয় তবে তাকে বহুপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট বলা যাবে।

(i) **উদ্দেশ্য :** ঝুঁকি বিস্তার, অধিক মুনাফালাভ এবং একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করাই এরূপ জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(ii) **সুবিধা :**

(১) একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট কাঁচামাল ক্রয় করতে যে খরচ তা কমাতে সাহায্য করে।

(২) এই জোট (একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট) কাঁচামালের যোগান ও মালের পরিমাণ সুনিশ্চিত করতে পারে।

(৩) বহুপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোটের দ্বারা নানা প্রকারের পণ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

(৪) এই বহুপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোটের দ্বারা যদি একটি দ্রব্য বিক্রয় করে লোকসান হয়ে থাকে তবে অপর একটি দ্রব্য বিক্রয় করে সেই লোকসান পূরণ করা সম্ভব হয়।

৮০.৩.৪ আঞ্চলিক জোট

যখন কোনও একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের শাখা খুলে কিংবা দেশের মধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা খুলে একই মালিকানার অধীনে পরিচালিত হয় তখন তাকে আঞ্চলিক জোট বলে। আবার একই অঞ্চলে সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে বিক্রয় বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যদি জোট গঠন করে তবে তাকে বলা হয় আঞ্চলিক জোট। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাটার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন এবং তা একই মালিকানার অধীনে পরিচালিত হওয়া হল আঞ্চলিক জোটের একটি উদাহরণ। আবার এই আঞ্চলিক জোট আন্তর্জাতিকও হতে পারে, যেমন বাটার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং তা সেই একই মালিকের দ্বারা পরিচালিত হয়।

(i) **উদ্দেশ্য :** দেশে বা বিদেশের বিভিন্ন বাজারে আধিপত্য বিস্তার এবং পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করাই এই জোটের মুখ্য উদ্দেশ্য।

(ii) **সুবিধা :**

(১) একই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি জোটবদ্ধ হওয়ায় বাজারে সেই দ্রব্যের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

(২) প্রচুর কাঁচামাল একসাথে ক্রয় করা এবং উৎপাদিত পণ্য একই প্রকৃতির হওয়ার জন্য এই জোটের পরিবহণ ব্যয় খুব অল্প হয়।

৮০.৩.৫ বৃত্তাকার জোট

বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনে জোটবদ্ধ হলে তাকে বৃত্তাকার জোট বলে। এই জোটের অপর নাম হল মিশ্র জোট। দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের

মধ্যে একটি গৌণ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে এই কারবার জোট গঠিত হয়। যেমন, বৃহৎ গোষ্ঠীভুক্ত কিছু কিছু ব্যবসায়ীর মাধ্যমে চা বাগানের সঙ্গে পাটকলের সংযোগ সাধিত হয়েছে। চা বাগান ও পাটকলের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও দুটি পণ্যসামগ্রীকে বিদেশে রপ্তানির দরুণ একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়। আই.টিসি. লিমিটেড কোম্পানী হল এইরূপ জোটের একটি উদাহরণ। এই কোম্পানীর প্রধান কাজ সিগারেট উৎপাদন। কিন্তু সিগারেট উৎপাদন ছাড়া এই কোম্পানী সিগারেটের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কাজে যুক্ত আছে। তার মধ্যে সামুদ্রিক পণ্য ও হোটেল ব্যবসা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৮০.৩.৬ তির্যক জোট

কোনও একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যখন সে পণ্যটি উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অথচ অতিরিক্ত একটি আনুষঙ্গিক দ্রব্য কিংবা সেবাকর্ম উৎপাদনকারী সংস্থা বা ব্যবস্থা মিলিত হয়, তখন তাকে বলা হয় তির্যক জোট। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্য উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান যদি পণ্য উৎপাদন সংস্থার সাথে যুক্ত হয়ে একই মালিকানার অধীনে পরিচালিত হয় তখন তাকে তির্যক জোটবন্ধন বলে। যেমন, একটি কারখানায় যদি কারখানার যন্ত্রপাতি মেরামতির নিজস্ব ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় অথবা মেরামতির সাথে যুক্ত কোনও সংস্থা যদি ঐ মূল কারখানার সাথে যুক্ত হয়, তখন তাকে বলা যাবে তির্যক জোটবদ্ধ কারখানা। এই কারবারী জোটের ফলে মূলদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি স্বনির্ভরতা লাভ করে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাইরের যোগানের উপর তাকে নির্ভর করতে হয় না।

৮০.৩.৭ ঐচ্ছিক জোট এবং বাধ্যতামূলক জোট

বিভিন্ন প্রকার কারবারী জোটগুলির মধ্যে স্বেচ্ছামূলক জোট ও বাধ্যতামূলক জোটের মধ্যে প্রভূত মিল লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত এই কারবারী জোটদ্বয় একই প্রকার সুবিধা ভোগ করে, আবার এদের প্রকট অসুবিধাগুলিও একই প্রকারের।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের ইচ্ছানুসারে যখন জোটবদ্ধ হয় বা জোটগঠন করে তখন সেই জোটকে স্বেচ্ছামূলক জোট বলা হয়। যেমন, অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড।

যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারি নির্দেশে বা মধ্যস্থতায় জোটগঠনে বাধ্য হয় তখন সেই জোটকে বলা হয় বাধ্যতামূলক জোট। যেমন ইন্ডিয়ান আয়রণ এন্ড স্টিল কোম্পানীর সাথে স্টিল কর্পোরেশনের একত্রীকরণ।

(i) স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের সুবিধা ঃ—

(১) এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি হয়।

(২) এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ করে থাকে।

(৩) এই জোটবন্ধনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সমস্যা এরা নিজেরাই সমাধান করে।

(৪) এই জোটবন্ধনের ফলে অদক্ষ কারবারের উচ্ছেদ ঘটে।

(৫) এই জোটের পক্ষে সস্তায় পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হওয়ায় ক্রেতারা খুশি হয়। ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

(৬) এই জোটদ্বয় দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পতন রোধ করে বেকার সমস্যা এড়াতে সাহায্য করে।

(৭) এই জোট জনহিতকর কার্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দূর করে অপচয় বন্ধ করে।

(৮) এই জোটবন্ধনের ফলে গবেষণা, কারিগরী জ্ঞান ও পেটেন্ট বিনিময়ে সুবিধা হয়।

(ii) স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোটের অসুবিধা ঃ—

(১) এই জোটের ফলে কারবার অধিক বৃহদায়তন হলে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

(২) এর ফলে জাতীয় সম্পদ বণ্টন অসম হয়।

(৩) এই জোট নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসকমণ্ডলীকে প্রভাবিত করে নিজেদের সুবিধামত আইন পাস করিয়ে নেয়।

(৪) এই জোটের ফলে শোষণ মনোভাব বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক বিক্ষোভ তীব্র হয়।

(৫) এই জোট অনেক সময় অতি মূলধন ও ফাটকাবাজার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

(৬) এই জোটের ফলে একচেটিয়া কারবারের এবং আধিপত্যের সুযোগ ঘটে এবং সম্ভাব্য অদক্ষতাও আরম্ভ হয়।

(৭) এই জোটগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করে থাকে, ফলে এদের আইনের কড়াকড়ির মধ্যে পড়তে হয়।

৮০.৪ জোটের গঠনসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ

জোটের গঠনের ওপর ভিত্তি করে জোটকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) সমিতিসমূহ,

(২) কারবারী সংঘ,

(৩) আংশিক সংহতি,

(৪) পূর্ণ সংহতি।

৮০.৪.১ সমিতিসমূহ

যখন প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন, বাজার, মূল্য, লাভ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের জন্য লিখিত বা অলিখিত চুক্তি সম্পাদন করে তখন সেই প্রকার জোটগুলিকে সমিতিসমূহ বলা হয়। এই সমিতিসমূহ চার রকমের। যেমন—

(ক) অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি,

(খ) ব্যবসায়ী সমিতি,

(গ) বণিক সভা,

(ঘ) শ্রমিক সংঘ।

(ক) অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি

নিজেদের মধ্যে বাজার বণ্টন, বিক্রয়ের শর্ত, দাম এবং মুনাফার বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে একমত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীরা অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে অলিখিত বা মৌখিক চুক্তি সম্পাদিত করে জোটবদ্ধ হয়। তাকে অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি বলা হয়। মৌখিক চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা মৌখিক অঙ্গীকার রক্ষা করবে—এই বিশ্বাসই এই জোটের ভিত্তি। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে এই জোট গঠিত হলেও এই জোটগঠনের ফলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হয় না।

এই ধরনের চুক্তি অনেক সময়েই কার্যকর হয় না। কারণ মৌখিক প্রতিশ্রুতি কেউ লঙ্ঘন করলে সেই চুক্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় না। তাছাড়া সমাজের স্বার্থ-বিরোধী কাজ অবলম্বনের জন্য এই জোট সামাজিক সমর্থন না পাওয়ায় এই শ্রেণীর জোট বেশিদিন স্থায়ী হয় না। বর্তমানে এই জোটের বিকল্প রূপ হিসাবে শেয়ার ও পণ্য বাজারে ব্যবসায়ী চক্রের (Ring or Corner) গঠন দেখতে পাওয়া যায়।

(খ) ব্যবসায়ী সমিতি

যখন একই ব্যবসায়ে লিপ্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একই নীতি গ্রহণের জন্য সমিতিবদ্ধ হয় তখন তাকে ব্যবসায়ী সমিতি বলা হয় শ্রমিক সম্পর্ক, জনসম্পর্ক, সরকারি শিল্প নীতি, বিপণন ও বিজ্ঞাপন পদ্ধতি, পণ্য পরিবেশনে ঋণ ও দস্তুরী প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যা সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাধান করাই এই ব্যবসায়ী সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ক্যালকাটা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল অয়েল মিলস্ অ্যাসোসিয়েশনস্ প্রভৃতি এই জাতীয় সমিতির উদাহরণ। ব্যবসায়ীগণের মুখপাত্র হিসাবে শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত আইনকানুনের সমীক্ষা এবং মতামত জ্ঞাপন করা ব্যবসায়ী সমিতির উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে অন্যতম।

(গ) বণিক সভা

রাজ্য, অঞ্চল বা দেশ জুড়ে অথবা শহরের ভিত্তিতে বণিক ও শিল্পপতিরা সম্মিলিতভাবে স্থায়ী সংগঠন স্থাপন করে নিজেদের মধ্যে জোটবদ্ধ হলে তাকে বণিক সভা বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় আঞ্চলিক বা রাজ্য অর্থাৎ স্থানীয় বণিকসভাগুলি সম্মিলিত হয়ে তাদের কেন্দ্রীয় সংগঠনও স্থাপন করে। সাধারণত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার জন্য এই সভা বা সমিতি গড়ে ওঠে। বণিক সভায় অংশগ্রহণ করে তার সদস্য হবে কিনা তা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। আবার কেউ সভার নির্দেশ অমান্য করলে তার সদস্যপদ নাকচ করে দেওয়া ছাড়া আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। এই সভার প্রধান কাজ কারবারী নীতি নিজেদের অনুকূলে আনা, পণ্যের বাজার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করা ও প্রচার করা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করা। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, ভারত চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি বণিক সভার উদাহরণ।

(ঘ) শ্রমিক সংঘ

কারবারে নিযুক্ত শ্রমিকরা কারবারী ক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকরি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ভোগের জন্য একত্রিত ও সমিতিবদ্ধ হলে শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠে। এরূপ সংঘে যোগদান করা শ্রমিকদের

জোটের গঠনসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ →

- সমিতিসমূহ →
  - ব্যবসায়ী সমিতি
  - বণিক সভা
  - শ্রমিক সংঘ
  - অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি
- কারবারী সংঘ →
  - উৎপাদন সংঘ →
    - উৎপাদন সংঘ
    - বাজার সংঘ
    - মুনাফা সংঘ
    - আয় সংঘ
  - কার্টেল →
    - শর্ত
    - গুণগত
    - উৎপাদন
    - বাজার
    - ট্রাফিক
    - বিক্রয়
  - কারবারী চক্র
- আংশিক সংহতি →
  - ট্রাস্ট
  - হোল্ডিং কোম্পানী →
    - প্রাথমিক
    - মধ্যবর্তী
    - বিশুদ্ধ
    - মিশ্র
    - সম্মিলিত
    - আদি
  - সমস্বার্থ গোষ্ঠী
- পূর্ণসংহতি →
  - একত্রীকরণ
  - অন্তর্ভুক্তি

সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। সংঘের আদেশ অমান্য করলে তার সদস্যপদ খারিজ করা ছাড়া অন্য কোনও আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায় না। হিন্দু মজদুর সভা, ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রভৃতি এরূপ শ্রমিক সংঘের উদাহরণ।

৮০.৪.২ কারবারী সংঘ

প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সুবিধার্থে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে জোট গঠন করলে কারবারী সংঘ গড়ে ওঠে। কারবারী সংঘ প্রধানত তিন প্রকারের।

যেমন—

(ক) উৎপাদক সংঘ,

(খ) বিক্রয়কারী সংঘ,

(গ) কারবারী চক্র।

(ক) **উৎপাদক সংঘ**—প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস করার জন্য এবং তাদের উৎপাদন, বাজার, মূল্য, লাভ প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে জোটগঠন করলে উৎপাদক সংঘ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদক সংঘগুলি বিভিন্ন প্রকারের।

যেমন :—

(i) **উৎপাদন সংঘ**—পণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠিত জোট উৎপাদন সংঘ। কারবারে অতি উৎপাদন দূর করার উদ্দেশ্যে এই সংঘের কারবারীরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মোট উৎপাদনের পরিমাণ নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী সংঘের প্রত্যেক সদস্যের উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। এই জোটের অন্তর্গত সদস্যরা সংঘের নির্দেশ মেনে চললেও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম।

(ii) **বাজার সংঘ**—বাজার বণ্টন করার উদ্দেশ্যে গঠিত জোট উৎপাদন সংঘ। এই সংঘের দ্বারা কারবারীগণ পণ্যের বিভিন্ন বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই সংঘের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকে। যে এলাকা যে প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট থাকে সেই প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সেই এলাকায় পণ্য বিক্রয়ের কোনও অধিকার থাকে না। পণ্য বিক্রয়ের এলাকা ভিন্ন হলেও সব এলাকাতেই পণ্য সংঘ দ্বারা নির্দিষ্ট দামেই বিক্রয় হয়। তবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের আগে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এবং পরিবহণ ব্যয়ের কথা বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

(iii) **মুনাফা সংঘ**—মুনাফা বণ্টনের জন্য গঠিত সংঘ মুনাফা সংঘ। এই সংঘ পণ্যের একটি নিম্নতম দাম ঠিক করে দেয়। তবে সংঘের সদস্যদের অধিকার দেওয়া হয় যে তারা যতটা সম্ভব এই দামের থেকে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। এই বিক্রয়মূল্য ও নিম্নতর মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পরিমাণ অর্থ বা মুনাফা সংঘের প্রতিটি সদস্যকে সংঘে জমা দিতে হয়। এই সম্মিলিত মুনাফা সংঘের প্রতিটি সদস্যের উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের মধ্যে ভাগ হয়।

(iv) **আয় সংঘ**—আয়ের পরিমাণ বণ্টনের জন্য গঠিত সংঘ বা জোট আয় সংঘ। এই সংঘের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের পুরোটাই সংঘের হাতে জমা দেয়। এখানেও পণ্যের নিম্নতম মূল্য স্থির থাকে। এরপর সংঘের দ্বারা পণ্যের নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তা সংঘের সদস্যদের মধ্যে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টন করা হয়।

এইরকম বিভিন্ন প্রকার উৎপাদক সংঘের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রায় একই প্রকারের। এই সংগঠনে কোনও রকম আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ এই সংগঠনগুলি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ইচ্ছাধীন। এই সংঘের সদস্যরা চুক্তি অনুযায়ী সংঘের নিয়ম বা শর্ত পালনে প্রতিশ্রুত হন। এই শর্ত ভঙ্গ হলে কিছু জরিমানার ব্যবস্থা থাকে, কোনও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। এই সংঘের বাঁধন খুব একটা দৃঢ় নয়। যে কোনও সদস্য যে কোনও সময়ে এই সংঘের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

(v) **সুবিধা :**

(১) এরূপ সংঘ গঠন করা খুবই সহজ। এই সংঘ গঠনে কোনওরকম আনুষ্ঠানিক বা আইনগত জটিলতা থাকে না।

(২) এরূপ চুক্তির ফলে সংঘের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দূর হয়।

(৩) এরূপ সংঘের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় কোনও রকম হস্তক্ষেপ ঘটে না এবং উৎপাদনও অব্যাহত থাকে।

(৪) এরূপ সংঘে মূলধন-আধিক্যের ভয় থাকে না। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় পুঁজি বা মূলধন বেশি হয় না।

(৫) এরূপ সংঘ গঠনের ফলে একসাথে কাঁচামাল ক্রয় করা যায়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(৬) এরূপ সংঘ গঠনের ফলে একসাথে কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরিবহণ ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে যেমন উৎপাদন ব্যয় কম হয় তেমনই বিক্রয়মূল্যও কম হয়।

(৭) এরূপ সংঘ সদস্যদের মধ্যে বাজার বণ্টন করা থাকে এবং পণ্যের দাম নির্দিষ্ট করা থাকে বলে পণ্যের মূল্য খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না। অর্থাৎ ক্রেতারা কম মূল্যে জিনিস ক্রয় করতে পারে।

(iv) **অসুবিধা :**

(১) অতি সহজেই এই সংঘ গঠন করা যায়। এই সংঘের বাঁধন খুবই শিথিল। আইনগত কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। সংঘের সদস্যদের কোনও নির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকে না। এই ধরনের জোট খুবই ভঙ্গুর হয়।

(২) এইভাবে গঠিত সংঘের চুক্তি অনেক সময়ই কার্যকর হয় না। সংঘের সদস্যগণ এই সকল চুক্তি অনায়াসেই অগ্রাহ্য করে থাকে।

(৩) এই সকল সংঘের ফলে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয়, মুনাফা লাভই তখন সংঘের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ক্রেতার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

(৪) একচেটিয়া কারবারের মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই সংঘের সদস্যরা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়।

(৫) এইরূপ সংঘে পণ্যের নিম্নতম মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় সাধারণ অদক্ষ কারবারের উৎপাদনের ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে। এর ফলে দক্ষ এবং অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে কোনও গুণগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করা যায় না।

(৬) এইরূপ সংঘের ফলে যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দূর হয় তার জন্য অদক্ষ প্রতিষ্ঠান চিরকাল অদক্ষই থেকে যায়। আবার দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেও আরও উন্নতি করার উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় না। ফলে দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় না।

(খ) **বিক্রয়কারী সংঘ :** একই দ্রব্য উৎপাদনকারী বা একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিভিন্ন কারবারী প্রতিষ্ঠান কার্টেল গঠন করে। এটি সমান্তরাল কারবারী জোট।

সদস্য কারবারী সংস্থাগুলি সরবরাহ ও বিক্রয় বাজারের ওপর একাধিপত্য বিস্তারের জন্য এবং মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাজারে পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। বাজার থেকে প্রতিযোগিতা দূর করে বাজারের ওপর একাধিপত্য বিস্তার করাই এই সংঘের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য এইরূপ সংঘ, তার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ, পণ্যের দাম এবং বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির করে দেয়। বিক্রয়কারী সংঘ বা কার্টেল, উৎপাদন সংঘের তুলনায় অনেক বেশি সুসংবদ্ধ এবং কার্যকরী জোট। তাছাড়া বলা হয় আমেরিকায় যা উৎপাদন সংঘ ইউরোপের বিভিন্ন দেশেই তা বিক্রয়কারী সংঘ। জার্মানিকে বলা হয় বিক্রয়কারী সংঘের জন্মদাতা।

কার্টেলের বৈশিষ্ট্য :

(i) এই সংঘের অন্তর্গত কারবারগুলির নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য, অস্তিত্ব ও সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় কোনও তৃতীয় শক্তি থাকে না।

(ii) চরিত্র বা প্রকৃতির দিক থেকে এই সংঘ সমান্তরাল জোট।

(iii) বিক্রয়কারী সংঘের সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ, পণ্যের মূল্য, বিক্রয়ের শর্তাবলী, পণ্যের গুণাগুণ, বিক্রয় উপযুক্ত পণ্যের পরিমাণ ইত্যাদি স্থির করে দেয় এই সংঘ। অনেক সময় ক্ষেত্র বিশেষে সিন্ডিকেট স্থাপন করে সংঘগুলি একমাত্র তার মারফত বাজারে পণ্য বিক্রয় করে।

(iv) উৎপাদক সংঘের তুলনায় বিক্রয়কারী সংঘ হল জোটের উচ্চতর রূপ। তাছাড়া এই সংঘ উৎপাদক সংঘের তুলনায় অনেক বেশি সুসংবদ্ধ ও কার্যকরী।

বিক্রয়কারী সংঘের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেই ভাগগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

(ক) **শর্ত কার্টেল**—এই কার্টেল সদস্যদের মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন শর্তাবলী স্থির করে দেয়। এই সকল শর্তের মধ্যে পণ্য সরবরাহ, দাম পরিশোধের শর্ত, বাট্টার হার, বকেয়া পাওনা বাবদ দেওয়া অতিরিক্ত অর্থ, পণ্য সরবরাহের স্থান ও সময় ধারের মেয়াদ, পণ্য বিলির পদ্ধতি কি হবে তা উল্লেখ করা থাকে। এই সকল শর্তাবলী সংঘের সদস্যদের কাছে অবশ্য পালনীয়।

(খ) **গুণগত কার্টেল**—এই সংঘ তার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের গুণগত মান নির্ণয় করে দেয়। এই কার্টেলের মাধ্যমে সংঘ বিভিন্ন মানের পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য স্থির করে দেয়। অর্থাৎ উন্নতমানের পণ্য যেমন বেশি দামে বিক্রিত হতে পারে তেমনি অনুন্নত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের পণ্য অল্প দামে বিক্রিত হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে পণ্যের গুণগত মান উন্নত হবার আশা থাকে। এই সংঘের অন্তর্গত সদস্যদের সংঘ দ্বারা নির্ধারিত দ্রব্যের মান ও বিক্রয়মূল্য বজায় রাখতে বাধ্য করা হয়।

(গ) **উৎপাদন কার্টেল**—এই সংঘ তার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। চাহিদার সাথে যাতে উৎপাদনের সমতা রক্ষা পায় তার জন্য এরূপ সংঘ মোট উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন সংঘের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং সদস্যরা এই নির্দিষ্ট হারে পণ্য উৎপাদনে বাধ্য থাকে। উৎপাদন কার্টেল উৎপাদন সংঘেরই অনুরূপ।

(ঘ) **বাজার কার্টেল**—এই সংঘ তার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে বাজার বা পণ্য বিক্রয়ের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেয়। এই সংঘের অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করার উদ্দেশ্যে এই সংঘ সমগ্র বাজারকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে এবং এক-একটি ভাগ এক একটি সদস্যকে দেওয়া হয়। সংঘের সদস্যরা কেবলমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পণ্য বিক্রয় করতে পারে। তবে সংঘের দ্বারা পণ্যের নিম্নতম মূল্য নির্দিষ্ট থাকে। এরূপ কার্টেল বাজার সংঘের অনুরূপ।

(ঙ) **ট্রাফিক সিন্ডিকেট**—এই সংঘ তার অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে পরিবহণের রাস্তা বা বিভিন্ন রুট নির্দিষ্ট করে দেয়। এই সংঘের সদস্যরা নিজের নিজের নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ভাড়ায় যান চলাচলের ব্যবস্থা করে থাকে। এর ফলে এক একটি রাস্তা বা রুটে একটি নির্দিষ্ট সদস্য অতি সহজেই স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট ভাড়ায় পরিবহণ ব্যবস্থা চালাতে পারে।

(চ) **বিক্রয় সিন্ডিকেট**—একত্রিতভাবে পণ্য বিক্রয়ের জন্য কতকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিবদ্ধ জোটের নাম বিক্রয় সিন্ডিকেট। এরূপ কার্টেলে পণ্যের একটি নির্দিষ্ট নিম্নতম মূল্য থাকে। সেই মূল্যের অধিক দামে দ্রব্য বিক্রয় করে এই সংঘের সদস্যরা যে মুনাফা অর্জন করে তা তারা একত্রে জমা করে। পরে তা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সাথে একমত হয়ে শুধুমাত্র একটি যুক্ত বিক্রয় সংস্থা স্থাপন করতে পারে কিংবা একটি লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হয়। এই বিক্রয় সিন্ডিকেট দ্বারা সংঘের সদস্যরা তাদের উৎপাদনের হার অনুসারে মুনাফা অর্জন করে।

কার্টেল জোটের উদ্দেশ্য হল পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্টেল দেখা যায়। যেমন, ভারতের সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী জাতীয় কার্টেল আর ইউরোপের স্টিল ওয়ার্কসের আন্তর্জাতিক কার্টেল। এছাড়া জার্মানির রাইনিশ ওয়েস্টফ্যালিয়ন কোল কার্টেলও খুব উল্লেখযোগ্য।

(i) **সুবিধা :**

(১) এই কার্টেল জাতীয় জোট গঠন করা খুবই সহজ। এটি গঠনে কোনও জটিলতা নেই।

(২) এটি গঠন করা সম্পূর্ণভাবেই তার সদস্যদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। এই কার্টেল গঠনে আইনের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

(৩) এই সংঘ বা কার্টেল গঠনে কোন রূপ ব্যয়-বাহুল্য নাই।

(৪) অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

(৫) এই সংঘ ঘটনে অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এতে মূলধন আধিক্যের ভয় থাকে না।

(৬) বৃহদায়তন হলেও এরূপ সংঘ একসঙ্গে কাঁচামাল ক্রয় করতে পারে। এর ফলে পরিবহণ-ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(৭) বাজারের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে কার্টেল তার সদস্যদের উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিয়ে সহজেই বাজারের চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য রক্ষায় সক্ষম হয়।

(৮) প্রতিযোগিতা হ্রাস এই সংঘের একটি বিশেষ সুবিধা, কারণ উৎপাদন সংঘ ও বিক্রয় সংঘ স্থাপনের দ্বারা কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দূর হয়।

(৯) কার্টেল পণ্যের উৎকর্ষ সাধনেও বিশেষ কার্যকর। কারণ পণ্যের গুণগত মান অনুসারে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং মুনাফা বণ্টন হওয়ায় প্রতিটি সদস্যই পণ্যের মান উন্নত করতে সচেষ্ট হয়।

(১০) কার্টেল পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাজারে স্থিরতা আসে এবং বিক্রয় ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(ii) **অসুবিধা :**

(১) এর গঠন সহজসাধ্য, ভাঙনও সহজসাধ্য। এর ফলে দায়িত্ব সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা থাকে না।

(২) স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে এই সংঘ গঠিত হয়। সকল প্রতিষ্ঠানকে এতে যোগদান করার জন্য বাধ্য করা যায় না। ফলে যোগানের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।

(৩) সংঘের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতন্ত্র থাকায়, এর উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয়-সংকোচের সুযোগ থাকে না।

(৪) সংঘের অন্তর্গত সদস্যরা স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন। যে কোনও সময়ে অংশগ্রহণকারী কোনও প্রতিষ্ঠান সংঘ বা কার্টেল-এর সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। এর ফলে কার্টেলের স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা বাড়ে।

(৫) যদি কার্টেল বিশেষভাবে কার্যকর হয় তবে একচেটিয়া কারবারের সূত্রপাত হতে পারে। যার ফলে কেবলমাত্র মুনাফা লাভই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এতে ক্রেতাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। তারা চড়া দামে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য হয়।

(৬) এরূপ সংঘ বা কার্টেলে যোগদান সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাধীন হওয়ায় অনেক প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দেয় না, ফলে বাজারে প্রতিযোগিতা, সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পায় না।

(৭) কার্টেল গঠনে শিথিলতা দেখা দিলে কার্টেল বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলি নানা প্রকারে প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। এতে সদস্যগণকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা যায় না। গোপনে সদস্যগণ উৎপাদন বেশি করে কমদামে পণ্য বিক্রয় করে বা বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। এতে কার্টেলের স্থায়িত্ব বা বাজারের স্থিরতা কোনটাই বজায় থাকে না।

(গ) **কারবারী চক্র**

অনেক সময়ে কিছু সংখ্যক কারবারী একত্রিত হয়ে কোনও পণ্য অবৈধভাবে মজুত করে বা কোনও পণ্যের যোগানকে পুরোপুরিভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে সেই পণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। একে বলা হয় কারবারী চক্র। একে সঠিক অর্থে জোট বলা যায় না। এরূপ চক্র নিতান্তই সাময়িক এবং স্বল্পস্থায়ী। কাজ হয়ে যাবার পর এই চক্র ভেঙে যায় আবার প্রয়োজনে পুনরায় এই চক্র গঠিত হয়। অতিমুনাফা অর্জন করাই হচ্ছে এরূপ চক্র সৃষ্টির প্রধান কারণ। যখন কোনও দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন ঐ দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আয়ত্তে এনে বাজারে ঐ দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হয়। এরপর ইচ্ছামত সেই দ্রব্য অল্প অল্প করে যোগান দিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে কারবারীরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। সাধারণত এটি ফাটকাবাজীরই একটি রূপ। অর্থাৎ ফাটকাবাজী থেকেই এই চক্রের সূত্রপাত। পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের এরূপ চক্র দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে এই চক্র বেশি গড়ে ওঠে। যেমন—পূজার সময় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরূপ চক্র সৃষ্টি হয়। এবং তা থেকে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করেন।

৮০.৪.৩ আংশিক সংহতি

যখন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে জোটবদ্ধ হয় এবং এই জোটবন্ধনের দ্বারা তাদের ওপর জোটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় আংশিক সংহতি। এই জোটের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর

জোটের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলির পৃথক সত্তা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয় না। এইরূপ জোটবন্ধন প্রধানত তিন প্রকার।

(ক) ট্রাস্ট, (খ) হোল্ডিং কোম্পানী, (গ) সমস্বার্থ গোষ্ঠী।

(ক) **ট্রাস্ট**

যদি এক বা একাধিক যৌথ কোম্পানীর শেয়ারগ্রহীতারা নিজ নিজ কোম্পানী পরিচালনা করার জন্য নিজেদের শেয়ারের অর্ধেকের বেশি অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের হাতে দান করে তবে সেই হস্তান্তরের ফলে যে প্রতিষ্ঠান বা জোট গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় ট্রাস্ট। ট্রাস্ট গঠনের ফলে যৌথ কোম্পানীর শেয়ারগ্রহীতাগণ ট্রাস্টের কাছ থেকে ট্রাস্ট সার্টিফিকেট পায়। এর ফলে শেয়ারহেল্ডারেরা ট্রাস্ট কারবারের সুফল ভোগ করার অধিকার পায়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ শেয়ার লাভ করে ট্রাস্ট সংস্থা সদস্য কারবারগুলির পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বলাভ করে। যৌথ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ও ব্যবস্থাপনার অধিকার হারালেও তাদের স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না। তারা স্বাধীনভাবেই উৎপাদনকার্য চালাতে পারে। তাছাড়া যৌথ কোম্পানী বা সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করার জন্য ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ নির্বাচন করা হয় এবং তারাই ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করে। এই জোট গঠনের ফলে শেয়ারহোল্ডারগণ ট্রাস্টের কাছ থেকে কোম্পানীর লভ্যাংশ পায়। এই ধরনের ট্রাস্ট প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত হয়। ট্রাস্ট সাধারণত ব্যবসায়িক ট্রাস্ট, ভোটদানের ট্রাস্ট এবং বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন নামের এবং প্রকারের। আমেরিকায় এ জোটবন্ধনের ট্রাস্ট সম্পূর্ণরূপে বেআইনী। এই জোট বর্জন করা হয় কারণ এই জোটবন্ধনের ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হবার ফলে পরিচালনার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব কেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকে। ফলে জোটবন্ধনের ট্রাস্টকে বর্জন করে হোল্ডিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্টের বৈশিষ্ট্যগুলি :—

(i) প্রকৃতি বা চরিত্রের দিক থেকে এই ধরনের জোট হল পূর্বাপর জোটের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

(ii) মালিকানা এবং পরিচালনার দায়িত্ব ট্রাস্টের হাতে চলে গেলেও সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব বা সত্তা কোনওটাই সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন সত্তা বজায় থাকে, কেবল পরিচালনা হস্তান্তরিত হয়।

(iii) এই ট্রাস্ট গঠনের ফলে শেয়ারের হস্তান্তরের সময় ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ নির্বাচন করা হয়। এই পরিচালকবর্গ এক বা একাধিক কোম্পানীর মালিক হন না বরং কেবলমাত্র একটি কোম্পানীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার পান।

(iv) অনেক সময় শেয়ারের ভোটাধিকার হস্তান্তর করা হয়। এবং সেই ভোটাধিকারের ফলে ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেন। এরূপ ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ট্রাস্টকে বলা হয় ভোটিং ট্রাস্ট। অর্থাৎ এইরূপ ট্রাস্টের পরিচালকবর্গ ভোটদানের ফলে নির্বাচিত হন। এতে শেয়ারহোল্ডাররাও নিজেদের ইচ্ছামতো পরিচলাক নির্বাচন করতে পারেন—

(i) **ট্রাস্টের সুবিধা :**

(১) সুসংহত, দৃঢ়সংবদ্ধ ও পূর্ণতর একীকরণ হওয়ায় ট্রাস্ট বেশি দিন স্থায়ী হয়।

(২) পরিচালনার এবং ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীকরণের সৃষ্টি হয়। যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধা লাভ করে। অন্যদিকে উৎপাদনের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকায় বাজারের চাহিদার সাথে উৎপাদন ও যোগান-এর সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।

(৩) অংশগ্রহণকারী কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এক।

(৪) ট্রাস্ট বেশি দিন স্থায়ী হওয়ায় ট্রাস্টের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ। তাছাড়া নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়া সহজসাধ্য।

(৫) পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ একজনের হাতে সমর্পিত হওয়ায় সকলের পক্ষে একই প্রকার নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়।

(৬) উৎপাদনের ওপর কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব থাকায় ট্রাস্ট মোট উৎপাদন ও দামের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে।

(৭) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দরুণ ট্রাস্ট উৎপাদনের নির্দিষ্ট মান কার্যকর করতে পারে।

(৮) ট্রাস্টে বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীগুলির একত্রীকরণ ঘটে। এর পক্ষে পর্যাপ্ত মূলধন যোগাড় করা সহজ।

(ii) **ট্রাস্টের অসুবিধা :**

(১) একচেটিয়া কারবার ও জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের সৃষ্টি হয়।

(২) এটির গঠন ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

(৩) প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধন সংগৃহীত হওয়ায় বিনিয়োগের সমস্যা হয়।

(৪) এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা। দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কার্যসূচী ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায় না।

(৫) ট্রাস্টে যোগদানকারী কোম্পানীর আপত্তি সত্ত্বেও উচ্চহারে পণ্য বিক্রয় করে জনস্বার্থ বিরোধী অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

ট্রাস্ট এবং কার্টেলের মধ্যে পার্থক্য :—

	ট্রাস্ট	**কার্টেল**
গঠন-পদ্ধতি ও প্রকৃতি	১। ট্রাস্ট গঠন-পদ্ধতি জটিল এবং ব্যয়-সাপেক্ষ। এতে অনেক প্রকার আইনগত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়।	১। কার্টেল-গঠন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এতে ব্যয়ও খুবই কম হয়। এতে কোনওরকম আইনগত আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না।
	২। এটি বেশি দৃঢ় সংবদ্ধ সংহতি।	২। এটি অপেক্ষাকৃত শিথিলবদ্ধ জোট।
	৩। এটি পূর্বাপর জোট।	৩। এটি সমান্তরাল জোট।

	ট্রাস্ট	কার্টেল
উৎপত্তি	৪। এই জোটের উৎপত্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।	৪। এই জোটের উৎপত্তি প্রধানত ঃ জার্মানীতে।
অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান	৫। কেবলমাত্র যৌথ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান-গুলি ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করতে পারে।	৫। যে কোনও প্রকার মালিকানা অধীন প্রতিষ্ঠানই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।
পৃথক সত্তা ও স্বাধীনতা	৬। এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। কেবলমাত্র নিজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। পরিচালনার ক্ষেত্রে ওদের কোনও স্বাধীনতা থাকে না।	৬। এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। নিজ নিজ কোম্পানীর পরিচালনা এরা নিজেরাই করে থাকে।
উদ্দেশ্য	৭। উৎপাদন ও বিক্রয় উভয় প্রকার কাজের ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যেই এটি গঠিত হয়।	৭। উৎপাদনের ব্যাপারে এরা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। কেবল বিক্রয়-এর ওপর এই জোট পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে।
পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	৮। এই জোটে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত হয়।	৮। এই জোটে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীভূত থাকে, শুধুমাত্র বিক্রয়ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ঘটে।
	৯। বিশেষভাবে নির্বাচিত পরিচালনাগোষ্ঠী সাধারণত পরিচালনার কাজ করে থাকে।	৯। এর জন্য কোনও বিশেষ পরিচালকগোষ্ঠী গঠিত হয় না। জোটই সব নির্ণয় করে দেয়।
ব্যয়সংকোচ	১০। ট্রাস্ট উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও পরিচালনা ইত্যাদি বৃহদায়তনের যাবতীয় ব্যয়সংকোচ ভোগ করে।	১০। কার্টেল কেবলমাত্র বিক্রয়সংক্রান্ত ব্যয়সংকোচ ভোগ করে। বৃহদায়তন উৎপাদনের অন্যসকল ব্যয়সংকোচ এরা ভোগ করতে পারে না।
সদস্যসংখ্যা	১১। ট্রাস্টে যোগদান করলে তা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। তাই ট্রাস্টে যোগদানকারী সদস্যসংখ্যা কম এবং সীমাবদ্ধ হয়।	১১। কার্টেলে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠান সহজেই তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ফলে এতে যোগদানকারী সদস্যসংখ্যা বেশি হয়।
আয়তন, পরিধি ও বিস্তৃতি	১২। ট্রাস্টের আয়তন ও পরিধি সাধারণত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।	১২। কার্টেলের আয়তন ও পরিধি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হতে পারে।
	১৩। এর আয়তন ও পরিধি সীমাবদ্ধ বলে পণ্যের বাজারে এটি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।	১৩। এর আয়তন ও পরিধি খুব বিস্তৃত। এটি পণ্যের বাজারের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারে এবং উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে।
স্থায়িত্ব	১৪। আইন মেনে গঠিত হওয়ায় ট্রাস্ট বেশিদিন স্থায়ী হয়।	১৪। কোনওরকম আইনের বাধ্য-বাধকতা না থাকায় কার্টেল সাধারণত অস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হয়।

(ক) **হোল্ডিং কোম্পানী**

যখন কোনও কোম্পানী অন্য এক বা একাধিক কোম্পানীর ৫১ শতাংশ শেয়ার বা তার বেশি পরিমাণ শেয়ারের মালিক হয়ে সেই কোম্পানী বা কোম্পানীগুলির ওপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় হোল্ডিং কোম্পানী। হোল্ডিং কোম্পানী যে সকল কোম্পানীগুলির শেয়ার ক্রয় করে থাকে সেই সকল কোম্পানীগুলিকে হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানী (Subsidiary Company) বলা হয়। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১৯৬৯ সালের সংশোধনীতে বলা হয়েছে, হোল্ডিং কোম্পানী এমন একটি কোম্পানী যে কোম্পানী অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারের (ইকুইটি) ৫১ শতাংশ বা তার বেশি শেয়ার করায়ত্ত করে অথবা অন্যান্য কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদগুলির ওপর নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে। ভারতে অবস্থিত শ'ওয়ালেস, ব্রুকবন্ড, প্যারী অ্যান্ড কোং হোল্ডিং কোম্পানীর দৃষ্টান্ত।

হোল্ডিং কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য ঃ—

(i) হোল্ডিং কোম্পানী সাধারণত তার অধীন কোম্পানীগুলির শেয়ারের অর্ধেকের বেশি বা অন্তত শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিক হয়। এছাড়াও হোল্ডিং কোম্পানী তার অধীন কোম্পানীগুলির পরিচালক পর্ষদের গঠনে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(ii) হোল্ডিং কোম্পানীর অন্তর্গত অধীন কোম্পানীগুলির সত্তা ও অস্তিত্ব পৃথক থাকে। তবে নামে পৃথক হলেও পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সবসময়ই হোল্ডিং কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।

(iii) হোল্ডিং কোম্পানী একটি নতুন কোম্পানীরূপে স্থাপিত হতে পারে কিংবা পুরানো কোনও কোম্পানী অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে হোল্ডিং কোম্পানীতে পরিণত হতে পারে।

(iv) হোল্ডিং কোম্পানী নিজ শেয়ার বিনিময় দ্বারা অধীন কোম্পানীর শেয়ারের মালিক হতে পারে নতুবা তারা নগদ টাকায় অধীন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে থাকে।

(v) হোল্ডিং কোম্পানী কেবলমাত্র অধীন কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অথবা অধীন কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথে নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে কোনও কারবার চালাতে পারে।

(vi) একটি হোল্ডিং কোম্পানীতে যে কোনও সংখ্যক অধীন কোম্পানী থাকতে পারে। আবার একটি হোল্ডিং কোম্পানীর এক বা একাধিক অধীন কোম্পানীর নিজেদেরও কিছু সংখ্যক অধীন কোম্পানী থাকতে পারে। হোল্ডিং কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ ঃ—

হোল্ডিং কোম্পানী নানা শ্রেণীর হয়।

যেমন—

(i) প্রাথমিক হোল্ডিং,

(ii) মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী,

(iii) বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী,

(iv) মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী,

(v) সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী,

(vi) আদি হোল্ডিং কোম্পানী,

(i) **প্রাথমিক হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন একটি মূল হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনে অবস্থিত অধীন কোম্পানীগুলির আবার এক বা একাধিক নিজস্ব অধীন কোম্পানী থাকে, তখন মূল হোল্ডিং কোম্পানীটিকে বলা হয় প্রাথমিক হোল্ডিং কোম্পানী।

(ii) **মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন প্রাথমিক হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীগুলির আবার এক বা একাধিক অধীন কোম্পানী থাকে তখন প্রথমোক্ত অধীন কোম্পানীগুলিকে মধ্যবর্তী হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়।

(iii) **বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন কোনও হোল্ডিং কোম্পানী নিজে কোনও প্রকার কার্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়ে কেবলমাত্র অধীন কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে বলা হয় বিশুদ্ধ হোল্ডিং কোম্পানী।

(iv) **মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন কোনও হোল্ডিং কোম্পানী তার অধীনস্থ অধীন কোম্পানীগুলির নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনকার্যে লিপ্ত হয় তখন সেই হোল্ডিং কোম্পানীগুলিকে বলা হয় মিশ্র হোল্ডিং কোম্পানী।

(v) **সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন অনেকগুলি যৌথ কোম্পানী তার অধিকাংশ শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা নূতন হোল্ডিং কোম্পানী গঠন করে তখন তাকে বলা হয় সম্মিলিত হোল্ডিং কোম্পানী।

(vi) **আদি হোল্ডিং কোম্পানী** :—যখন কোনও হোল্ডিং কোম্পানী তার অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা তাদের অধীনে নূতন অধীন কোম্পানী সৃষ্টি করে, তখন তাকে বলা হয় আদি হোল্ডিং কোম্পানী।

(i) **হোল্ডিং কোম্পানীর সুবিধা** :

(১) এই কোম্পানী সহজেই গঠিত হয়। এতে অধীন কোম্পানীর কোনও মতামত দেবার প্রয়োজন হয় না। বাজারের থেকে অধীন কোম্পানীগুলির শেয়ার ক্রয় করে এটি অনায়াসে গঠন করা যায়।

(২) এতে অপক্ষোকৃত অল্প অর্থ বিনিয়োগ করে অনেক বেশি পরিমাণে কর্তৃত্ব অধিকার করা যায়।

(৩) এটি প্রকৃত প্রস্তাবে যৌথ কোম্পানী, সুতরাং এটি যৌথ কোম্পানীর সকল প্রকার সুবিধা ভোগ করতে পারে।

(৪) হোল্ডিং কোম্পানীর অন্তর্গত অধীন কোম্পানীগুলির পৃথক সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় থাকায় তাদের সম্প্রসারণ ও পুনর্গঠনে কোনও অসুবিধা হয় না।

(৫) বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত একই ধরনের কোম্পানীগুলিকে হোল্ডিং কোম্পানীতে অন্তর্ভুক্ত করায় সহজেই তাদের মধ্যে বাজার বণ্টন করা যায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও দূর করা যায়।

(৬) হোল্ডিং কোম্পনী গঠিত হওয়ায় এটি অনেকগুলি কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও অর্থসংস্থান ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে পারে। এর ফলে হোল্ডিং কোম্পানী বৃহদায়তন কারবারের সুবিধা ভোগ করে এবং নানাবিধ ব্যয়সংকোচও করতে পারে।

(৭) পরিচালনার কেন্দ্রীকরণের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে পরিচালনারও ব্যয়সংকোচ ভোগ করে থাকে এই কোম্পানী।

(৮) প্রয়োজনবোধে হোল্ডিং কোম্পানী অধীন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় দ্বারা এই কোম্পানীর লোকসানের ঝুঁকিও অনায়াসে এড়াতে পারে।

(৯) এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ফলে এই কোম্পানীর সাহায্য ও সহযোগিতায় অধীন কোম্পানীগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সহজ হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে এক কোম্পানী থেকে অন্য কোম্পানীতে অর্থ বিনিয়োগ করাও চলে।

(১০) আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একচেটিয়া সংস্থা বলে মনে হয় না। ফলে এই কোম্পানীকে সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরোধিতা সহ্য করতে হয় না। কিংবা এটিকে জনমতের বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় না।

(ii) **হোল্ডিং কোম্পানীর অসুবিধা :**

(১) হোল্ডিং কোম্পানীর হাতে অনেক সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি জমে গিয়ে বিনিয়োগের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

(২) অনেক সময় হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীর মধ্যে আর্থিক লেনদেন ও হিসাবে গরমিল দেখা যায়।

(৩) হোল্ডিং কোম্পানীকে আপাতদৃষ্টিতে একচেটিয়া কোম্পানী মনে না হলেও এতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং এটি একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টির জন্য উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয়।

(৪) হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীর সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে এরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজ স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করে।

(৫) হোল্ডিং কোম্পানী বিশাল পরিমাণ সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে, কিন্তু এই কর্তৃত্ব দায়িত্বহীন।

(৬) আধিপত্য বিস্তার করতে করতে হোল্ডিং কোম্পানীর আয়তন এতই বেড়ে যায় যে তাদের ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা, কর্মচারীদের অসাধু আচরণ, ব্যয়-বাহুল্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

(৭) অনেক সময় হোল্ডিং কোম্পানী তার বিস্তৃতির জন্য খুবই চড়া সুদে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। এর ফলে ওই সুদ দিতে গিয়েই মুনাফা ফুরিয়ে যায়। এর ফলে হোল্ডিং কোম্পানীকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

(৮) হোল্ডিং কোম্পানী অনেক ক্ষেত্রেই অধীন কোম্পানীকে শোষণ করে থাকে। অধীন কোম্পানীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য এরা কম দামে ক্রয় করে থাকে এবং পরে তা খুবই চড়া দামে অধীন কোম্পানীকে বিক্রয় করে। এছাড়াও উচ্চ সুদে ঋণগ্রহণ, আত্মীয়পোষণ এবং তাদের উচ্চ বেতনে নিয়োগ, অত্যাধিক হাতে মুনাফা বণ্টন প্রভৃতির দ্বারাও হোল্ডিং কোম্পানী অধীন কোম্পানীগুলিকে শোষণ করে থাকে।

(iii) **ট্রাস্ট ও হোল্ডিং কোম্পানীর পার্থক্য :**

(গ) **সমস্বার্থ গোষ্ঠী**

	ট্রাস্ট	**হোল্ডিং কোম্পানি**
গঠন	১। ট্রাস্ট গঠনে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয়।	১। হোল্ডিং কোম্পানী গঠনে প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কারণ শেয়ার ক্রয় দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানি গঠিত হয়।
	২। এর গঠন অপেক্ষাকৃত জটিল।	২। এটি গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ।
প্রকৃত	৩। প্রকৃতির দিক থেকে এটি পূর্বাপর জোট।	৩। এর প্রকৃতি সমান্তরাল, পূর্বাপর বা বিভিন্নমুখী যে কোন প্রকারেরই হয়।

	ট্রাস্ট	হোল্ডিং কোম্পানী
	৪। ট্রাস্ট একটি আদিসংস্থা এবং কতকগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গঠিত।	৪। এটি নিজেই একটি যৌথ কোম্পানী।
পরিচালন	৫। ট্রাস্ট সংস্থাটি ট্রাস্ট বোর্ড বা অছিমণ্ডলীর (Board of Trustees) দ্বারা পরিচালিত।	৫। এটি পরিচালকমণ্ডলীর (Board of Directors) দ্বারা পরিচালিত। এই পরিচালকমণ্ডলীকে শেয়ার হোল্ডাররা নির্বাচিত করে।
শেয়ার বিনিময়	৬। ট্রাস্ট গঠন হবার পর ট্রাস্ট সদস্য কোম্পানীগুলিকে শেয়ারের বিনিময়ে ট্রাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে।	৬। হোল্ডিং কোম্পানীতে অধীন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করা হয়।
সৃষ্টি	৭। ট্রাস্ট চুক্তিবলে শেয়ার হস্তান্তরের দ্বারা সৃষ্টি হয়।	৭। হোল্ডিং কোম্পানী শেয়ার ক্রয় দ্বারা সৃষ্টি হয়।
মালিকানা	৮। ট্রাস্টে যে শেয়ার হস্তান্তর হয় তাতে মালিকানা স্বত্ব আসে না।	৮। হোল্ডিং কোম্পানী ক্রীত শেয়ারের মালিক।
উদ্দেশ্য ও আয়কর প্রদান	৯। ট্রাস্ট সংস্থা নিজস্ব লাভ বা মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত হয় না। এজন্য এর কোনও নিজস্ব আয় নেই এবং ট্রাস্ট সংস্থাকে কোনও আয়করও দিতে হয় না।	৯। হোল্ডিং কোম্পানী নিজস্ব লাভ বা মুনাফা অর্জনের জন্য গঠিত হয়। এজন্য এর নিজস্ব আয় হয় এবং এই আয়ের ওপর তাদের আয়কর দিতে হয়।
কর্তৃত্ব	১০। সদস্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডারদের সাথে চুক্তি দ্বারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর ট্রাস্ট কর্তৃত্ব লাভ করে।	১০। আইনসম্মতভাবে শেয়ার ক্রয় বা বিনিময় দ্বারা হোল্ডিং কোম্পানী অধীন কোম্পানীগুলির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করে।
বিলোপ সাধন	১১। ট্রাস্টে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিলোপ হতে পারে না।	১১। হোল্ডিং কোম্পানী যে কোনও সময় শেয়ার বিক্রয় করে কোম্পানীর বিলোপ সাধন করতে পারে।
আইনগত স্বীকৃতি	১২। ট্রাস্ট প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত হয় এবং পরে সেখানে বেআইনী ঘোষিত হয়।	১২। হোল্ডিং কোম্পানী ট্রাস্ট বেআইনী ঘোষিত হবার পর গঠিত হয় এবং আমেরিকা বা ভারতবর্ষে কোথাও এটি বেআইনী ঘোষিত হয়নি।

সমস্বার্থ গোষ্ঠী হল আংশিক সংহতির অন্যতম দৃষ্টান্ত। যখন একদল সংঘবদ্ধ বিনিয়োগকারী বিভিন্ন কোম্পানীতে শেয়ার মালিকানার দরুণ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ঐ সমস্ত কোম্পানী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তখন সেই কোম্পানীগুলির জোটকে বলা হয় সমস্বার্থ গোষ্ঠীর জোট। হ্যানীর মতে, সমস্বার্থ গোষ্ঠী হল কারবারী সংগঠনের এমন একটি রূপ যার আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া যে সব কোম্পানী বা কারবারী সংস্থা নিয়ে এই জোট গড়ে ওঠে তাদের কারবারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে একদল শেয়ারহোল্ডার বা পরিচালক। এই পরিচালকগণ নির্বাচিত হন শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য থেকে তাদের ইচ্ছামতো প্রার্থী হিসাবে। এর ফলে তারা সম্পূর্ণভাবে পর্ষদগুলিতে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে পারে। এইভাবে পৃথক অস্তিত্বসম্পন্ন কারবারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি অলিখিত, অনুষ্ঠানবিহীন,

কিন্তু অতি বাস্তব ও কার্যকরী জোট গড়ে ওঠে। আমেরিকায় যখন ট্রাস্ট বেআইনীরূপে ঘোষিত হয়, তখন যে সকল জোটগুলি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এই সমস্বার্থ গোষ্ঠীও অন্যতম। সমস্বার্থ গোষ্ঠী জাতীয় কারবারী জোট প্রধানত তিন প্রকারের। যেমন—

(i) যখন কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনেকগুলি কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর আসন লাভ করে এবং তাদের উদ্যোগে, পৃথক অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও ঐ কোম্পানীগুলি একই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একই কর্মনীতি ও পন্থা অনুসরণ করতে পারে। এই জাতীয় কারবারী জোট যা লিখিত ও আনুষ্ঠানিক আকারবিহীন সমস্বার্থ গোষ্ঠী জাতীয় কারবারী জোট, তাকে বলা হয় পরস্পর সংযুক্ত পরিচালক গোষ্ঠী। ভারতবর্ষে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া, জৈন, থাপার প্রভৃতি নয়টি পরিবার যুক্ত হয়ে এই জাতীয় জোট গঠন করে।

(ii) যখন একই ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা সংগঠন একাধিক কোম্পানী পরিচালনা করার জন্য নির্বাচিত হয় তখন সেই ব্যবস্থাপক বা ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি যে ধরনের সমস্বার্থ গোষ্ঠী গঠন করে তাকে বলা হয় ব্যবস্থাপনা সংহতি। অতীতে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের মারফত ব্যবস্থাপনাধীন একাধিক কোম্পানীর এইরূপ অলিখিত ও অনুষ্ঠানবিহীন জোট গড়ে উঠেছিল।

(iii) যখন একই অর্থসংস্থানকারী ব্যক্তি কিংবা সংস্থার দ্বারা কতকগুলি কোম্পানীর মধ্যে সমস্বার্থ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তখন তাকে বলা হয় আর্থিক সংহতি। এটি একপ্রকার অলিখিত ও আনুষ্ঠানবিহীন জোট।

(i) **সমস্বার্থ গোষ্ঠীর সুবিধা :**

(১) এই জাতীয় জোটগঠন খুবই সহজ। এটি গঠনে কোনও আনুষ্ঠানিক জটিলতা থাকে না।

(২) এই জাতীয় জোটের অন্তর্গত কোম্পানীগুলির পরিচালকবর্গ ও পরিচালনা-পদ্ধতি এক হলেও এগুলির পৃথক সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় থাকে।

(৩) জোটবদ্ধ কোম্পানীগুলি একই লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একই নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) সমস্বার্থ-গোষ্ঠী জাতীয় জোটগুলি বৃহদায়তন প্রকৃতির হওয়ায় পণ্যের উৎপাদন ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সুবিধা পায়। এতে কোম্পানীগুলির ব্যয়সংকোচ ঘটে।

(৫) এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা শিল্পোন্নতির একটি নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারে।

(ii) **সমস্বার্থ গোষ্ঠীর অসুবিধা :**

(১) এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করে উৎপাদন সীমাবদ্ধ ও মূল্যবৃদ্ধি করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের চেষ্টা করে, এতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং ক্রেতাদের স্বার্থ বিনষ্ট হয়। সুতরাং এটি একটি জনবিরোধী প্রতিষ্ঠান।

(২) বৃহদায়তনের সকল প্রকার সুবিধাভোগে এই জোট সক্ষম হয় না।

(৩) এই জোটের অন্তর্গত কোম্পানীগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী পরস্পর সংযুক্ত পরিচালকগোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তাতে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়।

(৪) এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা একদল পরিচালকের ওপর থাকায় এই সকল পরিচালকের মতৈক্য ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠানগুলির ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই মতৈক্য ও সহযোগিতা বজায় থাকে ততক্ষণ এই জোটের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। মতানৈক্য ও অসহযোগিতার সৃষ্টি হয় যখনই, তখনই এই জোট বিনষ্ট হয়।

(৫) এই জাতীয় জোট হল গোপন জোট। নিজেদের কার্যকলাপ ও স্বার্থ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাই এর উদ্দেশ্য। এজন্য এই জোট খুবই আপত্তিজনক ও ক্ষতিকর।

৮০.৪.৪ পূর্ণ সংহতি

যখন একাধিক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজ নিজ সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে নতুন কোম্পানী বা জোট সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় একীকরণ বা পূর্ণ সংহতি। হ্যানীর মতে, পূর্ণ সংহতি এমন একটি কারবারী সংগঠন যা অঙ্গীভূত অর্থাৎ যোগদানকারী সংস্থাগুলির সমুদয় সম্পত্তি সরাসরি কিনে নিয়ে এবং ওই সম্পত্তি সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত বা একত্রিত করে একটি কারবারী সংস্থায় পরিণত হয়। একীকরণ হল কারবারী জোটের সর্বোচ্চ রূপ।

পূর্ণ সংহতি বা একীকরণ প্রধানত দুপ্রকারের—(ক) একত্রীকরণ এবং (খ) অন্তর্ভুক্তি।

(ক) **একত্রীকরণ**—যখন এই জাতীয় জোট গঠনে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কারবার গুটিয়ে নিয়ে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার কাছে নিজেদের সম্পত্তি ও দায় হস্তান্তরিত করে দেয় তখন তাকে বলা হয় একত্রীকরণ। এর ফলে এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি চিরতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকে না। নতুন প্রতিষ্ঠানটি তখন যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়।

(খ) **অন্তর্ভুক্তি**—যখন কোনও চালু কোম্পানীর সাথে এক বা একাধিক কোম্পানী মিলিত হয় তখন তাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তি। অর্থাৎ একটি চালু কারবারী সংস্থা অন্য কতকগুলি কোম্পানী বা কারবারী সংস্থাকে কিনে নিয়ে পূর্ণ সংহতি স্থাপন করলে তাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তি। এই জোট গঠনের ফলে যে কারবারী সংস্থাটি অন্য সংস্থাগুলিকে কিনে নেয় তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু যে সংস্থাগুলিকে কেনা হয় তাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। এই সংস্থাগুলি নিজ নিজ সত্তা বিসর্জন দিয়ে এক বৃহত্তর আয়তনের সংস্থায় পরিণত হয়।

এই অন্তর্ভুক্তি ও একত্রীকরণের গঠনপদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হলেও এদের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা একই ধরনের। অর্থাৎ পূর্ণ সংহতির একই বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা এরা উভয়েই ভোগ করে। নিম্নে পূর্ণ সংহতির এই সকল বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করা হল।

(i) **পূর্ণ সংহতির বৈশিষ্ট্য :**

(১) এই জাতীয় কারবারী জোট গঠনের জন্য যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পূর্ণ সম্মতির প্রয়োজন। কোনও প্রতিষ্ঠানের সম্মতি ছাড়া এই জোট গঠিত হয় না।

(২) এই জাতীয় কারবারী জোট গঠনের জন্য যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় সম্পত্তি সরাসরি কিনে নিতে হয়।

(৩) এই জাতীয় কারবারী জোটে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিজ নিজ স্বাধীন সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাছাড়া এই জোটের ফলে একাধিক বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সাথে মিশে গিয়ে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

(৪) এই জাতীয় জোট হল কারবারী জোটের সর্বোচ্চ রূপ। এই জোটের ফলে সংস্থাগুলির মিলন পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত হয়। এই জোট থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না। ফলে এই জাতীয় জোট অনেকদিন স্থায়ী হয় এবং এর অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলিও নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করতে পারে।

(ii) **পূর্ণ সংহতির সুবিধা :**

(১) এটি কারবারী জোটের সরলতম, সরাসরি এবং সর্বাপেক্ষা স্থায়ী রূপ।

(২) আর্থিক ও আইনের দিক দিয়ে এটি একটি সুসংহত ও সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। আইনগত বাধ্য বাধ্যকতা থাকায় এই জোট অধিক দিন স্থায়ী হয়।

(৩) এই জোট গঠনের ফলে এর অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য ও পৃথক সত্তা লোপ পায়। এর ফলে এদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয় এবং সকলের পক্ষে একই নীতি গ্রহণ করা ও চালু করার সুবিধা হয়।

(৪) এই জোট স্থাপনের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়সংকোচ ঘটে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর হয়, অদক্ষ কারবার বন্ধ হয়ে যায়, উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি, দক্ষপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া চালু করা যায় এবং সুষ্ঠভাবে কারবার পরিচালনায় কোনওরূপ মতানৈক্য থাকে না।

(৫) এই জাতীয় জোটে মালিকানা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হয়। অন্যান্য জোটের ন্যায় ক্ষমতা একজনের হাতে আবার দায়িত্ব অন্যজনের হাতে থাকে না। ক্ষমতা ও দায়িত্ব একজনেরই হাতে বিন্যস্ত হওয়ার জোটের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, রদবদল, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি করা সম্ভব হয়।

(৬) ট্রাস্ট বা হোল্ডিং কোম্পানীতে যেখানে একনায়কতন্ত্রের প্রভাব বেশি সেখানে একীকরণে গণতন্ত্রের প্রভাব বেশি।

(৭) অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান নিয়ে এই জোট গঠিত হওয়ায় এদের আর্থিক সম্বল অনেক বেশি এবং তার ফলে অতি সহজেই সংস্থার সম্প্রসারণ করা যায়। এছাড়া বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতে থাকায় অতি সহজেই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণগ্রহণ বা ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহে কোনওরূপ অসুবিধা হয় না।

(৮) পণ্য বিক্রয়, প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই জোটের সুবিধা অন্যান্য জোটের তুলনায় অনেক বেশি। পৃথক পৃথক বিক্রয় সংগঠন, প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়ের পরিবর্তে একটি মাত্র প্রচার-বিজ্ঞাপন এবং পণ্যবিক্রয় ব্যবস্থার দ্বারা বিক্রয় এবং প্রচারের খরচ যথেষ্ট হ্রাস পায়।

(৯) এই জোটগঠনের ফলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে না। এই জোটের বাইরে অনেক কোম্পানী থাকে। তার ফলে সৎ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে এবং ক্রেতারা কম মূল্যে পণ্য পান এবং শ্রমিকরা ন্যায্য হারে মজুরি পায়। অর্থাৎ এই জোটের ফলে ক্রেতা এবং শ্রমিক উভয়েরই স্বার্থ রক্ষিত হয়।

(iii) **পূর্ণ সংহতির অসুবিধা :**

(১) এই জাতীয় জোট গঠনের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থের অভাবে অনেকসময় এরূপ জোট গড়ে তোলার চেষ্টা কার্যকর হয় না। তাছাড়া শেয়ারহোল্ডারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্মতি ছাড়া এরূপ জোট গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

(২) একত্রিত হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে যোগদানকারী কোনও প্রতিষ্ঠান তেমন লাভজনক হচ্ছে না, তা হলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না আবার একত্রিত কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠাধিকারও থাকে না।

(৩) এই জোট গঠিত হওয়ার ফলে জোটে যোগদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আগে যে সুনাম ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাদের আর কোনও পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। নতুন জোটকে তখন আবার নতুন করে সুনাম অর্জন করতে হয়। এটি সম্ভবপর হলেও সময়সাপেক্ষ।

(৪) যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হবে তাদের মালিকগণ অনেক সময়ই বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করে থাকেন। ফলে একত্রিত হবার প্রস্তাব আর কার্যকর হয় না।

(৫) একীকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানের নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় স্থানীয় অবস্থার বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না।

(৬) এই জোট কোনওপ্রকার দায়িত্ব বা ঝুঁকি এড়াতে পারে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ জোর করে কঠোরভাবে এদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

(৭) অনেক ক্ষেত্রে এই জোট সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে এটি অতি মূলধন ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অসুবিধা ভোগ করে তাছাড়া বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যেও অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

(৮) এই জাতীয় জোট প্রত্যক্ষভাবে এবং স্পষ্টভাবে একচেটিয়া ধরনের জোট। ফলে একে সরাসরিভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ আঘাত এবং জনমতের তীব্র বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়।

(৯) অন্যান্য জোটে যেমন হোল্ডিং কোম্পানীর অধীন কোম্পানীর দ্বারা ঝুঁকি কমানোর একটি উপায় থাকে, এই জাতীয় জোটে অর্থাৎ পূর্ণ সংহতির ক্ষেত্রে সেরূপ কোনও সুযোগ থাকে না।

একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে পার্থক্য : পূর্ণ সংহতির দুই রূপ একত্রীভবন ও অন্তর্ভুক্তির মধ্যে মিল অনেক বেশি। তারা একই ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, একই সুবিধা ভোগ করে আবার একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কেবলমাত্র গঠনের দিক দিয়ে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—

	একত্রীকরণ	**অন্তর্ভুক্তি**
সংজ্ঞা	১। বিভিন্ন কোম্পানী একত্রিত হয়ে একটি নতুন কোম্পানী সৃষ্টি করলে তাকে একত্রীকরণ বলে।	১। একটি কোম্পানী অপর একটি কোম্পানী ক্রয় করলে কিংবা একটি প্রতিষ্ঠান অপর একটি প্রতিষ্ঠান ক্রয় করলে তাকে অন্তর্ভুক্তি বলা হয়।
সত্তা ও অস্তিত্ব	২। একত্রীকরণের ক্ষেত্রে যোগদানকারী সকল কোম্পানীর পৃথক সত্তা বিনষ্ট হয়।	২। অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিক্রীত কোম্পানীর পৃথক অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়।
শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ	৩। এর অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়।	৩। এর অন্তর্গত যে সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয় তাদের শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু যার অন্তর্ভুক্ত হয় তার শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ হয় না।
প্রবর্তকের উদ্যোগ	৪। বাইরের কোন প্রবর্তকের উদ্যোগ ছাড়া এই জোট গঠিত হয় না। কারণ এখানে যাদের একত্রীকরণ ঘটে তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নিজেদের উদ্যোগে একত্রিত হতে পারে না।	৪। সাধারণত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানটির নিজের উদ্যোগেই এই জোট গড়ে ওঠে।

(iv) কার্টেল ও একীকরণের মধ্যে পার্থক্য : কার্টেল বা বিক্রয়কারী সংঘ এবং একীকরণ বা পূর্ণ সংহতির মধ্যে যে সকল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

	কার্টেল	একীকরণ
সংজ্ঞা	১। সদস্য কারবারী সংস্থাগুলি পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয়ের বাজারের ওপর একাধিপত্য বিস্তার এবং মুনাফা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাজারে পণ্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় তখন সেই চুক্তিবদ্ধ কারবারী জোটকে কার্টেল বলে।	১। যখন একাধিক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মিলতি হয়ে নতুন কোম্পানী সৃষ্টি করে তখন তাকে বলা হয় একীকরণ বা পূর্ণ সংহতি।
বিভাগ	২। শর্ত, গুণগত, উৎপাদন, বাজার কার্টেল এবং ট্র্যাফিক সিন্ডিকেট ও বিক্রয় সিন্ডিকেট এই ছটি হল এর প্রধান প্রধান ভাগ।	২। একত্রীকরণ এবং অন্তর্ভুক্তি হল এর প্রধান দুটি ভাগ।
স্বাধীন সত্তা	৩। এর অন্তর্গত সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে।	৩। এর অন্তর্গত সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়।
পরিচালনা	৪। এই জোটের অন্তর্গত সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় জোট কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করে না।	৪। এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় জোট সম্পূর্ণভাবে হস্তক্ষেপ করে।
মালিকানা	৫। এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না।	৫। এই জোটের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তরিত হয়।
একচেটিয়া কারবার	৬। সম্পূর্ণরূপে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করা এই জোটের প্রধান উদ্দেশ্য।	৬। আংশিকরূপে একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি করা এই জোটের প্রধান উদ্দেশ্য।
প্রকৃতি	৭। এটি সাধারণত প্রকৃতির দিক থেকে সমান্তরাল জোট।	৭। প্রকৃতির দিক থেকে এটি সমান্তরাল বা পূর্বাপর উভয়ই হতে পারে।
কেন্দ্রীকরণ	৮। এই জাতীয় জোটে কেবলমাত্র বিক্রয়কার্য পরিচালনা কেন্দ্রীভূত হয়। অন্য কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীকরণ ঘটে না।	৮। এই জাতীয় জোটে সকল প্রকার পরিচালনার ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীকরণ ঘটে। অর্থাৎ পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয়।
অতি মূলধন	৯। এই জোট গঠনের জন্য খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না, ফলে অতি মূলধনের ভয় থাকে না।	৯। এই জোট গঠনের জন্য খুব বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং তার ফলে অতি মূলধনের ভয় থাকে।
স্থায়িত্ব	১০। এই জোটগঠন খুবই সহজ। এতে কোনও আইনগত বিধি-ব্যবস্থা নেই। এটি শিথিল ও অস্থায়ী।	১০। এই জোট গঠন অপেক্ষাকৃত কঠিন। এতে আইনগত আনুষ্ঠিকতা থাকায় এটি সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী।

পরিধি	১১। এই জোট কেবলমাত্র দেশে নয় বিদেশেও গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ এর পরিধি দেশ-বিদেশে বিস্তৃত।	১১। এই জোট কেবলমাত্র দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এর পরিধি বিদেশে বিস্তৃত নয়।
গড়ে ওঠার সময়	১২। সাধারণত মন্দার সময়ে এই জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়।	১২। মন্দা বা তেজী, সাধারণত উভয় সময়েই এই জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়।
সমাজে প্রভাব	১৩। একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় বলে এটি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।	১৩। পুরোপুরি একচেটিয়া কারবারের সৃষ্ট না হওয়ায় এটি সমাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অকল্যাণকর।

৮০.৫ ভারতে কারবারী জোটবদ্ধকরণ

কৃষিনির্ভর দেশ ভারতবর্ষ আজও শিল্পে খুব একটা উন্নত নয়। তাই শিল্পে উন্নত দেশগুলির মতো এখানে কারবারী জোটবন্ধন খুব একটা বেশি প্রসার লাভ করেনি। ভারতীয় শিল্পে জোটবন্ধন কার্যত বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে আরম্ভ হয়েছে। ভারতে এরূপ মন্থর গতিতে শিল্প বিকাশের কিছু কারণও আছে।

(ক) পরাধীন ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে যে শিল্পের প্রসার ঘটেছিল তাতে অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব ছিল। প্রতিযোগিতাই হল জোট গঠনের প্রধান প্রেরণা। ফলে অবাধ প্রতিযোগিতার অভাবে ভারতে তেমনভাবে কোনও জোট গড়ে ওঠেনি।

(খ) পরাধীন ভারতে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই মালিক ছিল বিদেশিরা। তারা নিজেদের স্বার্থেই কারবার পরিচালনা করত। পরে ভারতীয়রা শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করলে যে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব লক্ষ করা যায় তা ম্যানেজিং এজেন্সি নামক জোট সৃষ্টি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে আর কোনও উন্নততর জোট গড়ে ওঠেনি।

(গ) আবার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবও খুব বেশি ছিল। তাছাড়া শিল্পগুলির বিক্ষিপ্ত অবস্থান এবং ক্ষুদ্র আয়তন আনুষ্ঠানিকভাবে জোট বন্ধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। ফলে সেরকমভাবে কোনও জোট ভারতে গড়ে ওঠেনি।

পরে যখন দেশ স্বাধীন হয় তার পর থেকে দেশে শিল্পোন্নতি ঘটে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এর ফলে ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে ব্যবসায়ীদের মনে জোটবন্ধন গড়ে তোলার মনোভাব গড়ে ওঠে। এর ফলে ভারতে যে বিভিন্ন প্রকার জোট গড়ে উঠতে দেখা যায় সেগুলি হল :

(i) **অ্যাসোসিয়েশন** : ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ সমিতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান সুগার মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান সোপ মেকার্স অ্যাসেসিয়েশন, ইন্ডিয়ান পেপার মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি।

(ii) **চেম্বারস অব কমার্স** : বিভিন্ন প্রকার সমিতির মতো ভারতে কিছু কিছু বণিক সভা বা চেম্বারস অব কমার্স দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্স, ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি। এর মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স হল এদেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রধান মুখপাত্র।

(iii) **পুল ও কার্টেল** : এই জাতীয় জোটবন্ধনও ভারতে কিছু কিছু লক্ষ করা যায়। সাধারণত পাট, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে এই জোট লক্ষ করা যায়। ভারতে উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় জোটের দৃষ্টান্ত হল :—

চটকল শিল্পে ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, সিমেন্ট শিল্পে সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানী, চিনি শিল্পে ইন্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেট প্রভৃতি। সাধারণত মূল্য বজায় রাখা ও মূল্যহ্রাস বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পুল ও কার্টেল গঠিত হয়।

(iv) **হোল্ডিং কোম্পানী** : ভারতে অনেকগুলি হোল্ডিং কোম্পানী দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, তামাক, চা প্রভৃতি শিল্পে এই জাতীয় জোট লক্ষ্য করা যায়। অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী (এসিসি) সিমেন্ট মার্কেটিং কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারের এবং পাতিয়ালা সিমেন্ট কোম্পানীর বহু শেয়ারের মালিক। এছাড়া শ ওয়ালেস কোম্পানী, ইকুইটেবেল কোল কোম্পানী প্রভৃতি এই জাতীয় জোট। ইস্পাত শিল্পের জন্য ভারত সরকার কর্তৃত্ব স্থাপিত Steel Authority of India Limited (SAIL) এবং কয়লাশিল্পের জন্য স্থাপিত Coal India Limited (CIL) হল দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হোল্ডিং কোম্পানী।

(v) **সমস্বার্থ গোষ্ঠী** : এই জাতীয় জোট ভারতবর্ষে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রভাবেই এরূপ জোট সৃষ্টি হত এবং প্রসার লাভ করত। অ্যানড্রু ইয়ুল, ম্যাকলিয়ড, মারটিন বার্ণ, জারডিন হেন্ডারসন, ডানকান প্রভৃতি ৯টি ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা ২৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। ভারতে এরূপ সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল টাটা, বিড়লা, ডামলিয়া, থাপার, সিংহানিয়া, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি প্রায় ৯টি শিল্পপতি গোষ্ঠী যারা ভারতীয় শিল্প কোম্পানীগুলির প্রায় ৬০০টির পরিচালক পদ দখল করেছিল।

(vi) **পূর্ণ সংহতি** : এই জাতীয় জোট ভারতে খুব একটা বেশি বিস্তার লাভ করেনি। তবে যা কিছু কিছু এই জাতীয় জোটে লক্ষ্য করা যায় তার বেশির ভাগই ম্যানেজিং এজেন্ট বা সরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই জাতীয় জোটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৬টি কোম্পানী নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১১টি সিমেন্ট কোম্পানী নিয়ে গঠিত অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী, ইন্ডিয়ান আয়রন এন্ড ষ্টীল কোম্পানী (IISCO) -এর মধ্যে ষ্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল (SCOB) এর অন্তর্ভুক্তি, ম্যাকনীল কোম্পানী ও বেরী কোম্পানীকে নিয়ে গঠিত ম্যাকনীল অ্যান্ড বেরী কোম্পানী প্রভৃতি।

(iv) **দেশি বিদেশি কারবারী জোট বা "জয়েন্ট ভেনচার"** ঃ স্বাধীনতা লাভের পর দেশি শিল্প সংস্থাগুলির সাথে বিদেশি শিল্প সংস্থাগুলির নানাধরনের জোটবদ্ধকরণের ফলে যে জোট গড়ে ওঠে তাকে বলে দেশি বিদেশি কারবারী জোট। বিদেশি সর্বাধুনিক কারিগরি জ্ঞান, বিদেশি পুঁজি, বিদেশি পেটেন্ট স্বত্ব ইত্যাদির সুবিধা ভোগই এর জাতীয় জোটের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জাতীয় জোটের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বিড়লা-ন্যুফিল্ড চুক্তি (হিন্দুস্থান মোটরস), টাটা-মারসিডিস বেনজ্ চুক্তি (টেলকো), আই-সি-আই-টাটা ইত্যাদি। তবে এই জাতীয় জোট খুবই সমালোচিত এবং এর ফলে দেশি বিদেশি একচেটিয়া বড় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে এই জাতীয় জোট খুব একটা বেশি বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

৮০.৬ বহুজাতিক কোম্পানী

যখন কোনও একটি দেশের কারবারী সংস্থা বিভিন্ন দেশের কারবারী ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তখন প্রভাব-বিস্তারকারী কারবারী সংস্থাকে বলা হয় বহুজাতিক কোম্পানী। এদের সংক্ষেপে মালটিন্যাশনাল, কখনও বা ইন্টারন্যাশনাল, আবার কখনও বা ট্রান্সন্যাশনালও বলা হয়। এগুলি হল বহু দেশে পরিব্যপ্ত বিরাট আন্তর্জাতিক জোট। এই জোটের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) সাধারণত উৎপাদনের ও বাজারের মাত্রা, বিষয়-সম্পত্তির আয়তন, বাজারের উপর তার ক্ষমতা বিস্তার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে।

(ii) এদের প্রত্যেকের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে। এদের প্রধান কার্যালয় কোনও একটি দেশে অবস্থিত হয়। যে দেশে এই জোট গঠিত হয় সেই দেশে এই জোটের একটি পৃথক আইনগত সত্তা বিদ্যমান থাকে। কেন্দ্রীয়

সংগঠনের অধীনে এরা বিভিন্ন দেশে অনেক সংগঠন সৃষ্টি করে থাকে।

(iii) পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ও উন্নত দেশগুলিতে মূলধনের প্রাচুর্যের ফলে এরা জন্মগ্রহণ করে।

(iv) এই জোটের অন্তর্গত কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকের মূলধন ও বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ বিপুল। এই বিপুল সম্পদের মাধ্যমে এরা বিভিন্ন দেশের উৎপাদন, বাজার এমনকি অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করে থাকে।

(v) এই জোট আন্তর্জাতিক পরিসরে পূর্বাপর জোটের ভিত্তিতেই কারবার পরিচালনা করে থাকে।

(vi) এরা দেশে-বিদেশে বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে তৎপর হয় এবং এই সকল বাজারে অবাধ বাণিজ্যের জন্য সচেষ্টা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই সকল জোটের কার্যকলাপ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। বহুজাতিক সংস্থার ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যই সর্বাধিক। তবে অন্যান্য দেশেও যেমন বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতেও এই জোট বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বহুজাতিক কোম্পানীর সুবিধা :

(i) এদের মূলধনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এরা সহজেই সংগঠিত মূলধনের বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং এতে তাদের বিনিয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার সুযোগ-সুবিধা থাকে।

(ii) এদের পক্ষে দক্ষ এবং ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করার সুবিধা আছে।

(iii) এদের শক্তি ও সম্পদের পরিমাণ এত বেশি যে এরা তার প্রভাব সরকারের ওপর ফেলতে পারে। এবং সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

(iv) এদের হিসাবরক্ষণ প্রণালী এত উন্নত যে এরা সহজেই বিভিন্ন দেশের সংস্থাগুলির ওপর সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে পারে।

(v) এরা আপেক্ষিক ব্যয়বিধির সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এবং তার ভিত্তিতে পণ্য আদান-প্রদান করার চেষ্টা করে।

(vi) এই জোটের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে।

বহুজাতিক কোম্পানীর অসুবিধা :

(i) বিভিন্ন দেশে কারবারী সংস্থাগুলি অবস্থিত হওয়ায় কার্যোপলক্ষে সংস্থার লোকজনদের বিভিন্ন দেশে বসবাস করতে হয়। ফলে সেই দেশের সরকারের আনুগত্য তাদের স্বীকার করতে হয়।

(ii) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার আইন এদের কার্যকলাপ বিস্তারে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্ট-বিরোধী আইন এই দেশের কোম্পানীগুলির ভিন্ন দেশে কাজকারবার চালানোয় নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি করেছে।

(iii) বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক নীতির ওপরও এদের নির্ভর করতে হয়। কারণ এরূপ প্রত্যেক দেশের প্রতিই এদের বাধ্য-বাধকতা আছে।

(iv) এই জাতীয় কোম্পানীর ম্যানেজারকে অনেক সময়ই স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। যে দেশে

এই কোম্পানীর সৃষ্টি হয় সেই দেশের সরকার এতে খুব একটা খুশি হয় না। ফলে তাদেরকে সরকারের বিরাগ-ভাজন হতে হয়।

(v) এই জাতীয় কোম্পানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে কার্যত শাখা বা অধীন কোম্পানীর জন্য একই নীতি প্রবর্তন করা বা কার্যকর করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ বিভিন্ন দেশের আচার-নিয়ম, আইনকানুন সবই পৃথক। এক দেশে যে নীতি চালু আছে অন্য দেশে হয়ত সেই নীতির বৈপরীত্য দেখা যায়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের শ্রমনীতি ও মজুরি প্রদানের হারও বিভিন্ন রকমের। ফলে এই সমস্ত ব্যাপার সমগ্র সংস্থার নীতি নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি করে।

(vi) এই জাতীয় সংস্থায় যে প্রযুক্তিবিদ্যা ও সহযোগিতার নীতি গৃহীত হয় তাতে একটি বিশেষ শর্ত থাকে যে, যে দেশে এরা কর্মরত থাকবে সেই দেশের লোককে এই প্রযুক্তির শিক্ষা দেবে এবং সেই দেশের লোক নিয়োগ হবে আগে। এতে উৎপাদনের ক্ষতি হয়। ফলে এই সংস্থার উন্নতি ব্যাহত হয়।

(vii) এদের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করতে হয় এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি চালু করতে হয়। এতে সমগ্র সংস্থাকে একই অনুশাসন অনুযায়ী চালনা করা যায় না। ফলে এর স্থায়িত্ব খুব একটা বেশিদিন থাকে না।

এত সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ম্যালটিন্যাশানাল কর্পোরেশনগুলির অনুপ্রবেশ বেড়েছে। বর্তমানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে যেমন— অ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, ঢালাই, ঔষধ প্রভৃতিতে এদের অবস্থিতি দেখা যাচ্ছে। এর ফলে দেশে একচেটিয়া কারবার বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

৮০.৭ ভারতে জোটবদ্ধকরণে সরকারি নীতি

ভারতের শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্রে কারবারীদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কতটা কেন্দ্রীভূত এবং তার ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রভাব কেমন তা জানার জন্য ভারত সরকার ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি স্থাপন করে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ পি.সি. মাইলানবিশ। এই কমিটি রিপোর্ট থেকে ভারতের একচেটিয়া কারবারের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই অবস্থার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ভারত সরকার একটি একচেটিয়া অনুসন্ধান কমিশন গঠন করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত এই কমিশন-এর সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন মি. কে. সি. দাশগুপ্ত। এই রিপোর্ট ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়। এই রিপোর্ট থেকেও ভারতের শিল্পবাণিজ্যে একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারক প্রভাব দেখা যায়। উপরোক্ত সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি আইন (Monopoly and Restrictive Trade Practices Act) পাস করা হয়।

এই আইনের উদ্দেশ্যগুলি হল :

(i) একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা। (একচেটিয়া কারবারের উচ্ছেদ-সাধন করা নয়।)

(ii) সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থনৈতিক ক্ষমতাগুলির কেন্দ্রীভবন রোধ করা।

(iii) উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন ও ন্যায্য বন্টনে ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা প্রতিরোধ করা এবং একচেটিয়া কারবার যাতে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই আইনের অন্তর্গত যে বিষয়গুলি উল্লিখিত আছে সেগুলি হল :

(i) এই আইনে উৎপাদক, পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পণ্য ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কীয় চুক্তিগুলিকে রেজিস্টারের কাছে নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ii) একচেটিয়া ব্যবসাপদ্ধতি বলতে উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অন্যায্যভাবে দ্রব্য বা সেবার মানের অবনতি ঘটানো, দ্রব্য বা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করা মূলধন নিয়োগ বা প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণ রোধ করা প্রভৃতিকে বুঝায়। আর বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি বলতে বোঝায় এরূপ প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করা, উৎপাদনে সম্পদ বা মূলধন নিয়োগ বিঘ্নিত করা, পণ্য বা সেবা বন্টনে ও মূল্য নির্ধারণে কারচুপির আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি। একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি আইন দ্বারা এই সকল বিষয়গুলি যাতে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

(iii) এই আইন কেবলমাত্র প্রভাবশালী এবং একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত হয়েছিল।

(iv) এই আইনের প্রথমেই একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

(v) এই আইনে অনুসন্ধান ডিরেক্টর এবং বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি রেজিস্ট্রার আছেন। বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসা-পদ্ধতির কোনও অভিযোগ পেলে ডিরেক্টর প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ করবেন এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও সত্যতা বিচার করবেন। আর রেজিস্ট্রার বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসার চুক্তিপত্র নথিবদ্ধ করবেন।

(vi) এই আইনে কারবার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণেরও ব্যবস্থা আছে। এর উদ্দেশ্য কারবার সম্প্রসারণ রুদ্ধ করা নয় কেবলমাত্র সম্প্রসারণের আবেদনের যৌক্তিকতা বিচার করা এবং তা যুক্তিযুক্ত হলে সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া।

অর্থাৎ বলা যায় যাতে কারবারী ক্ষেত্রে স্বাধীন ও ন্যায্য প্রতিযোগিতা স্থাপন হয়, তার উদ্দেশ্যেই এই আইন পাস করা হয়েছে। এই আইনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের ধনসম্পত্তি করায়ত্ত হওয়ার প্রচেষ্টা রোধ করা, স্বল্পবিত্তসম্পন্ন লোকের শিল্পবাণিজ্য দ্বারা অবস্থার উন্নতি করা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা।

এই আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি হল :

(i) সরকার অনেক ক্ষেত্রে জোটবন্ধন দ্বারা কারবারী ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে এবং তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই আইন তাহলে সরকারি নীতির বিপরীতগামী হয়ে দাঁড়াবে।

(ii) যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভাল শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে এই আইন শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে যায়।

(iii) বড় বড় কারবারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা লোকের জনজীবন নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয় পড়ছে এই ধারণা নিয়েই এই আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই ধারণা নিয়েই এই আইন পাস করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভারতে বৃহৎ কারবার সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে, এই আইনের দ্বারা কারবারের প্রতিষ্ঠার উৎসাহ ও উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যাবে এবং পণ্যের উৎকর্ষ ও ব্যবসা প্রসার উভয়ই বিঘ্নিত হবে।

(iv) সরকারি ও সমবায় ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ নেই। ফলে এতে বেসরকারি ক্ষেত্রের ওপর বৈষম্যমূলক আচারণই প্রকাশ পায়।

(v) প্রকৃত অর্থে, দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ কতটা প্রসারলাভ করছে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া খুবই কঠিন। ফলে এই আইন পরিচালনা করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপর।

(vi) এই আইনের দ্বারা যে কমিশন স্থাপন করা হয়েছে তার কাজও ব্যাপক নয়। ফলে তাদের দ্বারা প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে সেরূপ আশা করা যায় না।

(vii) লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে কমিশন এবং লাইসেন্স কমিটি—দুটি সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এতে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং একই কাজই হয়তো দু-বার করে করা হয়ে যায়।

এইভাবে সরকার একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারক ব্যবসাপদ্ধতি আইন দ্বারা একচেটিয়া কারবারের বিস্তার রোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

৮০.৮ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে কারবারী জোটবদ্ধকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ। প্রকৃতিগত ভাবে জোটের শ্রেণীবিভাগ যেমন— পূর্বাপর জোট, সমান্তরাল জোট, পার্শ্বিক জোট, আঞ্চলিক জোট, বৃত্তাকার জোট, তির্যক জোট এবং স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোট কাকে বলে, এদের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ভারতে এইরূপ জোটের দৃষ্টান্ত, সুবিধা, অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও এই এককে জোটের গঠনসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগগুলি, যেমন— সমিতিসমূহ, কারবারী সংঘ, আংশিক সংহতি, পূর্ণ সংহতি কাকে বলে, প্রতিটির উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগগুলি আবার কয় ভাগে বিভক্ত, তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সম্পর্কেও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে বহুজাতিক কোম্পানী কাকে বলে, তার বৈশিষ্ট্যসমূহ, সুবিধা, অসুবিধা, ভারতে কারবারী জোটবদ্ধকরণে সরকারি নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ এই এককে কিভাবে কারবারী জোট গড়ে ওঠে, কিভাবে তার বিভিন্ন ভাগ বিভক্ত হয়ে তাদের কার্যকলাপ বিস্তার করে, এই সকল জোটের ফলে কি সুবিধা ও অসুবিধা ভোগ করা যায় সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা হয়েছে।

৮০.৯ অনুশীলনী

(ক) **বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী :**

১। কারবারী জোট কাকে বলে ? এর বৈশিষ্টগুলি কি কি ?

২। "প্রতিযোগিতা জোটবন্ধন সৃষ্টি করে।"—আলোচনা করুন। বিভিন্ন প্রকার জোটবন্ধনের নাম উল্লেখ করুন।

৩। প্রকৃতি অনুযায়ী কারবারী জোটকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ? প্রতিটি জোটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৪। পূর্বাপর ও সমান্তরাল জোট কাকে বলে ? এদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিবৃত করুন।

৫। পার্শ্বিক জোট ও আঞ্চলিক জোট সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৬। স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক জোট সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৭। জোটের গঠনের ওপর ভিত্তি করে জোটকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? প্রতিটি ভাগ সম্পর্কে সবিস্তারে লিখুন।

৮। সমিতিসমূহ সম্পর্কে কি জানেন?—সবিস্তারে লিখুন।

৯। কারবারী সংঘ সম্পর্কে কি জানেন?—সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

১০। উৎপাদক সংঘ ও বিক্রয়কারী সংঘের বিবরণ দিন।

১১। ট্রাস্ট ও কার্টেল সম্পর্কে কি জানেন?— সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

১২। আংশিক সংহতি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

১৩। পূর্ণ সংহতি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কিরূপ?

১৪। সমস্বার্থ গোষ্ঠী কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখুন।

১৫। বহুজাতিক কোম্পানী সম্পর্কে যা জানেন সবিস্তারে লিখুন।

১৬। একচেটিয়া এবং বাধাসৃষ্টিকারী ব্যবসাপদ্ধতি আইন বলতে কি বোঝেন? এর বৈশিষ্ট্য কি? এই আইনে কোন কোন বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে? এই আইনের ত্রুটিগুলি কি কি?

১৭। হোল্ডিং কোম্পানী সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

(খ) **পার্থক্য নিরূপণ করুন :**

১। ট্রাস্ট ও কার্টেল; ২। একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তি ; ৩। কার্টেল একীকরণ।

(গ) **সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন:**

১। বহুজাতিক কোম্পানী।

২। একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তি।

৩। একপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট ও বহুপণ্যমুখী পার্শ্বিক জোট।

৪। অনুষ্ঠানবর্জিত চুক্তি।

৫। ব্যবসায়ী সমিতি।

৬। বণিক সভা।

৭। শ্রমিক সংঘ।

৮। কারবারী চক্র।

৯। হোল্ডিং কোম্পানী।

(ঘ) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

১। কারবারী জোট কাকে বলে ?

২। পূর্বাপর জোট কাকে বলে ?

৩। সমান্তরাল জোট কাকে বলে ?

৪। পার্শ্বিক জোট ও আঞ্চলিক জোট কাকে বলে ?

৫। তির্যক জোট ও বৃত্তাকার জোট কাকে বলে ?

৬। কারবারী সংঘ কি ?

৭। ট্রাস্ট কি ?

৮। হোল্ডিং কোম্পানী কি ?

৯। কার্টেল কি ?

১০। আংশিক সংহতি কাকে বলে ?

(ঙ) অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন :

১। উৎপাদন সংঘ।

২। বাজার সংঘ।

৩। আয় সংঘ।

৪। মুনাফা সংঘ।

৫। শর্ত কার্টেল।

৬। গুণগত কার্টেল।

৭। উৎপাদন কার্টেল।

৮। বাজার কার্টেল।

৯। ট্রাফিক সিন্ডিকেট।

১০। বিক্রয় সিন্ডিকেট।

একক ৮১ ❐ ক্ষুদ্রায়তন কারবার

গঠন

৮১.০ উদ্দেশ্য
৮১.১ প্রস্তাবনা
৮১.২ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের সংজ্ঞা
৮১.৩ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ
৮১.৪ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ভূমিকা
৮১.৫ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ত্রুটি এবং তার দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা
৮১.৮ সারাংশ
৮১.৯ অনুশীলনী

৮১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রায়তন কারবার সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন কারবার কাকে বলে, কিভাবে গড়ে ওঠে, এর উদ্দেশ্য কি, এই কারবারের ত্রুটিসমূহ কি এবং এই সকল ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে সরকারী ভূমিকা প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি করা।

৮১.১ প্রস্তাবনা

গ্রামভিত্তিক দেশ ভারতবর্ষ। এখানে শিল্পের তুলনায় কৃষির ওপরই বেশির ভাগ মানুষের জীবন নির্ভর করে। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির পাশাপাশি বর্তমানে বেশ কিছু শিল্পও গড়ে উঠেছে। গ্রামের তুলনায় শহরে বা শহরের নিকটবর্তী স্থানে এই সকল শিল্পের প্রসার ঘটেছে। শিল্পগুলি প্রধানত তিন প্রকারের : ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ। শিল্পের ওপর নির্ভর করেই কোনও দেশের কারবার গড়ে ওঠে। আর কোনও দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে সেই দেশের কারবারী লেনদেনের ওপর। কৃষিকে ভিত্তি করেও কারবারী লেনদেন ঘটে তবে সেগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রায়তনের হয়। আবার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে কেন্দ্র করেও কারবারী লেনদেন ঘটে যা ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে। তবে ভারতের মতো শিল্পে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন কারবার খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে। কারণ ভারতের অধিকাংশ কারবারী প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্রায়তনের।

৮১.২ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের সংজ্ঞা

যে সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তার কম সেই সকল কারবারী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় ক্ষুদ্রায়তন কারবার। এছাড়া বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রাংশ নির্মাণের সহযোগী কোনও কারবারের ক্ষেত্রে মূলধনের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলেও তাকে বলা হয় ক্ষুদ্রায়তন কারবার।

ভারতে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন থেকে শুরু করে তাদের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কাজ-কারবার বেশির ভাগই ক্ষুদ্রায়তন কারবারের মাধ্যমে হয়। ক্ষুদ্রায়তন কারবার আবার দুপ্রকার :

(ক) প্রাথমিক এবং (খ) গৌণ বা যান্ত্রিক কারবার।

প্রাথমিক কারবারের মধ্যে জীবন-ধারণের উপযোগী কৃষি শিল্পগুলি বেশি উল্লেখযোগ্য।

যান্ত্রিক বা গৌণ কারবারের মধ্যে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে গুড় প্রস্তুত, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, তেল নিষ্কাশণ, সাবান, পেস্টবোর্ড তৈরি, বিড়ি প্রস্তুত, ছাপাখানা, পোশাক তৈরি, ছোটছোটো আসবাব তৈরির কারখানা প্রভৃতি পড়ে। গ্রাম-ছাড়া শহরেও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত খুচরা ও পাইকারি অনেক কারবারই ক্ষুদ্রাকারের। এই সকল ক্ষুদ্রায়তন কারবার অধিকাংশই একক মালিকানাধীন। তবে কিছু কিছু একান্নবর্তী হিন্দু পারিবারিক কারবার, অংশীদারী কারবার ও সমবায় ভিত্তিক কারবারও পাওয়া যায়।

৮১.৩ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(i) এই কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ অন্যান্য কারবারের তুলনায় কম। এই পরিমাণ সাধারণত দশ লক্ষ বা তার কম।

(ii) কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত একক মালিকানাধীন। তবে হিন্দু পারিবারিক কারবার, অংশীদারী কারবার বা সমবায়ভিত্তিক কারবারও দেখা যায়।

(iii) কারবারের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ার ফলে এবং মালিক একজন বা কম হওয়ায় মালিক সহজেই দক্ষতার সাথে কারবার পরিচালনা করতে পারে।

(iv) নতুন নতুন ক্ষুদ্রায়তন কারবার স্থাপন করে বেকার ছেলেরা জীবিকা অর্জনের

(v) কারবার ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় কম যন্ত্রপাতি এবং মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে সহজেই এই কারবার স্থাপন করা সম্ভব।

(vi) ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষুদ্র কারবারের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।

(vii) দেশের শ্রমশক্তির একটা বিশাল অংশ এই কারবারে নিয়োজিত আছে

(viii) বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন অংশীদারী কারবারগুলিকে ঘরোয়া যৌথ কোম্পানীতে পরিণত করার জন্য সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে।

(ix) ক্ষুদ্রায়তন কারবারে শ্রম ব্যয়ের তুলনায় দক্ষতার মূল্য অনেকখানি। কোনও দক্ষ শ্রমিক সহজেই কুটির শিল্পের দ্বারা সুষ্ঠভাবে জীবনধারণ করতে পারে। ক্ষুদ্র কারবারে নিয়োজিত থাকার ফলে শ্রমিকের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পায়।

(x) অধিক শ্রমের ব্যবহার না করে দক্ষতার সাথে কারবার করা যায়। তাই বৃদ্ধ থেকে যুবা অথবা বৃদ্ধা থেকে তরুণী সকলেই এই কারবারে নিযুক্ত থেকে সম্মানের সঙ্গে নিজের জীবিকা অর্জন করতে পারে।

(xi) মূলধনের পরিমাণ কম হওয়ায় সহজেই বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়। কারণ অল্প

যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করা খুব একটা কষ্টসাধ্য হয় না।

(xii) যে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অল্প সেই বাজারে ক্ষুদ্রায়তন কারবার বিশেষ লাভজনক। ক্রেতার সংখ্যা যেখানে বেশি সেখানে এই কারবার কখনোই লাভজনক নয়।

৮১.৪ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ভূমিকা

সাধারণত দশ (১০) লক্ষ টাকা বা তার কম মূলধন নিয়ে গঠিত কোনও কারবারকে বলা হয় ক্ষুদ্র কারবার। ভারতের অর্থনীতিতে এই কারবার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। National Income Committee দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে ভারতের মতো একটি শিল্পে অনুন্নত দেশে বৃহদায়তন কারবারের দ্বারা যে পণ্য উৎপাদিত হয় ক্ষুদ্রায়তন কারবারে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ মূল্যের পণ্য উৎপাদিত হয়। এছাড়া ভারতবর্ষে বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হল ৩০ লক্ষ আর ক্ষুদ্রায়তন কারবারে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হল ২ কোটি। ভারতের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র কারবারকে এক নূতন তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র কারবারকে গ্রামীণ মানুষের সহকারী জীবিকা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সারা বৎসর কৃষিকার্য হয় না, ফলে অবসর সময়ে বা যে সময়ে কৃষিকার্য হয় না সেই সময় কৃষকরা কুটির শিল্প দ্বারা পণ্য উৎপাদন করে বা ক্ষুদ্র কারবারের সাহায্যে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের উন্নতি সাধিত হলে ভারতের বেকার সমস্যা কিছুটা হ্রাস পাবে। বর্তমানে আমাদের দেশে বৃহদায়তন কারবারের উন্নতি হলেও এখনও আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো কৃষিভিত্তিক। দেশের প্রায় শতকরা ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে অত্যধিক চাপ অনুভূত হয় এবং লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। কৃষির ওপর এই চাপ কমানোর জন্য এবং লোকের দারিদ্র্যতা হ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্র কারবারের বিস্তার এবং উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া বৃহদায়তন শিল্প গড়ে তুলতে হলে প্রচুর মূলধন এবং অত্যাধুনিক অতি মূল্যবান যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের মতো দেশে এ রকম মূলধন যোগানের কোনও সুবিধা নেই। বৃহদায়তন কারবার মূলধন প্রধান আর ক্ষুদ্রায়তন কারবার শ্রমিক প্রধান। ক্ষুদ্রায়তন কারবারে অল্প মূলধনে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করা যায়। এতে বেকারত্ব হ্রাস পায়। আবার বৃহদায়তন শিল্পের ফলে জায়গার সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, ধনবৈষম্যের সমস্যা দেখা দেয়। ক্ষুদ্র কারবারে এইসকল সমস্যা অনুপস্থিত। বরং বলা যায় ক্ষুদ্র কারবারের ফলে উদ্যোগ এবং অর্থের অপরিমিত কেন্দ্রীকরণ-জনিত সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রায়তন কারবারে বৃহদায়তন কারবারের মতো উন্নত কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এই কারবারের স্থির ব্যয় অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। এই জাতীয় ব্যবসা অতি সহজেই মন্দার হাত থেকে রক্ষা পায়। স্বল্পকালের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাতেও এই কারবার ব্যবহৃত হয়। অতএব এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র কারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতএব এই কারবারের সমস্যাগুলি দূর করে তার সম্প্রসারণ বা প্রসারে যত্নবান হওয়া সকলের অবশ্য কর্তব্য।

ক্ষুদ্রায়তন কারবার ব্যক্তিগত রুচি, সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং নানাবিধ ছোটোখাটো অভাব যতটা পূরণ করতে পারে বৃহদায়তন কারবার ততটা পারে না। ফলে দেখা যায় বিভিন্ন দেশে বৃহদায়তন কারবারের পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন কারবারও প্রসার লাভ করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃহদায়তন কারবারের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় তা আবার ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হয়। ফলে বলা যায় অনেক ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন

কারবার ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ওপর নির্ভর করে। ফলে বলা যায় যে বৃহদায়তন কারবারের উন্নতি-সাধন করতেও ক্ষুদ্রায়তন কারবারের বৃদ্ধি সাধন করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র ভারতের মতো শিল্পে অনুন্নত দেশ নয়, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড অথবা জাপানের মতো শিল্পোন্নত দেশেও বৃহদায়তন শিল্পের উন্নতি ও যন্ত্রপাতির জন্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ওপর নির্ভর করতে হয়। কারণ বৃহদায়তন কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি আগে নিজেদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে পরে তা দিয়ে আবার অন্য দ্রব্য উৎপাদন করে তবে তাদের উৎপাদন-ব্যয়ও যেমন বৃদ্ধি পাবে সময়ও অপচয় হবে প্রচুর। এতে মূলতঃ দেশের অর্থনীতি উপকৃত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেই দেশের বৃহদায়তন কারবার যেমন বিশেষ ভূমিকা পালন করে তেমন ভূমিকা গ্রহণ করে ক্ষুদ্রায়তন কারবারও। ক্ষুদ্রায়তন কারবার ছাড়া বৃহদায়তন কারবার উন্নতি সাধন বা বিস্তার-সাধন করতে পারে না। অর্থাৎ কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৮১.৫ ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ত্রুটি এবং তার দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন কারবার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তবে কারবারের সাংগঠনিক, আর্থিক এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—

(i) যে সকল লোক এই কারবারে নিযুক্ত তাদের অনেকেই দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে বহুলোক এতে নিযুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায় এই শিল্পের সংগঠনকে দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। এই কারবারের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের কোনও নির্দিষ্ট মান নেই। উৎপাদন ব্যয়ও অত্যাধিক হয়ে পড়ে এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে না। ফলে দেশের বৃহদায়তন কারবারের সঙ্গে এই কারবার প্রতিযোগিতায় আসতে পারে না।

(ii) এই কারবারের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। এদের কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে যে অর্থের প্রয়োজন হয় সে অর্থ এরূপ দরিদ্র মালিকদের নিজের সামর্থ্যে সংকুলান হয় না। এই অর্থের জন্য এদেরকে মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ ধার করতে হয়। মহাজনেরাও অধিক হারে সুদে টাকা ধার দেয় যা এই দরিদ্র মালিকরা কখনও শোধ করতে পারে না। ফলে তারা এইভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে চলতে থাকে এবং মহাজন ও মধ্যস্থকারবারীদের নির্দেশমতো কাঁচামাল ক্রয় ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

(iii) ক্ষুদ্রায়তন কারবারে কারবারীদের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মধ্যস্থকারবারী বা মহাজনদের ইচ্ছানুযায়ী উচ্চমূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ এরা ন্যায্য মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে না। ফলে মুনাফা অর্জনেও তারা ব্যর্থ হয়। উৎপাদিত পণ্যও এরা মধ্যস্থকারবারীদের ইচ্ছামতো কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। তাও আবার এই পণ্য কেবলমাত্র মধ্যস্থকারবারীদের নিকটই বিক্রয় করে, সরাসরি বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ পায় না। ফলে মধ্যস্থকারবারীরা এদের কাছ থেকে কম মূল্যে পণ্য কিনে বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এর ফলে এই কারবারের পণ্যের মান বা কারবারীদের অবস্থা কোনওটাই উন্নত হয় না।

দেশে যখন বিদেশি শাসন ছিল তখন এই কারবারে উন্নতির কোনওরকম চেষ্টাই করা হতো না। ফলে এই কারবার অনুন্নতই ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার এই কারবার বিস্তার ও উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে এবং এর উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকারের গৃহীত বিশেষ বিশেষ প্রচেষ্টাগুলি হল :

(i) ক্ষুদ্রায়তন কারবার বর্তমানে শিল্প ও বেসামরিক সরবরাহ সম্পর্কীয় মন্ত্রকের অধীন। এরূপ মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্যেও স্থাপন করা হয়েছে। এই মন্ত্রকের ওপর ক্ষুদ্রায়তন কারবারের উন্নতি বিধানের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

(ii) এই মন্ত্রকের চেষ্টায় ক্ষুদ্রায়তন কারবারের উন্নতির জন্য কতকগুলি সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ন্যাশনাল স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিস, রিজিওনাল স্মল স্কেল সার্ভিসেস ইনস্টিটিউশন্স, মেজর ইনস্টিটিউটস্, ব্রাঞ্চ ইনস্টিটিউটস্। এরা নিজ নিজ কার্যের পরিধির মধ্যে থেকে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এদের কার্য নিয়ন্ত্রণ ও সংযোজনার জন্য ডেভলপমেন্ট কমিশনারও নিযুক্ত হয়েছেন।

(iii) এই সকল সংস্থাগুলি ক্ষুদ্রায়তন কারবারগুলিকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে থাকে এবং তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে থাকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার এদের জন্য অর্ডার সংগ্রহ করে, পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে। স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ বোর্ড ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতি বিধানের উপযোগী কার্যলিপি প্রস্তুত করে এবং তদনুযায়ী কার্যে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

(iv) ক্ষুদ্রায়তন কারবার বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য লাভ করে। স্টেট ব্যাঙ্কের পাইলট স্কিম অনুযায়ী বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে তারা এই সাহায্য পায়। তাছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন কারবার স্টেট ফিনানশিয়াল কর্পোরেশন, কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যের সুবিধা পেয়ে থাকে। যদি কোনও সংস্থা এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তা আংশিক পূরণ করে।

(v) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট স্থাপিত হয়েছে। এদের কাজ শিল্পী বা কারবারীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভস সমবায় প্রথায় ক্ষুদ্রায়তন কারবার ও শিল্পগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত আছে।

(vi) বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য সরকার সার্ভে কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছেন। এই সুপারিশ অনুযয়ী ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন কারবারগুলির কর্মক্ষেত্রের কিছুটা পৃথকীকরণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন কারবারের উৎপাদন-সীমা নির্ধারিত হয়েছে তাদের ওপর কর বসিয়ে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য ক্ষুদ্রায়তন কারবার দ্বারা উৎপাদন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া ক্ষুদ্রায়তন কারবারে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এইরূপে সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষুদ্রায়তন কারবারকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টার ফলে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের খুব বেশি না হলেও কিছুটা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

৮১.৬ সারাংশ

এই এককে আলোচিত হয়েছে ক্ষুদ্রায়তন কারবার কাকে বলে, এই কারবার কিভাবে গড়ে ওঠে এবং এই কারবারের উদ্দেশ্যগুলি কি কি। অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন কারবার কিভাবে এবং কেন গড়ে ওঠে সে বিষয়ে পাঠকদের অবহিত করা হয়েছে।

এই এককে আরো আলোচনা করা হয়েছে কেন ক্ষুদ্রায়তন কারবার আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করেছে, সে বিষয়ে, এছাড়াও ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ত্রুটিসমূহ এবং তা দূরীকরণে সরকারের কিরূপ ভূমিকা হওয়া উচিত আর

সরকারই বা তা দূরীকরণে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা সম্পর্কে পাঠকদের একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে এই এককে।

অর্থাৎ এই এককে ক্ষুদ্রায়তন কারবার সম্পর্কে পাঠকদের একটি সম্পূর্ণ ধারণা দেওয়া চেষ্টা করা হয়েছে।

৮১.৭ অনুশীলনী

(ক) **বিষয়মূখী প্রশ্নের উত্তর দিন :**

১। ক্ষুদ্রায়তন কারবার কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?

২। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ভূমিকা কিরূপ ?

৩। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ত্রুটিসমূহ কি কি ? এই সকল ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিখুন।

৪। "ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রশিল্পের প্রাধান্যও এদেশে কম নয়।"— এই উক্তিটি তাৎপর্য সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

(খ) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

১। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের সংজ্ঞা লিখুন।

২। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের ত্রুটিগুলি কি কি ?

৩। ক্ষুদ্রায়তন কারবারে ত্রুটিগুলি দূরীকরণে সরকারি প্রচেষ্টা সংক্ষেপে লিখুন।

৪। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(গ) **অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

১। ক্ষুদ্রায়তন কারবার কাকে বলে ?

২। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের একটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩। ক্ষুদ্রায়তন কারবারের দুটি ত্রুটি লিখুন।

একক ৮২ ❑ কারবার সংগঠনের বিধিবদ্ধ রূপ

গঠন

৮২.০ উদ্দেশ্য

৮২.১ প্রস্তাবনা

৮২.২ কারবার সংগঠনের বিধিবদ্ধ রূপ

৮২.২.১ বেসরকারী ক্ষেত্র

৮২.২.২ বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

৮২.২.৩ যৌথ ক্ষেত্র

৮২.২.৪ যৌথ ক্ষেত্রের সরকারী নিয়ন্ত্রণ

৮২.২.৫ সরকারী ক্ষেত্র

৮২.৩ রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রকারভেদ

৮২.৩.১ শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির অগ্রগতি

৮২.৪ সারাংশ

৮২.৫ অনুশীলনী

৮২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৮২.০ উদ্দেশ্য

এই বিষয়টি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন ঃ—

(১) ক্ষেত্র অনুযায়ী কারবারকে ভাগ করতে পারবেন।

(২) সরকারী ও বেসরকারী কারবারের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি জানতে পারবেন।

(৩) সরকারী ক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ যথা বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা, বোর্ড ব্যবস্থাপনা, সরকারী করপোরেশন ও সরকারী কোম্পানী সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

৮২.১ প্রস্তাবনা

কারবার জানার পূর্বে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা দরকার। প্রতিষ্ঠান হল এমন একটি রূপ যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং যেখানে সকলে মিলে এই উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করছে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। বেসরকারী উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও মূলধন নিয়ে গঠিত, পরিচালিত ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারী ক্ষেত্র বলে এবং সরকারী উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও মূলধন নিয়ে গঠিত, পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ক্ষেত্র বলা হয়। সরকারী ক্ষেত্রগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থাকলে সরকার সর্বরকমে দায়ি থাকে।

৮২.২ কারবার সংগঠনের বিধিবদ্ধ রূপ (Corporate forms of business)

ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা বেসরকারী ক্ষেত্র, যৌথ ক্ষেত্র ও সরকারী ক্ষেত্র।

৮২.২.১ বেসরকারী ক্ষেত্র

সংজ্ঞা ঃ বেসরকারী উদ্যোগে মালিকানায়, উদ্দেশ্যে ও নিয়ন্ত্রনাধীনে গঠিত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাকে বেসরকারী ক্ষেত্র বলা হয়। যথা একমালিকী কারবার, অংশীদারী কারবার, যৌথমূলধনী কারবার, সমবায় সমিতি ও যৌথ হিন্দু পারিবারিক কারবার প্রভৃতি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমস্ত কারবারী প্রতিষ্ঠানই বেসরকারী ক্ষেত্রে অবস্থান করে থাকে। মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী পাশাপাশি অবস্থান করে

(ক) বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) বেসরকারী উদ্যোগে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে।

(২) বেসরকারী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়।

(৩) ব্যক্তিগত মূলধন নিয়োজিত হয় এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী মালিক দেখা যায়।

(৪) এই ব্যবস্থায় ধনবৈষম্য ও সম্পদ-বৈষম্য তীব্র হয়ে থাকে।

(খ) সুবিধাঃ

(১) এই সমস্ত কারবার ব্যক্তির ইচ্ছায় গঠিত হয় বলে মালিক মনে করলে কারবারটি বন্ধ করতে পারেন। অর্থাৎ মালিকের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপর কারবারটির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অন্য কোনো পক্ষের হস্তক্ষেপ থাকে না।

(২) এখানে প্রতিষ্ঠানে মালিক সদাসর্বদা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।

(৩) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে মালিকের সঙ্গে শ্রমিক কর্মচারীদের সরাসরি সম্পর্ক থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সহজেই বিরোধ দূর করা সম্ভব হয় এবং কারবারটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়।

(৪) এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে।

(গ) অসুবিধা ঃ

(১) এই সমস্ত কারবারগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় গঠিত হয় বলে কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

(২) মালিক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত লাভই ভোগ করে। ফলে লাভের কোন অংশই সমাজের কল্যাণে আসে না।

(৩) কারবারের উদ্দেশ্য ও পরিচালনায় ব্যক্তিগত প্রভাব থাকে বলে সামাজিক উদ্দেশ্য তখন গৌণ হয়।

(৪) লভ্যাংশ ব্যক্তির নিকট যায় বলে ধনবৈষম্য দেখা যায়।

৮২.২.২ বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ যাতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি না হয় সেজন্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে সরকারী নীতিগুলি হল ঃ

(১) বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপের উপরে সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(২) জাতীয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী ক্ষেত্রের কার্যকলাপ পরিচালিত হবে।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে এটি একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(৪) বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও সম্প্রসারণের জন্য (উন্নয়ণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে উদ্যোক্তাকে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) বেসরকারী ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য প্রয়োজনে সরকার বেঁধে দিতে পারেন।

৮২.২.৩ যৌথ ক্ষেত্র

সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানায়, উদ্যোগে, মূলধন ও নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে যৌথ ক্ষেত্র বলা হয়। R. S. Bhatt-এর মতে — "যৌথ ক্ষেত্র হইল এমন এক শিল্প সংগঠন যেখানে সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়-সম্বলের সাথে বেসরকারী ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ পরিচালন যোগ্যতা ও দক্ষতার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিবে।" ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতিতে যৌথ ক্ষেত্রের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস, সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, বীরভূমের বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। হলদিয়া পশ্চিমবঙ্গে টাটা গোষ্ঠির সঙ্গে পেট্রো-কেমিক্যালস গড়ে উঠেছে।

J. R. D. Tata যৌথ উদ্যোগগুলিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। যেমন— প্রথমত, যে সব বৃহদায়তন প্রকল্পে ৫ কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, সেইগুলি কেন্দ্রীয় সরকার ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় যৌথভাবে গড়ে তোলা হবে এবং দ্বিতীয়ত. যে সব প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫ কোটি টাকার কম, সেগুলিতে রাজ্য সরকার ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় যৌথ ক্ষেত্র গড়ে তোলা হবে।

(ক) বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সরকার, ব্যবসায়ী জনসাধারণ এই তিন ধরনের গোষ্ঠিভুক্ত লোকেরাই মালিক হন। তবে অধিকাংশ মালিকানা সরকারেরই হাতে থাকে।

(২) যৌথ ক্ষেত্রের মূলধনের অনুপাত হল— প্রথমত, যখন কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হবেন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কমপক্ষে ৫১ ভাগ মূলধন সরবরাহ করবেন।

(৩) রাজ্য সরকার বিদেশী সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হবেন, সে ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার (বা রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন) ২৫%, বিদেশী অংশীদার ২০%, দেশীয় উদ্যোক্তা ২০% এবং জনসাধারণের কাছে ৩৫% শেয়ার সরবরাহ করা হবে।

(৪) রাজ্য সরকার (বা রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন) দেশীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হবেন, তখন রাজ্যসরকার বা রাজ্যশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ২৬%, দেশীয় অংশীদার ২৫% এবং বাকি ৪৯% জনসাধারণ ও ঋণপ্রদানকারী সংস্থার নিকট শেয়ার বিক্রি করা হবে।

(৫) পরিচালনায় সরকারী ও বেসরকারী সহাবস্থান থাকলেও এই ক্ষেত্রগুলি মূলত সরকারী নিয়ন্ত্রণেই থাকে।

তবে ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী দক্ষতাকে কাজে লাগান হয়। ফলে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখা যায়।

(৬) এই ক্ষেত্রে এককভাবে ২৫% মূলধনের মালিক হতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগে কোন কারবার গড়ে উঠলেও অনুমতি নিতে হবে।

(খ) সুবিধা ঃ

প্রথমত, সরকারের একার পক্ষে মূলধন জোগাড় করা সম্ভব নয়। বেসরকারী মালিক ও জনসাধারণের নিকট থেকে মূলধন গ্রহণ করলে মূলধনের অভাব দূরীভূত হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

তৃতীয়ত, এই পদ্ধতির দ্বারা শিল্পে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

চতুর্থত, এর দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণসাধন করা সহজ হয়। যেমন, শিল্পের আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, ধনবৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি।

(গ) অসুবিধা ঃ

প্রথমত, সরকার মালিকানায় অংশগ্রহণ করলেও সংস্থার সম্পূর্ণ মালিক সরকার নয়, ফলে পূর্ণ কর্তৃত্ব সরকারের থাকে না।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ফলে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ ব্যাহত হয়।

৮২.২.৪ যৌথ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

যৌথ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিগুলি হল ঃ

(১) যে সকল শিল্প বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলিই যৌথ ক্ষেত্রেই আসবে, কিন্তু কোন সরকারী মালিকানায় যৌথ ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশ ঘটবে না।

(২) যৌথ ক্ষেত্রের বর্তমানে সরকার ২৬ শতাংশ, বেসরকারী ২৫ শতাংশ এবং আর্থিক সংস্থা ও জনসাধারণ ৪৯ শতাংশ অর্থ প্রদান করবে।

(৩) যদি কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠান যৌথক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে তাহলে সরকার ২৫ শতাংশ ভারতীয় কারবার সংস্থা ২০ শতাংশ, বিদেশী প্রতিষ্ঠান ২০ শতাংশ এবং জনসাধারণ ৩৫ শতাংশ অর্থপ্রদান করবে।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ২৫ শতাংশের বেশি শেয়ার ক্রয় করতে পারবে না।

৮২.২.৫ সরকারী ক্ষেত্র

প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী প্রভাবকে রাষ্ট্রের প্রভাব বলা হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের মালিকানায়, পরিচালনায় ও

নিয়ন্ত্রাধীনে এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তাকে সরকারী ক্ষেত্র বলা হয়। যেমন, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি।

(ক) **বৈশিষ্ট্য ঃ** এর বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **সরকারী মালিকানা ঃ** এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক সরকার।

(২) **সরকারী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ** যেহেতু সরকারই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক, সেইজন্য এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) **সামাজিক কল্যাণ ঃ** এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের এক প্রধান উদ্দেশ্যে হল সমাজের কল্যাণসাধন করা। কারণ সরকার জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত এবং তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সমাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়।

(খ) **উদ্দেশ্য ঃ** এর উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **সামাজিক কল্যাণ ঃ** সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সমাজের কল্যাণসাধন করার জন্য। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণসাধন করাই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

(২) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোও এর আর একটি উদ্দেশ্য।

(৩) **আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দূর করা ঃ** আয় ও সম্পদ বন্টনের মধ্যে বৈষম্য বিদ্যমান। সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়।

(৪) **কর্মসংস্থান ঃ** ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ সমস্যা হল বেকার সমস্যা। এই সমস্যা দূর করা সরকারের একান্ত কর্তব্য। সেইজন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়। এখানে প্রচুর শ্রমিক কাজ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও এর আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৫) **একচেটিয়া কারবারের বিলোপ সাধন ঃ** বেসরকারী ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের বিলোপসাধন করাই হল এই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য।

(৬) **শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ ঃ** বেসরকারী উদ্যোগে যদি শিল্প গঠিত হয় তাহলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিল্পগুলি স্থাপিত হবে। ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ হবে না। সরকারী কারবারী প্রচেষ্টা ভিন্ন সুষম শিল্প বন্টন সম্ভব নয়।

(৭) **প্রতিরক্ষা ঃ** বেসরকারী ক্ষেত্রে যদি দেশের নিরাপত্তার সাজসরঞ্জাম তৈরি হয় তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। অতএব দেশের নিরাপত্তা ঠিক রাখার জন্য প্রতিরক্ষার স্বার্থে সরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজন।

(গ) **সুবিধা ঃ** এর সুবিধাগুলি হল ঃ

(১) প্রচুর মূলধন নিয়ে বেসরকারী উদ্যোগে কারবার গঠন করা সম্ভব নয়, ফলে সরকারী মূলধনেরও প্রয়োজন হয়। সেইজন্য সরকারী কারবার গড়ে ওঠে।

(২) সরকারের উদ্দেশ্য হল সমাজের কল্যাণ সাধন করা। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের কল্যাণ-সাধনে সবসময় এগিয়ে আসে না। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নায্য বন্টন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনতা প্রতিরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের কল্যাণসাধন করে।

(৩) সরকারী ক্ষেত্রের ফলে কর্মসংস্থার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

(৪) এর দ্বারা শ্রমিকদের চাকুরীর নিরাপত্তা বাড়ে এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে।

(৫) এই সমস্ত ক্ষেত্রের দ্বারা আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা হয়।

(৬) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় না। এজন্য জনসাধারণ কম মূল্যে ভাল জিনিস ক্রয় করতে পারে।

(৭) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ফলে ফাটকাবাজী প্রশ্রয় পায়। সরকারী কারবার স্থাপনের ফলে ফাটকাবাজী দূর হয়।

(ক) অসুবিধা ঃ

(১) সরকারী কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনও জ্ঞান থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠান-পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব পরিচালিত হয়।

(২) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না বলে এতে প্রেরণা ও উদ্দীপনায় অভাব ও কাজে শৈথিল্য দেখা যায়। ফলে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়।

(৩) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিতে সরকার ও আমলাগণের মধ্যে স্বজনপোষণ দেখা যায়। ফলে দর্নীতির দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

(৪) সরকারী ক্ষেত্র পরিচালনার সময় রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ দেখা যায়। এইরকম হস্তক্ষেপের ফলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিসর্জিত হয়।

(৫) সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক কর্মচারী দেখা যায়। ফলে প্রশাসনিক ব্যয় বেশি হয়। ফলস্বরূপ কারবারে লাভের পরিবর্তে লোকসান হয়।

(৬) ঘনঘন সরকারের পরিবর্তনের ফলে সরকারী নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে কারবারের নীতি ও কর্মধারার পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যবসায়ের ব্যবসায়িক স্বার্থ ব্যাহত হয়।

৮২.৩ রাষ্ট্রীয় কারবারের প্রকারভেদ

সাংগঠনিক রূপ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়।

যথা ঃ—(১) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা,

(২) বোর্ড ব্যবস্থাপনা,

(৩) সরকারী করপোরেশন,

(৪) সরকারী কোম্পানী।

(১) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা ঃ সরকার প্রশাসনিক বিভাগ অথবা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তাকে বিভাগীয় সংগঠন অথবা বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা বলা হয়। যেমন ঃ সামাজিক

সরঞ্জাম উৎপাদন বিভাগ।

(ক) বৈশিষ্ট্যঃ

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের মালিক।

(২) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠাগুলোর আইনগত সত্তা নাই। এর কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী পরিগণিত হয়।

(৩) সরকারী বাজেট থেকে এর অর্থের সংস্থান করা হয় এবং উদ্বৃত্ত সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে।

(খ) সুবিধা ঃ

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে দেশের জসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়।

(২) জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গোপনীয়তা খুবই প্রয়োজন। সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে বলে গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(৩) এর কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী বলে সমস্ত রকম সরকারী সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে।

(গ) অসুবিধা ঃ

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা দেখা যায়। ফলে একদিকে যেমন কাজে অযথা বিলম্ব ঘটে, অন্যদিকে তেমনি লাল-ফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

(২) সরকর ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে সরকারী নীতিরও ঘনঘন পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে।

(৩) এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৪) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ দেখা যায়।

(২) **বোর্ড ব্যবস্থাপনা ঃ** এটি এক ধরনের রাষ্ট্রীয় কারবার। এইসব রাষ্ট্রীয় কারবারে একটি বোর্ড থাকে। বোর্ডটি কারবারে নীতিনির্ধারণ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সরকার বোর্ডের মাধ্যমে কারবারটি পরিচালনা করেন। বোর্ডে কয়েকজন সদস্য থাকে। সরকারও বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত থাকে। বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে, সেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিকে বোর্ড ব্যবস্থাপনা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় টি বোর্ড, কফি বোর্ড, ক্যয়ার বোর্ড ইত্যাদি। বোর্ডের কোনও রূপ খারাপ কাজকর্মের জন্য মন্ত্রী সংসদে উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন।

(ক) বৈশিষ্ট্যঃ

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারে মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

(২) এর আইনগত কোনও পৃথক সত্তা নেই।

(৩) আইনসভায় এর বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচিত হয়।

(খ) সুবিধা ঃ

(১) সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে সরকারী উদ্দেশ্য (যথা—দেশের কল্যাণসাধন) সাধন করা সম্ভব হয়।

(২) এর কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

(৩) এখানে গোপনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

(৪) এই সমস্ত বোর্ডে বেসরকারী সভ্য থাকার ফলে বেসরকারী স্বার্থও রক্ষিত হয়।

(গ) অসুবিধা ঃ

(১) এখানে ব্যবস্থাপনায় আমলাতান্ত্রিকতা ও লালফিতার দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

(২) এই সব প্রতিষ্ঠানে পরিচালকদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞানের অভাব দেখা যায়। ফলে এখানে ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা দেখা যায়।

(৩) ঘনঘন সরকারের পরিবর্তনের ফলে সরকারী নীতিরও পরিবর্তন ঘটে। ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতির পরিবর্তন ঘটে।

(৩) সরকারী করপোরেশন বা বিধিবদ্ধ করপোরেশন ঃ

যে সব রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি আইনসভার একটি পৃথক আইন দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাকে সরকারী করপোরেশন বলা হয়। যেমন ঃ জীবনবীমা নিগম, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, দামোদর ভ্যালি করপোরেশন, শিল্প অর্থ-করপোরেশন প্রভৃতি। এইসব রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি আইনসভার একটি বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং পৃথক আইনসত্তা বজায় থাকে। এইসব কারবারগুলোর উদ্দেশ্য ও নীতি উল্লিখিত থাকে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি একটি পরিচালকমণ্ডীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

যদিও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি একটি স্বশাসিত সংস্থা। তবুও কারবার পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার সরবরাহ করে থাকে এবং এদের কাজের অন্য সর্বদা সরকারের নিকট দায়ী থাকে।

(ক) বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি আইনসভার এক বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঐ আইন দ্বারা স্থিরিকৃত হয়।

(২) এর একটি পৃথক সত্তা আছে।

(৩) এর কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট জবাবদিহি দিতে বাধ্য থাকে।

(৪) দেশের সমস্ত সংবিধিবদ্ধ করপোরেশনগুলি একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে। মন্ত্রী ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আদেশ জারি করিতে পারেন।

(খ) সুবিধা ঃ

(১) মুনাফা উপার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলি সেবাপ্রদানের জন্য স্থাপিত হয়। সেবাপ্রদান করাই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) এই প্রতিষ্ঠানে পৃথক সত্তা থাকার ফলে পরিচালনায় স্বাধীনতা বজায় থাকে।

(৩) এটি আইনসভার নিকটে কাজের হিসাব দিতে বাধ্য থাকে। আইনসভাগুলি গঠিত হয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে। সুতরাং জনপ্রতিনিধির নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকেন।

(৪) এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

(৫) এখানে আমলাতান্ত্রিকতার অভাব দেখা যায়। এছাড়া রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কম থাকে।

(গ) **অসুবিধা ঃ**

(১) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো একজন মন্ত্রীর অধীনে থাকে বলে তার আদেশ ও নির্দেশে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয়। ফলে এখানে নামমাত্র স্বাতন্ত্র বজায় থাকে।

(২) এর কর্মচারীরা পুরোপুরি সরকারী কর্মচারী না হওয়ায় সরকারী সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পায় না এবং শ্রমিক স্বার্থ সব সময় রক্ষিত হয় না।

(৩) এর কার্যাবলী প্রয়োজন অনুযায়ী সবসময় পরিবর্তনশীল হয়। কারণ আইনসভার বিশেষ আইন দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলো গঠিত হলেও কোনও পরিবর্তন হলে আইনসভায় তা পাস করতে হয়। আইনসভার বিনা অনুমতি ভিন্ন উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, নীতি প্রভৃতির পরিবর্তন করা যায় না।

(৪) **সরকারী কোম্পানী ঃ**

১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৬১৭নং ধারায় সরকারী কোম্পানীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—"সরকারী কোম্পানী হল এমন এক কোম্পানী যার আদায়ীকৃত মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার অথবা এক বা একাধিক রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন অথবা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও একাধিক রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন।" সরকারী কোম্পানীর উদাহরণ হল—হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিমিটেড, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যৌথমূলধনী কারবার গঠিত হতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত হয়। অন্যান্য কোম্পানীর মত গঠনের সময় পরিমেল বন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলী প্রস্তুত করতে হয় এবং অন্যান্য কোম্পানীর মত নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি একটি পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়। পরিচালকমণ্ডলীতে সরকারের সদস্য সংখ্যার আধিক্য দেখা যায়।

(ক) **বৈশিষ্ট্যঃ** সরকারী কোম্পানীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ

(১) **গঠন ঃ** সরকারী কোম্পানীগুলি ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত হয়।

(২) **পৃথকসত্তা ঃ** এই সমস্ত কোম্পানীগুলির অন্যান্য যৌথ মূলধনী কোম্পানীর মত পৃথক সত্তা আছে।

(৩) **নিয়ন্ত্রণ ঃ** এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকে।

(৪) **কর্মচারীদের মর্যাদা ঃ** এদের কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারী বলে পরিগণিত হয়।

(খ) **সুবিধা ঃ** এর সুবিধাগুলি হল ঃ

(১) অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এটি পৃথক। কারণ এর পৃথক সত্তা আছে। সেইজন্য সংগঠন, প্রশাসন

ও আর্থিক দিক থেকে স্বতন্ত্র বজায় রাখতে পারে।

(২) সরকারের সঙ্গে বেসরকারী মালিকরা (জনসাধারণ) পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে বেসরকারী ব্যবস্থাপক থাকায় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা দেখা যায়। অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়।

(৩) এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের নিকট থেকে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সহজেই মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

(৪) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা ও লালফিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(গ) অসুবিধা ঃ এর অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ

(১) অর্ধেকের বেশি মূলধন সরকার সরবরাহ করে বলে এই সব প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনায় সরকারের প্রাধান্যের আধিক্য দেখা যায়। কারণ বেশিরভাগ পরিচালকই সরকারের মনোনীত ব্যক্তি। ফলে ব্যবসায়ের নীতি অনুযায়ী কারবারটি পরিচালিত হতে পারে না।

(২) অন্য রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির মত আইনসভার নিকট বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশে বাধ্য নয় বলে এটি অনেক সময় গণদায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

(৩) এর কর্মচারীরা সরকারের নিকট থেকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা পায় না।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারী কোম্পানীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(১) পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়কারী সরকারী কোম্পানী।

(২) সেবাপ্রদানকারী সরকারী কোম্পানী।

(১) পণ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয়কারী সরকারী কোম্পানী ঃ

এক ধরনের সরকারী কোম্পানী আছে যারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে, এই ধরনের সরকারী কোম্পানীগুলিকে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়কারী সরকারী কোম্পানী বলে। যেমন স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্টিলের দ্রব্যাদি উৎপাদন করে এবং সেই উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করে।

(২) সেবাপ্রদানকারী সরকারী কোম্পানী ঃ

এক ধরনের সরকারী কোম্পানী আছে যারা উৎপাদনের পরিবর্তে শুধু সেবাপ্রদান করে তাকে সেবা প্রদানকারী সরকারী কোম্পানী বলে। সেবাপ্রদান করাই এদের প্রধান কাজ।

৮২.৩.১ শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রিয় কারবারগুলির অগ্রগতি

অবাধ অর্থনীতি অবলুপ্ত হবার পর কারবারে সরকারী অনুপ্রবেশ ঘটে। স্বাধীনতার পূর্বে কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ দেখা গিয়েছিল। যেমন অর্ডিন্যান্স ফাক্টরি, লবণ কারখানা ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত শিল্পনীতিতে বলা হয়েছিল সরকারকে দেশের বিভিন্ন শিল্প বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার কথা বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠনের জাতীয় আদর্শ

গৃহীত হওয়ার দরুণ এবং পরিকল্পিত ও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার তাগিদে সমস্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং জনসেবামূলক কাজ সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। ১৯৫১ সালে মাত্র ৫টি সরকারী উদ্যোগ ছিল এবং তাদের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯কোটি টাকা। ১৯৮৫ সালে সরকারী উদ্যোগের সংখ্যা ছিল ২০৫ টি এবং মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬,৪০০ কোটি টাকা। ১৯৮৬ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ২২৮টি সরকারী উদ্যোগের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০,৩৪১ কোটি টাকা।

সারণী-১

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগের (কোটি টাকা) তালিকা

বিনিয়োগের ধরন	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬৯-৭৪	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৪-৭৯	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০
মোট বিনিয়োগ	২২,৬৩৫	৬৩,৭৫১	১,৫৮,৭১০	৩,২২,৩৬৬
সরকারী ক্ষেত্র মোট বিনিয়োগের শতকরা হার (টাকায়)	১৩,৬৫৫ (৬০.৩০%)	৩৬,৭০৩ (৫৭.৬%)	৯৭,৫০০ (৬১%)	১,৫৪,২১৮ (৪৭.৮%ঃ
বেসরকারী ক্ষেত্র মোট বিনিয়োগের শতকরা হার (টাকায়)	৮৯৮০ (৩৯.৭%)	২৭,০৪১ (৪২.৪%)	৬১,২১০ (৩৯%)	১,৬৮,১৪৮ (৫২.২%)

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিনিয়োগের তালিকার উৎস ঃ

Sherlekar & Sherlekar, Modern Business Organization and Management, Himalaya Publishing House, Bombay, 1999, P. 2.65

৮২.৪ সারাংশ

এই বিষয়টি পাঠ করলে ক্ষেত্র অনুযায়ী আপনি কারবারকে শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন। প্রধানত দুইভাগে ভাগ করতে পারবেন। প্রথমটি হল সরকারী ক্ষেত্র এবং অপরটি হল বেসরকারী ক্ষেত্র। সরকারী ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় কারবার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির মালিক হল সরকার। সরকার দ্বারা কারবারগুলি গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারী ক্ষেত্র বা রাষ্ট্রীয় কারবারগুলো প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা— বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা, বোর্ড ব্যবস্থাপনা, সরকারী করপোরেশন ও সরকারী কোম্পানী।

৮২.৫ অনুশীলনী

খুব সংক্ষিপ্ত ধরনের প্রশ্ন ঃ

(১) বেসরকারী ক্ষেত্র কাকে বলে ?

(২) সরকারী ক্ষেত্র বলতে কি বোঝ ?

(৩) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কাকে বলে ?

(৪) বোর্ড ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।

(৫) সরকারী করপোরেশন কাকে বলে ?

(৬) সরকারী কোম্পানী বলতে কি বোঝ ?

(৭) রেলওয়ে কি ধরনের সংগঠন ?

(৮) জীবন বীমা করপোরেশন কি ধরনের সংগঠন ?

পার্থক্য আলোচনা করঃ

(১) সরকারী ক্ষেত্র এবং বেসরকারী ক্ষেত্র।

(২) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা এবং বোর্ড ব্যবস্থাপনা।

(৩) সরকারী করপোরেশন ও সরকারী কোম্পানী।

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) সরকারী ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(২) বেসরকারী ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৩) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৪) বোর্ড ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৫) পাবলিক করপোরেশনের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৬) সরকারী কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

৮২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

(1) S.A. Sherlekar V.S. Sherlekar : Modern Business Organization and Management Systems Approach.

(2) Naresh Chandra Raychowdhury : Business Organization.

একক ৮৩ ❐ বাজার

গঠন

৮৩.০ উদ্দেশ্য
৮৩.১ প্রস্তাবনা
৮৩.২ বাজারের সংজ্ঞা
৮৩.৩ সংগঠিত বাজার
৮৩.৩.১ সংজ্ঞা
৮৩.৩.২ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
৮৩.৪ পণ্যের বাজার
৮৩.৪.১ সংজ্ঞা
৮৩.৪.২ বৈশিষ্ট্য
৮৩.৪.৩ কার্যাবলী
৮৩.৫ মূলধনের বাজার
৮৩.৫.১ বৈশিষ্ট্য
৮৩.৫.২ কার্যাবলী
৮৩.৬ টাকার বাজার
৮৩.৬.১ বৈশিষ্ট্য
৮৩.৬.২ কার্যাবলী
৮৩.৭ সারাংশ
৮৩.৮ অনুশীলনী
৮৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮৩.০ উদ্দেশ্য

এই বিষয়টি আপনি পড়লে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন ঃ

(১) বাজার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

(২) বাজারের শ্রেণীবিভাগ, বৈশিষ্ট্য এবং এদের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৮৩.১ প্রস্তাবনা

মানুষের চাহিদা মেটাবার জন্য পণ্যের আদান-প্রদান করা খুবই দরকারি। পণ্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অপরিচয়ের বাধা দূর করা। বাজার এমন এক স্থান যেখানে এই বাধা দূর হয়। যে সমস্থ স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতা মিলিত হয়ে তাদের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে চুক্তি করে তাকে বাজার বলে। পূর্বে এই স্থান অর্থাৎ বাজার ছিল না ; কিন্তু পরবর্তীকালে এই স্থান অর্থাৎ বাজার সৃষ্টি হয়। এখন বাজারকেও

কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয় তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। ফলে সেই সমস্ত জিনিস ক্রয়ের ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতারা সেই সমস্ত বাজারে যায়। যেমন, শেয়ার ক্রয়ের জন্য শেয়ার বাজার, আবার পণ্য ক্রয় করার জন্য পণ্যের বাজার প্রভৃতি। সর্বশেষে কোনও বিশেষ স্থানকেই শুধু বাজার বলা হয় না, যেমন পশ্চিমবঙ্গে পাটের বাজার, মহারাষ্ট্রে তুলার বাজার ইত্যাদি।

৮৩.২ বাজারের সংজ্ঞা

ক্রেতা-বিক্রেতার সমষ্টিকেই অনেক সময় বাজার বলা হয়। এই সব বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হতে পারে অথবা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ এক অংশের পণ্যমূল্য অপর অংশের পণ্যমূল্যের উপর প্রতিক্রিয়া করে তাহলে ওই স্থানটিকেই বাজার বলা হয়। সম্ভাব্য ক্রেতা-বিক্রেতা কারবারী ক্ষেত্রে বাজার বলে গণ্য করা হয় এবং বর্তমান মূল্যে ভবিষ্যৎ সরবরাহের চুক্তিকেও বাজারের লেনদেন বলে গণ্য করা হয়।

যে স্থানে ক্রেতা-বিক্রেতা মিলিত হয়ে নানা প্রকারের জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকে তাকে সাধারণ অর্থে বাজার বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন— পাটের বাজার, তুলার বাজার ইত্যাদি। অর্থনীতিবিদ্ বেনহাম বাজারের সংজ্ঞা দিয়েছেন— " যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে আদান-প্রদানের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ফলে বাজারের বিভিন্ন অংশের দ্রব্যমূল্য একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তবে ঐ অঞ্চল সংকীর্ণ হউক, বা বিস্তৃত হউক, তাকে বাজার বলা হয়।

বাজারকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় ; যথা-সংগঠিত বাজার ও অসংগঠিত বাজার। আবার আয়তন অনুযায়ী বাজারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজার।

৮৩.৩ সংগঠিত বাজার

৮৩.৩.১ সংজ্ঞা ঃ

যে বাজারের কার্যাবলী বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেই সংগঠিত বাজার বলা হয়। অর্থাৎ সংগঠিত বাজার হল এমন এক স্থান যেখানে—

(১) ক্রেতা ও বিক্রেতা নিয়মিতভাবে সমবেত হয় ;

(২) পণ্য-সামগ্রী বা তার স্বত্বাধিকার বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং

(৩) সংগঠনের সমস্তরকম নিয়মকানুন মেনে এই সমস্ত কার্যাবলী সংগঠিত হয়।

৮৩.৩.২ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

এই সব বাজারের বৈশিষ্টগুলি হল ঃ

(১) সংঘ ঃ সংগঠিত বাজার প্রধানতঃ এক একটি সংঘ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের সদস্যগণই বাজারের সদস্য হন।

(২) **লেনদেন ঃ** সংগঠিত বাজারে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়। যেমন যে সমস্থ সংগঠিত বাজারে পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে পণ্যের বাজার বলা হয় এবং যে সমস্থ বাজারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে শেয়ার বাজার বলা হয়।

(৩) **নিবন্ধন ঃ** সংগঠিত বাজার হল একটি নিবন্ধিত সংস্থা। সদস্যগণ নিজ নিজ নামেই কারবার চালান ; কিন্তু সংস্থা নিজে কোন কাজ করে না।

(৪) **স্থায়িত্ব ঃ** যে সব পণ্য স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব সেই সব পণ্য এই বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয়। যেমন তুলা, পাট ইত্যাদি।

(৫) **পণ্য ঃ** সমজাতীয় পণ্য সংগঠিত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয় ; কিন্তু পণ্যের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে।

শ্রেণীবিভাগ ঃ সগঠিত বাজডারকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—পণ্যের বাজার, মূলধনের বাজার ও টাকার বাজার।

৮৩.৪ পণ্যের বাজার

৮৩.৪.১ সংজ্ঞা ঃ

কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত যে সংগঠিত বাজারে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কাঁচামাল, শিল্পজাত পণ্য, মূল্যবান ধাতুপিণ্ড (সোনা, রূপা ইত্যাদি) পাইকারি হারে অথবা নিলামে তার সদস্যদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে পণ্যের বাজার বলা হয়। একাধিক পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকলে তাকে সাধারণ বাজার বলা হয়। কিন্তু পণ্যবাজারে শুধুমাত্র একটি বিশেষ পণ্যের লেনদেন হয়। কিন্তু পণ্যবাজারে শুধুমাত্র একটি বিশেষ পণ্যের লেনদেনের বাজারকে বিশেষ পণ্যের বাজার বলা হয় ; যেমন উত্তরপ্রদেশে চিনির বাজার, পশ্চিমবাংলায় আলুর বাজার প্রভৃতি।

সংগঠিত পণ্যের বাজারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়— যথা নগদ কারবার এবং ধারে কারবার। বাজারের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একটি পরিচালকমণ্ডলী ও একটি সালিশি কমিটি গঠিত হয়। পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নিয়মাবলীর দ্বারা বাজারটি পরিচালিত হয় এবং সদস্যদের মধ্যে কখনো বিরোধ দেখা দিলে সালিশি তা নিষ্পত্তি করেন।

৮৩.৪.২ বৈশিষ্ট্যঃ

(১) এটি সাধারণত যৌথ কোম্পানী আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) এটি পরিচালনায় পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৩) এই বাজারে দালালের মারফত ক্রয়বিক্রয় হয়।

(৪) এই বাজার সাধারণ পণ্যের ও বিশেষ পণ্যের হয়ে থাকে।

৮৩.৪.৩ কার্যাবলী : এই বাজারের কার্যাবলী নিম্নরূপ

(১) এই বাজার পণ্য বা দ্রব্যের নমুনা ও বর্ণনার ভিত্তিতে বিক্রয় হয়।

(২) এই বাজার পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য, গুণাগুণ ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করে।

(৩) এই বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা রক্ষা করে।

(৪) এটি রক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভবিষ্যতে দর উঠা-নামাজনিত লাভ-লোকসানের হাত থেকে ক্রেতা-বিক্রেতাকে রঁক্ষা করে।

৮৩.৫ মূলধনের বাজার

মূলধন হল কারবারের প্রাণস্বরূপ। মূলধন ছাড়া কারবার অচল। মূলধনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন। যে সমস্ত মূলধন স্থায়ি সম্পত্তিতে বিনিয়োজিত থাকে তাকে স্থায়ী মূলধন বলা হয় এবং যে সব মূলধন চলতি সম্পত্তিতে বিনিয়োজিত হয় তাকে চলতি মূলধন বলা হয়।

সংগঠিত বাজারকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, তার মধ্যে মূলধনের বাজার অন্যতম। যে বাজার থেকে শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী মূলধন সংগৃহীত হয়, তাকে মূলধন বাজার বলা হয়। যে সব প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে মূলধনী বাজার গঠিত সেগুলি হল ঃ

(১) বিনোয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন, লগ্নীকারক ট্রাস্ট, ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদি।

(২) বিমা কোম্পানী, যেমন ভারতের জীবনবিমা করপোরেশন।

(৩) অর্থসহায়ক সংস্থা, যেমন ভারতের শিল্প-অর্থ করপোরেশন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক।

(৪) লগ্নিপত্রের বাজার, যেমন শেয়ার বাজার।

৮৩.৫.১ বৈশিষ্ট্য ঃ এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া এই বাজারের প্রধান কাজ।

(২) বিনিয়োগকরীদের অর্থ নিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা হয়।

৭৬.৫.২ কার্যাবলী

(১) এই বাজারে স্থায়ী মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

(২) এটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাকে কারবার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে।

(৩) অধিকাংশ সময়ে প্রত্যক্ষ ঋণপ্রদান না করে এটি শিল্প-বাণিজ্য মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন, শেয়ার বাজার।

(৪) বিভিন্ন লাভজনক লগ্নিপত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে এই বাজার সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে।

৮৩.৬ টাকার বাজার

যে সমস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি আমানত গ্রহণ এবং ঋণদানের কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকে তাদেরকে সমষ্টিগত ভাবে টাকার বাজার বলে। অর্থাৎ যারা ঋণদান কাজে অংশগ্রহণ করে, যথা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ঋণ লেনদেনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে টাকার বাজার গঠিত হয়। ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সকল দেশেই টাকার বাজার গঠিত হয়।

টাকার বাজারকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়— অতি স্বল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার এবং দীর্ঘকালীন বাজার। যদি কয়েকদিনের জন্য ঋণদান করা হয় এবং চাহিদামাত্র ঋণ পরিশোধ করা হয় তাকে অতি-স্বল্পকালীন টাকার বাজার বলা হয়। যদি কয়েক মাসের জন্য (সাধারণত তিনমাস) ঋণ পাওয়া যায় তাকে স্বল্পকালীন টাকার বাজার বলা হয়। যথা বিল ভাঙিয়ে টাকা পাওয়া। সাধারণত কয়েক বছরের জন্য যে ঋণ পাওয়া যায় তাকে দীর্ঘকালীন ঋণের বাজার বলা হয়। যেমন বিমা কোম্পানী, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এইরকম ঋণ দিয়ে থাকে।

৮৩.৬.১ বৈশিষ্ট্য ঃ এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল

(১) টাকার বাজার সুসংগঠিত ও অসংগঠিত দুই প্রকারের হতে পারে। সুসংগঠিত বাজারের সদস্যগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রনাধীন, আর অসংগঠিত বাজারের সদস্যগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৮৩.৬.২ কার্যাবলী

(১) এই বাজার স্বল্পমেয়াদী ঋণপ্রদান করে থাকে।

(২) জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে কারবারী সংস্থাসমূহে ঋণ দেয়।

(৩) আমানতকারীগণের হয়ে শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

(৪) আমানতের উপর সুদ প্রদান করে থাকে।

(৫) এটি চেক বিল ভাঙিয়ে দেয়।

(৬) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মূল্যবান দলিলাদি ও অলঙ্কার গচ্ছিত রাখে।

৮৩.৭ সারাংশ

এই বিষয় থেকে বাজার সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। বাজারকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল সংগঠিত বাজার এবং দ্বিতীয়টি হল অসংগঠিত বাজার। সংগঠিত বাজারকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা পণ্যের বাজার, মূলধন বাজার এবং টাকার বাজার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় লগ্নিপত্রের বাজার এবং শেয়ার বাজার মূলধন বাজারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানও এই বাজারের মধ্যে পড়ে। আবার যে সব প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ এবং ঋণদান কাজকারবারে লিপ্ত থাকে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে টাকার বাজার বলা হয়।

৮৩.৮ অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) বাজার কাকে বলে ?

(২) সংগঠিত বাজারের সংজ্ঞা দাও।

(৩) অংসংগঠিত বাজার বলতে কি বোঝ ?

(৪) টাকার বাজার কি ?

(৫) মূলধন বাজারের সংজ্ঞা দাও।

(৬) পণ্যের বাজার কি ?

(৭) বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) সংগঠিত বাজার ও অসংগঠিত বাজারের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

(২) সংগঠিত বাজারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি ?

(৩) মূলধনী বাজার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে গঠিত সেগুলির নাম কি ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) সংগঠিত বাজারের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(২) পণ্যের বাজারের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৩) মূলধনী বাজারের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

(৪) টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

৮৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(1) S. A. Sherlekar & V. S. Sherlekar : Modern Business Organization and Management Systems Approach.

(2) Naresh Chandra Roychowdhury : Business Organization.

একক ৮৪ □ সরকার ও কারবার

গঠন

৮৪.০ উদ্দেশ্য

৮৪.১ প্রস্তাবনা

৮৪.২ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

৮৪.২.১ প্রাচীন ধারণা পরিবর্তন ও পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি

৮৪.২.২ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবেশের, কারবার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি

৮৪.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কথাটির অর্থ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কারণ

৮৪.৪ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার বিভিন্ন রূপ— ভারতের উদাহরণসহ আলোচনা

৮৪.৪.১ পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ

৮৪.৪.২ নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে সরকারের ভূমিকা

৮৪.৪.৩ সংক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির আলোচনা

৮৪.৫ সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতিগুলির আলোচনা— প্রথম শিল্পনীতি

৮৪.৫.১ দ্বিতীয় শিল্পনীতি

৮৪.৫.২ ১৯৭০ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৫.৩ ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৫.৪ ১৯৭৭ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৫.৫ ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৫.৬ ১৯৮৩ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৫.৭ ১৯৯১ সালের শিল্পনীতি

৮৪.৬ শিল্পনীতিগুলির সার্থকতা

৮৪.৭ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতা ও সাহায্য

৮৪.৮ অনুশীলনী

৮৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির বিভিন্ন অংশের আলোচনায় আমরা সরকার ও কারবার-এর সম্পর্ক সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা করব। কারবার বলতে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড বুঝে থাকি তাদের সঙ্গে সরকার (Government) -এর সম্পর্ক কিরূপ। অতীতকালে সরকার কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারের বা শাসকের ভূমিকা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেই আলোচনাও এককটির মধ্যে করা হবে। বিভিন্ন ধরনের কারবারী ক্রিয়াকলাপ-এর গঠন, পরিচালনা, অর্থ সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের অধিকার, দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। সরকারের এই ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারবারী ক্রিয়া-কলাপের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণও বাড়ছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত বিষয়গুলিও আলোচনার অন্তর্গত হবে।

৮৪.১ প্রস্তাবনা

কারবার কথাটি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা হল ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত কাজ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কারবার বলতে বোঝায় দ্রব্য এবং সেবা কার্য্য উৎপাদন ও সৃজন থেকে আরম্ভ করে তাদের বিপণন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত যাবতীয় কার্যাবলী। অর্থাৎ শিল্প, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়, বিজ্ঞাপন, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান, পরিবহন, বিমা, মালগুদাম, বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্য প্রভৃতির সংগে যুক্ত সমস্ত কার্যাবলী। তাই শিল্প উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে বিপণন পর্যন্ত যাবতীয় মুখ্য ও সহায়ক কার্যাবলীর সমন্বয় হল কারবার। তাই কারবার একটি সামগ্রিক ধারণা।

'সরকার' শব্দটির অর্থ দেশের শাসক। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রায় সবদেশে প্রচলিত। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই শাসক শ্রেণীর গঠন হয়। তাই শাসক গোষ্ঠী বর্তমান যুগে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

৮৪.২ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

অতি প্রাচীন যুগের সরকার ও কারবারের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শাসনের সাথে সাথে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও প্রজাপালনের দায়বদ্ধতার ধারণা আমাদের ভারতের প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সরকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা হত। সরকারের কাজের এলাকাগুলি ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব বা কর আদায় এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিজ দেশ রক্ষা।

ঐ সময়ে শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ, মালিকানা বা কোনও প্রকার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা হত। দেশের শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর, কর্তৃত্ব, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানায় আর সরকার দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে একাগ্র থাকবে। এটাই ছিল তৎকালীন চিন্তাধারার মূলকথা। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকার বা শাসকের এই উদারনীতি ও

ব্যক্তিগত মালিকানার উপর পূর্ণ আস্থার আদর্শকে তৎকালীন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের বর্ণিত Laisserfaire Policy (লেস্যাফেয়ার পলিসি) উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। Laisserfaire Policy'র বাংলা অর্থ হল 'ছাড়িয়া দাও' অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা দাও কারণ শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য সম্বন্ধে তারাই প্রয়োজনমত কাজ করতে পারবে। সম্পদের ব্যবহার, উৎপাদন-ভোগ ও বন্টনের দায়দায়িত্ব ব্যক্তিগত মালিকানাতেই সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দমত বহন করা হবে। বিপরীতভাবে এ সবক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপের ফলে সরকারের মূল কাজগুলি ব্যহত হবে।

কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কী এবং ধনবিজ্ঞানী লর্ড কেইনস্ এই অবাধ বাণিজ্য ও স্বাধীন অর্থনীতির অবসান ঘটিয়ে কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের বা অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখা করেন।

৮৪.২.১ প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন ও পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে চিন্তাধারার লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। বর্তমান জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা দান প্রায় প্রত্যেক দেশের সরকারের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দেশের সরকার বর্তমানে তাই কারবারী ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে আগ্রহী। মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং কারবারী ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সাহায্যে সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের' (Socialistic Pattern of Society) মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ত্রুটিগুলি দুর করার নীতি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন, শ্রমিক ও দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুষম উন্নয়নের (balanced growth and development) নীতি গৃহীত হয়। সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কারবারী কার্যাবলীর গঠন ও পরিচালনা আরম্ভ হয়। এইভাবে স্বাধীন ভারতে কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) প্রবর্তিত হয়। সরকারী উদ্যোগ-এর (State enterprise) প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ এবং পাশাপাশি বেসরকারী ক্ষেত্রের (Private sector) এলাকা নির্দ্দিষ্ট করে তাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করাই ভারতের মিশ্র অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

৮৪.২.২ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবেশের, কারবার নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি

কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ প্রবেশ, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ প্রসার করার যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) সরকারী মালিকানায় ভারী ও মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা।

(২) দেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য উপকরণগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করণ।

(৩) উৎপাদন ব্যবস্থা ও শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

(৪) অধিক কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা এবং জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করা।

(৫) জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন এবং ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা।

(৬) সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) দরিদ্র জনসাধারণ ও শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা।

(৮) বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজ যেমন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ।

(৯) অর্থনৈতিক উত্থান পতন (ups & downs) অর্থাৎ বাণিজ্যচক্রের নিয়ন্ত্রণ এবং বেকার সমস্যার সমাধানকরণ।

(১০) মূলস্তরের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, দেশের টাকার বাজার এবং মূলধনের বাজার নিয়ন্ত্রণ।

(১১) কারবারী ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিবাদের আধিপত্য হ্রাস করা।

(১২) নিত্যব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক পণ্যের বন্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তা করা।

(১৩) ব্যাঙ্ক, বিমা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

(১৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ অব্যাহত রাখা।

৮৪.৩ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কথাটির অর্থ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কারণ

ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব বা উৎপত্তি হয়। রাষ্ট্রের উৎপত্তির সাথেই রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য সরকার সৃষ্টি হয়। সরকারই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা মস্তিষ্ক হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাই সমাজ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। ঠিক একই ভাবে সমাজবদ্ধ মানুষই কারবার করে। অর্থাৎ মানুষের জন্য কারবার আবার কারবারের জন্য মানুষ। কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পরিচালক হিসাবে সরকারের কতটা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে বা থাকা উচিত তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আছে।

রাষ্ট্রের অর্থাৎ সরকারের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হবে সর্বাধিক জনকল্যাণ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়ন। জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও কল্যাণসাধন করতে হলে দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক সম্পদের পূর্ণ ও সঠিক ব্যবহার করা। সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন, ভোগ ও বন্টন ব্যবস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কেবল সরকার জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও ন্যায়বিচার করতে পারে তাই এই সার্বিক নিয়ন্ত্রণ-কেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা যায়।

এই মতবাদগুলির মধ্যে ধনতান্ত্রিক মতবাদ, সমাজতান্ত্রিক মত ও মিশ্র অর্থনীতির মতবাদ তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল কথা হল উৎপাদন ভোগ বন্টন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে ব্যক্তিগত মালিকানায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে সমস্ত উৎপাদন ও ভোগবন্টন ব্যবস্থায়। আর মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা পাশাপাশি থাকবে। এই তিনটি ব্যবস্থারই নিজ নিজ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা আছে তাই এই ক্ষেত্রে মতপার্থক্যও যথেষ্ট বিদ্যমান।

কিন্তু মত পার্থক্য যতই থাক না কেন এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা, এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর বিশেষ করে শিল্প,

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলিতে যেমন সর্বাধিক সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ দেখা যায় তেমনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দেশগুলিতেও কমবেশি সরকারী নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। তাই কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সব রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কারবারের উপর সরকারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বা এককথায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) দেশের সম্পদ সুরক্ষার জন্য (Protection of National resources) ঃ খুব সঙ্গত কারণেই যে কোনও দেশের সম্পদ-এর সুরক্ষা অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত যেহেতু সম্পদ অধিকাংশই সীমাবদ্ধ। এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র সরকারের হাতেই থাকতে পারে এবং থাকা দরকার। অন্যথায় কারবারীরা নিজ নিজ প্রয়োজনমত সম্পদের ব্যবহার করবে।

(২) ভারী ও মূল শিল্পের উন্নয়ন (Development of heavy and, basic industries) ঃ দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য মূল ও ভারী শিল্পগুলির স্থাপন ও উন্নয়নের দায়িদায়িত্ব সরকার বা রাষ্ট্রের নেওয়া দরকার।

(৩) আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে শিল্প স্থাপনের সঠিক নীতি অনুসরণ করা (Abolition of regional unbalances and determination of right policy for location of industries) ঃ যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। তাছাড়া ভারতের মত বিরাট দেশে আঞ্চলিক বৈষম্য সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হলে শিল্প স্থাপনের সঠিক নীতি প্রণয়ন করা দরকার। দেশের অনুন্নত অংশে শিল্প স্থাপন এবং অত্যাধিক মাত্রায় যাতে একাদেশীভবন (Localisation) না ঘটে সেজন্য সঠিক নীতি প্রণয়নের পূর্ণ অধিকার রয়েছে সরকারের।

(৪) একচেটিয়া কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ হল একচেটিয়া কারবার প্রসার রোধ। ব্যক্তিগত কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে একচেটিয়া কারবারে রূপান্তরিত হতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত আইন প্রায় সবদেশেই প্রণয়ন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শারমান এন্টিট্রাস্ট আইন, ক্লেটন আইন প্রভৃতির বলে ট্রাষ্ট কারবারী জোট বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতে ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া ও নিয়ন্ত্রণমূলক কারবারী আইন (Monopoly and Restrictive Trade Practices Act.) প্রনয়ণ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার ; অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রিত কারবারী ক্রিয়া কলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যেও অনুরূপ আইনের বলে একচেটিয়া কারবার রোধ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৫) যৌথ মূলধনী কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের বলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কোম্পানী গঠনের প্রারম্ভিক কাজ থেকে কোম্পানী গুটানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যের উপরই আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।

(৬) ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এই পদ্ধতি প্রয়োগের একমাত্র অধিকারী। পুঁজির সরবরাহ করে দেশের সঞ্চয় (Saving) যাতে কারবারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ পায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এই কাজের সহায়তা করে। পুঁজির বিনিয়োগ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে।

(৭) বৈদেশিক মুদ্রানিয়ন্ত্রণ ঃ সরকার দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি ও রপ্তানি নীতির পরিবর্তনের

মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারের পরিবর্তন করে। কারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে কখনো বৈদেশিক মুদ্রার অধিক প্রয়োজন হয়।

(৮) সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ঃ— সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শ্রমিক শ্রেণীর এবং দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা। শিল্পবিরোধ আইন, কারখানা আইন, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ আইন ; কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন ; ন্যূনতম মজুরি আইন ; বোনাস আইন ; ইত্যাদি।

(৯) রাজস্বনীতি ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর বা রাজস্বনীতি। কারবারী প্রতিষ্ঠান তাদের অর্জিত মুনাফার কতটা অংশ কর হিসাবে সরকারকে দেবে তা সরকার স্থির করে থাকেন। মূল্যবান ও আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্যও সুষ্ঠ করনীতি বা রাজস্বনীতি থাকা দরকার। ধনবন্টনের বৈষম্য, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সঠিক করনীতি অত্যাবশ্যক। ভারত সরকার স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। আয়কর, কর্পোরেশন কর, ব্যয়কর ইত্যাদি।

(১০) দাম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ দেশের সাধারণ জনগণ ও ক্রেতা সাধারণের সুবিধা এবং তাদের প্রতি সুবিচারের জন্য সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (Essential Commodities Act) এবং ক্রেতাসুরক্ষা আইন (Consumer's Protection Act 1986) প্রণয়ন করেন। নিত্যব্যবহার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায্য দাম, সঠিক সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এই সকল আইনের সাহায্যে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য।

(১১) দুর্বল ও অক্ষম শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দুর্বল শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের পরিধি কিন্তু অনেক ব্যাপক। দুর্বল এবং ক্ষীণপ্রায় সংগঠনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। তাছাড়া অক্ষম শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির স্বপ্ন, উৎপাদন জনিত সমস্যা, পরিচালন সংক্রান্ত ত্রুটি, শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক-মালিক বিরোধ জনিত সমস্যা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার এ সকল সমস্যার সমাধান করেন।

এইভাবে কারবারী ক্রিয়াকলাপের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা হয়।

৮৪.৪ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার বিভিন্ন রূপ— ভারতের উদাহরণসহ আলোচনা।

কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণের যুক্তিগুলি পূর্বের ৭৭.২.১ নং এককে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ যুক্তিগুলির ভিত্তিতে কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন রকমের ভূমিকার কথা আলোনা করা দরকার। নিম্নে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল ঃ—

(১) উদোক্তা হিসাবে সরকারের ভূমিকা ঃ— স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন (First Industrial Policy Resolution, 1948) । এই শিল্প অনুসারে বিশেষ কতগুলি শিল্প, যেমন দেশরক্ষার সামগ্রী আণবিক শক্তি, রেল পরিবহণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ সরকারী মালিকানায় রাখা হবে। তাছাড়া কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, খনিজতৈল দূরসঞ্চার, বিমান প্রভৃতি ছয়টি শিল্প ক্ষেত্রেও সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানায় নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতেই ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার

নূতন শিল্পনীতি (Industrial Policy Resolution, 1956) ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতিটি দেশের সার্বিক শিল্পোন্নতির জন্য এবং দেশকে শিল্পপ্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে (to convert the country into an industrial economy) কতগুলি ভারী ও মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা হিসাবে সরকারী ভূমিকা স্বীকৃত হল। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনে ১৭টি মূল শিল্প স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা সরকারী ক্ষেত্রের দায়িত্বে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের শিল্পগুলির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাও সরকারী তত্ত্বাবধানেই রাখা হবে বলে ঘোষিত হয়। শিল্পগুলি চিহ্নিত হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রের অর্থাৎ বাকী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে বলে ঐ শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় শিল্পনীতি অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে ভারত সরকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির সরকার কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগ সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়! যেমন দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই, বোকারো এবং ভাইজাগ লৌহ ইস্পাত কারখানা, রাচীর হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, বাঙ্গালোরে মেশিন টুলস্, হিন্দুস্থান অ্যারোনোটিক্যালস্ লিমিটেড প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া কয়লা খনিজ তৈল, বিদ্যুৎ আণবিক শক্তি, সার, ভারী রাসায়নিক, কাগজ, রেলইঞ্জিন, জাহাজ নির্মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশ কয়েক শিল্প কারখানা সরকারী উদ্যোগে ও মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতি ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির প্রচেষ্টায় সরকারী সংস্থা (Public Sector Units) প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার সময়ে ভারতে সরকারী সংস্থার সংখ্যা ছিল ৫টি। কিন্তু ১৯৯০-৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠিত সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৪৫টি। আর বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির মালিকানায় সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১০০০-এর মত।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন বাবদ প্রায় ২২,১৮৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার সংখ্যা ২৪৫ টি এবং ১,৪৬,৯৭১ কোটি টাকা সরকারী উদ্যোগের জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

৮৪.৪.১ পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ

স্বাধীনতালাভের পর থেকেই ভারত সরকার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ ছাড়াও পরোক্ষভাবে কারবারী ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করছে।

কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ও সাহায্যে সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, বিনিয়োগ ও কর্মীব্যবস্থাপনার উপর নিয়ন্ত্রণ। শিল্পনীতি, অনুমোদন নীতি, মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত বিধান শুল্কনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি, কর প্রবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া শিল্পোন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য সরকার সামগ্রিকভাবে শিল্প ও কারবারী ক্রিয়াকলাপের সার্বিক প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত সহায়ক কার্যাবলীর প্রসার ঘটাচ্ছেন।

(১) শিল্পোন্নয়নের সামগ্রিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও রেলপথের সম্প্রসারণ।

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।

(৩) কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, কারিগরী শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করা।

(৪) শিল্প স্থাপনের ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থলগ্নির ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে সরকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন (I F C), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (IDBI), ন্যাশানাল ইন্ডস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NIDC), লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন (LIC), জেনারেল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন

(GIC) ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া (UTI), রি ফাইনান্স কর্পোরেশন (Re-finance Corporation), স্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশন (SFC), রাষ্ট্রীয় ও ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনই পরোক্ষ হস্তক্ষেপের প্রমাণ বহন করে।

৮৪.৪.২ ক্রিয়া-কলাপের নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে সরকারের ভূমিকাঃ—

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানায় কারবারী ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত ও পরিচালিত হত। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং শিল্প ও অন্যান্য কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী ক্ষেত্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রের এলাকা নির্দিষ্টকরণ-এর মধ্য দিয়ে সরকার কারবারী ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে। মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের ফলে সরকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি বেসরকারী সংগঠনও সহাবস্থান করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বেসরকারী সংগঠনেরও ভূমিকা থাকবে। সুতরাং বেসরকারী সংগঠনগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব সরকারের হাতে থাকবে।

সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্য দিয়ে কার্যকরী করা হয়।

(ক) শিল্প স্থাপনের স্থান নির্দিষ্টকরণের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ঃ— আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং অনগ্রসর অঙ্গরাজ্যগুলির উন্নতির জন্য ভারত সরকার শিল্প লাইসেন্স নীতির মাধ্যমে শিল্প স্থাপনের নিয়ন্ত্রণ করছে।

শিল্প নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই আইন অনুসারে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকারের অনুমোদন (licence) নিতে হয়।

(খ) শিল্প সংস্থাগুলির মূলধনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বিলি নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন পত্রের বিধি এবং অনুমোদন (Permission from Controller of Capital issue)।

(গ) শিল্পের অবস্থান, আয়তন দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ও মান প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্ত আরোপ করে সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখে।

(ঘ) শিল্পপতি, শ্রমিক প্রতিনিধি ক্রেতা প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করে শিল্পের উৎপাদন, পরিমাণ, ক্ষমতা, অপচয় নিবারণ, যন্ত্রপাতির মান ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঙ) যৌথ কোম্পানীগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রণয়ন ও ঐ আইনের যথাযথ প্রয়োগ এই আইনের প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক।

(চ) অধিগ্রহণ ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করার ক্ষমতা বলে সরু, রুগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

(ছ) পণ্যমান, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ সঠিক রাখার উদ্দেশ্যে সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বলবৎ করেছে (Essential Commodities Act)। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাও এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করে।

(জ) শিল্প ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কারবারী ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন এবং সেগুলির সঠিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইনগুলি হল—চুক্তি আইন, কোম্পানী

আইন, অংশীদারী কারবারের আইন, সমবায় আইন, হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, সমবায় আইন, কারখানা আইন, সর্বনিম্ন মজুরী আইন, মজুরী প্রদান আইন, শিল্প বিরোধ আইন, বোনাস ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত আইন, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্তআইন, কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন, পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক আইন, নিত্য ব্যবহার্য অত্যবশ্যক পণ্য আইন, ক্রেতা সুরক্ষা আইন ইত্যাদি।

(ঝ) বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ কারবারী ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক-বিভাগ, প্রভৃতি বিভাগ ও মন্ত্রকগুলিকে দায়িত্ব দিয়ে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছেন।

তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন (F. E. R. A) প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঞ) দেশের শিল্প ও কারবারী ক্রিয়াকলাপের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, পাশাপাশি দরিদ্র সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার বিভিন্ন আর্থিক নীতি গ্রহণ করে (Fiscal & Monetary Policies) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রয়োজনমত কারবারীদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ট) একচেটিয়া কারবারীদের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া ব্যবসায় ও অন্তরায়মূলক বাণিজ্যিক প্রথা আইন Monopolies and Restrictive Trade Practices Act প্রণয়ন করেন। এই আইনের বলে একদিকে একচেটিয়া বৃহৎ কারবারী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ অন্যদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা সম্ভব। ২৫ কোটি টাকার অধিক মূলধন থাকলে সে সব কারবরী প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আসবে এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশাধিকার পাবে না।

(ঠ) **সালিশীর মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ** (Role of the Government as an Arbitrator): শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন অব্যাহত রাখা, শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করা এবং জাতীয় অর্থ ও সামাজিক নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে কারবারী ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন সালিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

১৯৬৫ সালে ভারতীয় সালিশী পর্ষৎ (Indian Council of Arbitration) স্থাপন করা হয়। এই পর্ষৎ-এর আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরোধের মীমাংসা করা। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন প্রধান বণিক সভা ও শিল্পপতির এই পর্ষৎ-এর সদস্য।

তাছাড়া শিল্পে বিরোধ মিটানোর জন্য ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইন নানা ধরনের বিরোধ, প্রতিরোধ ও মীমাংসায় সহায়তা করে।

৮৪.৪.৩ সংক্ষেপে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির আলোচনা

সুতরাং উপরের ৭৭.২.৩ এককের আলোচনার মাধ্যমে ভারতের ক্ষেত্রে কারবারী ক্রিয়াকলাপে সরকারী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল। সংক্ষেপে বলা যায় যে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ভারত সরকার কারবারী ক্রিয়াকলাপের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে—

(১) বিভিন্ন শিল্পনীতি ও লাইসেন্স বা অনুমোদন নীতির মাধ্যমে শিল্প স্থাপন, সম্প্রসারণ এবং শিল্পের প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

(২) ১৯৬৯ সালের এম. আর. টি. পি. আইনের সাহায্যে একচেটিয়া কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।

(৩) ১৯৪৭ সালের ক্যাপিটাল ইস্যুস্ কন্ট্রোল আইন অনুসারে শেয়ার, ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র) ও অন্যান্য লগ্নীপত্র ক্রয়বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ।

(৪) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের বলে কোম্পানীর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ করা।

(৫) ১৯৫১ সালের শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে সরকার বেসরকারী শিল্পের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৬) রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য শিল্প পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৭) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দান ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্স ও কোটা ব্যবস্থায় প্রণয়ন। নিত্যব্যবহার্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব আনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (Essential Commodities Act) প্রণয়ন করা হয় ১৯৫৫ সালে।

(৮) শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত উৎপাদন, অর্থসংস্থান মজুতকরণ, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন সংস্থা ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হল—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন—(State Trading Corporation), ফুড করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া (Food Corporation Of India), ন্যাশানাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (N. I. D. C.) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন (ICICI), স্টেট ফিনানসিয়াল করপোরেশন (IFC), ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (IDBI) ইত্যাদি।

৮৪.৫ সরকারী নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনীতিগুলির আলোচনা — প্রথম শিল্পনীতি

বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির মধ্যে শিল্পনীতির বিশেষ গুরুত্ব।

যে কোনও দেশের শিল্প ও অন্যান্য কারবারী ক্রিয়াকলাপের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করার অন্যতম ব্যবস্থা হল পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত শিল্পনীতি প্রনয়ণ করা। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তাই শিল্প ও কারবারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, দ্রুত শিল্পায়ন এবং সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। এককটির এই অংশে ভারত সরকারের শিল্পনীতিগুলি নিয়ে পরপর আলোচনা করা হল ঃ

ভারত সরকারের শিল্পনীতিগুলি ও তাদের আলোচনা ঃ

(১) স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরেই ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন (Industrial Policy Resolution of 1948)! ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন প্রকার শিল্পগুলিকে মালিকানার ক্ষেত্রভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ করা হয়। চারটি প্রধান শ্রেণীবিন্যাস এ বিষয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(ক) কতগুলি শিল্প সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগে থাকবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে যেমন দেশরক্ষা সংক্রান্ত, যুদ্ধ সরঞ্জাম, পরমাণু শক্তি, রেলপথ পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যগুলি ইত্যাদি।

(খ) কতগুলি শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। যেমন, বিমান, টেলিফোন, যোগাযোগ, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি শিল্প।

(গ) কতগুলি শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচালনায় থাকবে কিন্তু সেগুলি বেসরকারী মালিকানায়ও থাকবে যেমন মোটর গাড়ী নির্মাণ, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, অন্যান্য খনিজ উৎপাদন ইত্যাদি।

(ঘ) কতগুলি ক্ষেত্র সাধারণভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন অথচ বেসরকারী উদ্যোগে থাকবে।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্যগুলি ছিল ঃ—

(১) ভারতের মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তনের গোড়াপত্তন করা।

(২) সরকারী ক্ষেত্রের এলাকার সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের সংকোচন কিন্তু উৎসাহ দান।

(৩) দেশের সম্পদ সুপরিকল্পিত ভাবে উপযুক্ত ব্যবহার করা।

(৪) অধিক কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে সাধারণের আয় বৃদ্ধি করা ও দারিদ্র্য দূর করা।

(৫) শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

(৬) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮৪.৫.১ দ্বিতীয় শিল্পনীতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভকালেই ভারত সরকার ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন (Industrial Policy Resolution, 1956)। নীতিটিতে শিল্পগুলিকে তিনটি মূল শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

(১) এই শিল্পনীতি অনুসারে ১৭টি প্রধান প্রধান শিল্পে কেবলমাত্র সরকারেরই উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার থাকবে। যেমন পরমাণু, লৌহ ইস্পাত, মৌলিক ও ভারী যন্ত্রপাতি শিল্প, কয়লা, লৌহ ইত্যাদি।

(২) প্রাথমিকভাবে, ১৭টি প্রধান প্রধান শিল্প সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগাধীন রাখার পর বাকি ১২টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করা হয়েছে। এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে যে সকল সংস্থা বেসরকারী উদ্যোগের এই ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকবে না। যেমন এল্যুমিনিয়াম, মেশিন টুলস, মিশ্র ধাতু, রবার প্রভৃতি শিল্প।

(৩) উপরের বর্ণিত (i) ও (ii)-এর শিল্পগুলি ছাড়া বাকি যাবতীয় শিল্পগুলি বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(৪) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের স্থায়ী উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(৫) উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক কল্যাণ সাধন এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনই শেষ লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়। (Establishment of Socialistic Pattern of Society.)

সুতরাং শিল্প ও কারবারের ক্ষেত্রে সরকারের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দ্বিতীয় শিল্পনীতিটি আরও সুদূর প্রসারী প্রভাব করবে বলে আশা করা হয়েছে।

৮৪.৫.২ ১৯৭০ সালের শিল্পনীতি

১৯৭০ সালে ভারত সরকার আরও একটি নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন (Industrial Policy of 1970)।

বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্প দ্রব্যের বাজার, চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যই এই শিল্পনীতিটিতে ঘোষিত হয়েছিল। তাই সরকার রপ্তানিকারক দ্রব্য উৎপাদনে জড়িত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দান করবে বলে নীতি গৃহীত হয়।

১৯৭০ সালের শিল্পনীতি অনুসারে অনুমতি পত্র (Licence) প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্পগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (i) মূল ক্ষেত্র (ii) মধ্যম ক্ষেত্র, (iii) যৌথ ক্ষেত্র, (iv) সংরক্ষিত ক্ষেত্র ও সমবায় ক্ষেত্র।

তাছাড়া বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সম্প্রসারণ রোধ এবং বৈদেশিক মূলধন ও প্রযুক্তির প্রয়োজনে বৃহৎ শিল্পসংস্থার অনুপ্রবেশের শর্ত শিথিল করা হবে বলে নীতি হিসাবে গৃহীত হয়।

৮৪.৫.৩ ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি

১৯৭৩ সালে ভারত সরকার মূলত ঃ রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আরও একটি শিল্পনীতি (Industrial Policy 1973) ঘোষণা করেন। যৌথ ক্ষেত্রের (Joint Sector)-এর সম্প্রসারণ ও এই শিল্পনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮৪.৫.৪ ১৯৭৭ সালের শিল্পনীতি

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রের জনতা সরকার একটি নূতন শিল্পনীতির ঘোষণা করেন (Industrial Policy of 1977)।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, কর্ম সংস্থানের দ্রুত বৃদ্ধি, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং শিল্পের দ্রুত বিকাশ করাই জনতা সরকারের শিল্প নীতির উদ্দেশ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছিল।

৮৪.৫.৫ ১৯৮০ সালের শিল্পনীতি

১৯৮০ সালের শিল্পনীতি (Industrial Policy, 1980) পূর্বতন জনতা সরকারের শিল্পনীতির তীব্র সমালোচনা করে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে কংগ্রেস সরকার নূতন শিল্পনীতির ঘোষণা করেন।

(১) উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, (২) দ্রুত শিল্পায়ন, (৩) পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, (৪) আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, (৫) অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে উন্নতি, (৬) বেকারত্ব দূরীকরণ, (৭) কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নের সহায়তা, (৮) রপ্তানি শিল্পের দ্রুত প্রসার, (৯) সমতার ভিত্তিতে বিনিয়োগ।

৮৪.৫.৬ ১৯৮৩ সালের শিল্পনীতি

১৯৮৩ সালের লাইসেন্স নীতি (Licensing Policy of 1983)— দেশের শিল্পোন্নতির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিল্প লাইসেন্স প্রথার আওতার বাইরে থাকার সুযোগ ভোগের জন্য ঊর্ধ্বতম মাত্রা ৩ কোটি টাকার পরিমাণ থেকে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। তাছাড়া ভর্তুকী দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে শিল্পবিহীন অনুন্নত জেলাগুলির জন্য। এই উদ্দেশ্যে জেলাগুলিকে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে তিনটি শ্রেণীতে।

৮৪.৫.৭ সালের শিল্পনীতি

১৯৯১ সালে নূতন শিল্পনীতিতে শিল্প লাইসেন্স সম্বন্ধে আরও উদার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ও

প্রতিরক্ষা এবং ঐ ধরনের ১৮টি শিল্প ছাড়া বাকি সকল শিল্পের লাইসেন্স ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানো হয়েছে। আবার ঐ নির্দিষ্ট ১৮টি শিল্পের দ্রব্য যদি কোনও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করতে চায় তবে তাদের ক্ষেত্রে কোনও লাইসেন্স-এর প্রয়োজন হবে না। এইভাবে সরকার কারবারী ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উদারনীতির মনোভাবের পরিচয় দেয় বর্তমান শিল্পনীতি ও লাইসেন্স নীতির মাধ্যমে।

৮৪.৬ শিল্পনীতিগুলির সার্থকতা

কারবারী ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৯১ সালের শিল্পনীতি পর্যন্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সরকারের লক্ষ্য বহুলাংশেই পূরণ করেছে। প্রথমতঃ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে, সরকারী মালিকানায় কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৯৫১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের মাত্র ৫টি সংস্থা, ১৯৯৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৪৫টি সংস্থায় পরিণত হয়। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির সংস্থার সংখ্যাও ১২০০-এর অধিক।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৫১ সালের সরকারী কারবারে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি টাকা কিন্তু ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগের ব্যয় হয় ১,৪৬, ৯৭১ কোটি টাকা।

তৃতীয়ত ঃ ভারতের শিল্পক্ষেত্রের বিশাল অংশ এখন সরকারী কর্তৃত্বে রয়েছে। সাধারণ নিত্য ভোগ্য খাদ্য সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে ভারী ও মূল শিল্পগুলির প্রধান প্রধান উদ্যোগই সরকারী মালিকানার অধীনে।

চতুর্থত ঃ রেল, পরিবহণ. টেলিফোন, যোগাযোগ, মাল ডাক ও তার, বিমান, খনি, বিভিন্ন শক্তি সম্পদ অর্থসংস্থান-কারী প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন প্রসারে সহায়তাকারী বিভিন্ন সংস্থাগুলি সরকারী কর্তৃত্বে থেকে সামগ্রিকভাবে ভারতের শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কেবলমাত্র রেল, ডাক ও তার বিভাগে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮৮৫ কোটি টাকা।

পঞ্চমত ঃ কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় ২ কোটি কর্মী বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নিযুক্ত। এবং জাতীয় আয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ উৎপন্ন করে সরকারী কারবার (১৯৮৮-৮৯-এর হিসাব মত)

ষষ্ঠত ঃ শিল্পনীতিগুলির অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি ছিল সামাজিক ন্যায় বিচার ; জনকল্যাণ বৃদ্ধি ; মূলধন যোগান ও গঠনের বৃদ্ধি ; সুষম উন্নয়ন ; সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন ; বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ; জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই সকল উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে সরকারী কারবার এবং ভারতের সামগ্রিক শিল্প ও কারবারী ক্ষেত্রে বহুলাংশে সমর্থ হয়েছে।

৮৪.৭ কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগীতা ও সাহায্য

এই পর্যায়ের বিভিন্ন এককগুলির মাধ্যমে কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশ, উদ্যোগ গঠন এবং বিশেষ করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনে হতে পারে যে কারবারী ক্ষেত্রে সরকার প্রবেশ করে উদ্যোগ গঠন করে পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর সামগ্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্য পূরণ করছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ও সেগুলির গভীরতা যথেষ্ট, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে—

(১) প্রত্যেকটি শিল্পনীতিতেই সরকার বেসরকারী শিল্প ও কারবারী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে তাদের নানাভাবে সাহায্য করার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করেছে। সাংগঠনিক, উন্নয়ন সংক্রান্ত পরামর্শ, আর্থিক সাহায্য, বিপণন, পণ্য সংরক্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য ও সহযোগীতা দান সরকারের অন্যতম নীতি।

(২) তাছাড়া মিশ্র অর্থনীতি ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারত সরকার বেসরকারী কারবারের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে আর্থিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করেন। ভারতের প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই সরকারী ক্ষেত্রের মত বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য অর্থসংস্থান ও বরাদ্দ রাখা হয়ে আসছে।

(৩) উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার সুফল বেসরকারী সংস্থাগুলিও ভোগ করছে।

(৪) সারা দেশের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের শিল্প ও অন্যান্য কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সরকারের 'সামাজিক ন্যায় বিচার' (Social Justice) প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের (Socialistic Pattern of Society) লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করে সেজন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন, নির্দেশ দান এবং সহযোগীতা করা সরকারের কার্য্যসূচির অন্তর্গত।

(৫) দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়কে সুবিধাদানের জন্য সরকার সর্বদাই উপযুক্ত বাণিজ্য-নীতি ও শুল্ক-নীতি প্রণয়ন করে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন।

(৬) দেশের শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সরকার বাউন্টি (Bounty) বা রাজবৃত্তি অর্থাৎ এককালীন অর্থ সাহায্য এবং সহায়তা বৃত্তি (Subsidy) দিচ্ছেন। সহায়তা বৃত্তির অর্থ হল কোনও প্রতিষ্ঠানকে একক উৎপাদন প্রতি বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করা। এই রকম সাহায্যের ফলে দেশের শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়নের সুযোগ পায়।

(৭) ক্ষুদ্রায়তন মাঝারি ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তা এবং পরামর্শদানের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন এবং আরও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বীমা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সারা দেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানগলিকে নানাভাবে সহায়তা দান করছে।

(৮) শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, গুণগত উৎকর্ষতা, পরিমাণ বৃদ্ধি, মানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা পর্ষদ, জাতীয় গবেষণা উন্নয়ন কর্পোরেশন, ভারতীয় মান সংস্থা প্রভৃতি সংস্থা গঠন করা হয়।

সুতরাং দেখা গেল যে কারবারী ক্ষেত্রে সরকার একাধারে মালিকানা, উদ্যোক্তা এবং পরিচালকের ভূমিকা পালন করছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। অন্য দিকে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের এলাকা সুনির্দিষ্ট করে কর্তৃত্ব বজায় রাখছে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন গঠন করে সরকার বেসরকারী কারবারগুলিকে সরকারী লক্ষ্য পূরণের

জন্য উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বিভিন্ন শিল্পআইন, লাইসেন্স সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হয়।

৮৪.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। সরকারী উদ্যোগ বলতে কি বোঝেন?

২। বেসরকারী উদ্যোগ কথাটির অর্থ কি?

৩। কারবারী ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

৪। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি কি?

৫। বিভিন্ন শিল্পনীতিগুলি কোন কোন সালে প্রণয়ন করা হয়?

৬। মিশ্র অর্থনীতি কি?

৭। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ কথাটির অর্থ কি?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। কারবারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়? কি কি উপায়ে সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে?

২। ভারত সরকারের শিল্পনীতিগুলি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩। শিল্প লাইসেন্স বলতে কি বোঝ? ভারত সরকারের শিল্প লাইসেন্স নীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৪। কারবারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়?

৫। কারবারের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Biswas Bilash Kumar—Karbar Sangathan O Babasthapana- Oriental Book Company Private Ltd—Calcutta 1989.

2. Mukerjee Sushil—Karbar Sangathan O Babasthapanar Niti-- Chhaya Prakashani Calcutta-1991.

3. Dasgupta A & Sengupta N. K.—Government and Business-Vikas Publishing House Pvt Ltd. New Delhi-1987.

4. Shukla M.—C. Business Organisation & Management-- S. Chand & Company Ltd. New Delhi-1991.

5. Bhattacharya & Debnath-- Babsaya Sangathan O Babasthapana. - Indian Progressive Publishing Co. Private Ltd. Calcutta-1986.

6. Roy Choudhury N. C.—Business Organisation---Modern Book Agency-Calcutta-1976.

একক ৮৫ ❐ রুগ্ন ও দুর্বল কোম্পানী এবং তাদের পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবন।

গঠন

৮৫.০ উদ্দেশ্য

৮৫.১ প্রস্তাবনা

৮৫.২ রুগ্নতা বা দুর্বলতা

৮৫.২.১ রুগ্নতার লক্ষণগুলি

৮৫.২.২ রুগ্নতার কারণ

৮৫.৩ ভারতের শিল্পক্ষেত্রের রুগ্নতা

৮৫.৩.১ এই বিষয়ে সরকারী চিন্তাভাবনা

৮৫.৪ রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন বা পুনর্জীবন-এর ধারণা

৮৫.৫ রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠন

৮৫.৫.১ রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য গঠিত সংস্থাগুলির আলোচনা

৮৫.৫.২ শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন সংস্থার গঠন ও কার্যাবলী— কার্যনির্বাহক পর্ষদ

৮৫.৬ ঋণ আদায়করণের ট্রাইবুন্যাল

৮৫.৬.১ ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যালের গঠন

৮৫.৭ একত্রীকরণ ও অধিগ্রহণ— ভারতের উদাহরণ

৮৫.৭.১ বিভিন্ন ধরনের একত্রিকরণের পদ্ধতিগুলি—ভারতের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা

৮৫.৮ অনুশীলনী

৮৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল শিল্পের রুগ্নতা সম্বন্ধে আলোচনা। আলোচনার বিভিন্ন অংশে শিল্পের রুগ্নতা বলতে কি বোঝায়— রুগ্নতার কারণ—শ্রেণীবিভাগ—ভারতের ক্ষেত্রে শিল্পের রুগ্নতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা—এককটিতে রুগ্নতা প্রতিরোধের জন্য গৃহিত ব্যবস্থাগুলিও আলোচিত হবে। রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠন সংক্রান্ত ধারণা এবং রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসন বলতে কি বোঝায়—রুগ্ন শিল্প পুনর্গঠনে যে সকল সংস্থা গঠন করা হয়েছে সেই সকল সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া সংস্থার ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ আদায় করণের ব্যবস্থা ইত্যাদিও এই এককটিতে আলোচনা করা হবে।

তাছাড়া এককটিতে একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের একত্রিকরণ এবং একত্রীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির আলোচনা করা হবে।

৮৫.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে সেই শিল্প সংস্থাকেই রুগ্ন শিল্প সংস্থা বলে আখ্যা দেওয়া হবে যখন "যে সংস্থা বিগত বছরে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং অর্থ সরবরাহকারী ব্যাঙ্কের ধারণা, বর্তমান এবং আগামী বছরগুলিতেও আর্থিক ক্ষতির আশংকা আছে এবং/ অথবা কোনও সংস্থার আর্থিক কাঠামোর ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। অর্থ চলতি খাতে দেনা-পাওনার অনুপাত যখন ১:১ এবং ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত যখন হ্রাসমান।" (RBI Report on Trend and Progress of Banking in India--- 1977-78)

সুদর্শন লাল-এর মতে "যখন কোন সংস্থা উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর নীচে অবস্থান করে উৎপাদন করে অর্থাৎ যখন তা ব্যয় ও অপচয় পূরণের সামর্থ্য হারিয়েছে" তখনই সে সংস্থাটিকে রুগ্ন সংস্থা বলা হবে। (Sudarsan Lal-How to Prevent Industrial Sickness-P--18)

উপরের সংজ্ঞা দুটো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দুর্বল আর্থিক নীতি ; উৎপাদনহীনতা বা স্বল্পতা ; অদক্ষ পরিচালনা ; ত্রুটিযুক্ত মূলধন কাঠামো ইত্যাদি হল রুগ্ন শিল্পসংস্থার মূল বৈশিষ্ট্য।

রুগ্নতার প্রকৃতি অনুসারে রুগ্ন সংস্থাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) প্রকৃত রুগ্ন সংস্থা, (খ) জন্মগত রুগ্ন সংস্থা এবং (গ) উদ্ভূত রুগ্ন সংস্থা।

একটি সংস্থাকে আমরা যখন প্রকৃত রুগ্ন সংস্থা বলি তখন বুঝতে হবে যে ঐ রুগ্নতা সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণের বাইরে বা ঐ ধরনের রুগ্নতার জন্য সংস্থাটি দায়ী নয়।

জন্মগত রুগ্নতার জন্য সাংগঠনিক স্তরের (Promotional Stage) ত্রুটিই দায়ী।

উদ্ভূত রুগ্নতা অদক্ষ পরিচালনা এবং ত্রুটিযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ভ্রান্ত কর্মী ব্যবস্থাপনার ফলে সৃষ্টি হয়।

কোনও একটি নির্দিষ্ট শিল্পে (যেমন লৌহ-ইস্পাত শিল্প, সুতীবস্ত্র বয়ন শিল্প বা পাটশিল্প ইত্যাদি) যখন বহু সংস্থা রুগ্ন হয়ে পড়ে তখন সেই শিল্পকে রুগ্নশিল্প বলা হয়।

৮৫.২ রুগ্নতা ও দুর্বলতা

কোনও সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ যখন সেই সংস্থার নীট মূল্যের (New worth) সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তখন সেই সংস্থাকে রুগ্ন সংস্থা বলা হয়। সুতরাং এই লক্ষণ হল রুগ্নতার লক্ষণ।

কিন্তু যখন কোন সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ বিগত পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ নীট মূল্যের ৫০ শতাংশের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তখন ঐ সংস্থাকে দুর্বল সংস্থা বলা হয়।

৮৫.২.১ রুগ্নতার লক্ষণগুলি

শিল্প রুগ্নতার লক্ষণগুলি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হল ঃ

(ক) প্রথম লক্ষণ হল সংস্থাটির স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধ করার এবং আইনসম্মত দায় মেটানোর মত প্রয়োজনীয় নগদ টাকা থাকে না। যেমন শ্রমিক কর্মীদের বেতনের দায়, কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে মালিকের দেয় অংশ জমা দেওয়ার অক্ষমতা, কাঁচামালের দাম দেওয়ার অক্ষমতা ইত্যাদি।

(খ) দ্বিতীয় লক্ষণ হল পূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য, নির্মিয়মান দ্রব্য, কাঁচামাল-এর মজুত ভাণ্ডারের ক্রমাগত বৃদ্ধি। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের অক্ষমতার জন্যই মজুত ভাণ্ডার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

(গ) তৃতীয় লক্ষণ হল সংস্থাটির পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার করার অক্ষমতা।

(ঘ) সংস্থাটির অর্জিত মুনাফার হার যখন বাজারে চলতি সুদের হারের অপেক্ষা কম হতে থাকে তখন রুগ্নতার চতুর্থ লক্ষণ দেখা যায়।

(ঙ) রুগ্নতার অপর লক্ষণ হল যখন চলতি সম্পত্তি (Current Assets) সংস্থাটির চলতি দায় মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন সংস্থাটি রুগ্ন হয়ে পড়েছে বুঝতে হবে।

(চ) দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ বা ঋণের দেয় অংশের দায় মেটানোর অক্ষমতা রুগ্নতার অপর লক্ষণ।

৮৫.২.২ রুগ্নতার কারণ

শিল্প-রুগ্নতার কারণগুলি দুই ভাগে বিভক্ত ঃ

(ক) আভ্যন্তরীণ কারণ এবং (খ) বাহ্যিক কারণ।

(ক) **আভ্যন্তরীণ কারণ ঃ** (১) অন্যতম প্রধান আভ্যন্তরীণ কারণ হল পরিচালন দক্ষতার অভাব বা অত্যন্ত নিম্নমানের পরিচালন পদ্ধতি। সংস্থাটির সমস্ত এলাকায় অর্থাৎ আর্থিক, মানবিক, যান্ত্রিক, বিপণন, প্রভৃতি বিষয়ক ভুল পরিচালন নীতি রুগ্নতার সৃষ্টি করে।

(১) ভ্রান্ত মূলধন পরিকল্পনা এবং ত্রুটিপূর্ণ মূলধন ব্যবহার পদ্ধতি হল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ কারণ। কোনও নির্দিষ্ট খাতের টাকা অন্য খাতে খাটানো, লভ্যাংশ বন্টন সংক্রান্ত ভুল নীতি, মাত্রাতিরিক্ত উপরিব্যয় (Overhead), হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটি যেমন অবচিতি, (Depreciation), ভবিষ্যত ব্যবস্থা (Provision), সঞ্চিতি (Reserve) সংক্রান্ত ভুল নীতি।

(২) বিপণন ব্যবস্থাপনার অকর্মণ্যতা—অর্থাৎ সংস্থাটি ক্রয়-বিক্রয় নীতি ও পদ্ধতির সামগ্রিক ব্যর্থতা সংস্থাটির রুগ্ন সংস্থায় পরিণত করে।

(খ) শিল্প রুগ্নতার বাহ্যিক কারণগুলি হল ঃ—

(১) অন্যতম প্রধান বাহ্যিক কারণ হল ভ্রান্ত সরকারী নীতির বেড়াজাল অর্থাৎ সংস্থার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের, কাঁচামালের দাম ও সামগ্রিক ভাবে ঐ শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য সংক্রান্ত সরকারী নীতি।

(২) **সরকারী পরিকল্পনানীতির প্রভাব ঃ** কোনও শিল্প সংস্থাই সরকারী পরিকল্পনানীতির বাইরে যেতে পারে না। তাই নিজস্ব সমস্যাগুলির সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৩) মন্দা ঃ অর্থনৈতিক মন্দার ফলে শিল্পে রুগ্নতা দেখা দেয়। ভারতের ক্ষেত্রেও মন্দাজনিত রুগ্নতা রয়েছে।

(৪) রুগ্নতার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল মজুরি ও আয়সংক্রান্ত সুষ্ঠু জাতীয় নীতি প্রণয়নে সরকারী ব্যর্থতা বা উদাসীনতা। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে আলাদা আলাদা মজুরি ও বেতন সংক্রান্ত চুক্তি ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(৫) **বিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদের সমস্যা ঃ** বিদ্যুৎ সঙ্কটে উৎপাদন ব্যহত থাকে, তাই কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত লোকসান বহন করে এবং সংস্থাগুলি রুগ্নতা প্রাপ্ত হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলের রুগ্নতার জন্য বিদ্যুৎ সঙ্কট বহুলাংশে দায়ী।

৮৫.৩ ভারতের শিল্পক্ষেত্রের রুগ্নতা

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন ; ১৯৫১ সাল থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থনৈতিক উন্নয়ন ; ১৯৫১ সালের শিল্প লাইসেন্স ও নিয়ন্ত্রণ নীতি ; ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিলে শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা এই সকল দলিল পত্রই শিল্প ক্ষেত্রে ভারত সরকারের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকেই ভারতে শিল্পক্ষেত্রে রুগ্নতা দেখা দেয় এবং সত্তরের দশকে শিল্পরুগ্নতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বর্তমানে ভারতের বেশ কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পের রুগ্নতা জাতীয় অর্থনীতিতে ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রধান বৃহৎ শিল্পে এবং বহুসংখ্যক মাঝারি শিল্পে এবং প্রায় সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রেই রুগ্নতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে ভারতের রুগ্ন শিল্পে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৬ হাজার ৯৮টি (এই তথ্য ১৯৮৯-৯০ সালের ইকনমিক সার্ভের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত)। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৮৩ সালের জুন মাসে ৬৬৩টি রুগ্ন সংস্থার মোট ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯১৩ কোটি টাকা। এই ৬৬৩টি সংস্থাই ছিল মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত। রুগ্নতায় আক্রান্ত শিল্প সংস্থার অধিকাংশই পশ্চিমবাংলা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও গুজরাটে অবস্থিত। রুগ্নশিল্প সংস্থার অধিকাংশই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বস্ত্রবয়ন শিল্পের সংস্থা। তাছাড়া, রাসায়নিক, পাট, চিনি ইত্যাদি শিল্প।

৮৫.৩.২ এই বিষয়ে সরকারী চিন্তাভাবনা

ভারতে শিল্প রুগ্নতা জনিত সমস্যা নিয়ে সরকারী ভাবনা ও উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে ষষ্ঠ পরিকল্পনার দলিলে—এই প্রসঙ্গে দলিলটির একাংশে বলা হয়েছিল—" শিল্প রুগ্নতা কেবল যে বেকার সমস্যাকেই তীব্র করে তোলে তা নয়, বিনিয়োজিত পুঁজিকে করে তোলে ফলহীন এবং শিল্পোন্নতির পক্ষে সৃষ্টি করে প্রতিকূল পরিবেশ। উন্নত দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় শিল্পক্ষেত্রে এ রকম পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা হয় ; কিন্তু যে দেশের বেকার সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা এবং উপকরণও স্বল্প, সে দেশের পক্ষে এ রকম শিল্পরোগ অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই শিল্পরোগ এমন একটি ক্ষেত্র যার উপর সরকারের বেশি অগ্রাধিকার দিতেই হবে।" ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাব পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে সারা দেশের রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ২ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকারও অধিক পরিমাণ টাকা অনাদায়ী ও আবদ্ধ অবস্থায় বকেয়া পড়ে আছে। এই বিরাট অংকের টাকা নূতন আয় সৃজনে ব্যর্থ এবং জনগণের অর্থের অপচয় করছে এবং পাশাপাশি দেশের আর্থিক ভিত দুর্বল করে

তুলছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের ক্ষুদ্র শিল্প ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা করার জন্য ঋণ দান করা। বাস্তবে কিন্তু ঋণ দানের ক্ষেত্রে জাতীয় কৃত ব্যাঙ্কগুলি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঋণের নামমাত্র অর্থও ফেরত না পাওয়ার ফলে ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে ৮টি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ককে রুগ্ন বলে ঘোষণা করা হয়। ভারতে শিল্প রুগ্নতা এইভাবে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলছে।

৮৫.৪ রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবন-এর ধারণা

রুগ্নশিল্পের পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবন প্রায় সমার্থক। সংক্ষেপে পুনরুজ্জীবন বা পুনর্বাসন বলতে রুগ্ন শিল্প সংস্থাটি বা ঐ শিল্পের অন্তর্গত সংস্থাগুলির রুগ্নতা দূরীকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে রুগ্ন সংস্থাগুলির রুগ্নতার কারণ নির্ণয় করে ঐ সংস্থাগুলির পুরুজ্জীবন করা। রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির এবং কোনও শিল্পের রুগ্নতার কারণ, রুগ্নতার পরিমাণ ও লক্ষণ বিচার ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শিল্প সংস্থাগুলির রুগ্নতা দূর করতে গেলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক ঃ—

(১) সুদক্ষ পরিচালক গোষ্ঠী নিয়োগ। (২) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ; কর্মী ব্যবস্থাপনা ; বিপণন ব্যবস্থাপনা ; উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি প্রত্যেকটি কার্যনির্বাহী ক্ষেত্রের (Functional areas) জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: (৩) সঠিক মূলধন নিয়োগ ও মূলধন পরিকল্পনা (Capital planning and utilisation) । (৪) উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত মান উন্নয়ন। (৫) সঠিক দাম নীতি (Price Policy) স্থির করে উপরি ব্যয় কমানোর সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (৬) সঠিক মজুরি ও বেতন নীতি প্রণয়ন। (৭) শ্রমিক-মালিক বিরোধ মিটানোর সবরকম ব্যবস্থা করা এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

৮৫.৫ রুগ্নশিল্পের পুনর্গঠন

শিল্পের রুগ্নতা রোধ করার জন্য এবং রুগ্ন শিল্প পুনর্গঠনের জন্য গঠিত সংস্থাগুলি এবং গৃহীত ব্যবস্থাগুলির আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। ১৯৪৮ সালের শিল্প আইনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালের শিল্প নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও অনুমোদন নীতি প্রণয়ন এবং ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের বিভিন্ন ধারা প্রণয়নের ও সংশোধনের মাধ্যমে রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কতগুলি সুপারিশ করেন। সুপারিশ গুলি হল—

(১) রুগ্ন শিল্পগুলির মালিকদের কাছ থেকে শাস্তিমূলক জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা এবং তাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ মূল্য থেকে সব বকেয়া পাওয়া আদায় করা।

(২) রুগ্নতার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তা যথাসম্ভব সত্বর অধিগ্রহণ করা।

(৩) সংশ্লিষ্ট সংস্থার আর্থিক পরিচালনা কাঠামো পুনর্গঠন করা ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা।

(৪) সংস্থাটির পুনরুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত মূলধন যোগানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮৫.৫.১ রুগ্নশিল্প পুনর্গঠনের জন্য গঠিত সংস্থাগুলির আলোচনা

যে কোনও শিল্পসংস্থায় এককভাবে বা ঐ শিল্পে রুগ্নতা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা

অত্যাবশ্যক। কারণ ভয়াবহ বেকারত্ব, উৎপাদন হীনতা, সামগ্রিকভাবে মূলধনের অবক্ষয়, জাতীয় সম্পদের অপচয় ; সামাজিক ব্যয় এবং সরকারী ব্যয়ের প্রতিদান হীনতা এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক মন্দা ও অধোগতি প্রকট হয়ে পড়ে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে ষাটের দশকের শেষে ভারতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রুগ্নতা দেখা দেয় এবং সত্তর-এর দশকের মাঝামাঝি তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। সরকারী কার্যকরী চিন্তা এবং পদক্ষেপ এ বিষয়ে প্রথম ঘোষণা করা হয় ১৯৭৮ সালে। তদানীন্তন জনতা সরকারের কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ১৫ই মে সংসদে রুগ্নশিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করেন। সরকারী নীতির মূল কথা হল ঃ—

(ক) রুগ্ন অবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকেই সরকার ঐ শিল্প সংস্থাগুলি সম্বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এবং কাজকর্ম সম্বন্ধে নজর রাখবেন (monitoring)।

(খ) রুগ্ন সংস্থাটি অধিগ্রহণ করার কথা বিবেচনা করার জন্য সরকার একটি স্ক্রিনিং কমিটি করবেন। ঐ কমিটি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচনা করবেন। কমিটি, রাজ্য সরকার, এবং ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ ক্রমে অধিগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অধিগ্রহণ করার পর রুগ্ন প্রতিষ্ঠানটিকে চালু প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে বিক্রয় করা যায় কিনা তাও বিবেচনা করা যেতে পারে। রুগ্ন সংস্থাটির সামগ্রিক পরিকাঠামো পরিবর্তন করে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিল্পমন্ত্রীর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ওই সরকারী নীতি ঘোষণা করার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ শিল্প সংস্থাটির বা সংস্থাগুলির উপর নজরদারির জন্য একটি কেন্দ্রীয় সেল (monitoring cell) গঠন করে। সারা দেশের বিভিন্ন অংশেও আঞ্চলিক সেলও গঠন করা হয়।

(গ) ঋণদাতা সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে যোগ্য বা সংগঠনগুলি মিলিতভাবে যোগ্য পেশাদারী পরিচালকমণ্ডলীর একটি দল গঠন করে ঐ দল থেকে প্রতিনিধি পাঠাবেন বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালক বোর্ডে। পরিচালকদের কোনও রূপ দুর্নীতি বা অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে ঋণদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শিল্পে রুগ্নতার ভয়াবহ কুফলের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিচালক গোষ্ঠীরা মিলিতভাবে তাদের প্রতিনিধি নিয়ে একটি দল গঠন করেন এই কোম্পানী আইন ও শিল্পনিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন নীতি সংশোধন করার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন—ঐ সুপারিশগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(১) রুগ্ন শিল্প মালিকদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। ক্ষতিপূরণ বলতে শাস্তিমূলক জরিমানা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

(২) রুগ্নতার কোনও সম্ভাবনা দেখা দিলেই অতি-সত্ত্বর সেই সংস্থাকে অধিগ্রহণ করা।

(৩) রুগ্ন সংস্থাটির আর্থিক ও পরিচালন কাঠামোর পুনর্গঠন করা।

(৪) রুগ্ন সংস্থাটির রুগ্নতা দূর করে সেটির পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করার ব্যবস্থা এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের শ্রমমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ-এর মতামত উল্লেখ কর যেতে পারে।

(১) তার মতে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন দায়িত্ব শ্রমিকদের উপর ন্যাস্ত করা আবশ্যক। তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুনর্বাসন বা পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা আছে এমন প্রতিষ্ঠান গুলির কথাই ভাবা আবশ্যক।

(২) রুগ্ন সংস্থার অতীত দায় কমিয়ে দেওয়া।

(৩) রুগ্ন সংস্থাগুলির জন্য কম সুদে ঋণদান করা। এই জন্য 'Soft Loan' প্রকল্প অনুসরণ করা।

(৪) কাঁচামাল ও সহকারী দ্রব্য সামগ্রী যাতে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(৫) রুগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ পরিচালক গোষ্ঠীর নিয়োগ ব্যবস্থা করা। এই বিশেষজ্ঞ পরিচালক গোষ্ঠীতে কারিগরী ও প্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকবেন।

(৬) রুগ্ন সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবনের জন্য কয়েক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া আবশ্যক।

১৯৭১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য ঋণ দানের সুবিধার জন্য ভারতের শিল্প পুনর্গঠন করপোরেশন গঠন করেন (Industrial Reconstruction Corporation of India) সংক্ষেপে সংস্থাটিকে I. R.C.I (আই. আর. সি. আই) বলা হয়। সংস্থাটি কোম্পানী আইনের অধীনে গঠিত হয়।

১৯৮৫ সালে পার্লামেন্টে গৃহীত এক আইনের বলে এই I.R.C.I-আই. আর. সি. আই সংস্থাটি নতূন রূপে এবং নতূন নামে পুনগঠিত হয়। পুনর্গঠিত সংস্থাটির নাম হয় (Industrial Reconstruction Bank of India) ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্ষেপে I. R. B. I—আই. আর. বি. আই। রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এই সংস্থাটি শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্যও ঋণদন করে থাকে। 'MRTP' 'এম. আর.টি.পি আইন এবং 'ফেরা' FERA আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে বহুজাতিক করপোরেশনগুলি যাতে রুগ্নশিল্প সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনুমতি দানের ক্ষমতাও ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্কে (IRBI)-কে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই ব্যাঙ্ক রুগ্ন সংস্থার উন্নয়ন, পুনর্গঠন, উন্নত সংস্থার সাথে যুক্তকরণ, অধিগ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিতে পারে। শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক, রুগ্ন সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য তার পরিচালন দায়িত্বও গ্রহণ করতে পারে।

তাছাড়া ১৯৮৫ সালে রুগ্ন শিল্প সংস্থা আইন প্রণয়ন করা হয় (Sick Industrial Companies Act বা SICA)-রুগ্ন সংস্থা চিহ্নিতকরণের সর্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৯৮৫ সালের জুনমাস পর্যন্ত শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক IRBI মোট ৩৩৩ টি রুগ্ন শিল্প সংস্থার পুনর্জ্জীবন বা পুনর্বাসনের চেষ্টা ও সাহায্য করা হয়। অত্যন্ত আশার কথা এদের মধ্যে ১৩১ টি রুগ্ন সংস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। রুগ্ন এবং দুর্বল শিল্পসংস্থাগুলির সাহায্যার্থে ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার রুগ্ন শিল্প সংস্থাগুলিকে অন্তঃশুল্কের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৮৫.৫.২ শিল্প ও আর্থিক পুনর্গঠন সংস্থার গঠন ও কার্যাবলী—কার্যনির্বাহক পর্ষদ

রুগ্ন ও দুর্বল সংস্থাগুলির পুনর্জীবন-এর জন্য বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণয়নের সাথে সাথে ভারত সরকার কতগুলি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। সেই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী অর্থ সাহায্য করা হয়ে থাকে। ১৯৮৪ সালের পার্লামেন্টের আইন বলে ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক (IRBI) Industrial Reconstruction Bank of India. নামে প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়।

ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক ঃ Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI)

ভারতের রুগ্ন ও দুর্বল শিল্প সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের জন্য এবং বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের শিল্প রুগ্নতার ভয়াবহতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ১৯৭১ সালে ভারত সরকার শিল্পপুনর্গঠন করপোরেশন গঠন করেন। পরবর্তী কালে ১৯৮৪ সালে শিল্পপুনর্গঠন করপোরেশনকে তার কার্যক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট এবং সম্প্রসারিত করার জন্য শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্কে রূপান্তর করে ভারতের শিল্প পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। (IRBI) রুগ্ন ও দুর্বল শিল্পসংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন এবং পুনর্গঠন করাই এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য।

রুগ্ন ও দুর্বল শিল্পগুলি অধিগ্রহণ এবং পরিচালনার দায়িত্ব ও গ্রহণ করার অধিকার এই প্রতিষ্ঠানটির আছে। ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ; শিল্প অর্থ করপোরেশন ; শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ; জীবন বীমা করপোরেশন ; স্টেট ব্যাঙ্ক ; এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি এই প্রতিষ্ঠানটি মূলধনে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান।

১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কটি ৭৫৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং তার মধ্যে ৫২৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান, শিল্পের পুনর্গঠন, একত্রীকরণ, পরামর্শ দান, পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই দায়িত্ব নিয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। বিগত বৎসরগুলিতে বস্ত্রবয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, খনি ও ফাউন্ড্রি শিল্প সংস্থাগুলি এই প্রতিষ্ঠানটির সাহায্যে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছে।

একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর ব্যাঙ্কটির পরিচালনার ভার ন্যস্ত কিন্তু শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক দ্বারা নিযুক্ত একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (IDBI)

১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মালিকানাধীন এই ব্যাঙ্কের কার্যাবলীর তদারকির ভারও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। শিল্পোন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ দান করে থাকে। ১৯৭৫ সালে আইন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থায় পরিণত হয়। ১৯৬৪ থেকে ১৯৮২-র জুন পর্যন্ত সংস্থাটি ৮৮১২ কোটি টাকার ঋণ ও সাহায্য দিয়েছে।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনাম করপোরেশন (IFC)

১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে এই করপোরেশনটি স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বৃহদায়তন শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও অর্থ সাহায্য করাই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (ICIC)

বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শমত ভারত সরকারের সমর্থনে, মার্কিন সরকারের সম্মতিতে এবং মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অংশীদারীতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রূপে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী কোম্পানীগুলিকে মোট ১৯১৮ কোটি টাকা ঋণ দান করেছে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (IRCI)

ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারতের রুগ্নশিল্পকে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের রুগ্নশিল্প পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং পুনর্বাসনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির গঠন করা হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে সেগুলির পুনর্বাসন করাই এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য।

সিকা (SICA) ও (BIFR) বি আই এফ আর

তাছাড়া শিল্পরুগ্নতা নির্দ্দিষ্টকরণের প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার এবং রুগ্নতা দূর করার জন্য ১৯৮৫ সালে **রুগ্ন শিল্প সংস্থা আইন** (SICA) Sick Industrial Companies Act প্রণয়ন করা হয়। কোনও শিল্পসংস্থার, কোনও

নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের ক্ষতির পরিমাণ যদি অতীত ৫ বছরের সর্বাধিক নিট মূল্যের বা Net worth- এর অর্ধাংশ হয় (৫০%) সেই শিল্প সংস্থাকে তখন এই SICA আইন অনুসারে রুগ্ন বলা হবে। এই আইনটির বিভিন্ন বিধান (Provisions) গুলির মধ্যে দুইটি বিধান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল যদি সংস্থাটির ক্ষতির পরিমাণ নিট মূল্যের ৫০ শতাংশ হয় তবে ঐ সংস্থার পরিচালক বোর্ড বার্ষিক হিসাব বন্ধ (Close) হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে বিষয়টি অর্থাৎ সংস্থার অবস্থা শেয়ার গ্রহীতাদের জানাবেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল যদি ক্ষতির পরিমাণ নিট মূল্যের ১০০ শতাংশ বা বেশি হয় এবং ধারাবাহিকভাবে দুই বৎসর একই রূপ আর্থিক অবস্থা দেখায় তবে সংস্থাটি SICA আইন অনুসারে গঠিত বোর্ড ফর ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এন্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন (BIFR)-কে জানানো হবে। তখন ঐ BIFR রুগ্ন সংস্থাটি সম্বন্ধে তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে পরিস্থিত অনুযায়ী একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিকল্প তিনটি ব্যবস্থা হল সংযুক্তিকরণ (Merger) ; পুনর্বাসন (Rehabilitation) এবং বিলুপ্তি (Liquidation) । ১৯৯১ পর্যন্ত BIFR মোট ৪৭২টি রুগ্নসংস্থার সমীক্ষা করে এবং ১৯৯৬ পর্যন্ত ২৬৯২টি রুগ্ন সংস্থার আবেদন পায়।

৮৫.৬ ঋণ আদায়করণের ট্রাইবুন্যাল

শিল্পোন্নয়ন ; শিল্প সংস্কার ও রুগ্ন শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য এবংদেশের শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সে সকল সংস্থা ও সংগঠনগুলি স্বাধীনতার পর থেকে গঠন করা হয়েছে সেই সংস্থাগুলি এ যাবৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসাবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দিয়েছে। একইভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর জাতীয় কৃত ব্যাঙ্কগুলিও শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে বিপুল ঋণদান করেছে। বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সমান ভাবে ঋণের সুযোগ পেয়েছে। সংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃহৎ ও মাঝারি আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় কম হলেও ঋণের টাকার অংকের পরিমাণগত দিক থেকে বৃহৎ ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি।

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগান দেওয়া হয়েছে এ যাবৎ ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেই অর্থের অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ ফেরত পেয়েছে। ফলে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা অনাদায়ী হিসাবে পড়ে থাকার ফলে জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন অর্থ যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক বুনিয়াদ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ১৯৮৯-৯০ সালে ৮টি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ককে এই কারণে রুগ্নসংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

৮৫.৬.১ ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যালের গঠন

ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন ঋণদানকারী আর্থিক সংস্থাগুরি অনাদায়ী ঋণ আদায়করণের বিষয় বিচার বিবেচনা করার জন্য ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যাল Debt Recovery Tribunal গঠন করা হয়। প্রথাগত নিয়মানুসারে কোনও উচ্চ আদালতের (High Court) অবসরপ্রাপ্ত বিচারক-এর সভাপতিত্বে তিন থেকে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে এই ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়। কোনও উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এবং অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস-দের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে সাধারণত এই ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যাল Debt Recovery Tribunal গঠন করা হয়।

ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যালে ঋণ ও আদায়সংক্রান্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু

আক্ষেপের বিষয় হল—আইনের জটিলতা ও সরকারী কাজের স্বাভাবিক ধীরগতি ও লালফিতার বাধনের মধ্যে ঋণ আদায়কারী ট্রাইবুন্যালের Debt Recoveryt Tribunal- এর তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বকেয়া ঋণ অনাদায়ী হিসাবে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে গত ১২ই জানুয়ারি ২০০০ তারিখে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনের ৫নং হলে অনুষ্ঠিত সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক পরিচালকদের ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর এক সভার আলোচনার একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।—"এ যাবৎ দশটি Debt Recovery Tribunal এবং একটি এপীলেট ট্রাইবুন্যাল সংগঠিত হয়েছে। সভায় DRT-কে শক্তিশালী করে প্রস্তাব করা হয়। আরও প্রস্তাব করা হয় যে ৫টি আরও DRT (Debt Recovery Tribunal) এবং ৪টি Debt Recovery Appelate Tribunal (DRAT) গঠন করা হবে। DRT-এর কার্যপ্রণালী সন্তুষ্টজনক নয় বলেও অভিমত প্রকার করা হয়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১৭,৯২২.৯৫ কোটি টাকার দাবী সম্বলিত ২১.৭৮১-টি মামলা স্থানান্তর করা হয় বা DRT-তে পাঠানো হয়। উচ্চ অঙ্কের মূল্যের (১ কোটি বা তার অধিক) মূল্যের দায়ের করা মামলার টাকার পরিমাণ প্রায় ১৫,৯৯৩ কোটি টাকার ৩১.৩.৯৯ পর্যন্ত। কিন্তু দায়ের করা মামলার সংখ্যা হল ৩৪০১টি। এ পর্যন্ত DRT অর্থাৎ ঋণ আদায়কারী টাইবুন্যাল Debt Recovery Tribunal ১৭৯৯.৬৬ কোটি টাকার দাবী সম্বলিত ৩৭৭৪ টি মামলার নিষ্পত্তি করেছে। কিন্তু এর মধ্যে মার ৪২৪.৯৭ কোটি টাকা আদায়করণ হয়েছে। এই টাকার পরিমাণ হল মীমাংসা-কৃত মামলার ২৪% শতাংশ এবং DRT-র নিকট প্রেরিত মামলায় যুক্ত মোট দাবীকৃত টাকার ২% শতাংশ মাত্র। সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট যে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনও অগ্রগতির লক্ষণ নেই। তাছাড়া আইনের দুর্বলতা বা শৈথিল্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

"10 DRT & one Appellate Tribunal has already been set up. Steps are being taken to strengthen the DRTs and there is a proposal to set up 5 more DRts & 4 DRTAs. Progress made by DRTs is not satisfactory. 21,781 cases involving an amount of Rs 17,922.95 crore of Public Sector Banks transferred or filed with the DRTs upto 31.3.99. High value (Rs 1 crore & above) suit filed cases account for Rs 15,993.73 crores as on 31.3.99, although such no of accounts are smaller at 3401. So far only 3774 cases (17% of total cases) involving an amount of Rs 1799.66 crores (10% of the total amount involved) have been decided by DRTs. However, the actual amount recovered was Rs 424.97 crores which is 24% of the total amount of the decided cases and 25 of the total amount referred to DRTs. This indicates the even ro decreed cases the process of realising the lolbaterals is very slow due mainly to legal weaknesses."

(Extracted from the Minutes of Finance Ministers Meeting with the Chief Executives of Public Sector Banks at Conference Hall No-5 Vigyan Bhawan on 12-1-2000.)

৮৫.৭ একত্রিকরণ ও অধিগ্রহণ—ভারতের উদাহরণ

বিভিন্ন চলতি কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হয়ে যখন একটি নূতন কারবারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় বা ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হয়ে যখন একটি নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে তাকে একত্রিকরণ বলা হয়। এ রকম কারবারী জোট গঠনের ফলে জোট গঠনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

একত্রীকরণ এবং পূর্ণ সংহতি সমার্থক

ভারতবর্ষে পূর্ণ সংহতির বা একত্রিকরণের খুব বেশি উদাহারণ নেই। ১৯২০ সালে ৬টি কোম্পানীর একত্রীভবন হয়ে কানপুরের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া করপোরেশন গঠিত হয়। মাদ্রাজের বাকিংহাম এন্ড কর্নাটক মিলস ; এসোসিয়েটেড সিমেন্স কোম্পানী ; আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানী। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের ৪টি ব্যাঙ্ক একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক চারটি হল হুগলি ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশন এবং কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।

একত্রিকরণের ও অন্তর্ভুক্তি ভারতে তেমন প্রসার লাভ করেনি। যে সামান্য পরিমাণ একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তির উদাহরণ পাওয়া যায় তা অধিকাংশই সরকারী প্রচেষ্টায় এবং পূর্বতন ম্যানেজিং এজেন্টদের চেষ্টার ফলে হয়েছে। কার্পাস শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, দেশলাই প্রভৃতি শিল্প ক্ষেত্রে একত্রীকরণ ও অন্তর্ভুক্তির কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়।

ভারতে কারবারী জোট তেমন প্রসার লাভ করেনি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকায় অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে কারবারী জোটের ব্যাপক প্রসার এবং সাফল্য লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক বিকাশের অভাব এবং উন্নয়নের ধীরগতি, কারবারী জগতের প্রতিনিয়ত উত্থান ও পতন পাশাপাশি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ভারতে কারবারী ও শিল্পক্ষেত্রে আশানুরূপ বিকাশ ঘটাতে পারেনি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে মোটামুটিভাবে ভারতে কারবারী জোটবন্ধনের সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে কারবারী জোটবন্ধনের অভাবের কারণগুলি হলঃ

(১) **প্রতিযোগীতার অভাব ঃ** বিদেশী শাসনকালে ভারতে কারবারী ক্ষেত্রে তেমন তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি বললেই চলে।

(২) **শিল্পের অনুন্নতি ঃ** বিদেশী শাসক গোষ্ঠী ভারতের বিকাশের ভারসাম্যতার দিকে নজর দেয়নি তাই শিল্প কাঠামোই অনুন্নত ছিল। ফলে কারবারী জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

(৩) **ম্যানেজিং প্রথার গঠন ও প্রাধান্য ঃ** ভারতের কারবারী ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা একচ্ছত্র আধিপত্য করে গেছে। তারাই কারবার গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। কারবারী জোট গঠনের ক্ষেত্রে তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না।

(৪) **ভারতীয় কারবারীদের সংকীর্ণ অঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ** ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর এবং প্রধান প্রধান কারবারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট। তাছাড়া তারা ব্যক্তিগত দিকটাকেই বড় করে দেখত বলে কারবারী ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত প্রসার নিয়ে তত চিন্তা করত না, ফলে কারবারী জোটের প্রসার ঘটেনি।

(৫) **কারবারের ক্ষুদ্র আয়তন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান ঃ** প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ভারতের অধিকাংশ কারবারী প্রতিষ্ঠানই আয়তনে ক্ষুদ্র এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। ফলে কারবারী জোট গঠনের প্রাসঙ্গিকতাই ঘটেনি।

(৬) **কারবারীদের উদ্যোগের অভাব ঃ** ভারতে কারবারীদের মধ্যে জোট গঠনের উদ্যোগের একান্ত অভাব লক্ষনীয়।

৮৫.৭.১ বিভিন্ন ধরনের একত্রিকরণের পদ্ধতিগুলি—ভারতের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা

বিগত তিন-চার দশক ধরে ভারতে কারবারী জোটের প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পর কারবারী ক্ষেত্রে সরকারের প্রবেশের ফলে কারবারীদের মধ্যে জোটবন্ধনের আগ্রহ বেশি মাত্রায় আরম্ভ হয়। আত্মরক্ষার কারণে ; তীব্র প্রতিযোগীতার উদ্ভবের ফলে এবং সরকারের বিভিন্ন শিল্পনীতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতির ফলে কারবারীরা

জোটবন্ধনে আগ্রহী হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে কারবারী জোটের গতি ও বৃদ্ধি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ—

(১) সাধারণ সমিতি ও বণিক সভা (Simple Association) —বিগত বৎসরগুলিতে কারবারীরা নিজেদের মধ্যে সাধারণ চুক্তির মাধ্যমে এই ধরনের জোটের প্রসার ঘটিয়েছে। ইণ্ডিয়ান ট্রেডার্স এসোসিয়েশন ; ইন্ডিয়ান জুটমিলস্ এসোসিয়েশন ; ইন্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েশন, পাবলিশার্স গিল্ড ; ফেডারেশন অফ্ চেম্বার অফ্ কমার্স ; বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স, বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা সমিতি ইত্যাদি এই ধরনের সাধারণ সমিতি ও বণিক সভার উদাহরণ।

(২) পুল ও কার্টেল—পাট, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে ভারতে এ ধরনের জোটগঠন দেখা যায়। ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ এসোসিয়েশন, এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানী Acc; ইন্ডিয়ান সুগার মিলস অ্যাসোসিয়েশন ; ইন্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন। তাছাড়া ওয়েষ্টার্ন ইন্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী (WIMCO) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) ট্রাস্ট— ভারতে টাটা, বিড়লা, সিংহানিয়া, করমচাঁদ থাপা, ডালমিয়া প্রভৃতি বড় শিল্পপতিরা বহু ট্রাস্ট গঠন করেছে। যেমন ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া ; ইনভেষ্টা ইন্ড্রাষ্ট্রিয়াল করপোরেশন ইত্যাদি।

(৪) সমস্বার্থ গোষ্ঠী এবং হোল্ডিং কোম্পানী— ভারতের অধুনালুপ্ত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা সমস্বার্থ গোষ্ঠীর প্রকৃত উদাহরণ। ভারতে ১৭টি ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠান ৪৬১ টি সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করত এবং ভারতে সমস্বার্থ গোষ্ঠী জোটের বৃহত্তম উদাহরণ। ভারতের কয়লা, স্টিল, তামাক, পাট প্রভৃতি শিল্পে হোল্ডিং কোম্পানীর জোট দেখা যায়— স্টিল অথরিটি অফ্ ইন্ডিয়া (SAIL), কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIL): শা ওয়ালেশ কোম্পানী, ইকুইটেবল কেবল কোম্পানী ইত্যাদি হোল্ডিং কোম্পানী উল্লেখযোগ্য উদাহরণ.

(৫) একত্রিকরণ ও অন্তর্ভুক্তি— ভারতীয় কারবারী ক্ষেত্রে এই প্রকৃতির জোট সীমিত। একত্রিকরণের দৃষ্টান্ত থাকলেও অন্তভুক্তি সংখ্যা নগণ্য। সরকার ও ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রচেষ্টা একত্রীকরণ কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে। যেমন দেশলাই, কার্পাস, লৌহ ইস্পাত, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে একত্রীকরণ দেখা যায়।

(৬) যৌথ উদ্যোগ— বহু দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান মিলে এধরনের কারবারী জোট গঠনের উদ্যোগ ভারতে বর্তমানে লক্ষ্য করা যায়। প্রিমিয়ার অটোমবাইলস ; অশোক লেল্যান্ড ; টাটা মার্সিডিজ বেনজ্ ; হিন্দুস্থান মোটর্স প্রভৃতি। তাছাড়া ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ ; দুর্গাপুর, রাউলকেল্লা ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত প্রকল্প, ন্যাশানাল রেয়ন কর্পোরেশন ইত্যাদি যৌথ উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। টাটা ও ভলকার্ট ব্রাদার্সের যৌথ উদ্যোগে ভলটাস লিঃ-এর গঠন ; হিন্দুস্থান পিল কিংটন গ্লাস কোম্পানী, সেন-র‍্যালে, ব্যাবকক্ ভিকম প্রভৃতির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮৫.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। শিল্প রুগ্নতা বলতে কি বোঝায় ?

২। রুগ্নতা ও দুর্বলতা কি এক ?

৩। শিল্প রুগ্নতা কত প্রকার ?

৪। রুগ্নতা কি কি কারণে সৃষ্টি হয়?

৫। শিল্প পুর্নজীবন বলতে কি বোঝায়?

৬। শিল্প পুনর্গঠন করার ক্ষেত্রে গঠিত কয়েকটি সংস্থার নাম কর।

৭। শিল্প-রুগ্নতার আভ্যন্তরীণ কারণ (অন্তত তিনটি) বলুন।

৮। শিল্প-রুগ্নতার তিনটি বাহ্যিক কারণ উল্লেখ করুন।

৯। SICA 'সিকা' কি?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

১। শিল্প রুগ্নতার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। শিল্প-রুগ্নতার ফলে অর্থনীতি কিভাবে প্রভাবিত হয় বলুন।

২। শিল্প-রুগ্নতা কিভাবে প্রতিবিধান করে এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতিটি ব্যাখ্যা করুন।

৩। একত্রীকরণ কাকে বলে? ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের একত্রীকরণের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৮৫.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Biswas B. K.- Karbar Sangathan O Babasthapana-Oriental Book Company Private Ltd-Calcutta 1989.

2. Karbar Sangathan O Babasthapana Niti- Mukerjee Sushil-Chhaya Prakashani- Calcutta-1991.

3. Roy Swapan Kumar-Economic Principles & Economic Problems of India-Lakshmi Prakasani, Calcutta-1991.

4. Basak & Chakrabarti-Bharater Artha Niti Parichay-Vidyodaya-Calcutta-1986.

একক ৮৬ ❑ রাশিতত্ত্বের উপস্থাপন ও সংক্ষিপ্তকরণ

গঠন

৮৬.০ উদ্দেশ্য

৮৬.১ প্রস্তাবনা

৮৬.২ পরিসংখ্যান শব্দের অর্থ

৮৬.৩ রাশিতথ্য ও উহার প্রকার ভেদ

৮৬.৩.১ প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক রাশিতথ্য সংগ্রহের উৎস

৮৬.৪ রাশিতথ্যের উপস্থাপন

৮৬.৫ পরিসংখ্যান বিভাজন

৮৬.৫.১ পরিংখ্যা বিভাজন গঠনে কিছু প্রাথমিক নির্দেশ

৮৬.৬ শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনে ব্যবহৃত কিছু সংজ্ঞা

৮৬.৬.১ শ্রেণী পরিসংখ্যা বিভাজন গঠন

৮৬.৭ বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন উপস্থাপন

৮৬.৭.১ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন

৮৬.৮ প্রতিলিপির সাহায্যে উপস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা

৮৬.৯ বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র

৮৬.১০ অনুশীলনী

৮৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৮৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- পরিসংখ্যান কাকে বলে
- রাশিতথ্যের উপস্থাপন ও তার প্রকারভেদ
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিঙাজন উপস্থাপনা ও
- বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্রের প্রকার

৮৬.১ প্রস্তাবনা

ইংরেজী Statistics শব্দটি খুব সম্ভবত ল্যাটিন শব্দ ‘Status’ অথবা ইতালীয় শব্দ ‘Statista’ অথবা জার্মান শব্দ ‘Statistek’ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যা রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের জনগণের শাসনকার্যের বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আহরিত তথ্যের সংকলনকে বোঝাত। বর্তমানকালে, statistics বা পরিসংখ্যান কৃষিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৮৬.২ পরিসংখ্যান শব্দের অর্থ ঃ

পরিসংখ্যান শব্দটির দু'টি ভিন্ন অর্থ আছে। বহুবাচনিক অর্থে (Plural sense), পরিসংখ্যান বলতে বিশেষ পদ্ধতিতে সংকলিত কোনও বিশেষ বিষয়ের রাশিমালা বোঝায়। একবাচনিক অর্থে (Singular sense) পরিসংখ্যান হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও প্রয়োগবিধি সমূহ (Scientific Theories and Methods), যা কোনও বিশেষ বিষয়ের রাশিমালার শ্রেণীবিন্যাস, উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণ নিয়ে গড়ে ওঠা এই বিজ্ঞানকে রাশিবিজ্ঞান বা সংখ্যাতত্ত্ব বলা হয়।

৮৬.৩ রাশিতথ্য ও উহার প্রকারভেদ ঃ

একজন রাশিবিজ্ঞানীর প্রথম কাজ হচ্ছে রাশিতথ্য বা সংখ্যাতথ্য (Data) সংগ্রহ ও একত্রীকরণ করা। সে নিজে অনুসন্ধানক্ষেত্রে গিয়ে তা সংগ্রহ করতে পারে অথবা অন্য কোনও উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। অনুসন্ধানক্ষেত্রে নিজের সংগৃহীত তথ্যকে প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ রাশিতথ্য (Primary Data) বলে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, এই প্রাথমিক তথ্যই পরিসংখ্যানের কাঁচামাল। অনুসন্ধানকার্যে অন্য কোনও উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হলে ঐ তথ্যকে অপ্রাথমিক বা পরোক্ষ রাশিতথ্য (Secondary Data) বলে।

প্রাথমিক রাশিতথ্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সরাসরি অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্যই হল সরাসরি অনুসন্ধানক্ষেত্রে আহরণ করা (Original)। সাধারণত প্রাথমিক রাশিতথ্য কোনও সংস্থা বিশেষরূপে প্রকাশ করে থাকে। দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর আদমসুমারীর (Census) সাহায্যে সংগৃহীত তথ্য প্রাথমিক রাশিতথ্য।

পরোক্ষ রাশিতথ্য প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত উভয় উৎস থেকে পাওয়া যেতে পারে। কোনও সংস্থা প্রাথমিকভাবে নিজ প্রয়োজনে বা কাউকে তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে থাকলে সেই তথ্য অনুসন্ধানকারীর কাছে পরোক্ষ তথ্য হিসাবে আসে। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ পরিবেশিত হয় তা পরোক্ষ তথ্য, যেহেতু, এই তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়।

একই তথ্য যে সংগ্রহ করছে তার কাছে প্রাথমিক তথ্য, আবার অন্য একজন যে ব্যবহার করছে তার কাছে অপ্রাথমিক তথ্য। যেমন আদমসুমারী বিভাগে সংগৃহীত তথ্য প্রাথমিক তথ্য, কিন্তু অন্য কোনও বিভাগ ইহা ব্যবহার করলে তা তার কাছে পরোক্ষ তথ্য।

৮৬.৩.১ প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক রাশিতথ্য সংগ্রহের উৎস

প্রাথমিক রাশিতথ্য ঃ

i) "Annaul Report of the Railway Board", ভারত সরকারের রেলমন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত।

ii) "Indian Coal Statistics" (বার্ষিক), ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রকের মাইনস্-এর প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষক কর্তৃক প্রকাশিত।

iii) "Reserve Bank of Indian Bulletin" (মাসিক), ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, মুম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত।

iv) "Indian Textile Bulletin" (মাসিক), Textile Commissioner, মুম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত।

v) "Jute Bulletin" (মাসিক), ভারত সরকারের, ভারতীয় কেন্দ্রিয় জুট কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত।

অপ্রাথমিক রাশিতথ্য ঃ

i) "Monthly Abstract of Statistics," কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

ii) "Statistical Abstract of the Indian Union", (বাৎসরিক), কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন, দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাথমিক রাশিতথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি হল ঃ

i) প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অনুসন্ধান

ii) অপ্রত্যক্ষ মৌখিক অনুসন্ধান

iii) ডাকের মাধ্যমে প্রশ্নমালার দ্বারা অনুসন্ধান

iv) অনুসন্ধানকারী মারফত তালিকা দ্বারা অনুসন্ধান

v) দূরভাষ মাধ্যমে অনুসন্ধান

প্রাথমিক রাশিতথ্য উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। ভৌগোলিক এলাকার সীমানা ছোট হলে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু এলাকা বড় হলে তা অসম্ভব হয়ে উঠে এবং তখন প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অপ্রত্যক্ষ মৌখিক অনুসন্ধান করা হয়। খবরের কাগজের তথ্য সাধারণত, এই প্রক্রিয়ায় করা হয়। যদিও এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ও তাড়াতাড়ি রাশিতথ্য সংগ্রহ করা যায়, তবু এই তথ্য ব্যক্তিগত পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নমালার দ্বারা তথ্যানুসন্ধান সাধারণত দু'ধরনের হয় — ডাকের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পাঠালে উত্তরকারীরাই তা পূরণ করে ও অনুসন্ধানকারী মারফত উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর জেনে তা পূরণ করা। যে সব উৎস থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে তাদের একটি তালিকা প্রথমে তৈরি করা হয় এবং তাদেরকে একটি প্রশ্নমালা ডাকযোগে বা নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা পাঠানো হয়। ডাকযোগে পাঠানো হলে উত্তরদাতাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর সহযোগে প্রশ্নমালাটি ডাকযোগে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। প্রশ্নমালা প্রস্তুতিতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় যাতে কোনও অবান্তর বা বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন না থাকে। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরের জন্য জায়গা রাখা হয়। উত্তর পাঠাতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রশ্নমালার সঙ্গে সঙ্গে জবাবী খামও সাধারণত পাঠানো হয়। ডাকব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে সহজেই এক বিশাল ভৌগোলিক এলাকা থেকে এভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

প্রশ্নমালা পাঠানোর সময় লক্ষ রাখতে হয় যে, প্রশ্নগুলি ঠিকমত তৈরি হয়েছে কিনা এবং এদের উত্তরও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কিনা। কি উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে জানানো উচিত। এই সঙ্গে জানিয়ে দিতে হয় যে, উত্তরদাতার নাম-ধাম গোপন রাখা হবেও তার প্রদত উত্তর কোন সময় তাকে অসুবিধায় ফেলবে না। প্রয়োজনে উত্তর ফেরত পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আবার চিঠি দিয়ে উত্তর পাঠানোর অনুরোধ করতে হয়।

প্রশ্নমালা তৈরি করার কিছু বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন প্রশ্নমালায় থাকা উচিত নয়। কীভাবে উত্তর দিতে হবে সে ব্যাপারে উত্তরদাতাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে। প্রশ্নের সংখ্যা খুব বেশি হলে উত্তরদাতা ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করতে পারে। প্রশ্নগুলি অবশ্যই সরাসরি, সহজ, ছোট ও যথাসম্ভব বস্তুনির্ভর হওয়া উচিত। এগুলি যথাসম্ভব 'হ্যাঁ' বা 'না' ধরনের উত্তরের উপযোগী হলে ভালো হয়। প্রশ্নগুলি যুক্তি সঙ্গতভাবে পরপর সাজানো উচিত এবং প্রশ্নের উত্তর যাতে অন্য প্রশ্নগুলরি উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা দেখতে হবে। এসব সতর্কতা সত্ত্বেও প্রশ্নমালা পাঠানোর পদ্ধতি অনেক সময় ফলপ্রসূ হয় না। কারণ এক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় এবং উত্তরকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে

সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না বা আদৌ উত্তর পাওয়া যায় না। এই পদ্ধতির এটাই বড় ত্রুটি।

প্রশ্নমালা ডাকে পাঠানো ছাড়া অন্য একটি উপায় হল, নিজস্ব প্রতিনিধি প্রশ্নমালা নিয়ে গিয়ে উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর জেনে নিয়ে তা পূরণ করবে। এতে উত্তর না পাওয়ার সম্ভাবনা কমে। যারা অনিচ্ছুক উত্তরদাতা তাদেরকে বুঝিয়ে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা যায়, আবার যারা উত্তর দেওয়ার মতো উপযুক্ত শিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকেও উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতিতে খরচ অনেক বেশি হয়।

খুব তাড়াতাড়ি উত্তর পাওয়ার জন্য দূরভাষের (telephone) মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পদ্ধতিকে দূরভাষ মাধ্যমে অনুসন্ধান বলে। এই পদ্ধতিতে খুব পরিচিত ব্যক্তি এবং যেখানে দূরভাষের ব্যবস্থা আছে কেবলমাত্র সেখানে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল, কোন কোনও সময় উত্তরদাতা অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়।

৮৬.৪ রাশিতথ্যের উপস্থাপনা

সাধারণত রাশিতথ্য নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয় ঃ

i) **বিবরণের মাধ্যমে** (Textual Presentation),

ii) **ছকের মাধ্যমে** (Tabular Presentation),

iii) **প্রতিলিপি বা চিত্রের মাধ্যমে** (Diagrammatic Presentation).

i) **বিবরণের মাধ্যমে**—এই পদ্ধতিতে রাশিতথ্যকে একটি বিবরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বিবরণমূলক উপস্থাপনায় অনুসন্ধানকারীর পক্ষে দীর্ঘ বিবরণের মাঝখান থেকে রাশিতথ্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে দৃষ্টিগোচর আনা খুব কষ্টকর হয়।

ii) **ছকের মাধ্যমে**—এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত রাশিতথ্যকে একটি সুবিন্যস্ত ছকের (Table) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। রাশিতথ্যের এরকম সুনিব্যস্ত একটি ছকে শ্রেণী বিন্যস্ত রাশিতথ্যকে উপর থেকে নীচে এবং বামদিক থেকে ডানদিকে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে সন্নিবেশ করা হয়।

একটি ছকের বিভিন্ন অংশগুলি হল ঃ

a) **ছক বা সারণি নং** (Table Number) ঃ সহজে সনাক্ত করার জন্য ছক বা সারণির একটি নম্বর দেওয়া হয়, বিশেষ করে যখন একাধিক ছক একসঙ্গে প্রস্তুত করা হয়।

b) **শিরোনাম** (Title) ঃ ছকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে উহার উপরে লিখিত অংশটিকে শিরোনাম বলা হয়।

c) **ছক বা সারণির বামপার্শ্বের বিবরণ লিপি** (Stub or Row Headings) ঃ এটি ছকের বামদিক থেকে ডানদিকে সারিকৃত রাশিমালার বিবরণ লিপি।

d) **ছকের উপরিভাগের বিবরণ লিপি** (Caption or Column Headings) ঃ এটি ছকের উপর থেকে নীচে সারিকৃত রাশিমালার বিবরণ লিপি।

e) **মূল অংশ** (Body or Data) ঃএই অংশে রাশিতথ্য প্রকাশ করা হয়।

f) **পাদটীকা** (Foot note) ঃ ইহা ছকের নীচে থাকে। এই অংশে তথ্যের উৎস বর্ণনা এবং ছকে ব্যবহৃত কোনও পদের ব্যাখ্যা (explanation) করা হয়।

নিম্নে একটি ছকের বিভিন্ন অংশ দেখান হল। ঃ

সারণি নং—

শিরোনাম

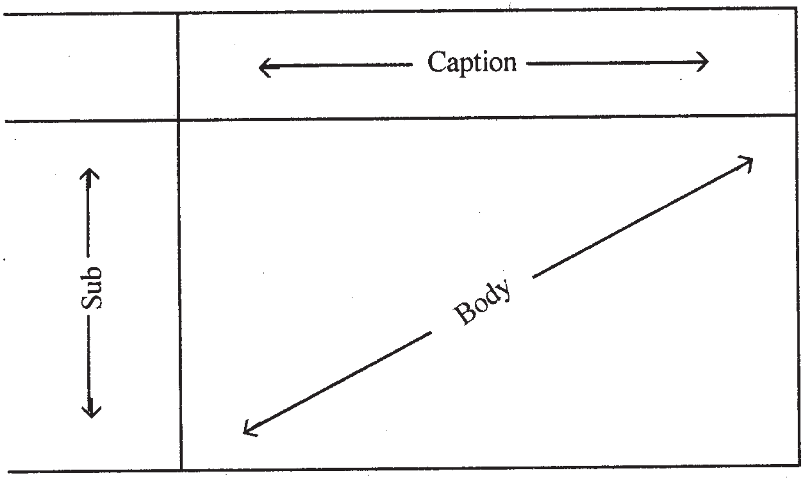

উৎস ঃ

পাদটীকা ঃ

ছক তৈরি করার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। তবে ছক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাদে রাশিতথ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ খুব স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য হয়। যদি ছক জটিল হয় তবে তা ভেঙে সহজে বোধগম্য এরূপ কয়েকটি পৃথক সরল ছকে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

উদাহরণ ১. পাঁচটি কারখানার দু'টি ভিন্ন তারিখে স্ত্রী-পুরুষের আঠার বছরের কম এবং আঠার বছরের বা তার বেশি দু'টি বিভাগে গড় আয়ের শূন্য ছক প্রস্তুত কর।

সমাধান ঃ

সারণি নং ৮৬.১

পাঁচটি কারখানায় গড় আয়

কারখানা	তারিখ—				তারিখ—			
	18-বছর নিচে		18-বছর বা তার উপর		18-বছরের নিচে		18-বছর বা তার উপর	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
1								
2								
3								
4								
5								
মোট								

iii) প্রতিলিপি বা চিত্রের মাধ্যমে— এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যকে লেখ, চার্ট, ছবি ইত্যাদির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়। পরের একটি অনুচ্ছেদে এর বিষয় আলোচনা করা হবে।

৮৬.৫ পরিসংখ্যান বিভাজন ঃ

কোনও বিশেষ অনুসন্ধান ক্ষেত্রে যাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাদের সমষ্টিকে সমগ্রক (Population বা Universe) বলে। সমগ্রকের যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাকে পরিমেয় বৈশিষ্ট্য বা চালক (Variable) বলে। যেমন— বিক্রয়, রপ্তানী, উৎপাদন, আয়, উচ্চতা, ওজন, বয়স ইত্যাদি চলক। কোনও একটি চালকের সংগৃহীত মানগুলি যদি বিস্তৃত বা বিশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে রাশিবিজ্ঞানবিদদের পক্ষে ঐ মানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে তার অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হতে পারে। অন্তর্নির্হিত অর্থ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের জন্য চালকের মানগুলিকে সারিকরণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা জরুরি। পরিসংখ্যানে বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত চলকের মানগুলিকে সারিকরণ বা বিভাগীকরণকে পরিসংখ্যান বিভাজন (Frequency distribution) বলে। কোনও একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে চলকের যতগুলি মান পড়বে সেই সংখ্যাকে উক্ত শ্রেণীর **পরিসংখ্যান** (Frequency) বলে এবং যে ছকের মাধ্যমে চলকের সারিকৃত মান ও তার পরিসংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাকে পরিসংখ্যা ছক বা সারণি (Frequency Tabel) বলে।

পরিসংখ্যা বিভাজন দুই প্রকারের হয়— (i) সরল পরিসংখ্যা বিভাজন (Simple Frequency Distribution) এবং (ii) শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন (Grouped Frequency Distribution)।

i) **সরল পরিসংখ্যা বিভাজন** — এই বিভাজনে চলকের বিভিন্ন মান ও তাদের পরিসংখ্যা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হয়। নিচে 30 জন ছাত্রের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হল তা থেকে গঠিত সকল পরিসংখ্যা বিভাজন দেখানো হল ঃ

30 জনের প্রাপ্ত নম্বর ঃ 20, 25, 41, 27, 20, 27, 20, 46, 32, 27, 25, 46, 32, 41, 32, 27, 27, 25, 32, 41, 32, 25, 41, 27, 32, 27, 32, 41, 25, 27.

সারণি নং ৮৬.২

30 জন ছাত্রের নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন

নম্বর	টালিমার্ক	পরসংখ্যা
20	///	3
25	~~////~~	5
27	~~////~~ ///	8
32	~~////~~ //	7
41	~~////~~	5
46	//	3
মোট	—	30

নম্বর 20- পরিসংখ্যা 3 বলতে বোঝায় 20 নম্বর পেয়েছে এরকম ছাত্রের সংখ্যা 3। উপরের টালিমার্ক হ'ল হেলানো দাগ (/) যার চারটির পরে পঞ্চমটি আড়াআড়িভাবে দেওয়া হয়। এরকম পাঁচটি টালিমার্কের একটি গুচ্ছের পরে একটু বেশি ফাঁক দেওয়া হয়। টালিমার্ক সবসময় মান বা মানের শ্রেণীর একই লাইনে বসাতে হবে। পরিসংখ্যার গণনার পক্ষে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।

ii) **শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন**—চলকের মান অল্পসংখ্যক হলে সরল পরিসংখ্যা বিভাজন যথোপযুক্ত। যে ক্ষেত্রে চলকের প্রচুর মান রয়েছে, সেক্ষেত্রে এইভাবে বিভাজন প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যা ছককে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য সংগৃহীত রাশিতথ্য মালাকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য চলকের মানের প্রসার (range)-কে কতকগুলি সসীম উপপ্রসার (sub-range)-এ ভাগ করে সেই অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ফলে, শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন প্রক্রিয়ায় চলকের মানগুলি কতকগুলি সসীম উপপ্রসারে শ্রেণীবদ্ধ করে শ্রেণীগুলির পরিসংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে চলকের কোন একটি বিশেষ মানের পরিসংখ্যা জানা যায় না।

নিচে 100 জন ছাত্রের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হল এবং তা থেকে গঠিত শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন দেখানো হল ঃ

100 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর ঃ

3	23	24	8	16	23	16	20	24	20
15	8	21	29	50	24	33	42	30	20
24	35	8	26	38	30	26	38	24	26
24	26	24	15	10	10	16	26	45	45
30	29	33	24	26	24	13	24	26	24
26	45	21	21	21	23	44	13	35	23
23	30	21	23	46	42	24	16	13	15
20	26	33	29	42	24	20	29	20	15
15	21	21	21	26	37	27	44	29	23
16	15	31	24	31	26	24	23	31	20

সারিণ নং ৮৬.৩

100 জন ছাত্রের নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন

নম্বর	টালিমার্ক	পরসংখ্যা
1-5	/	1
6-10	𝍸	5
11-15	𝍸 ////	9
16-20	𝍸 𝍸 //	12
21-25	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 /	31
26-30	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20
31-35	𝍸 ///	8
36-40	///	3
41-45	𝍸 ///	8
46-50	///	3
মোট	—	100

৮৬.৫.১ পরিসংখ্যা বিভাজন গঠনে কিছু প্রাথমিক নির্দেশ ঃ

i) শ্রেণীসংখ্যা খুব কম বা খুব বেশি হবে না। বেশি হলে গণনা কার্য দীর্ঘ ও জটিল হয়, আবার খুব কম হলে বৈশিষ্টের সঠিকতা (accuracy) হারাবে। সাধারণত শ্রেণীসংখ্যা 5 থেকে 20 এর মধ্যে হয়।

ii) শ্রেণীদৈর্ঘ্য যথাসম্ভব সমান হওয়া উচিত। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। আয়ের পরিসংখ্যা বিভাজনে আয়ের প্রসার খুব বেশি হয়, যথা 100 টাকা থেকে 5000 টাকা। এক্ষেত্রে সমান শ্রেণীদৈর্ঘ্য সম্ভব নয়।

iii) বিভাজনে চলকের সকল মানকে গণ্য করতে হবে। কোনও মান বাদ দেওয়া চলবে না।

iv) শ্রেণীগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী হবে অর্থাৎ একটি মান কেবলমাত্র একটি শ্রেণীতেই থাকবে।

c) মুক্ত প্রাপ্ত (open end) শ্রেণী যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত।

৮৬.৬ শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনে ব্যবহৃত কিছু সংজ্ঞা ঃ

i) **অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন চালক** (Continuous and Discrete variables) ঃ কোনও চালকের সংগৃহীত বিভিন্ন মানগুলি যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে ঐ সীমাকে চলকের প্রসার (Range) বলে। যেমন কোনও শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতার বিভিন্ন মানগুলি যদি 120 সেমি থেকে 180 সেমি-এর মধ্যে থাকে, তবে ছাত্রদের উচ্চতার প্রসার হবে (180-120) সেমি বা 60 সেমি। যদি একটি চলক এরূপ হয় যে, একটি নির্দিষ্ট প্রসারের অন্তর্বর্তী যে কোন মান উহা গ্রহণ করতে পারে, তবে চালকটিকে অবিচ্ছিন্ন চালক (continuous variable) বলে। আলোচ্য উদাহরণে কোন একজন ছাত্রের উচ্চতা 129 সেমি বা 129.8 সেমি বা 129.86 সেমি বা 120 সেমি থেকে 180 সেমি-এর মধ্যে যে কোনও সংখ্যা হতে পারে। অর্থাৎ, অবিচ্ছিন্ন চলকের অসংখ্য মান থাকা সম্ভব। আয়, উচ্চতা, ওজন, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। কিন্তু চলকের অসংখ্য মান থাকা সম্ভব। আয়, উচ্চতা, ওজন, আয়তন, ঘনত্ব প্রভৃতি অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। কিন্তু কোনও চলক যদি এমন হয় যে, ইহা কেবল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন (isolated) মান গ্রহণ করতে পারে, তবে উহাকে বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable) বলে। কোনও দ্রব্যের উৎপাদন সংখ্যা, কোনও সভায় লোকের সংখ্যা, বিভিন্ন পরিবারে শিশু সংখ্যা, ফুটবল খেলায় গোলসংখ্যা, ক্রিকেট খেলায় রানসংখ্যা ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। ফুটবল খেলায় গোলসংখ্যা কখনও ভগ্নাংশ হতে পারে না— ইহা সবসময়ই অখণ্ড পূর্ণ সংখ্যা হবে। অন্যভাবে বলা যায়, মাপনীয় দ্বারা নির্ণীত চলকের মান অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু গণনার দ্বারা নির্ণীত চলকের মান বিচ্ছিন্ন।

ii) **শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী প্রসার** (Classi interval) ঃ যদি চলক অবিচ্ছিন্ন হয় অথবা বিচ্ছিন্ন চলক অধিক সংখ্যক মান গ্রহণ করে, তবে চলকের মানের প্রসারকে কয়েকটি সসীম উপপ্রসারে বিভক্ত করে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করা হয়। এইক্ষেত্রে চলকের উপপ্রসারকে শ্রেণী বিভাগ বা শ্রেণী প্রসার বলে। সারণি নং ৩-এর প্রথম স্তম্ভে উহার দেখানো হয়েছে। এইভাবে 1-5, 6-10, 11-15 ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণী প্রসার।

যদি কোনও শ্রেণীর এক প্রান্তের মান অনুক্ত থাকে, তবে ইহাকে মুক্তপ্রান্ত শ্রেণী (open end class) বলে। কোনও পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি বা দুটি মুক্ত প্রান্ত শ্রেণী থাকতে পারে। মুক্ত প্রান্ত শ্রেণী তখনই গঠন করা হয়, যখন প্রান্তীয় মান অন্যান্য মান থেকে অনেক দূরে থাকে, অন্যথায় কিছু শ্রেণীর পরিসংখ্যা হয়তো শূন্য লিখতে হবে।

iii) **শ্রেণী পরিসংখ্যা ও মোট পরিসংখ্যা** (Class frequency and Total frequency) ঃ চলকের যতগুলি মান একটি শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই সংখ্যাকেই উহার শ্রেণী পরিসংখ্যা বলে। সারণি নং 3-এ 16-20 শ্রেণী বিভাগের পরিসংখ্যা 12 এবং 16-20 শ্রেণী প্রসারের সমষ্টিকে মোট পরিসংখ্যা ইত্যাদি। সমস্ত শ্রেণী বিভাগের পরিসংখ্যার সমষ্টিকে মোট পরিসংখ্যা বলে। সারণি নং-3-এর মোট পরিসংখ্যা 100।

iv) **শ্রেণী সীমা** (Class Limit) **এবং শ্রেণী সীমানা** (Class Boundary) ঃ কোনও শ্রেণী প্রসারের দুটি প্রান্তকে ঐ শ্রেণীর শ্রেণী সীমা (Class Limit) এবং বড়টিকে উর্ধ্ব শ্রেণী সীমা (Upper Class Limit) বলে। সারণি নং-৩-এ 21-25 শ্রেণী প্রসারের নিম্নশ্রেণী সীমা 21 এবং উর্ধ্বশ্রেণী সীমা 25।

অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে, রাশিগুলিকে কোনও একটি এককের আসন্ন মান লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন, কিছু লোকের ওজনের বিভাজনের কথা ধরা যাক। যদি ওজন পাউন্ডের কাছাকাছি পরিমাপ করা হয়, তবে 99.5 lb থেকে 109.5lb-এর মধ্যে সমস্ত রাশিতথ্য 100-109 শ্রেণীপ্রসারের অন্তর্গত হবে। 100-109 শ্রেণঈ প্রসারের জন্য 99.5-কে নিম্নশ্রেণী সীমানা (Lower Class Boundary) এবং 109.5-কে উর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা (Upper Class Boundary) বলে। অনুরূপভাবে, 100-109 শ্রেণীপ্রসারের জন্য নিম্নশ্রেণী সীমানা ও উর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা যথাক্রমে 109.5 এবং 119.5 । এক্ষেত্রে 99.5 থেকে 100.5 পর্যন্ত যে কোনও মানের আসন্ন মান 100। আবার 99.45 থেকে 99.55 পর্যন্ত যে কোনও মানের এক দশমিক পর্যন্ত আসন্ন মান 99.51 লক্ষণীয় যে, কোনও শ্রেণীর উর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা পরবর্তী শ্রেণী নিম্নশেণী সীমানার সমান হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণী সীমানা নির্ণয় করা হয় ঃ

$$\text{নিম্ন শ্রেণী সীমানা} = \text{নিম্নশ্রেণী সীমা} - \frac{d}{2}$$

$$\text{এবং উর্ধ্বশ্রেণী সীমানা} = \text{উর্ধ্বশ্রেণী সীমা} + \frac{d}{2}$$

যেখানে d হল কোনও শ্রেণীর উর্ধ্বসীমা ও পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমার মধ্যে পার্থক্য।

v) **মধ্যবিন্দু** (Mid point or Mid value or Class Mark) ঃ কোনও শ্রেণীবিভাগের ঠিক মধ্যমানকে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বলে। ইহা দুটি শ্রেণীসীমা বা শ্রেণী সীমানার গড়, অর্থাৎ

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{1}{2}(\text{নিম্নশ্রেী সীমা} + \text{উর্ধ্বশ্রেণী সীমা})$$

$$= \frac{1}{2}(\text{নিম্নশ্রেণী সীমানা} + \text{উর্ধ্বশ্রেণী সীমানা})$$

সারণি নং -3-এ 26-30 শ্রেণীর মধ্যবিন্দু হল $\frac{1}{2}(26+30)$ বা 28।

vi) **শ্রেণী দৈর্ঘ্য** (Size or Width of Class Interval) ঃ কোনও শ্রেণী বিভাগের উর্ধ্ব ও নিম্ন সীমানার অন্তর-ফলকে ঐ শ্রেণীর দৈর্ঘ্য বলে। সারণি নং 3-এ 31-35 শ্রেণীর দৈর্ঘ্য 35.5-30.5=5 লক্ষণীয়। এই সারণিতে সমস্ত শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য 5।

vii) **পরিসংখ্যা ঘনত্ব** (Frequency density) ঃ কোনও শ্রেণী বিভাগের প্রতি একক শ্রেণী দৈর্ঘ্যের পরিসংখ্যাকে শ্রেণীটির পরিসংখ্যা ঘনত্ব বলে।

$$\text{পরিসংখ্যান ঘনত্ব} = \frac{\text{শ্রেণী পরিসংখ্যা}}{\text{শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য}}$$

3-নং সারণির 21-25 শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব $= \frac{31}{5} = 6.2$

viii) **আনুপাতিক পরিসংখ্যা** (Relative frequency) ঃ শ্রেণী বিভাগের পরিসংখ্যা যদি মোট পরিসংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে ঐ শ্রেণীর আনুপাতিক পরিসংখ্যা বলে।

$$\text{আনুপাতিক পরিসংখ্যা} = \frac{\text{শ্রেণী পরিসংখ্যা}}{\text{মোট পরিসংখ্যা}}$$

3-নং সারণির 41-45 শ্রেণীর আনুপাতিক পরিসংখ্যা হল $\frac{8}{100}$ বা 0.08।

সারণি নং ৮৬.৪

শ্রেণী সীমা, শ্রেণী সীমানা, মধ্যবিন্দু, পরিসংখ্যা ঘনত্ব ও আনুপাতিক পরিসংখ্যা

শ্রেণী প্রসার	শ্রেণী পরিসংখ্যা	শ্রেণী সীমা		শ্রেণী সীমানা		মধ্যবিন্দু	শ্রেণী দৈর্ঘ্য	পরিসংখ্যা ঘনত্ব	আনুপাতিক পরিসংখ্যা
		নিম্ন	ঊর্ধ্ব	নিম্ন	ঊর্ধ্ব				
1-5	1	1	5	0.5	5.5	3	5	0.2	0.01
6-10	5	6	10	5.5	1.5	8	5	1.0	0.05
11-15	9	11	15	10.5	15.5	13	5	1.8	0.09
16-20	12	16	20	15.5	20.5	18	5	2.4	0.12
21-25	31	21	25	20.5	25.5	23	5	6.2	0.31
26-30	20	26	30	25.5	30.5	28	5	4.0	0.20
31-35	8	31	35	30.5	35.5	33	5	1.6	0.008
36-40	3	36	40	35.5	40.5	38	5	0.6	0.03
41-45	8	41	45	40.5	45.5	43	5	1.6	0.08
46-50	3	46	50	45.5	50.5	48	5	0.06	0.03
মোট	100	–	–	–	–	–	–	–	1.00

৮৬.৬.১ শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন গঠন ঃ

শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন গঠনের জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা হয় ঃ

i) প্রথমে মানগুলির প্রসার (অর্থাৎ, সর্বোচ্চ মান — সর্বনিম্ন মান) নির্ণয় করা হয়।

ii) প্রসারকে উপযুক্ত শ্রেণীবিভাগ সংখ্যায় ভাগ করতে হয়। ইহা এমনভাবে করা হয় যাতে শ্রেণী দৈর্ঘ্য বা তার গুণিতক হয় গণনা কার্য সহজ হওয়ার উপযুক্ত।

iii) প্রথম শ্রেণীর নিম্নসীমা শূন্য (0) বা 5 বা তার গুণিতক হওয়া উচিত। যেমন, যদি সর্বনিম্ন মান 27 এবং শ্রেণী বিভাগের দৈর্ঘ্য 10 হয়, তবে প্রথম শ্রেণী 27-37 -এর পরিবর্তে 25-35 হওয়া উচিত।

iv) টালিমার্কের সাহায্যে শ্রেণী পরিসংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

v) প্রথম স্তম্ভ শ্রেণী প্রসার ও দ্বিতীয় স্তম্ভে তার পরিসংখ্যা রেখে সারণি বা ছক তৈরি করতে হয়। এটাই নির্ণেয় পরিসংখ্যা বিভাজন হবে।

৮৬.৭ বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন উপস্থাপন ঃ

৭৯.৩-নং সারণিতে শ্রেণীসীমা (Class Limits) ব্যবহার করে শ্রেণী প্রসার বা শ্রেণী বিভাগ দেখান হয়েছে। নিচে আর কয়েকটি উপস্থাপন দেখান হল ঃ

সারণি নং-৮৬.৫
142 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর

নম্বর	পরিসংখ্যা
0-10	5
10-20	10
20-30	20
30-40	40
40-50	30
50-60	20
60-70	10
70-80	4
80-90	2
90-100	1
মোট—	142

সারণি নং-৮৬.৬
250 জন কর্মীর সাপ্তাহিক আয়

আয় (টাকার)	পরিসংখ্যা
30 –	3
32 –	8
34 –	24
36 –	31
38 –	50
40 –	61
42 –	38
44 –	21
46 –	12
48 – 50	2
মোট—	250

সারণি নং-৮৬.৭
40 জন লোকের সাপ্তাহিক আয়

আয় (টাকার)	পরিসংখ্যা
30 এর 40 এর নিচে	8
40 এর 50 এর নিচে	12
50 এর 60 এর নিচে	6
60 এর 70 এর নিচে	4
70 এর 80 এর নিচে	10
মোট—	40

সারণি নং ৮৬.৮
80 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর

নম্বর	পরিসংখ্যা
30 এর নীচে	7
30-40	12
40-50	25
50-60	16
60-70	15
70 এর উপর	5
মোট—	80

৮৬.৫-নং সারিণতে শ্রেণী প্রসার শ্রেণী সীমানা (Class boundaries) দিয়ে দেখান হয়েছে। যে মানটি শ্রেণী সীমানার সঙ্গে সমান হয় তা সাধারণত পরবর্তী শ্রেণীতে ধরা হয়। যেমন নম্বর 20 ও 30 যথাক্রমে 20-30 ও 30-40 শ্রেণীতে রয়েছে।

৮৬.৬ নং সারণিতে শ্রেণীপ্রসার দেখানোর সময় উর্ধ্বশ্রেণী সীমা (Upper Class Limit) গুলো পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়নি। প্রথম শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে 30 ও তার উপর, কিন্তু 32-এর নিচে এবং দ্বিতীয় শ্রেণী 32 ও তার উপর, কিন্তু 34-এর নিচে।

৭৯.৭ নং সারণিতে কোনও শ্রেণীর উর্ধ্বসীমা পরবর্তী শ্রেণীতে রয়েছে। যেমন প্রথম শ্রেণীর 40 দ্বিতীয় শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণীর 50 তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে।

৭৯.৮নং সারণিতে প্রথম শ্রেণী ও শেষ শ্রেণী মুক্ত (Open)। ফলে প্রথম শ্রেণীর নিম্নসীমা ও শেষ শ্রেণীর উর্ধ্বসীমা অজানা। যদি সকল শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য সমান হয়, তবে মুক্ত প্রান্তীয় শ্রেণীগুলি সমপ্রসার বিশিষ্ট ধরা হয়, অন্যথায় তা অজানা থাকবে।

৮৬.৭.১ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন ঃ

পরিসংখ্যানে অনেক সময় চলকের একটি নির্দিষ্ট মান অপেক্ষা রাশিতথ্যমালার কতগুলি মান ছোট (বা বড়) তা জানার প্রয়োজন হয়। এই সব ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত বা মানের উপরে পরিসংখ্যাগুলিকে ক্রমান্বয়ে যোগ (accumulate) করতে হয়। এই ক্রমান্বয়ে যোগ করা পরিসংখ্যাকে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদি প্রথম বা উপর থেকে পরিসংখ্যা যথাক্রমে a, b, c, d ইত্যাদি হয়, তবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি বিভাগ পর্যন্ত মোট পরিসংখ্যা হবে যথাক্রমে (a+b), (a+b+c), (a+b+c+d) ইত্যাদি এবং এগুলি যথাক্রমে বিভাগগুলির ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্দেশ করে।

যতগুলি সংখ্যা নির্দিষ্ট মানের সমান বা তার চেয়ে নিচে সেই সংখ্যাকে "নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা" (Less-than cumulative frequency) এবং যতগুলি সংখ্যা নির্দিষ্ট মানের সমান বা তার থেকে বেশী সেই সংখ্যাকে "উপর থেক ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা" (Greater-than cumulative frequency) বলে।

যদি চলকের বিভিন্ন মান ও তার অনরূপ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (নিচ থেকে বা উপর থেকে) একটি ছক বা সারণিতে সাজানো হয়, তবে তাকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন (Cumulative Frequency Distribution) বলে। শ্রেণীবদ্ধ রাশিতথ্যের ক্ষেত্রে, ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা অনুরূপ শ্রেণী সীমানার বিপরীতে লিখতে হয়। কেবলমাত্র ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বলতে সাধারণত 'নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা'-কে বোঝায়।

নিচে কয়েকটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছক দেখান হল ঃ

সারণি নং ৮৬.৯

30 জন ছাত্রের নম্বরের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন

নম্বর	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা	
		নিচ থেকে	উপর থেকে
20	3	3	30
25	5	8	27
27	8	16	22
32	7	23	14
41	5	28	7
46	2	30	2
মোট	30	–	–

সারণি নং ৮৬.১০

60 জন ছাত্রের ওজনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন

শ্রেণী সীমানা	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা	
		নিচ থেকে	উপর থেকে
29.5	0	0	60
34.5	3	3	57
39.5	5	8	52
44.5	12	20	40
49.5	18	38	22
54.5	14	52	8
59.5	6	58	2
64.5	2	60	0
মোট	60	–	–

সারণি নং ৮৬.১১

60 জন ছাত্রের ওজনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন

ওজন (কেজিতে)	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা	
		নিচ থেকে	উপর থেকে
30 – 40	3	3	60
35 – 39	5	8	57
40 – 44	12	20	52
45 – 49	18	38	40
50 – 54	14	52	22
55 – 59	6	58	8
60 – 64	2	60	2
মোট	60	–	–

৮৬.৮ প্রতিলিপির (Diagram) সাহায্যে উপস্থাপনার সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

যদিও শ্রেণী বিন্যাস ও ছক বিন্যাস রাশিতথ্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে তবুও

অধিকাংশ মানুষের পক্ষে স্বল্প সময়ে ও অনায়াসে উহার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। যদিও লেখ (Graphs) বা চার্ট (Charts) বা চিত্র কেবলমাত্র স্থূল (approximate) প্রতিলিপি তুলে ধরে, তবু এর দৃষ্টি আকর্ষণী ক্ষমতা প্রচুর। সে জন্য সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে পরিসংখ্যানের রাশিতথ্য অনেক সময়েই লেখ ও চিত্রাদির দ্বারা প্রকাশ করতে দেখা যায়। লেখ ও চিত্রাদি ব্যবহারে নিম্নলিখিত কতকগুলি সুবিধা ও অসুবিধা আছে ঃ

সুবিধা ঃ

i) এই পদ্ধতি সাধারণ লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক ও তথ্যবহুল।
ii) জটিল কোনও সমস্যা অনেক সময় লেখ ও চিত্রাদি দ্বারা সহজবোধ্য হয়।
iii) ইহার দ্বারা বিভিন্ন রাশিতথ্যমালার তুলনা করা খুব সহজ হয়।
iv) মানের পরিবর্তনের হার লেখ ও চিত্রাদি থেকে সহজবোধ্য হয়।
v) ইহা চলকের অন্তঃমান (interpolation) নির্ণয়ে সাহায্য করে।
vi) রাশিতথ্যমালার বিশেষ কোনও প্রবণতা (trend) থাকলে বুঝতে সুবিধা হয়।
vii) লেখ বা চিত্রাদির সাহায্যে সংগৃহীত রাশিতথ্যের মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলে তা দৃষ্টিগোচর হয়।

অসুবিধা ঃ

i) ছকের সাহায্যে প্রকাশিত রাশিতথ্যে চলকের সঠিক মান পাওয়া যায়। কিন্তু লেখ বা চিত্রাদির মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে চলকের সঠিক মান পাওয়া সম্ভব নয়।

ii) ইহার দ্বারা প্রকাশিত রাশিতথ্যে বিস্তৃত বিবরণ থাকে না।

iii) ইহা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ও সাবধানতার প্রয়োজন ; অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

iv) ইহা কখনও কখনও সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।

৮৬.৯ বিভিন্ন ধরনের লেখচিত্র ঃ

i) রেখাচিত্র (Line Char) বা লেখ (Graph)
ii) বারচিত্র বা দণ্ডচিত্র (Bar Chart)
iii) আনুপাতিক চিত্র বা সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখচিত্র (Ratio Chart of Semi-Logarithmic Graph)
iv) পাই চিত্র (Pie Chart or Pie Graph)
v) আয়তলেখ (Histogram)
vi) পরিসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)
vii) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা (Ogire or Cumulative Frequency Curve)
viii) পরিসংখ্যা দণ্ড লেখ (Column Diagram)
ix) ধাপচিত্র (Step Diagram)

i) রেখাচিত্র (Line Chart) বা লেখ (Graph) ঃ

এই ধরনের লেখাচিত্রে, x-অক্ষ বরাবর স্বাধীন চলক (independent variable) এবং অধীন চলক (dependent variable) y-অক্ষ বরাবর বিন্দুগুলি স্থাপন করা হয়। এইভাবে যে বিন্দুগুলি লেখ-তে পাওয়া যায় সেগুলিকে

পর্যায়ক্রমে (successively) সরলরেখা দ্বারা যোগ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে রেখাচিত্র বা লেখ বলে।

কোনও কালীন সারির লেখিক প্রকাশকে হিস্টোরিগ্রাম (Historigram) বা কালীন লেখ বলে।

উদাহরণ ১. কোন সংস্থার প্রথম ছয় মাসের মাসিক গাড়ির উৎপাদন নিচে দেওয়া হল। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে তথ্যগুলিকে উপস্থাপন কর।

নাম	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
গাড়ির সংখ্যা	160	180	140	180	200	210

সমাধান ঃ

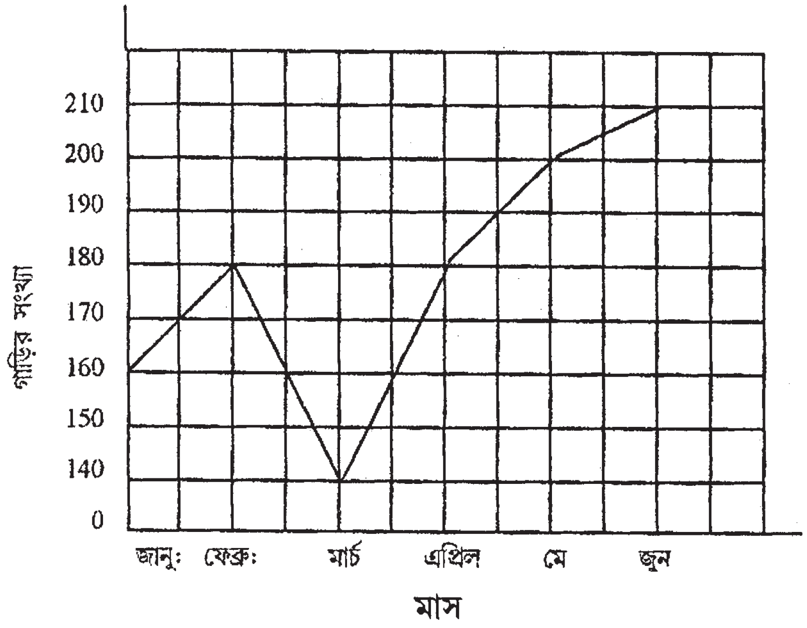

উদাররণ ২. নিচের ছকে একজন লোকের বিভিন্ন বয়সে উচ্চতা ও ওজন দেওয়া আছে।

বয়স (বছর)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
উচ্চতা (সেমি)	75	90	105	125	140	150	175	185	195
ওজন (কেজি)	20	25	35	40	45	55	60	65	70

দু'টি রেখচিত্র অঙ্কন কর ছকের তথ্য থেকে এবং লোকের উচ্চতা ও ওজনকে অবিচ্ছিন্ন চলক মনে করে লেখচিত্র অন্তঃমান নির্ণয় পদ্ধতিতে ঐ ব্যক্তির 9 বছর বয়সে উচ্চতা ও ওজন কত ছিল নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ

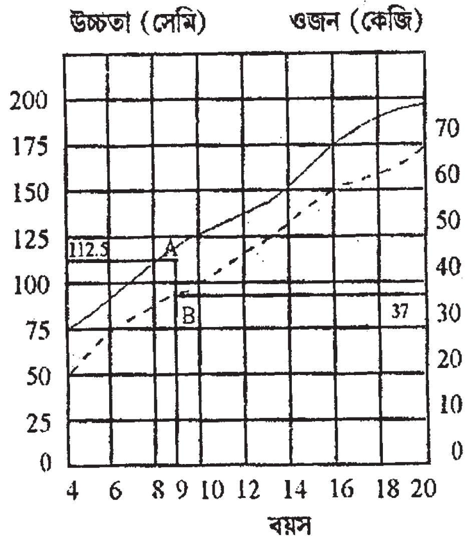

উচ্চতার রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 9 বছর বয়সে একজনের উচ্চতা আনুমানিক 112.5 সেমি (A-চিহ্নিত স্থান) এবং ওজন 37 কেজি (B-চিহ্নিত স্থান) ছিল।

ii) **বারচিত্র বা দণ্ডচিত্র ঃ**

দণ্ডচিত্র বা বারচিত্র পরিসংখ্যান-বিষয়ক রাশিতথ্যের প্রকাশের আর একটি বহুল-ব্যবহৃত পদ্ধতি। দণ্ডচিত্র বা বারচিত্র হল কতকগুলি সমান প্রস্থের ও পরস্পর হতে সমান দূরত্বে অবস্থিত আয়তাকার বার বা দণ্ড। কোনও একটি বারের দৈর্ঘ্য উহা যে রাশিতথ্যের মানকে প্রকাশ করে, তার সঙ্গে সমানুপাতিক করে ঠিক করা হয়। বার বা দণ্ডগুলি উল্লম্বভাবে কোনও অনুভূমিক রেখার উপর অথবা অনুভূমিকভাবে কোনও উল্লম্ব রেখার উপর পরপর থাকতে পারে। প্রথমে উল্লেখিত বারচিত্রকে উল্লম্ব বারচিত্র (Vertical Bar Chart or Column Chart) এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে বারচিত্রকে অনুভূমিক বারচিত্র (Horizontal Bar Chart) বলে। কালীন সারির ক্ষেত্রে উলম্ব বারচিত্র ব্যবহার করা হয়।

পরপর দু'টি বারের মধ্যে কতখানি ফাঁকা জায়গা থাকবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে দরকার মতো উক্ত স্থান একটি বারের প্রস্থ বা প্রস্থের অর্ধেকের সমান হতে পারে।

উল্লেখিত প্রত্যেকবার বা দণ্ডচিত্রের জন্য বহুল বারচিত্র (Multiple or Compound Bar Chart) তৈরি করা যায়। জটিল বারচিত্রে পরস্পর সম্পর্কিত দুই বা ততোধিক রাশিতথ্য উপস্থাপন করা হয়। বহু অংশে বিভক্ত বারচিত্রে একটি বার বা দণ্ডকে বহু অংশে বিভক্ত করে রাশিতথ্যমালার বিভিন্ন অংশ প্রকাশ করা হয়। রাশিতথ্যের এইরূপ উপস্থাপনে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক এবং সমগ্র রাশিতথ্যের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণের সাহায্যে সমস্ত বার বা দন্ড চিত্র দেখান হল।

উদাহরণ ৩. একটি ব্যবসায়ী সংস্থার 1993-1997 সালের লাভ-ক্ষতি নিচে দেওয়া হল। তথ্যগুলিকে বার বা দণ্ড চিত্রে উপস্থাপন কর।

সাল	1993	1994	1995	1996	1997
লাভ (টাকায়)	3000	4000	2500	_	6000
ক্ষতি (টাকায়)	_	_	2000	_	_

সমাধান ঃ A

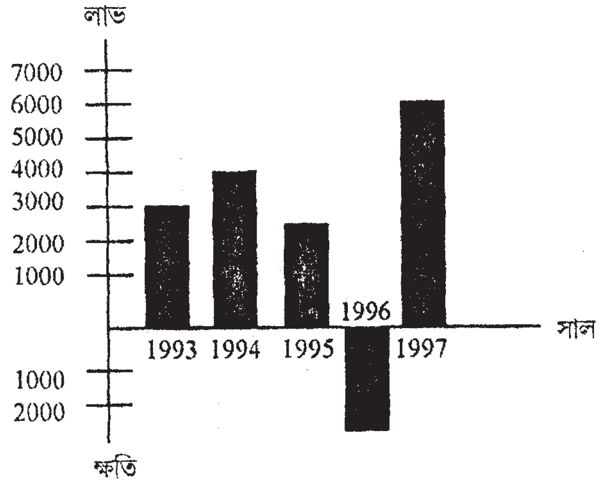

উদাহরণ ৪. 5 টি বিভিন্ন শহরের অধিবাসী সংখ্যা উপস্থাপন করার জন্য একটি বার বা দণ্ড চিত্র অঙ্কন কর।

শহরের নাম	A	B	C	D	E
লোকসংখ্যা ('000)	22	40	25	42	30

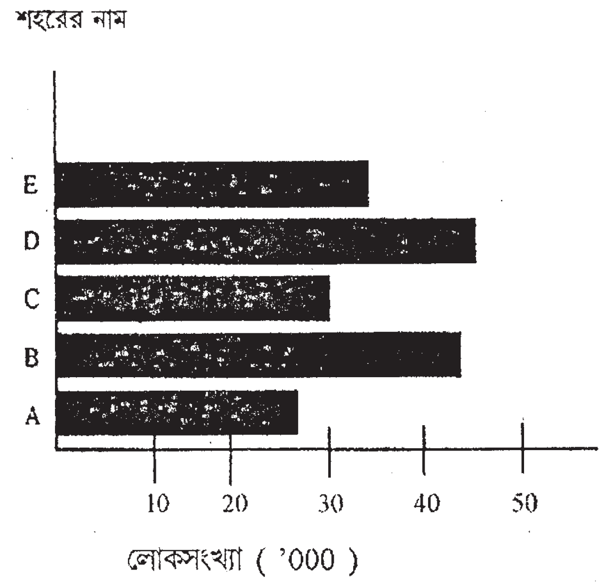

উদাহরণ ৫. কেন্দ্রীয় সরকারের 1955-61 সালের রাজস্ব ও ব্যয়ের প্রবণতা নিচের ছকে দেওয়া হল। জটিল বার বা দণ্ড চিত্র অঙ্কন কর।

সাল	1955-56	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61
রাজস্ব (কোটিতে)	480	560	680	740	670	820
ব্যয় (কোটিতে)	440	470	630	760	680	830

সমাধান ঃ

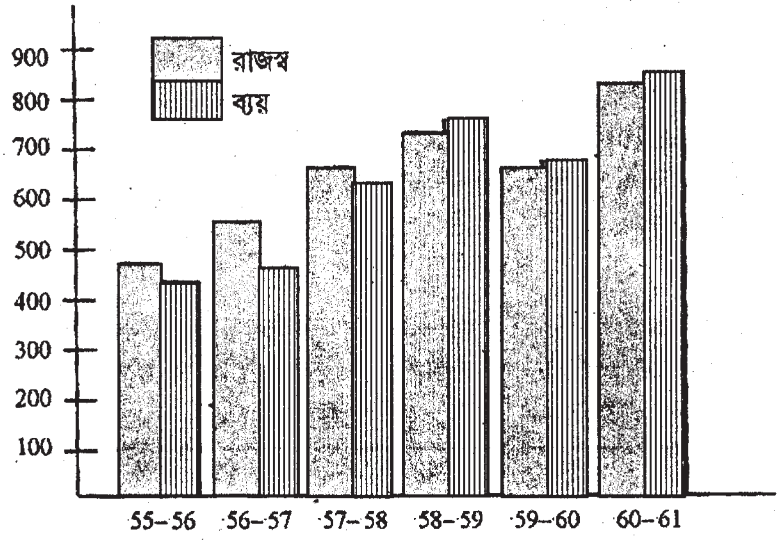

উদাহরণ ৬. 1975-78 সালে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল। রাশিতথ্যকে বহু অংশে বিভক্ত বার বা দণ্ড চিত্রে উপস্থাপন কর।

সাল	কলা বিভাগ	বিজ্ঞান বিভাগ	বাণিজ্য বিভাগ	মোট
1975-76	20,000	12,000	7,000	39,000
1976-77	24,000	15,000	10,000	49,000
1977-78	25,000	18,000	15,000	58,000

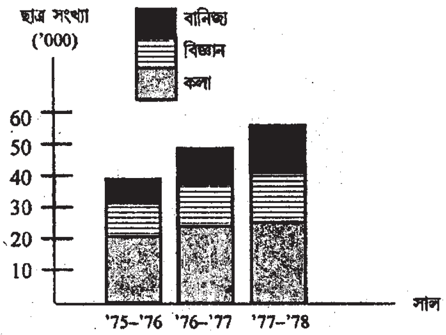

iii) আনুপাতিক চিত্র বা সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখচিত্র ঃ

লেখচিত্র প্রস্তুতিতে স্বাধীন চলকের মান অনুভূমিক বা x-অক্ষ বরাবর এবং অধীন চলকের মান উল্লম্ব বা y-অক্ষ বরাবর নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত যে সব লেখচিত্র আলোচনা করা হয়েছে তাতে অক্ষের চলক সমূহের মান স্বাভাবিক পরিমাপ মাত্রায় (Natural or Absolute scale-এ) প্রকাশ করা হয়েচে। এইসব চিত্রে স্বাধীন চলক x-এর মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধীন চলক y-এর মানের প্রকৃত পরিবর্তন (actual change)-এর চিত্রই শুধু পাওয়া যায়, কিন্তু অধীন চলক কী হারে পরিবর্তিত হচ্ছে তা পরিমাপ করা যায় না। যে লেখ থেকে অধীন চলকের মান পরিবর্তনের হার সরাসরি নির্ণয় করা যায় তাকে সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখচিত্র (Semi-Logarithmic Graph) বা আনুপাতিক লেখচিত্র (Ratio Chart or Graph) বলে। এই লেখচিত্র অঙ্কন করতে হলে উল্লম্ব রেখায় log y-এর মান এবং অনুভূমিক রেখায় স্বাধীন চলক x-এর স্বাভাবিক মান নেওয়া হয়। সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখ-এর উল্লম্ব রেখায় সমান সমান দূরত্ব অধীন চলক y-এর মান সমান সমান শতকরা পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে।

একটি উদাহরণ সহযোগ দেখা যাক। ধরা যাক, y-এর কয়েক জোড়া মান পরিবর্তন নিম্নরূপ ঃ

(a) 100 থেকে 150; (b) 250 থেকে 300 এবং (c) 500 থেকে 550; স্বাভাবিক পরিমাপে প্রতি জোড়া সংখ্যার ক্ষেত্রে y-এর প্রকৃত মানের পরিবর্তন 50 একক। কিন্তু (a)-এর ক্ষেত্রে y-এর শতকরা 50 ভাগ, (b)-এর ক্ষেত্রে y-এর শতকরা 20 ভাগ $\left(=\frac{100}{5}\right)$ এবং (c)-এর ক্ষেত্রে y-এর শতকরা 10 ভাগ $\left(=\frac{50\times 100}{500}\right)$ বৃদ্ধি পেয়েছে। আনুপাতিক চিত্র সরলরেখা হলে বুঝতে হবে y-এর পরিবর্তনের হার সর্বত্র সমান।

উদাহরণ ৭. বর্ষশেষে উৎপাদনের সংখ্যাগত তথ্য নিম্নের সারণিতে দেওয়া হল। রাশিতথ্য সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখচিত্র বা আনুপাতিক লেখচিত্র-এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বছর	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
উৎপাদিত এককের সংখ্যা	20	62	147	300	536	811	1104	1425	1755

সমাধান ঃ

বছর	উৎপাদিত এক (y)	log y (আসন্ন দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত)
1947	20	1.32
1948	62	1.79
1949	147	2.17
1950	300	2.48
1951	536	2.73
1952	811	2.91
1953	1104	3.04
1954	1425	3.15
1955	1755	3.24

অন্যথায় সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখ-কাগজ ব্যবহার করা যায়। এই লেখ কাগজে y-অক্ষ এমন যে, দুটি বিন্দুর দূরত্ব তাদের লগারিদ্‌মের পার্থক্যের সমান। অর্থাৎ 1 এবং 10-এর দূরত্ব, 10 এবং 100-র দূরত্ব বা 100 থেকে 1000-এর দূরত্ব সমান কারণ তাদের লগারিদ্‌মের পার্থক্য সমান।

iv) পাইচিত্র ঃ

পাইচিত্রের সাহায্যে পরিসংখ্যান বিষয়ক রাশিতথ্য প্রকাশের বহুল প্রচলন আছে। বহু অংশে বিভক্ত বারচিত্রের

মতো রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পূর্ণতথ্যের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দরভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে পাইচিত্রের ব্যবহার খুবই উপযোগী।

চিত্র তৈরির জন্য একটি যে কোনও ব্যাসার্ধের বৃত্তকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয় যাদের ক্ষেত্রফল প্রদত্ত মানগুলির সমানুপাতিক হয়। আবার যেহেতু বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল কেন্দ্রস্থ কোণের সমানুপাতিক, এক কথায় বলা যায় যে, পাইচিত্র হল একটি বৃত্ত যাকে কয়েকটি ব্যাসার্ধের দ্বারা এমনভাবে কয়েকটি বৃত্তাংশে ভাগ করা হয় যাতে বৃত্তাংশগুলির কেন্দ্রস্থ কোণগুলি পূর্ণ রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশ তথ্য সমূহের সমানুপাতিক হয়।

উদাহরণ ৮. নিচে কোনও সরকারের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতের আনুমানিক ব্যয় দেখানো হয়েছে। উহাদের পাইচিত্র-এর সাহায্যে প্রকাশ কর ঃ

বিষয়	**টাকা (কোটিতে)**
কৃষি	8000
শিল্প ও খনি	7000
সেচ ও শক্তি	4000
যানবাহন	5500
বিবিধ	2500

সমাধান ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় = 27000 কোটি টাকা। নিচে বিভিন্ন খাতের ব্যয়কে মোট ব্যয়ের শতকরা প্রকাশ করে অনুরূপ কেন্দ্রস্থ কোণগুলি নির্ণয় করা হল ঃ

বিষয়	**শতকরা হিসাব**	**কেন্দ্রস্থ কোণ**
কৃষি	$\frac{8000}{27000} \times 100\% = 29.6\%$	$\frac{8000}{2700} \times 360^0 = 106.7^0$ (প্রায়)
শিল্প ও খনি	$\frac{7000}{27000} \times 100\% = 26.0\%$	$\frac{2700}{27000} \times 360^0 = 93.3^0$ (প্রায়)
সেচ ও শক্তি	$\frac{4000}{27000} \times 100\% = 14.8\%$	$\frac{4000}{27000} \times 360^0 = 53.3^0$ (প্রায়)
যানবাহন	$\frac{5500}{27000} \times 100\% = 20.4\%$	$\frac{5500}{27000} \times 360^0 = 73.3^0$ (প্রায়)
বিবিদ	$\frac{2500}{27000} \times 100\% = 9.2\%$	$\frac{2500}{27000} \times 360^0 = 33.4^0$ (প্রায়)
মোট	100%	360^0

সুবিধামত ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কন করে উহার কেন্দ্রে পরপর $106.7^0, 93.3^0$ ইত্যাদি কোণ অঙ্কন করে প্রদত্ত রাশিতথ্যের পাইচিত্র নিম্নরূপ ঃ

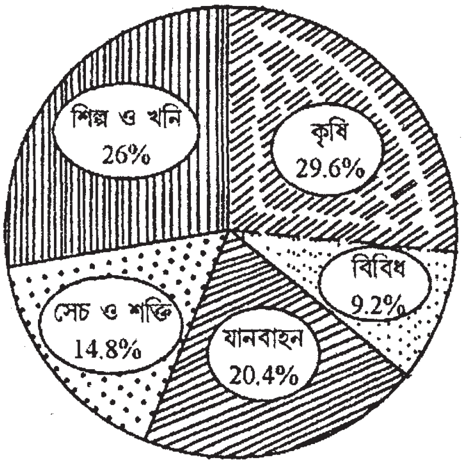

পাইচিত্র

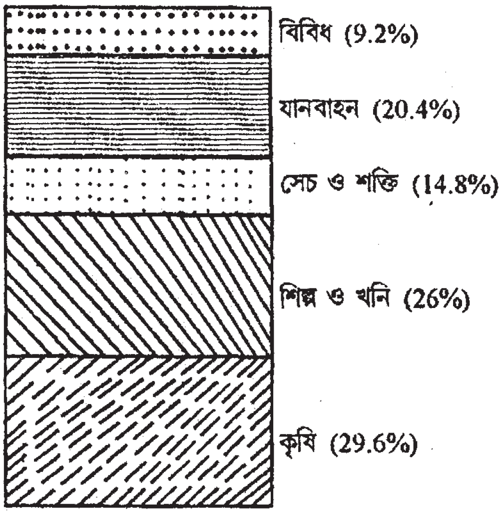

বহু অংশে বিভক্ত বার চিত্র

v) **আয়তলেখ** ঃ পরিসংখ্যা বিভাজনের লৈখিক প্রকাশের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের রাশিতথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আয়তলেখের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আয়তলেখ একটি সরলরেখার উপর এমন কতকগুলি আয়তক্ষেত্র যাদের প্রতিটির ক্ষেত্রফল অনুরূপ শ্রেণী পরিসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক।

আয়তলেখ অঙ্কন করতে হলে পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের শ্রেণীবিভাগগুলির শ্রেণী সীমানাগুলি (Class boundaries) অনুভূমিক রেখায় (x- অক্ষে) শ্রেণী বিভাগের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক অংশ পরপর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি অংশের উপর নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগের পরিসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক করে আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করতে হয়। এর ফলে উৎপন্ন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অনুরূপ শ্রেণী বিভাগগুলির পরিসংখ্যাকে এবং আয়তক্ষেত্রগুলির মোট ক্ষেত্রফল মোট পরিসংখ্যাকে প্রকাশ করে।

যদি পরিসংখ্যা বিভাজনে প্রতিটি শ্রেণী দৈর্ঘ্য সমান হয়, তবে আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতাগুলি অনুরূপ শ্রেণী পরিসংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক করে নেওয়া হয়। যদি শ্রেণী প্রসারগুলির দৈর্ঘ্য অসমান হয়, তবে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা নিম্নলিখিতভাবে স্থির করা হয় ঃ

উচ্চতা = শ্রেণী পরিসংখ্যা ÷ শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য = পরিসংখ্যা ঘনত্ব।

উদাহরণ ৯. 2000 জন ছাত্রের ওজনের পরিসংখ্যা বিভাজন নিচে দেওয়া আছে। একটি আয়তলেখ-এর সাহায্যে প্রকাশ করা।

ওজন (পাউন্ডে)	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140
ছাত্র সংখ্যা	500	700	300	400	100

সমাধান ঃ

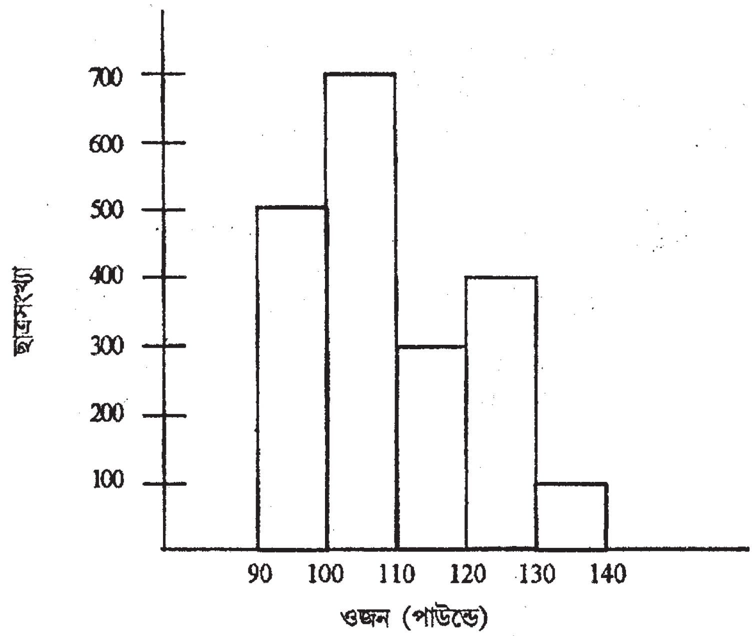

vi) **পরিসংখ্যা বহুভুজ ঃ** পরিসংখ্যা বিভাজনের লৈখিক প্রকাশ ইহার সাহায্যেও করা হয়। বেশির ভাগ সময় ইহা সমান শ্রেণীপ্রসারযুক্ত বিভাজনের ক্ষেত্রে করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শ্রেণীর পরিসংখ্যা অনুরূপ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর বিরুদ্ধে সংস্থাপন করা হয়। যে বিন্দুগুলি পাওয়া যায় সেগুলি পরপর সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়। প্রথম ও শেষ বিন্দু দু'টি দু'প্রান্তে কল্পিত পরিসংখ্যাহীন শ্রেণীর মধ্যবিন্দু ধরে বহুভুজসম্পন্ন করা হয়।

আয়তলেখ থেকে পরিসংখ্যা বহুভুজ পেতে হলে, আয়তক্ষেত্রগুলির উপরের অংশের মধ্যবিন্দুগুলি যোগ করে এবং পূর্বে বর্ণিত উপায়ে প্রান্তদ্বয় সম্পূর্ণ করা হয়।

যদি পরিসংখ্যা বিভাজনে শ্রেণীপ্রসার ক্রমশ ছোট করা হয়, তবে শ্রেণীর সংখ্যা বাড়বে। ফলে বহুভুজের শীর্ষবিন্দুগুলি খুব কাছাকাছি আসবে এবং সেক্ষেত্রে বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে সন্তত রেখা টানলে (smooth free hand curve) যে রেখা পাওয়া যায় তাকে পরিসংখ্যা রেখা (Frequency curve) বলে।

উদাহরণ ১০. নিচের ছকে কর্মীদের মাসিক আয় দেওয়া আছে। উহা পরিসংখ্যা বহুভুজের সাহায্যে প্রকাশ কর।

মাসিক আয় (টাকায়)	কর্মী সংখ্যা
50.00–59.00	8
60.00–69.99	10
70.00–79.99	16
80.00–89.99	14
90.00–99.99	10
100.00–109.99	5
110.00–119.99	2

সমাধান ঃ পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের জন্য গণনা কার্য ঃ

মধ্যবিন্দু	54.995	64.995	74.995	84.995	94.995	104.995	114.995
পরিসংখ্যা	8	10	16	14	10	5	2

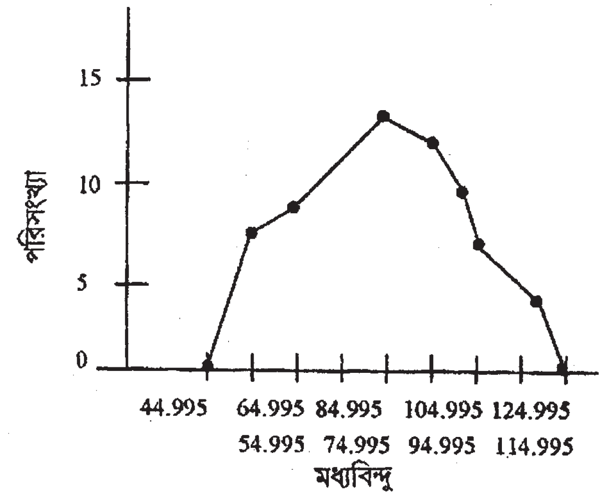

vii) **ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যারেখা ঃ** ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলির লৈখিক প্রকাশ ইহার সাহায্যে করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি শ্রেণী সীমানাগুলির বিরুদ্ধে উপস্থাপন করে যে বিন্দুগুলি পাওয়া যায় সেগুলি পরপর সরলরেখা দ্বারা যোগ করা হয়। ইহা দু'ধরনের — (a) 'নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা'-র জন্য এবং (b) 'উপর থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা'-এর জন্য। নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা দেখতে বর্ধিত S-এর মতো এবং উপর থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা উপর দিক নিচে উল্টানো বর্ধিত S-এর দেখতে। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখার দ্বারা মধ্যমা, চতুর্থক প্রভৃতি নির্ণয় করা যায়।

উদাহরণ ১১. নিম্নলিখিত রাশিতথ্য ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখার সাহায্যে প্রকাশ কর (a) নিচ থেকে, (b) উপর থেকে ঃ

100 জন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন

নম্বরের শ্রেণী বিভাগ	ছাত্র সংখ্যা
10–19	8
20–29	14
30–39	22
40–49	29
50–59	14
60–69	7
70–79	4
80–89	2
মোট	100

সমাধান ঃ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখার জন্য গণনা কার্য ঃ

নম্বরের শ্রেণীবিভাগ	শ্রেণীসীমানা	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা	
			নিচ থেকে	উপর থেকে
10–19	9.5–19.5	8	8	100
20–29	19.5–29.5	14	22	92
30–39	29.5–39.5	22	44	78
40–49	39.5–49.5	29	73	56
50–59	49.5–59.5	14	87	27
60–69	59.5–69.5	7	94	13
70–79	69.5–79.5	4	98	6
80–89	79.5–89.5	2	100	2

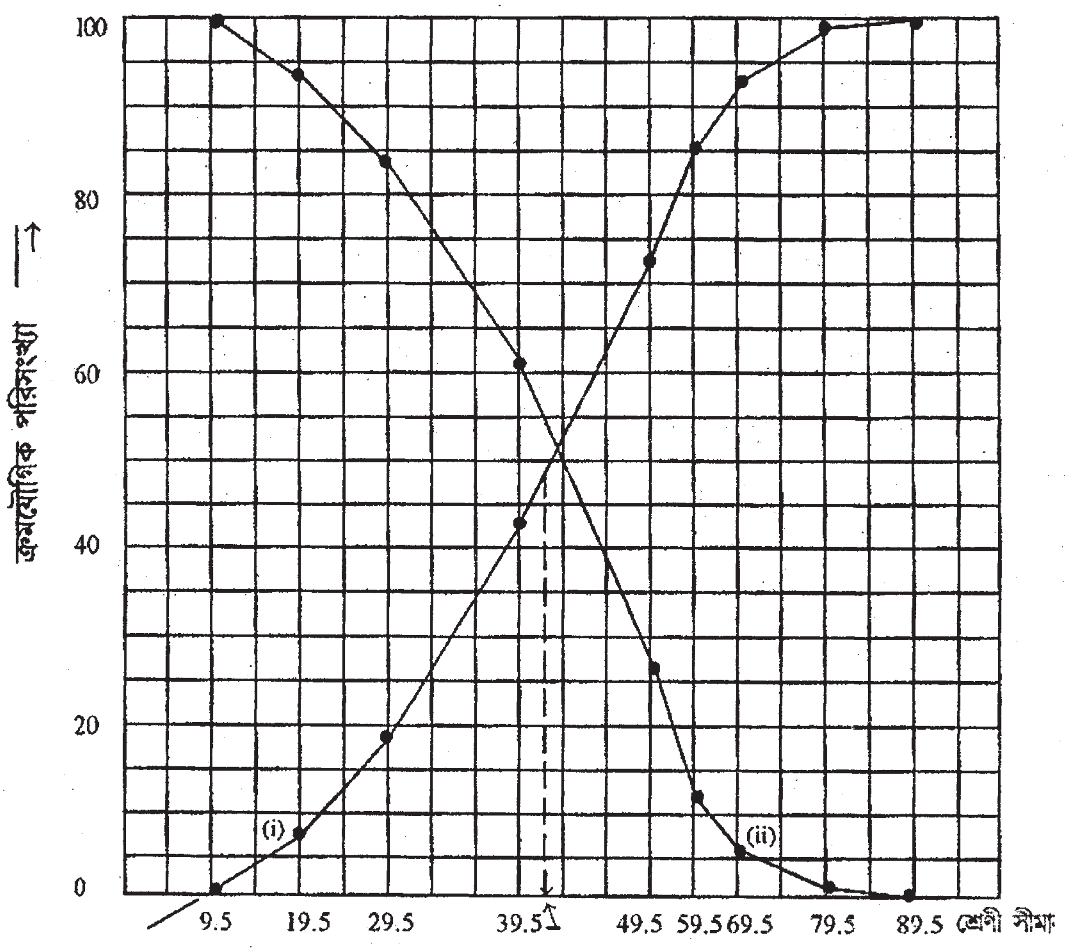

vii) **পরিসংখ্যা দণ্ড লেখ (Column diagram)** ঃ বিচ্ছিন্ন চলকের বিভিন্ন মানের জন্য যে পরিসংখ্যা বিভাজন তার উপস্থাপন ইহার দ্বারা করা হয়। খুব কম প্রসার (সূক্ষরেখা)-এর বিচ্ছিন্ন উল্লম্ব দণ্ড বা বার বিভিন্ন মানের উপর দাঁড় করিয়ে ইহা আঁকা হয়, সেখানে দণ্ডগুলির উচ্চতা পরিসংখ্যার সমানুপাতিক হয়।

উদাহরণ ১২. প্রতি এক মিনিটে আগত দূরভাস সংখ্যা নিচের ছকে দেখান হয়েছে। ইহা লেখ-এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

দূরভাষ সংখ্যা	0	1	2	3	4	5	6	7	8
পরিসংখ্যা	5	22	31	43	51	40	35	15	3

সমাধান ঃ

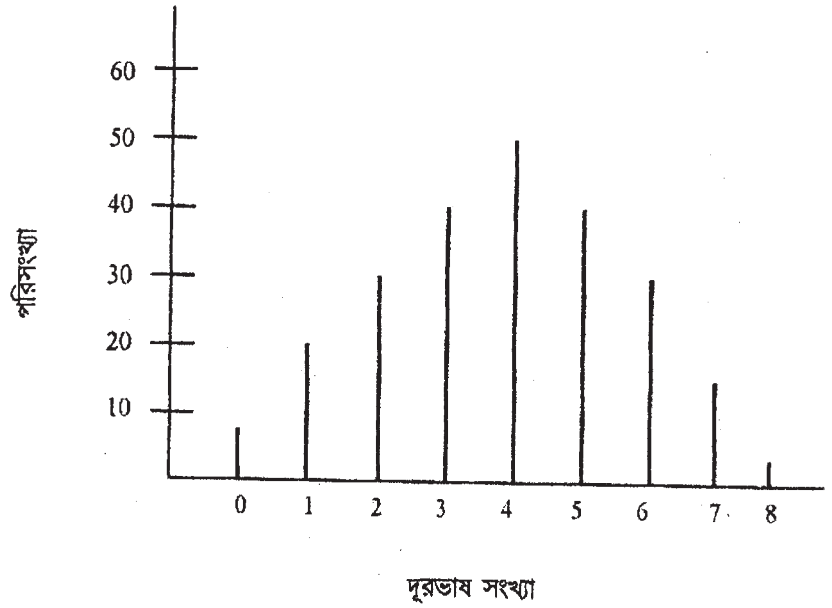

ix) **ধাপচিত্র** (Step diagram) ঃ বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাগের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাকে চিত্রায়িত করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

নিচ থেকে ক্রমযৌগিক চিত্রটি দেখতে বাম থেকে ডানে ওঠা সিঁড়ির মতো, যার প্রথম ধাপের উচ্চতা প্রথম নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা, দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় নিচ থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ইত্যাদির সমানুপাতিক।

উপর থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্রটি দেখতে ডান থেকে বামে উঠা সিঁড়ির মতো, যার প্রথম ধাপের উচ্চতা প্রথম উপর থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা, দ্বিতীয় উপর থেকে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ইত্যাদির সমানপ্যুতকি।

উদাহরণ ১৩. নিম্নের বিভাজন ছকের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা চিত্র (উভয় প্রকার) অঙ্কন কর ঃ

মান (Grade)	1	2	3	4	5	6
ছাত্রসংখ্যা	20	34	40	52	26	16

সমাধান ঃ ধাপচিত্রের জন্য গণনা কার্য ঃ

মান	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা	
		নিচ থেকে	উপর থেকে
1	20	20	188
2	34	54	168
3	40	94	134
4	52	146	94
5	26	172	42
6	16	188	16

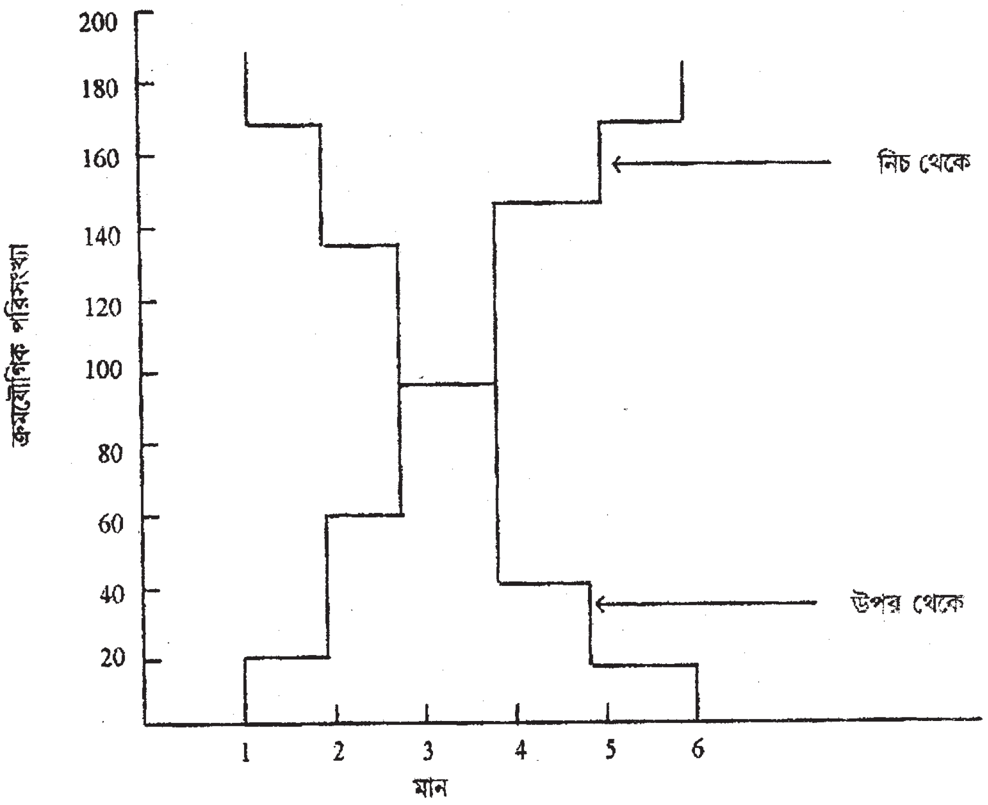

৮৬.১০ অনুশীলনী ঃ

১) প্রাথমিক রাশিতথ্য কাকে বলে ?

২) অপ্রাথমিক রাশিতথ্যের দু'টি উৎস লেখ।

৩) বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন চলকের একটি করে উদাহরণ দাও।

৪) শ্রেণী সীমা ও শ্রেণী সীমানার পার্থক্য কী ?

৫) পরিসংখ্যা ঘনত্ব কোন্ ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ?

৬) উৎস সারণীর কোন্ অংশে থাকে ?

৭) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কত প্রকার ও কী কী ?

৮) সেমি লগারিদ্‌ম্ লেখচিত্র কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় ?

৯) নিম্নোক্ত লেখচিত্রগুলি প্রয়োগের একটি করে উদাহরণ দাও ঃ

ক) উলম্ব ও অনুভূতির বারচিত্র।

খ) জটিল ও বহু অংশে বিভক্ত বারচিত্র।

গ) পাইচিত্র ও বহু অংশে বিভক্ত বারচিত্র।

ঘ) দণ্ডলেখ ও আয়তলেখ।

ঙ) ধাপচিত্র ও ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা।

১০) পরিসংখ্যা রেখার / বহুভুজের অন্তর্গত আয়তনের মোট ক্ষেত্রফল কত ?

১১) পরিসংখ্যান বলতে কী বোঝ ? পরিসংখ্যান শব্দটি কোন্ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

১২) "রাশিতথ্যের সাধারণত দু'টি প্রকারভেদ থাকে ঃ i) প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ এবং ii) অপ্রাথমিক বা পরোক্ষ" — সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। প্রাথমিক রাশিতথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির এবং অপ্রাথমিক রাশিতথ্যের প্রধান উৎসগুলির নাম কর।

১৩) একটি পরিসংখ্যান ছকের বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা কর।

১৪) (i) সরল পরিসংখ্যান ছকের বিভাজন ও (ii) শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন কাকে বলে বর্ণনা কর ও প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

১৫) একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বছর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ ও তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা লিঙ্গভেদে প্রদর্শনের জন্য একটি খালি ছক (bank table) তৈরি কর।

১৬) লেখচিত্রের সাহায্যে রাশিতথ্যের উপস্থাপন বলতে কী বোঝায় ? উহার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

১৭) বার বা দণ্ড চিত্র, পাইচিত্র ও আয়তলেখ বলতে কী বোঝায়? ব্যবসাক্ষেত্রে এদের ব্যবহার উদাহরণ সহকারে বোঝাও।

১৮) পার্থক্য ব্যাখ্যা কর ঃ

i) বারচিত্রও আনুপাতিক চিত্র (Bar Chart and Ratio Chart)

ii) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা ও ধাপচিত্র (Ogive and Step diagram)

iii) আয়তলেখ ও কালীনলেখ (Histogram and Historigram)

১৯) ভারতে মাসিক সাইকেল উৎপাদন নিচে দেওয়া হল ঃ

জানুয়ারী	—	5720	ফেব্রুয়ারি	—	4900	মার্চ	—	6110
এপ্রিল	—	5930	মে	—	6040	জুন	—	4610
জুলাই	—	3060	আগস্ট	—	4700	সেপ্টেম্বর	—	5605
অক্টোবর	—	3275	নভেম্বর	—	6850	ডিসেম্বর	—	6130

উপরের তথ্য উপস্থাপন কর (a) রেখাচিত্র (Line Chart) এবং (b) বারচিত্র (Bar Chart)-এর সাহায্যে।

২০) বহুল বারচিত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত রাশিতথ্য প্রকাশ কর ঃ

বছর	1975	1976	1977	1978	1979
কারখানা A-তে উৎপাদন	300	326	180	275	320
কারখানা B-তে উৎপাদন	260	310	250	250	270

২১) নিম্নলিখিত দু'মাসের খরচের রাশিতথ্যকে বহু অংশে বিভক্ত বারচিত্রে ও পাইচিত্রে প্রকাশ কর ঃ

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারী
কাঁচামালা	700	600
শ্রমিক	800	700
উৎপাদন	100	70
বিবিধ	200	300
মোট	1800	1670

২২) নিম্নলিখিত তথ্য একটি বারচিত্রে প্রকাশ কর ঃ

শহর	A	B	C	D	E
জনসংখ্যা (হাজারে)	20.2	17.1	13.8	12.0	18.8

২৩) নিম্নলিখিত তথ্য (i) আয়তলেখ, (ii) পরিসংখ্যা বহুভুজ ও (iii) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা দিয়ে প্রকাশ কর ঃ

শ্রমিকদের দৈনিক আয়

দৈনিক আয় (টাকায়)	শ্রমিক সংখ্যা
30 – 32	4
33 – 35	7
36 – 38	16
39 – 41	31
42 – 44	60
45 – 47	11
48 – 50	1

২৪। নিম্নলিখিত তথ্যকে (i) পরিসংখ্যা বারচিত্র ও (ii) ধাপচিত্র-এর সাহায্যে প্রকাশ কর ঃ

দৈনিক যান দুর্ঘটনা সংখ্যা	দিন সংখ্যা
2	4
3	7
4	13
5	3
6	2
7	1
মোট	30

৮৬.১১ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) রাজকুমার সেন (1986) : সংখ্যাতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২) শৈলেশভূষণ চৌধুরী, অরিজিৎ চৌধুরী ও বিশ্বনাথ দাস (1976) : রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

৩) সৌরেন্দ্রনাথ দে (1991) : ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

৪) Maity, J. C. and Chakrabarti, J. (1995) : Elementary Level Business Mathematics & Statistics, Eureka Publishers, Calcutta.

৫) Levin, R.I and Rubin, D.S. (1994) : Statistics For Managmenent, Prentice-Hall of India, New Delhi.

একক ৮৭ ❑ পরিসংখ্যা বিভাজনের বৈশিষ্ট্য

গঠন

৮৭.০ উদ্দেশ্য

৮৭.১ প্রস্তাবনা

৮৭.২ কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের প্রকারভেদ

৮৭.৩ যৌগিক গড়

৮৭.৩.১ যৌগিক গড়ের সংজ্ঞা

৮৭.৩.২ যৌগিক গড়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মসমূহ

৮৭.৩.৩ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে যৌগিক গড় নির্ণয়

৮৭.৩.৪ শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের যৌগিক গড় নির্ণয়

৮৭.৪ গুণোত্তর গড়ের সংজ্ঞা

৮৭.৫ বিবর্ত যৌগিক গড়ের সংজ্ঞা

৮৭.৫.১ বিভিন্ন প্রকার গড়ের পারস্পরিক সম্পর্ক

৮৭.৬ মধ্যমা

৮৭.৭ সংখ্যাগুরু মান বা ভূয়িষ্ঠক

৮০.৭.১ যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানের তুলনা

৮৭.৮ বিস্তৃতির পরিমাপ

৮৭.৮.১ বিস্তৃতির পরম পরিমাপসমূহ

৮৭.৮.২ বিস্তৃতির পরম পরিমাপসমূহের তুলনামূলক আলোচনা

৮৭.৮ বিস্তৃতির আপেক্ষিক পরিমাপসমূহ

৮৭.১০ ভ্রামক

৮৭.১০.১ কেন্দ্রীয় ভ্রামক ও কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে ভ্রামকের সম্পর্ক

৮৭.১০.২ কেন্দ্রীয় ভ্রামক ও শূন্যবিন্দু ভিত্তিক ভ্রামকের মধ্যে সম্পর্ক

৮৭.১১ প্রতিবৈষম্য

৮৭.১২ তীক্ষ্ণতা

৮৭.১৩ অনুশীলনী

৮৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের প্রকারভেদ কী কী
- যৌগিক গড় ও তার ধর্মসমূহ কী কী
- গুণোত্তর গড় কাকে বলে এবং বিভিন্ন প্রকার গড়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কীরকম
- মধ্যমা ও বিস্তৃতির পরিমাপ, ভ্রামক, প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতা কাকে বলে

৮৭.১ প্রস্তাবনা

পরিসংখ্যান বিষয়ক যে কোনও তথ্যানুসন্ধানে বিস্তৃত ও ব্যাপক রাশিতথ্যমালার শ্রেণীবিন্যাস, ছেদবিন্যাস বা পরিসংখ্যা বিভাজনের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত করণ করা যায়। রাশিতথ্যমালার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত করণ যথেষ্ট নয়। যেমন, এক লক্ষ ভারতীয়'র আয়ের পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে ভারতীয়দের আয় সম্পর্কে কোনও ধারণা করা যায় না। কিন্তু কেবলমাত্র একটি মান, গড় আয়, সমস্ত সমগ্রক (Population)-এর প্রতিভূ (representative) হিসাবে কাজ করে যা সহজবোধ্য ও মনে রাখা যায়। সুতরাং, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সমূহের যথার্থ বিশ্লেষণের জন্য উহাদের সংখ্যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন বা অন্য কথায় বলা যায়, বৈশিষ্ট্যসমূহের সংখ্যাগত পরিমাপ (Quantitative measure) জানা প্রয়োজন। এরকম পরিমাপ রাশিতথ্যমালার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে অথবা বিভিন্ন রকম তুলনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

অধিকাংশ পরিসংখ্যা বিভাজন ছক পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, উহার কেন্দ্রীয় মানসমূহের পরিসংখ্যা সাধারণত প্রান্তীয় মানসমূহের পরিসংখ্যার চেয়ে বেশি হয়। তাহলে একথা বলা যায় যে, কোনও পরিসংখ্যা বিভাজনে রাশিতথ্যমালার মানসমূহ একটি কেন্দ্রীয় মানের চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে,—এটা পরিসংখ্যা বিভাজনের একটি বৈশিষ্ট্য। যে কেন্দ্রীয় মানের চতুর্দিকে রাশিতথ্যমালার মানসমূহ বিস্তৃত থাকে, তাহার সংখ্যাগত পরিমাপকে

রাশিবিজ্ঞানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ (Measure of Central Tendency) বলে। এই জাতীয় একটি বৈশিষ্ট্যের পরিমাপক সংখ্যাকে পরিসংখ্যান গড় (Statistical Average) বা শুধু গড় (Average) বলা হয়। রাশিবিজ্ঞানে গড় ছাড়া বিস্তৃতি (Dispersion), প্রতিবৈষম্য (Skewness) ও তীক্ষ্ণতার (Kurtosis) সাহায্যেও পরিসংখ্যা বিভাজনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাগত পরিমাপ করা হয়।

৮৭.২ কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের প্রকারভেদ ঃ

যে কোনও পরিসংখ্যা বিভাজন সারণিতে রাশিতথ্যমালার মানসমূহ যে কেন্দ্রীয় মানের চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে তার সংখ্যাগত পরিমাপকে (Quantitative Measure-কে) রাশিবিজ্ঞানে গড় বলা হয়। তাই এক কথায়, গড় হল একটি একক সংখ্যা যা একজাতীয় কতকগুলি সংখ্যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। এই হিসাবে গড়কে ঐ সংখ্যাশ্রেণীর প্রতিভূ বলে মনে করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার একটি ভাল পরিমাপককে নিম্নলিখিত গুণাবলী বিশিষ্ট হতে হবে ঃ

(i) এটি সহজবোধ্য হবে।

(ii) এটি সহজে মাপা যাবে।

(iii) এর মান নিরূপণে রাশিতথ্যমালার প্রত্যেকটি মান ব্যবহৃত হবে।

(iv) এর মাপন দ্ব্যর্থহীন হবে।

(v) অতিরিক্ত বীজগাণিতিক গণনা কার্যে এর ব্যবহার খুব সুবিধাজনক হবে।

(vi) এটি প্রান্তীয় মানসমূহের দ্বারা অযথা প্রভাবিত হবে না।

প্রকারভেদে কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক তিন প্রকার ঃ

(ক) গড় (Mean), (খ) মধ্যমা (Median), এবং (গ) সংখ্যাগুরু মান বা ভূয়িষ্ঠক (Mode)।

গড় আবার তিন প্রকার ঃ

(i) যৌগিক গড় (Arithmetic Mean or A.M.)

(ii) গুণোত্তর গড় (Geometric Mean or G.M.)

(iii) বিবর্ত যৌগিক গড় (Harmonic Mean or H.M.)

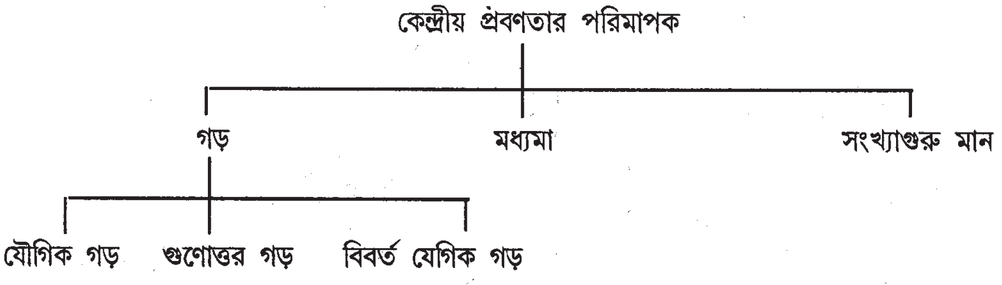

৮৭.৩ যৌগিক গড় ঃ

তিনপ্রকার মধ্যকের মধ্যে যৌগিক গড়ের ব্যবহার সর্বাধিক। সাধারণভাবে মধ্যক বলতে যৌগিক গড়কে বোঝায়। পরিসংখ্যান শাস্ত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৮৭.৩.১ যৌগিক গড়ের সংজ্ঞা [Definition of A. M.] ঃ

সমজাতীয় কতকগুলি রাশির যৌগিক গড় রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক একটি সংখ্যা এবং এর মান রাশিগুলির সমষ্টিকে রাশিগুলির মোট সংখ্যার দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ফলের সমান।

যদি, n-সংখ্যক সমজাতীয় রাশি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$-এর যৌগিক গড় $\bar{x}$ হয়, তবে

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots\ldots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1} x_i n}{n} = \frac{\sum x}{n} \ldots\ldots\ldots(1)$$

উদাহরণ ১. 10 জন শ্রমিকের মাসিক আয় যথাক্রমে 2500 টাকা, 2700 টাকা, 2400 টাকা, 2300 টাকা, 2550 টাকা, 2650 টাকা, 2750 টাকা, 2450 টাকা, 2600 টাকা, 2400 টাকা। উহাদের গড় মাসিক আয় কত ?

সমাধান ঃ মোট আয় = (2500+2700+2400+2300+2550+2650+2750+2450+2600+2400) টাকা

= 25300 টাকা

রাশির সংখ্যা = 10

$\therefore$ নির্ণেয় গড় মাসিক আয় = $\frac{25300}{10} = 2530$ টাকা

উপরোক্ত সূত্র বা উদাহরণে যে যৌগিক গড়ের কথা বলা হয়েছে, তাকে **সরল যৌগিক গড়** (Simple A.M.) বলে। যদি চলরাশি (x)-এর মানসমূহ গুরুত্বের দিক দিয়ে ভিন্ন হয়, তবে মানসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (relative importance) সাধারণত পরিসংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

মনে কর, চলরাশি x-এর n সংখ্যক মান $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$ এর পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, f_n$ এবং চলকে যৌগিক গড় $\bar{x}$ হইলে,

$$\bar{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + \ldots\ldots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + \ldots\ldots\ldots + f_n} = \frac{\sum fx}{\sum f} \ldots\ldots(2)$$

এইরূপ গড়কে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$ মানসমূহের **ভারযুক্ত যৌগিক গড়** (Weighted A.M.) বলে।

যদি চলকের মানসমূহের পরিসংখ্যাগুলি পরস্পর সমান হয়, তবে ভারযুক্ত যৌগিক গড়ের মান সরল যৌগিক গড়ের মানের সঙ্গে সমান হবে।

উদাহরণ ২. নিম্নলিখিত ছক থেকে গড় দূরভাষ বার্তা (Telephone Call)-এর সংখ্যা নির্ণয় কর।

দূরভাষ বার্তা সংখ্যা	পরিসংখ্যা
(x)	(f)
0	4
1	10
2	13
3	21
4	23
5	21
6	17
7	10
8	1
মোট	120

সমাধান ঃ গড় দূরভাষ বার্তা সংখ্যা $\overline{x}$ হলে,

$$\overline{x} = \frac{\sum xf}{\sum f} = \frac{0\times4+1\times10+2\times13+3\times21+4\times23+5\times21+6\times17+7\times20+8\times1}{120}$$

$$= \frac{476}{120} = 3.967$$

৮৭.৩.২ যৌগিক গড়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মসমূহ [Important properties of A.M.] ঃ

(1) কোন চলকের উহাদের যৌগিক গড় হইতে পার্থক্যের বীজগাণিতিক (Algebric) সমষ্টির মান শূন্য হবে।

অর্থাৎ $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = 0$ বা,

$\sum f_i(x_i - \overline{x}) = 0$

প্রমাণ ঃ (i) সরল যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে ঃ

মনে কর, $x_1, x_2, ..., x_n$ এই সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় $\overline{x}$ ।

$$\therefore\ \overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

বা, $x_1 + x_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots x_n = n\bar{x}$

এখন, $\sum(x_i - \bar{x}) = (x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \ldots\ldots\ldots + (x_n - \bar{x})$

$$= (x_1 + x_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots x_n) - n\bar{x}$$

$$= n\bar{x} - n\bar{x}$$

$$= 0.$$

(ii) ভারযুক্ত যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে ঃ

মনে কর, $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots x_k$ রাশিগুলির ভার বা পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots\ldots f_k$ এবং উহাদের যৌগিক গড় $\bar{x}$ ঃ

$$\therefore \ \bar{x} \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \ldots\ldots + f_k x_k}{f_1 + f_2 + \ldots\ldots\ldots + f_k}$$

বা, $N\bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots + f_k x_k \ \left[n = f_1 + f_2 + \ldots\ldots\ldots + f_k \text{ ধরি}\right]$

এখন, $\sum f_i(x_i - \bar{x}) = f_1(x_1 - \bar{x}) + f_2(x_2 - \bar{x}) + \ldots\ldots\ldots\ldots + f_n(x_n - \bar{x})$

$$= (f_1x_1 + f_2x_2 + \ldots\ldots\ldots + f_kx_k) - \bar{x}(f_1 + f_2 + \ldots\ldots + f_k)$$

$$= n\bar{x} - n\bar{x}$$

$$= 0$$

(2) যদি কোনও চলকের সমস্ত মানসমূহ সমান হয়, তবে উহাদের গড় ঐ মানের সঙ্গে সমান হবে।

প্রমাণ ঃ সরল যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে ঃ ধরা যাক চলক x-এর সমস্ত মান সমান ও উহা a

তাহলে $\sum_{i=1}^{n} x_i = na$ এবং $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{na}{n} = a.$

(3) যদি $y = a + bx$, x-এর একটি সরলরৈখিক অপেক্ষক, তবে চলকদ্বয় y ও x-এর যৌগিক গড়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক বর্তমান থাকবে।

প্রমাণ ঃ (i) সরল যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে ঃ

ধরা যাক, $y = a + bx$

চলক x-এর মান x_i-এর জন্য চলক y-এর মান $y_i = a + bx_i$ হবে, $i = 1, 2\ldots\ldots\ldots\ldots, n.$

এখন, $\overline{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(a + bx_i)}{n} = \frac{a\sum_{i=1}^{k} f_i + b\sum_{i=1}^{k} f_i x_i}{n}$

$= a + b.\frac{\sum_{i=1}^{k} f_i x_i}{n}$ [যেহেতু $n = \sum_{i=1}^{k} f_i$]

$= a + b\overline{x}$

(4) যদি $x_1, x_2, ..., x_{n1}$ এই n_1 সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় $\overline{x}$ এবং $y_1, y_2, ..., y_{n2}$ এই n_2 সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় $\overline{y}$ হয়, তবে $x_1, x_2, ..., x_{n1}, y_1, y_2 ...., y_{n2}$ এই $(n_1 + n_2)$ সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় হবে $\frac{n_1\overline{x} + n_2\overline{y}}{n_1 + n_2}$

প্রমাণ ঃ ধরা যাক, $x_1, x_2, ..., x_{n1}, y_1, y_2, ..., y_{n2}$ এই (n_1+n_2) সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় z।

$$\therefore\ z = \frac{x_1 + x_2 + ...+x_{n_1} + y_1 + y_2 + ...+y_{n_2}}{n_1 + n_2}$$

$$= \frac{\sum x_i + \sum y_i}{n_1 + n_2}$$

প্রশ্নানুযায়ী, $\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n_1}$ বা, $\sum x_i = n_1\overline{x}$

এবং $\overline{y} = \frac{\sum y_i}{n_2}$ বা, $\sum x_i = n_2\overline{y}$

$$\therefore\ z = \frac{\sum x_i + \sum y_i}{n_1 + n_2} = \frac{n_1\overline{x} + n_2\overline{y}}{n_1 + n_2}$$

[অনুরূপভাবে ইহা ভারযুক্ত গড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য]

সাধারণভাবে, যদি চলক x-এর t সেট মান থাকে এবং মানগুলির সংখ্যা $n_1, n_2, ... n_t$ এবং যৌগিক গড় যথাক্রমে $\overline{x}_1, \overline{x}_2, ...\overline{x}_t$ হয়, তবে একই সঙ্গে সমস্ত মানের যৌগিক গড় হবে,

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{t} n_i \bar{x}}{\sum_{i=1}^{t} n_i}$$

(5) যদি দুটি চলক x ও y এর প্রত্যেকের n-টি করে মান থাকে এবং একটি নতুন চলক $z = ax + by$ তৈরি করা হয়, তবে যৌগিক গড়ত্রয় $\bar{x}, \bar{y}$ ও $\bar{z}$-এর ক্ষেত্রে সম্পর্ক হবে $\bar{z} = a\bar{x} + b\bar{y}$

প্রমাণ ঃ যদি চলক ত্রয়ের মান x_i, y_i ও z_i ; $i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots, n$ হয় তবে,

$$z_i = ax_i + by_i$$

তাহলে, $\sum z_i = a\sum x_i + b\sum y_i$

বা, $\frac{\sum z_i}{n} = a \cdot \frac{\sum x_i}{n} + b\frac{\sum y_i}{n}$

বা, $\bar{z} = a\bar{x} + b\bar{y}$

[অনুরূপভাবে ইহা ভারযুক্ত গড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য]

৮৭.৩.৩ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে যৌগিক গড় নির্ণয় [Determination of A.M. by shortcut method] ঃ

(i) **সরল যৌগিক গড় নির্ণয় ঃ**

ধরা যাক, n সংখ্যক রাশি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$-এর যৌগিক গড় $\bar{x}$। প্রদত্ত রাশিগুলির মানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কোনও একটি রাশিকে (ধরা যাক A, যার মান প্রদত্ত রাশিগুলির ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মানের মাঝামাঝি হবে এবং সুবিধামত আন্দাজ করা যাবে) উহাদের কাল্পনিক গড় হিসাবে ধরন। যদি $\ell_1, \ell_2 \ldots\ldots\ldots, \ell_n$ যথাক্রমে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$-এর উহাদের কাল্পনিক গড় থেকে পার্থক্য হয়, তবে

$$\bar{x} = A + \frac{\sum \ell_i}{n} \ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

$$= A + \bar{\ell} \text{ হবে}$$

প্রমাণ ঃ প্রশ্নানুযায়ী, $\ell_1 = x_1 - A, \ell_2 = x_2 - A, \ldots\ldots\ldots, \ell_n = x_n - A$

সুতরাং, $x_1 = \ell_1 + A, x_2 = \ell_2 + A, \ldots\ldots\ldots, x_n = \ell_n + A.$

$$\therefore \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 \ldots\ldots + x_n}{n}$$

$$= \frac{(\ell_1 + A) + (\ell_2 + A) + \ldots\ldots\ldots + (\ell_n + A)}{n}$$

$$= \frac{(\ell_1 + \ell_2 + \ldots\ldots\ldots + \ell_n) + nA}{n} = A + \frac{\sum \ell_i}{n} = A + \bar{\ell}$$

উদাহরণ ৩. 25, 29, 33, 37, 41, 48 সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ ধরা যাক, সংখ্যাগুলির কল্পিত গড়, $A = 35$

এখন সংখ্যাগুলির কল্পিত গড় থেকে পার্থক্য যথাক্রমে, $\ell_1 = 25 - 35 = -10$, $\ell_2 = 29 - 35 = -6$

$\ell_3 = 33 - 35 = -2$, $\ell_4 = 37 - 35 = 2$, $\ell_5 = 41 - 35 = 6$, $\ell_6 = 48 - 35 = 13$

$\therefore$ সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় $\bar{x}$ হলে,

$$\bar{x} = A + \frac{\sum \ell_i}{n}$$

$$= 35 + \frac{-10 - 6 - 2 + 2 + 6 + 13}{6}$$

$$= 35 + \frac{3}{6} = 35 + 0.5 = 35.5$$

(ii) ভারযুক্ত যৌগিক গড় নির্ণয় ঃ

ধরা যাক, n সংখ্যক চলকের মান যথাক্রমে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$ এবং উহাদের পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots\ldots f_k$। কোনও একটি রাশিকে (ধরা যাক, A) উহাদের কল্পিত গড় হিসাবে ধরুন। যদি $\ell_1, \ell_2 \ldots\ldots\ldots, \ell_k$ যথাক্রমে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots x_n$-এর তাদের কল্পিত গড় থেকে পার্থক্য হয়, তবে

$$\bar{x} = A + \frac{\sum f_i \ell_i}{n} \ldots\ldots\ldots(4)$$

$= A + \bar{\ell}$ হবে ;

এখানে $\overline{x}$ হল চলকের মানগুলির নির্ণেয় যৌগিক গড় এবং $n = \sum f_i$

প্রমাণ ঃ প্রশ্নানুযায়ী, $\ell_1 = x_1 - A, \ell_2 = x_2 - A, ..., \ell_k = x_k - A$

সুতরাং, $x_1 = \ell_1 + A, x_2 = \ell_2 + A, ..., x_n = \ell_n + A.$

$$\therefore \overline{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + ...+ f_nx_n}{n}$$

$$= \frac{f_1(\ell_1 + A) + f_2(\ell_2 + A) + ...+ f_n(\ell_n + A)}{n}$$

$$= \frac{f_1\ell_1 + f_2\ell_2 + ...f_k\ell_k + A(f_1 + f_2 + ...+ f_k)}{n}$$

$$= A + \frac{\sum f_i d_i}{n} = A + \overline{\ell}$$

উদাহরণ ৪. সূত্র প্রয়োগে উদাহরণ ২-এর যৌগিক গড় নির্ণয় কর।

দূরভাষ বার্তা সংখ্যা (a)	পরিসংখ্যা (f)	কাল্পনিক গড় (A=4) থেকে পার্থক্য $\ell = x - A$	$f\ell$
0	4	– 4	– 16
1	10	– 3	– 30
2	13	– 2	– 26
3	21	– 1	– 21
4	23	0	0
5	21	1	21
6	17	2	34
7	10	3	30
8	1	4	4
মোট	N = 120		$\sum f_i\ell_i = -4$

রাশিতথ্যের যৌগিক গড় $\bar{x}$ হলে,

$$\bar{x} = A + \frac{\sum f_i \ell_i}{n} = 4 - \frac{4}{20} - 0.033 = 3.967$$

৮৭.৩.৪ শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের যৌগিক গড় নির্ণয় (Determination of A.M. from Grouped Frequency Distribution) :

শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে চলকে যৌগিক গড় নির্ণয় ভারযুক্ত যৌগিক গড় নির্ণয় পদ্ধতিতে করা যায়। এক্ষেত্রে ধরা হয় যে, একটি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে চলকের প্রতিটি মানই ঐ শ্রেণী বিভাগের মধ্য বিন্দুর (Mid-point) মানের সঙ্গে সমান। তাহলে শ্রেণী বিভাগের অন্তর্গত পরিসংখ্যাকে উক্ত মধ্যমানের ভার হিসাবে ধরে পূর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক গড় নির্ণয় করা হয়। এই নিয়ম সমান বা অসমান উভয় শ্রেণী দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তাহলে, শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন ছক চলকের যৌগিক গড় (2) বা (5) সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যাবে। বিশেষ করে, পরিসংখ্যা বিভাজনকে শ্রেণী বিভাগগুলির দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান (equal width) হয়, তবে নিম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগ করে, সহজে যৌগিক গড় নির্ণয় করা যায়।

$$\bar{x} = A + \frac{\sum f_i \ell_i}{n} \times c, \ldots\ldots\ldots\ldots(5)$$

$$= A + c.\,\bar{\ell}'_i$$

যেখানে, $\bar{x}$ = চলকের যৌগিক গড়

$n = \sum f_i =$ মোট পরিসংখ্যা

$$\ell'_i = \frac{x_i + A}{c}$$

$x_i =$ i- শ্রেণী বিভাগের মধ্যমান ; $i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots, k$

$A =$ কাল্পনিক গড়

$c =$ শ্রেণীবিভাগের দৈর্ঘ্য।

$f_i =$ i-শ্রেণী বিভাগের পরিসংখ্যা।

প্রমাণ ঃ

$$\ell'_i = \frac{x_i + A}{c}$$

বা, $x_i = A + c\ell' i$

বা, $f_i x_i = Af_i + cf_i \ell' i$

বা, $\sum f_i x_i = A \sum f_i + c \sum f_i \ell'_i$

বা, $\frac{\sum f_i x_i}{n} = A \frac{\sum f_i}{n} + c \frac{\sum f_i \ell'_i}{n}$

বা, $\bar{x} = A + c \frac{\sum f_i \ell'_i}{n}$

$= A + c\bar{\ell}'_i$

উদাহরণ ৫. সূত্র (2), (4) ও (5) প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় কর।

একটি শিল্পাঞ্চলে কারখানাগুলির মাসিক বিক্রয়ের পরিসংখ্যা বিভাজন ঃ

মাসিক বিক্রয় (হাজার টাকায়)	কারখানা সংখ্যা
300 – 350	5
350 – 400	14
400 – 450	23
450 – 500	50
500 – 550	52
550 – 600	25
600 – 650	22
650 – 700	7
700 – 750	2

সমাধান ঃ

সূত্র (2) প্রয়োগ করে প্রদত্ত রাশিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় ঃ

গণনা কার্য

মাসিক বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ (হাজার টাকায়)	মধ্যমান (x)	কারখানা সংখ্যা (f)	fx
300 – 350	325	5	1625
350 – 400	375	14	5250
400 – 450	425	23	9775
450 – 500	475	50	23750
500 – 550	535	52	27300
550 – 600	575	25	14375
600 – 650	625	22	13750
650 – 700	675	7	4725
700 – 750	725	2	1450
মোট—	—	N = 200	$\sum f_i x_i = 102000$

সুতরাং, কারখানাগুলির মাসিক বিক্রয়ের যৌগিক গড় $\overline{x}$ হলে,

$$\overline{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{102000}{200}$$ হাজার টাকা

= 510 হাজার টাকা

= 510000 টাকা

সূত্র (4) প্রয়োগ করে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় ঃ

গণনা কার্য ঃ

মাসিক বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ (হাজার টাকায়)	মধ্যমান (x)	কারখানা সংখ্যা (f)	কাল্পনিক গড় (A=525) থেকে পার্থক্য $\ell = x - A$	f1
300 – 350	325	5	– 200	– 1000
350 – 400	375	14	– 150	– 2100
400 – 450	425	23	– 100	– 2300
450 – 500	475	50	– 50	– 2500
500 – 550	525	52	0	0
550 – 600	575	25	50	1250
600 – 650	625	22	100	2200
650 – 700	675	7	150	1050
700 – 750	725	2	200	400
মোট	—	N = 200	—	– 3000

মাসিক বিক্রয়ের যৌগিক গড় $\overline{x}$ হলে,

$$\overline{x} = A + \frac{\sum f_i \ell_i}{n}$$

$$= \left(525 - \frac{3000}{200}\right) \text{ হাজার টাকা}$$

= 510 হাজার টাকা

= 510000 টাকা

সূত্র (5) প্রয়োগ করে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় নির্ণয় ঃ

গণনা কার্য ঃ

মাসিক বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ (হাজার টাকায়)	মধ্যমান (x)	কারখানা সংখ্যা (f)	কাল্পনিক গড় (A=525) থেকে পার্থক্য $\ell = x - A$	$f1'$
300 – 350	325	5	– 4	– 20
350 – 400	375	14	– 3	– 42
400 – 450	425	23	– 2	– 46
450 – 500	475	50	– 1	– 50
500 – 550	525	52	0	0
550 – 600	575	25	1	25
600 – 650	625	22	2	44
650 – 700	675	7	3	21
700 – 750	725	2	4	8
মোট	—	n = 200	—	$\sum f_i \ell'_i = -60$

মাসিক বিক্রয়ের যৌগিক গড় $\bar{x}$ হলে,

$$\bar{x} = A + \frac{\sum f_i c_i'}{n} \times c$$

$$= \left(525 - \frac{60}{200} \times 50\right) \text{ হাজার টাকা}$$

$$= 510 \text{ হাজার টাকা}$$

$$= 510000 \text{ টাকা।}$$

দ্রষ্টব্য ঃ (i) তিনটি পদ্ধতিতে নির্ণেয় যৌগিক গড়ের মানের কোনও তারতম্য হয় না।

(ii) সূত্র (5) প্রয়োগে গণনা কার্য সর্বাপেক্ষা সহজ, তবে শ্রেণীপ্রসার সমান না হলে সূত্র (4) প্রয়োগ করতে হবে।

(iii) সর্বক্ষেত্রে কল্পিত গড় 525 হাজার টাকা ধরা হয়েছে। সুবিধামত মাঝামাঝি ভিন্নমান নিলেও যৌগিক গড়ের কোনও পরিবর্তন হবে না।

৮৭.৪ গুণোত্তর গড়ের সংজ্ঞা ঃ

সমজাতীয় n-সংখ্যক রাশির গুণোত্তর গড় রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক একটি সংখ্যা এবং উহার মান রাশিগুলির গুণফলের n-তম মূলের (nth root) সমান।

যদি n সংখ্যক সমজাতীয় রাশি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$-এর গুণোত্তর গড় G হয়, তবে

$$G = (x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots x_n)^{1/n} \ldots\ldots\ldots\ldots(6)$$

ইহাকে অন্যরূপেও প্রকাশ করা হয়। (6)-এর উভয়পক্ষের logarithm লইয়া পাই,

$$\log G = \frac{1}{n}\log(x_1, x_2 \ldots\ldots\ldots x_n)$$

$$= \frac{1}{n}(\log x_1 + \log x_2 + \ldots\ldots + \log x_n)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log x_i$$

অর্থাৎ গুণোত্তর গড়ের logarithm-এর মান রাশিসমূহের logarithm-এর মানগুলির যৌগিক গড়ের সমান।

আবার যদি কোনও চলকের n সংখ্যক মান $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_k$-এর পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots, f_k$ হয়, তবে গুণোত্তর গড় G হলে,

$$G = \left\{x_1^{f_1}, x_2^{f_2} \ldots\ldots f_k^{fk}\right\}^{\frac{1}{n}} \ldots\ldots\ldots(7)$$

যেখানে $N = \sum_{i=1}^{n} f_i$

এখন (7)-এর উভয়পক্ষের logarithm লইয়া পাই,

$$\log. G = \frac{1}{n}[\, f_1 \log x_1 + f_2 \log x_2 + \ldots\ldots + f_k \log x_k\,]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} f_i \log x_i$$

অর্থাৎ এক্ষেত্রে গুণোত্তর গড়ের logarithm-রাশিগুলির logarithm-এর ভারযুক্ত গড়ের সমান।

উদাহরণ ৬. 9, 24, 64 সংখ্যা তিনটির গুণোত্তর গড় নির্ণয়।

সমাধান ঃ প্রদত্ত সংখ্যা তিনটির গুণোত্তর গড় G হলে,

$$G = (9 \times 24 \times 64)^{\frac{1}{3}} = (3 \times 3 \times 8 \times 3 \times 4 \times 4 \times 4)^{\frac{1}{3}} = (3^3 \times 2^3 \times 4^3)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 3 \times 2 \times 4 = 24$$

উদাহরণ ৭. নিম্নলিখিত পাঁচটি সংখ্যার গুণোত্তর গড় নির্ণয় কর ঃ

47, 52, 66, 85, 123

সমাধান ঃ প্রদত্ত পাঁচটি সংখ্যার গুণোত্তর গড় G হলে,

$$\log G = \frac{1}{5}[\log 47 + \log 52 + \log 66 + \log 85 + \log 123]$$

$$= \frac{1}{5}[1.6721 + 1.7160 + 1.8195 + 1.9294 + 2.0899]$$

$$= \frac{1}{5} \times 9.2269 = 1.8454$$

$\therefore G = \text{Anti}\log(1.8454) = 70.04$

উদাহরণ ৮. গুণোত্তর গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত ভারযুক্ত শ্রেণীসূচক বিভাজন ছক থেকে সাধারণ সূচক নির্ণয় কর।

শ্রেণী	A	B	C	D	E	F
শ্রেণীসূচক	118	120	97	107	111	93
ভার	4	1	2	6	5	2

সমাধান ঃ

গণনা কার্য ঃ

শ্রেণী	শ্রেণী সূচক (x)	ভার (f)	log x	f (log x)
A	118	4	2.0719	8.2876
B	120	1	2.0792	2.0792
C	97	2	1.9868	3.9736
D	107	6	2.0294	12.1764
E	111	5	2.0453	10.2265
F	93	2	1.9685	3.9370
মোট	—	20	—	40.6803

এখন, গুণোত্তর গড় G হলে, $\log G = \frac{1}{n}\sum f_i \log x_i$

$$= \frac{40.6803}{20}$$

$$= 2.0340$$

$\therefore$ G = Anti log (2.0340) = 108.1

৮৭.৫ বিবর্ত যৌগিক গড়ের সংজ্ঞা (Definition of H.M.)

সমজাতীয় কতকগুলি রাশির বিবর্ত যৌগিক গড় রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক একটি সংখ্যা এবং উহা রাশিগুলির অনোন্যকের reciprocal যৌগিক গড়ের অনোন্যকের সমান।

যদি n-সংখ্যক সমজাতীয় রাশি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$-এর বিবর্ত যৌগিক গড় H হয়, তবে

$$H = \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots..+\frac{1}{x_n}} \ldots\ldots..(8)$$

আবার, যদি $x_1, x_2, \dots\dots\dots, x_k$ রাশিগুলির পরিসংখ্যা বা ভার যথাক্রমে $f_1, f_2, \dots\dots\dots, f_k$ এবং উহাদের বিবর্ত যৌগিক গড় H হয়, তবে

$$H = \frac{n}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2} + \dots\dots\dots + \frac{f_k}{x_k}} \dots\dots\dots\dots(9)$$

যেখানে, $n = \sum f_i$

উদাহরণ ৯. এক ব্যক্তি সাইকেলে ঘণ্টায় 20 কিমি. বেগে x হইতে y-তে যায় এবং ঘণ্টায় 24 কিমি. বেগে ফিরে আসে। তার ঘণ্টায় গড় গতিবেগ কত ?

সমাধান ঃ এক্ষণে গড় গতিবেগ নির্ণয় করার জন্য বিবর্ত যৌগিক গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যথোপযুক্ত।

$\therefore$ গড় গতিবেগ, $H = \frac{2}{\frac{1}{20} + \frac{1}{24}}$ কিমি/ঘণ্টা

$= \frac{240}{11}$ কিমি/ঘণ্টা

$= 21.82$ কিমি/ঘণ্টা

উদাহরণ ১০. এক ব্যক্তি প্রতি ঘণ্টায় 4 মাইল বেগে 12 মাইল, আবার প্রতি ঘণ্টায় 5 মাইল বেগে 10 মাইল ভ্রমণ করে। ঐ ব্যক্তির গড় গতিবেগ কত ?

সমাধান ঃ এক্ষণে গড় গতিবেগ নির্ণয় করার জন্য ভারযুক্ত বিবর্ত যৌগিক গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করা যথোপযুক্ত।

গণনা কার্য ঃ

গতিবেগ (x)	**অতিক্রান্ত পথ** (f)	(f/x)
4	12	3
5	10	2
মোট	22	5

$\therefore$ গতিবেগ, $H = \frac{n}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2}}$

$= \frac{22}{5}$ মাইল/ঘণ্টা

$= 4.4$ মাইল/ঘণ্টা

৮৭.৫.১ বিভিন্ন প্রকার গড়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

(i) যে-কোন সংখ্যক সংখ্যার যৌগিক গড় (A.M.), গুণোত্তর গড় (G.M.) এবং বিবর্ত যৌগিক গড়ের (H.M.) মধ্যে সম্পর্ক হল ঃ

$$A.M. \geq G.M. \geq H.M.$$

(ii) কেবলমাত্র দুটি প্রদত্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে,

$$A.M. \times H.M. = (G.M)^2$$

৮৭.৬ মধ্যমা (Median)

সমজাতীয় কতকগুলি রাশির মধ্যমা রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক একটি সংখ্যা এবং ইহার মান রাশিগুলিকে মানের উর্ধ্বক্রমে (ascending order) সাজালে যে রাশিটির অবস্থান ঠিক মাঝখানে হয় তার সমান। অর্থাৎ মধ্যমা রাশিতথ্যমালাকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করে। একটি ভাগের মধ্যের প্রত্যেকটির রাশির মান মধ্যমা অপেক্ষা কম এবং অপর ভাগের প্রত্যেকটি রাশির মান মধ্যমা অপেক্ষা বেশি।

(i) **সরল শ্রেণীর** (simple series) ক্ষেত্রে রাশিতথ্যমালায় মোট রাশির সংখ্যা অযুগ্ম (odd) হলে, উহাদের মানের ক্রম-অনুযায়ী সাজিয়ে ঠিক মাঝখানে একটি রাশি পাওয়া যাবে এবং ঐ রাশিটি মধ্যমা হবে। কিন্তু মোট রাশির সংখ্যা যদি যুগ্ম (even) হয়, তবে মানের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে মধ্যম স্থানে দুটি রাশি পাওয়া যাবে যাদের মধ্যের যে কোনও সখযাকে মধ্যমা হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে নির্দিষ্ট একটি মান পাওয়ার জন্য ঐ মানদ্বয়ের যৌগিক গড়কে মধ্যমা হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ যদি রাশিতথ্যমালায় মোট রাশির সংখ্যা n (অযুগ্ম) হয়, তবে উহাদের মানের ক্রমানুসারে পরপর সাজালে $\frac{n+1}{2}$ তম রাশির মান মধ্যমা হবে এবং n (যুগ্ম) হলে, $\frac{n}{2}$ তম ও $\left(\frac{n}{2}+1\right)$-তম রাশিদ্বয়ের যৌগিক গড় মধ্যমা হবে।

(ii) পরিসংখ্যা ছকের মাধ্যমে প্রদত্ত রাশিমালা থেকে মধ্যমার মান নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে কেবলমাত্র স্থূলভাবে (approximately) নির্ণয় করা যায়।

$$M = \ell_1 + \frac{\left(\frac{n}{2} - F\right)}{f_m} \times \ell, \ldots\ldots\ldots(10)$$

যেখানে, M = নির্ণেয় মধ্যমার মান,

n = মোট পরিসংখ্যা,

ℓ_2 = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা আছে তার নিম্নসীমানা,

F = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা আছে তার নিচের শ্রেণী বিভাগের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা

f_m = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা আছে তার পরিসংখ্যা,

এবং c = যে শ্রেণী বিভাগে মধ্যমা আছে তার দৈর্ঘ্য।

উদাহরণ ১১. নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির মধ্যমা নির্ণয় কর ঃ

(i) 32, 22, 29, 17, 40, 26, 21

(ii) 88, 72, 33, 29, 70, 86, 54, 91, 61, 57

সমাধান ঃ (i) সংখ্যাগুলিকে মানের উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাই,

17, 21, 22, 26, 29, 32, 40

মোট রাশির সংখ্যা = 7

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমা = $\left(\frac{7+1}{2}\right)$তম বা ৪র্থ স্থানে রাশির মান = 26

(ii) সংখ্যাগুলিকে মানের উর্ধ্বক্রম সাজিয়ে পাই,

29, 33, 54, 57, 61, 70, 72, 86, 88, 91

এখানে রাশির মোট সংখ্যা = 10

নির্ণেয় মধ্যমা $\frac{10}{2}$-তম বা ৫ম ও $\left(\frac{10}{2}+1\right)$-তম বা ৬ষ্ঠ মানের মধ্যবর্তী অর্থাৎ 61 ও 70-এর মধ্যে যে কোনও সংখ্যা হবে। তবে উহাদের যৌগিক গড় $\frac{61+70}{2}$ বা, 65.5-কে নির্দিষ্ট মধ্যমা হিসাবে ধরা হবে।

উদাহরণ ১২. নিম্নলিখিত সরল পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের মধ্যমা নির্ণয় কর ঃ

x	0	1	2	3	4	5	6	মোট
f	7	44	35	16	9	4	1	116

সমাধান ঃ

গণনা কার্য ঃ

x	f	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (নিচ থেকে)
0	7	7
1	44	51
2 ⟵	35	⟶ 86
3	16	102
4	9	111
5	4	115
6	1	116 (= N)
মোট	116	

এক্ষণে $\frac{n}{2} = 58$। এই 58-এর স্থান ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা স্তম্ভে 86-এর মধ্যে। ঐ সারিতে চলক x-এর মান 2। সুতরাং, নির্ণেয় মধ্যমা = 2

উদাহরণ ১৩. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনের মধ্যমা নির্ণয় কর ঃ

একটি কারখানায় 300 জন শ্রমিকের মাসিক আয়ের পরিসংখ্যা বিভাজন ঃ

মাসিক আয় (টাকায়)	শ্রমিক সংখ্যা
1000 – 1100	16
1100 – 1200	24
1200 – 1300	59
1300 – 1400	100
1400 – 1500	41
1500 – 1600	31
1600 – 1700	19
1700 – 1800	10
মোট	300

সমাধান ঃ

গণনা কার্য ঃ

মাসিক আয়ের শ্রেণীবিভাগ (টাকায়)	শ্রমিক সংখ্যা (f)	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা
1000 – 1100	16	16
1100 – 1200	24	40
1200 – 1300	59	99 (=F)
1300 – 1400 ⟵	100 (fm) ⟶	199
1400 – 1500	41	240
1500 – 1600	31	271
1600 – 1700	19	290
1700 – 1800	10	300
মোট	300 (=n)	—

এক্ষণে, $\frac{N}{2} = \frac{300}{2} = 150$

যে শ্রেণী বিভাগের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা মোট পরিসংখ্যার অর্ধেকের ঠিক বেশি (just greater), তাতে মধ্যমা আছে। এখানে শ্রেণীবিভাগ 1300 – 1400 তে মধ্যমা আছে।

এখানে ℓ_1 = মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমানা = 1300

F = মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমানা (অর্থাৎ 1200 – 1300)

ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা = 99

f_m = মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা = 100

c = মধ্যমা শ্রেণীর দৈর্ঘ্য = 100

$$\therefore M = \ell_1 + \frac{\frac{n}{2} - F}{f_m} \times c$$

$$= 1300 + \frac{150 - 99}{100} \times 100$$

$$= 1351$$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যমার মান = 1351 টাকা।

৮৭.৭ সংখ্যাগুরুমান বা ভূয়িষ্ঠক (Mode) ঃ

সমজাতীয় কতকগুলির রাশির সংখ্যাগুরু মান রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক একটি সংখ্যা ও উহার মান রাশিতথ্যমালায় যেমনটি সর্বাপেক্ষা বেশি বার রয়েছে তার সমান। বাণিজ্যে সংখ্যাগুরু মান বেশি ব্যবহৃত হয়। আবহবার্তা বিভাগেও এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

কোনও একটি বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান সবসময় থাকবে এমন কোনও কথা নেই। উদাহরণস্বরূপ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 বিভাজনের কোনও সংখ্যাগুরু মান নেই। আবার কেনাও কোনও বিভাজন ছকের একাধিক সংখ্যাগুরু মান থাকতে পারে। যেমন 1, 3, 5, 8, 11, 5, 6, 2, 5, 9 বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান 5 অর্থাৎ বিভাজনটির একটি সংখ্যাগুরু মান আছে। আবার 1, 5, 4, 3, 8, 4, 5, 6, 9, 5 বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান দুটি অর্থাৎ 4 এবং 5। একটি সংখ্যাগুরু মান থাকলে উক্ত বিভাজন ছককে একক সংখ্যাগুরু মান-বিশিষ্ট পরিসংখ্যা বিভাজন (Unimodal Frequency Distribution) বলে। দুই বা ততোধিক সংখ্যাগুরু মান থাকলে উক্ত বিভাজন ছককে দুই বা বহুল সংখ্যাগুরু মান-বিশিষ্ট পরিসংখ্যা বিভাজন (Bimodal or Multimodal Distribution) বলে।

(i) সরল পরিসংখ্যা বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান হল চলকের সেই মান যার পরিসংখ্যা সর্বাধিক।

(ii) শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। স্থূলভাবে (approximately) সমান শ্রেণীদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিভাজনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করা হয়।

$$\text{সংখ্যাগুরু মান} = \ell_1 + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \times c \text{..........(11)}$$

যেখানে ℓ_1 = সংখ্যাগুরু মান শ্রেণীবিভাগের (Modal Class) নিম্ন সীমানা

d_1 = সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা ও তার ঠিক পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যার পার্থক্য

d_2 = সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা ও তার ঠিক পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যার পার্থক্য

c = সংখ্যাগুরু মান শ্রেণীর দৈর্ঘ্য

যদি f_0, f_{-1}, f_1 যথাক্রমে সংখ্যাগুরু শ্রেণী, তৎপূর্ববর্তী শ্রেণী ও তৎপরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা হয় তবে

$d_1 = f_0 - f_{-1}$ এবং $d_2 = f_0 - f_1$

যদি পরিসংখ্যা বিভাজনের শ্রেণী দৈর্ঘ্যগুলি সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট না হয়, তবে ঐ সব শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব নিয়ে কাজ করতে হয়। মধ্যক, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানের স্থূল (approximate) সম্পর্ক।

মধ্যক — সংখ্যাগুরু মান = 3 (মধ্যক — মধ্যমা)

ব্যবহার করেও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণ ১৪. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর।

ওজন (কিগ্রা)	পরিসংখ্যা
45	8
50	15
55	25
60	28
65	14
70	10
মোট	100

সমাধান ঃ যেহেতু 60 কিগ্রা ওজনের পরিসংখ্যা 28 ও ইহাই সর্বোচ্চ। তাই সংখ্যাগুরু মান 60 কিগ্রা।

উদাহরণ ১৫. নিম্নলিখিত বিভাজন ছকে 100টি দোকানের প্রত্যেক মাসের লাভ টাকাতে দেওয়া আছে। সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর।

লাভ (টাকায়)	0 – 100	100 – 200	200 – 300	300 – 400	400 – 500	500 – 600
দোকানের সংখ্যা	12	18	27	20	17	6

সমাধান ঃ সংখ্যাগুরু শ্রেণী $= 200 - 300$

এখানে $f_0 = 27, f_{-1} = 18, f_1 = 20$

$d_1 = f_0 - f_{-1} = 27 - 18 = 9$

$d_2 = f_0 - f_1 = 27 - 20 = 7$

$c = 100$

$\ell_1 = 200$

$\therefore$ সংখ্যাগুরু মান $= 200 + \dfrac{9}{9+7} \times 100$

$= 256.25$ টাকা

৮৭.৭.১ যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানের তুলনা ঃ

(i) একটি ভালো পরিমাপক সুসংজ্ঞাত হবে। যৌগিক গড় ও সংখ্যাগুরু মান সুসংজ্ঞাত। রাশির সংখ্যা যুগ্ম ছাড়া মধ্যমাও সুসংজ্ঞাত।

(ii) ভালো পরিমাপক সহজে নির্ণয় করা যাবে। তিনটি পরিমাপকই প্রায় সমান শ্রমসাধ্য। অবিচ্ছিন্ন

(Continuous) চলকের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চলকের কয়েকটি মান দেওয়া থাকলে সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় করা অসুবিধাজনক।

(iii) ভালো পরিমাপক সহজবোধ্য হবে। তিনটি পরিমাপকই সহজবোধ্য। তবে যৌগিক গড় অধিকতর সহজবোধ্য।

(iv) ভালো পরিমাপক সমস্ত রাশির ওপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হবে। তিনটি পরিমাপের মধ্যে যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে এবং মধ্যমাও সংখ্যাগুরু মানের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সমস্ত রাশির মান নেওয়া হয়। অর্থাৎ, রাশির তথ্যমালার একটি মান পরিবর্তন হলে যৌগিক গড়ের মান পরির্বতন হবে, কিন্তু মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানের ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। রাশিমালার মধ্যে যদি দু-একটি অস্বাভাবিক বড় বা ছোট মান থাকে তাতে যৌগিক গড় বিশেষভাবে প্রভাবিত হবে, মধ্যমা বা সংখ্যাগুরু মান প্রভাবিত হবে না।

(v) ভালো পরিমাপকের ক্ষেত্রে সরল বীজগাণিতিক ধর্ম থাকা বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র যৌগিক গড়ের ক্ষেত্রে এটি প্রতিফলিত হয়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানের ক্ষেত্রে হয় না।

(vi) প্রান্তীয় শ্রেণীবিভাগ মুক্ত (open) হলে মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান প্রভাবিত হয় না, কিন্তু যৌগিক গড় নির্ণয় অসুবিধাজনক।

৮৭.৮ বিস্তৃতির পরিমাপ (Measures of Dispersion) ঃ

যে সংখ্যাগত পরিমাপের সাহায্যে কোনও পরিসংখ্যা বিভাজন বা রাশিতথ্যমালার মানগুলি তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের চারদিকে কীভাবে বিস্তৃত (dispersed) অথবা মানগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের মানের পার্থক্য (deviation) অথবা প্রভেদ (variation) প্রকাশ করে, তাকে বিস্তৃতির পরিমাপ বলে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক সংখ্যার (গড় বা মধ্যমা বা সংখ্যাগুরু মান) দ্বারা কোনও পরিসংখ্যা বিভাজন বা রাশিতথ্যমালার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারা যায় না। নিম্নলিখিত উদাহরণ পর্যালোচনা করলে তা বুঝতে পারা যাবে।

A — শ্রেণী — 30, 32, 36, 38, 39 মোট — 175

B — শ্রেণী — 4, 19, 36, 53, 63 মোট — 175

প্রদত্ত শ্রেণীদ্বয়ের যৌগিক গড় একই অর্থাৎ 35। এমনকি মধ্যমাও একই ও উহা 36। ফলে শুধু গড় বা মধ্যমা দিয়ে বিচার করলে শ্রেণীদ্বয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে না। তবে দেখা যাচ্ছে: A-শ্রেণীর মানগুলি একে অন্যের কাছাকাছি এবং উহা গড় ও মধ্যমারও কাছাকাছি। কিন্তু B-শ্রেণীর মানগুলির মধ্যে সেরকম কোনও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে না এবং একে অপরের থেকে খুবই ছড়ানো অবস্থায় আছে। এই জন্য আমরা B-শ্রেণীর মানগুলি A-শ্রেণীর মানগুলি থেকে বেশি ছড়িয়ে আছে বলতে পারি। এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, কেবলমাত্র গড় পরিসংখ্যা বিভাজনের সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় এবং যেহেতু বিস্তৃতির পরিমাপের প্রয়োজন আছে।

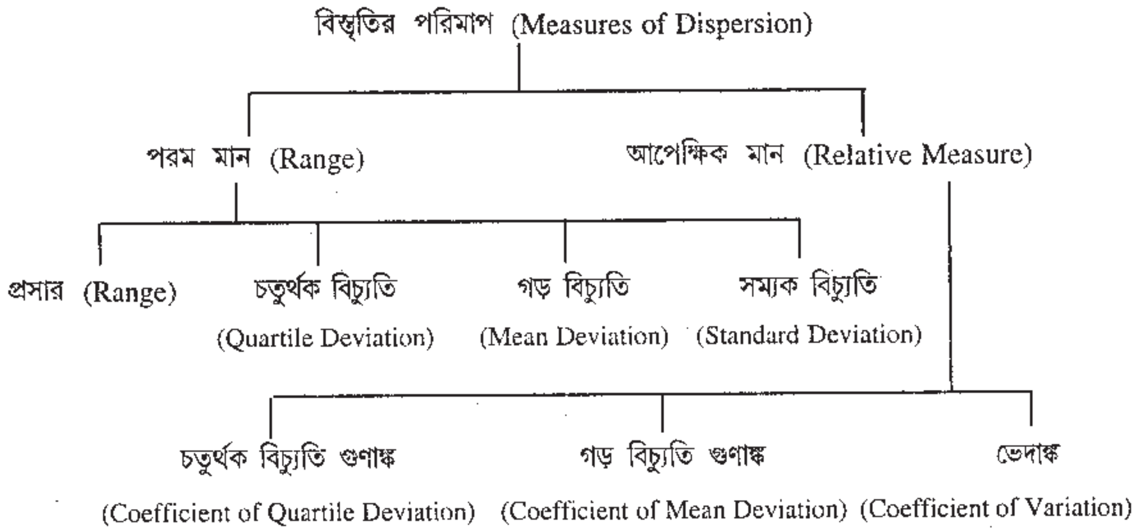

৮৮.৮.১ বিস্তৃতির পরম পরিমাপসমূহ (Absolute Measures of Dispersion) ঃ

বিস্তৃতির পরম পরিমাপগুলি হল ঃ

(i) প্রসার (Range)

(ii) চতুর্থক বিচ্যুতি (Quartile Deviation or Semi-interquartile range)

(iii) গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation)

(iv) সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation)

রাশিতথ্যমালার মানগুলি যে এককে প্রকাশিত হয়, পরম বিস্তৃতির পরিমাপও সেই এককে প্রকাশ করা হয়।

(i) **প্রসার (Range) :**

প্রসার হল রাশিতথ্যমালার রাশিগুলির বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রাশিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যের মান।

অর্থাৎ, প্রসার = বৃহত্তম মান—ক্ষুদ্রতম মান।

ইহা খুব সহজবোধ্য এবং খুব সহজে ও অল্পসময়ে নির্ণয় করা যায়। পরিসংখ্যা বিভাজনে প্রান্তীয় শ্রেণীবিভাগ যদি মুক্ত (open) থাকে, তবে এইটি পরিমাপ করা যায় না। প্রসার একই হলেও রাশিমালার বিচ্যুতি আলাদা হওয়া সম্ভব। বাস্তবে বিস্তৃতির পরিমাপ হিসাবে এটি খুব কম ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ ১৬. নিম্নলিখিত রাশিগুলির (টাকায়) প্রসার নির্ণয় কর।

6, 4, 1, 6, 5, 10, 3

সমাধান ঃ এখানে সর্বোচ্চ মান = 10

সর্বনিম্ন মান = 1

$\therefore$ নির্ণেয় প্রসার = (10 – 1) টাকা = 9 টাকা

(ii) চতুর্থক বিচ্যুতি **(Quartile Deviation or Semi-interquartile Range) :**

রাশিমালার মানগুলিকে উর্ধ্বক্রমে সাজালে ঠিক মধ্যম স্থানের রাশিটিকে মধ্যমা বলা হয়। রাশিতথ্যমালাকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজালে উহার এক-চতুর্থাংশ, দুই-চতুর্থাংশ ও তিন-চতুর্থাংশ অবস্থানে স্থিত রাশি তিনটির মানই তিনটি চতুর্থকের মান। এক-চতুর্থাংশ অবস্থা স্থিত রাশির মানকে প্রথম চতুর্থক (First Quartile) বা নিম্ন চতুর্থক (Lower Quartile) এবং তিন-চতুর্থাংশ অবস্থানে স্থিত রাশির মানকে তৃতীয় চতুর্থক (Third Quartile) বা উচ্চ চতুর্থক (Upper Quartile) বলে। দ্বিতীয় চতুর্থকের মান রাশিমালার মধ্যমার মানের সমান হবে। সাধারণত প্রথম [illegible] Q_1 এবং তৃতীয় চতুর্থক Q_3 দ্বারা সূচিত করা হয়। রাশিতথ্যমালার রাশিগুলির মোট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ Q_1 অপেক্ষা ছোট ও তিন-চতুর্থাংশ উহার চেয়ে বড় হয় এবং মোট সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ Q_3 অপেক্ষা ছোট এবং এক-চতুর্থাংশ উহার চেয়ে বড় হয়। এদের একটি সাধারণ পরিমাপ হচ্ছে দশমক (Decile) অথবা শততমক (Percentile)। একটি দশমীক বা শততমক, z_p, p-তম মান হচ্ছে সেই মান যার নিচে p-অংশক রাশি ও উপরে (1–p) অংশক রাশি রয়েছে।

সরল বিভাজন ছকের ক্ষেত্রে, যদি রাশিগুলির মোট সংখ্যা n হয় এবং উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়, তবে $\frac{n}{4}$-তম এবং $\frac{3n}{4}$-তম অবস্থানের রাশিদ্বয়ের মান যথাক্রমে Q_1 ও Q_2-এর মান হবে।

শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা ছকের ক্ষেত্রে, প্রদত্ত রাশিমালার চতুর্থকদ্বয়ের মান নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগ করতে হবে।

$$Q_1 = \ell_1 + \frac{\left(\frac{n}{4} - F\right)}{f_m} \times c \text{.........}(12)$$

$$Q_3 = \ell_1 + \frac{\left(\frac{3n}{4} - F\right)}{f_m} \times c \text{.........}(13)$$

যেখানে, ℓ_1 = যে শ্রেণীবিভাগে প্রথম বা তৃতীয় চতুর্থক থাকে তার নিম্ন সীমানা,

F = যে শ্রেণীতে প্রথম বা তৃতীয় চতুর্থক আছে তার নিচের শ্রেণীর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা,

f_m = যে শ্রেণীতে প্রথম বা তৃতীয় চতুর্থক আছে তার পরিসংখ্যা,

c = যে শ্রেণীতে প্রথম বা তৃতীয় চতুর্থক আছে তার দৈর্ঘ্য এবং

n = মোট পরিসংখ্যা।

নিম্ন ও উচ্চ চতুর্থক থেকে অন্য একটি বিস্তৃতির পরিমাপ পাওয়া যায়। যদি চতুর্থকদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশি হয়, তবে রাশিমালার বিস্তৃতিও বেশি হবে। মধ্যমা থেকে নিম্ন চতুর্থকের পার্থক্য এবং উচ্চ চতুর্থকের থেকে

মধ্যমার পার্থক্যের গড়কে একটি নতুন বিস্তৃতির পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহাকে চতুর্থক বিচ্যুতি বলা হয়। তাহলে,

$$\text{চতুর্থক বিচ্যুতি } (Q) = \frac{(M - Q_1) + (Q_3 - M)}{2}$$

$$= \frac{Q_3 - Q_1}{2} \quad \text{.........(14)}$$

যেখানে, Q_1 = নিম্ন চতুর্থক বা প্রথম চতুর্থক,

Q_3 = উচ্চ চতুর্থক বা তৃতীয় চতুর্থক।

চতুর্থক বিচ্যুতিকে অর্ধ-চতুর্থক প্রসারও (Semi Interquartile Range) বলা হয়।

উদাহরণ ১৭. উদাহরণ ১১ (ii) -এর চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ সংখ্যাগুলিকে মানের উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

29, 33, 54, 57, 61, 70, 72, 86, 88, 91

মোট রাশির সংখ্যা = $n = 10$.

$\therefore$ প্রথম চতুর্থক $(Q_1) = \frac{n}{4}$ তম বা 2.5 তম রাশি $\simeq$ 3 তম রাশি = 54

$\therefore$ তৃতীয় চতুর্থক $(Q_3) = \frac{3n}{4}$ তম বা 7.5তম রাশি $\simeq$ 8 তম রাশি = 86

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থক বিচ্যুতি $(Q) = \frac{86 - 54}{2} = 16$

উদাহরণ ১৮. উদাহরণ ১২-এর চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ এখানে, $\frac{N}{4} = \frac{116}{4} = 29$ এবং $\frac{3N}{4} = 87$

ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা স্তম্ভ পর্যবেক্ষণ করে পাই,

প্রথম চতুর্থক $(Q_1) = 1$ এবং তৃতীয় চতুর্থক $(Q_3) = 3$

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থক বিচ্যুতি $(Q) = \frac{3 - 1}{2} = 1$

উদাহরণ ১৯. উদাহরণ ১৩-এর চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ এখানে $\frac{n}{4} = \frac{300}{4} = 75$ এবং $\frac{3n}{4} = 225$

$\therefore$ প্রথম চতুর্থক $= 1200 + \frac{(75-40)}{59} \times 100$

$= 1259.32$ টাকা

$\therefore$ তৃতীয় চতুর্থক $(Q_3) = \ell_1 + \frac{\left(3\frac{n}{4} - F\right)}{f_m} \times c$

$= 1400 + \frac{(225-199)}{41} \times 100$

$= 1463.41$ টাকা

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থক বিচ্যুতি $(Q) = \frac{(Q_3 - Q_1)}{2} = 102.045$ টাকা

(iii) গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) :

গড় বিচ্যুতি হল কোনও একটি চলকের মানগুলির কোনও একটি (কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকের গড়, মধ্যমা বা সংখ্যাগুরু মান) মান থেকে উহাদের মানগুলির বিস্তৃতির একটি পরম পরিমাপ এবং উহার মান, যৌগিক গড়, মধ্যমা বা ভূয়িষ্ঠক থেকে চলকের মানগুলির ধনাত্মক পার্থক্যের যৌগিক গড়ের সমান।

যদি কোনও একটি চলকের n-সংখ্যক মানগুলি যথাক্রমে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$ এবং ঐ মানগুলির যৌগিক গড় x হয় তবে, $\overline{x}$ এর সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি হ'ল—

$$MD_{\overline{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \overline{x}|}{n} \ldots\ldots\ldots\ldots(15)$$

আবার, যদি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_k$ এর পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots\ldots, f_k$ হয়, তবে গড় বিচ্যুতি,

$$MD_{\overline{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{k} |x_i - \overline{x}| f_i}{n}, \ldots\ldots\ldots(16)$$

যেখানে, $n = \sum_{i=1}^{k} f_i$

উদাহরণ ২০. নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় ও মধ্যমার সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

46, 79, 26, 85, 39, 65, 99, 29, 56, 72

সমাধান ঃ প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই,

26, 29, 39, 46, 56, 65, 72, 79, 85, 99

এখানে, $n = 10$

$\therefore \frac{n}{2}$ তম বা 5 তম ও $\left(\frac{n}{2}+1\right)$-তম বা 6 তম মানের যৌগিক গড় $\frac{56+65}{2} = 60.5$-কে মধ্যমা হিসাবে ধরা যাক।

আবার সংখ্যাগুলির য�ৌগিক গড় $= \frac{26+29+39+46+56+65+72+79+85+99}{10}$

$$= \frac{596}{10} = 59.6$$

গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

রাশির মান (x)	রাশিগুলির যৌগিক গড় থেকে ধনাত্মক পার্থক্য = $\mid x = 59.6 \mid$	রাশিগুলির মধ্যমা থেকে ধনাত্মক পার্থক্য = $\mid x - 60.5 \mid$
26	33.6	34.5
29	30.6	31.5
39	20.6	21.5
46	13.6	14.5
56	3.6	4.5
65	5.4	4.5
72	12.4	11.5
79	19.4	18.5
85	25.4	24.5
99	39.4	38.5
মোট	204.0	204.0

$\therefore$ যৌগিক গড়ের সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতির মান, $MD_{\bar{x}} = \frac{204}{10} = 20.4$

$\therefore$ মধ্যমার সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতির মান, $MD_{Me} = \frac{204}{10} = 20.4$

উদাহরণ ২১. উদাহরণ (২)-এর ক্ষেত্রে মধ্যমার সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য গণনাকার্য ঃ

দূরভায (x)	পরিসংখ্যা (f)	যৌগিক পরিসংখ্যা	$\lvert x - Me \rvert$	$\lvert x - Me \rvert f$
0	4	4	4	16
1	10	14	3	30
2	13	27	2	26
3	21	48	1	21
4	23	71	0	0
5	21	92	1	21
6	17	109	2	34
7	10	119	3	30
8	1	120	4	4
মোট	120	—	—	182

এখানে মধ্যমা, $Me = 4$.

$\therefore$ মধ্যমার সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি, $MD_{Me} = \frac{182}{120} = 15.17$ (প্রায়)

(iv) সম্যক বা প্রমাণ বিচ্যুতি (Standard Deviation) ঃ

সম্যক বিচ্যুতি বিস্তৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরম পরিমাপক এবং ইহার মান রাশিমালার যৌগিক গড় থেকে রাশিগুলির পার্থক্যের বর্গের যৌগিক গড়ের ধনাত্মক বর্গমূলের সমান।

সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়ের সূত্রাবলী ঃ

(ক) সরল সংখ্যাশ্রেণীর সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও একটি সূত্র প্রয়োগে করা যায় ঃ

(i) $s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n}}$ ....(17)

(ii) $s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$ ....(18)

(খ) পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে সম্যক বিচ্যুতি নিম্নলিখিত যে কোনও একটি সূত্র প্রয়োগে করা যায় ঃ

(i) $s = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2 f_i}{n}}$ ....(19)

(ii) $s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{n} - \left(\frac{\sum x_i f_i}{n}\right)^2}$ ....(20)

$$= \sqrt{n\sum x_i^2 f_i - (\sum x_i f_i)^2} \;/\; n$$

যেখানে, s : সম্যক বা প্রমাণ বিচ্যুতির প্রতীক।

m : রাশিগুলির মোট সংখ্যা।

$\bar{x}$: $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$-এর যৌগিক গড়।

$n = \sum f_i =$ পরিসংখ্যা বিভাজনের মোট পরিসংখ্যা।

সম্যক বা প্রমাণ বিচ্যুতির ধর্ম ঃ

(ক) যদি চলকের মানগুলি সমান হয়, তবে সম্যক বিচ্যুতির মান শূন্য হবে। অর্থাৎ,

$x_i = c \,;\, i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots, n$ হলে $s = 0$.

(খ) সম্যক বিচ্যুতির মান মূল বিন্দুর অবস্থানের ওপর (Origin) নির্ভর করে না, কিন্তু চলকের একক বা স্কেলের (Unit or Scale) ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, যদি $\ell = \frac{x - a}{c}$ হয়, তবে $s_x = |c|\, s_{\ell}$

(গ) যদি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n$-এই n_1 সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় ও সম্যক বিচ্যুতি $\bar{x}$ ও s_x এবং $y_1, y_2, \ldots\ldots\ldots\, y_{n2}$-এই n_2 সংখ্যক রাশির যৌগিক গড় ও সম্যক বিচ্যুতি $\bar{y}$ ও s_y হয়, তবে $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, y_{n2}$-এই $(n_1 + n_2)$ সংখ্যক রাশির সম্যক বিচ্যুতি হবে

$$\sigma = \left\{\frac{n_1 s_x^2 + n_2 s_y^2}{n_1 + n_2} + \frac{n_1(\bar{x} - \bar{\bar{x}})^2 + n_2(\bar{y} - \bar{\bar{y}})^2}{n_1 + n_2}\right\}^{\frac{1}{2}}$$

যেখানে, $\bar{\bar{x}} = \frac{n_1 \bar{x} + n_2 \bar{y}}{n_1 + n_2}$

(ঘ) সম্যক বিচ্যুতি রাশিগুলির পার্থক্যের বর্গের যৌগিক গড়ের ধনাত্মক বর্গমূলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট। অর্থাৎ, $\sqrt{\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2} \le \sqrt{\frac{1}{n}\sum (x_i - A)^2}$ যে কোনও A-এর জন্য।

উদাহরণ ২২. নিম্নলিখিত রাশিগুলির সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর ঃ

49, 63, 46, 59, 65, 52, 60, 54

সমাধান ঃ

সম্যক বিচ্যুতির গণনা কার্য ঃ

রাশি (x)	যৌগিক গড় 56 হইতে রাশিগুলির পার্থক্য, $d = x - 56$	d^2
49	-7	49
63	7	49
46	-10	100
59	3	9
65	9	81
52	-4	16
60	4	16
54	-2	4
448	—	**324**

রাশিগুলির যৌগিক গড়, $\bar{x} = \frac{448}{8} = 56$

$\therefore$ নির্ণেয় সম্যক বিচ্যুতি $\therefore s = \sqrt{\frac{\sum d^2}{n}} = \sqrt{\frac{324}{8}} = \frac{9}{2}\sqrt{2} = 6.36$ (প্রায়)

উদাহরণ ২৩. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনের সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

x	5	15	25	35	45	55	65	75
f	3	7	9	23	15	8	6	4

সমাধান ঃ

সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

x	f	$\ell' = \frac{x-35}{10}$	$f\ell'$	$f\ell'^2$
5	3	– 3	– 9	27
15	7	– 2	– 14	28
25	9	– 1	– 9	9
35	23	0	0	0
45	15	1	15	15
55	8	2	16	32
65	6	3	18	54
75	4	4	16	64
মোট	75	—	33	229

এখন, $S^2_{\ell'} = \frac{\sum f_i \ell_i'^2}{n} - \left(\frac{\sum f_i \ell'_i}{n}\right)^2 = \frac{229}{75} - \left(\frac{33}{75}\right)^2 = 3.053 - (0.44)^2 = 2.859$

$\therefore\ s_{\ell'} = \sqrt{2.859} = 1.69$

$\therefore\ s_x = |c|\, S_{\ell'} = 10 \times 1.69 = 16.9$

৮৭.৮.২ বিস্তৃতির পরম পরিমাপসমূহের তুলনামূলক আলোচনা ঃ

সমস্ত বিস্তৃতির পরম পরিমাপসমূহ সুসংজ্ঞাত। তবে প্রসারের ক্ষেত্রে প্রান্তীয় শ্রেণীবিভাগদ্বয়ের মধ্যে কমপক্ষে একটি মুক্ত (open) হলে এটি অর্থহীন হয়। চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয়ে রাশিতথ্যমালার প্রত্যেকটি রাশি ব্যবহৃত হয় না এবং বীজগণিতের সহজ নিয়মাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সুবিধাজনক নয়। বাস্তবক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার খুব সীমিত।

প্রসার সহজে নির্ণয় করা যায়। অন্য পরিমাপগুলোর ক্ষেত্রে গণনাকার্যের শ্রম প্রায় সমপরিমাণ আছে।

প্রসারের তাৎপর্য সহজবোধ্য। চতুর্থক বিচ্যুতি ও গড় বিচ্যুতিও বোধগম্য। কিন্তু সম্যক বিচ্যুতি কিছুটা জটিল।

গড় বিচ্যুতি ও সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয়ে রাশিতথ্যমালার সমস্ত রাশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চতুর্থক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে রাশিতথ্যমালার কিছু রাশি পরিবর্তন করলেও উহার মান অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এই দিক থেকে প্রসার সর্বনিম্নে। প্রসারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান দু'টি ঠিক রেখে বাকি সমস্ত রাশি পরিবর্তন করলেও উহার মান অক্ষত থাকে।

সম্যক বিচ্যুতির মান নিরূপণে বীজগণিতের সহজ নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্ভব। সেইজন্য পরিসংখ্যান শাস্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পরিমাপক সংখ্যার মান নির্ণয়ে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সম্যক বিচ্যুতির সাহায্যে দুই বা ততোধিক সংখ্যাশ্রেণীর মিলিত (combined) বিস্তৃতির পরিমাপ সম্ভব। অন্য কোনও পরিমাপকের সাহায্যে এইরকম পরিমাপ সম্ভব নয়।

এইজন্য সাধারণভাবে সম্যক বিচ্যুতিকে বিস্তৃতির সবচেয়ে ভালো পরিমাপক মনে করা হয়, যেমনভাবে যৌগিক গড়কে কেন্দ্রীয় প্রবণতার সবচেয়ে ভালো পরিমাপক মনে করা হয়।

৮৭.৯ বিস্তৃতির আপেক্ষিক পরিমাপ সমূহ ঃ (Relative Measures of Dispersion) ঃ

মূল রাশিতথ্যমালা যে এককে দেওয়া থাকে, বিস্তৃতির পরম পরিমাপও সেই এককে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, দুই বা ততোধিক রাশিতথ্যমালা যদি একই এককে প্রকাশিত হয়, তবে সহজেই বিস্তৃতির পরিমাপ পরম মানের সাহায্যে তুলনা করা যায়। কিন্তু দুই বা ততোধিক রাশিমালা যদি বিভিন্ন এককে প্রকাশিত থাকে, তবে বিস্তৃতির পরম মানের সাহায্যে উহাদের তুলনা করা যায় না। এই সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃতির অপেক্ষিক পরিমাপের সাহায্যে রাশিতথ্যমালাগুলি তুলনা করা যায়।

বিস্তৃতির কোনও পরম পরিমাপক কোনও কেন্দ্রীয় প্রবণতা মাপকের শতকরায় প্রকাশ করে বিস্তৃতির আপেক্ষিক পরিমাপ (Relative measure) নির্ণয় করা হয়। এর ফলে রাশিতথ্যমালার এককের ওপর ততোধিক রাশিতথ্যমালার বিস্তৃতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এর দ্বারা করা যায়। বিস্তৃতির আপেক্ষিক পরিমাপগুলি হল ঃ

(i) চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক (Coefficient of Quartile Deviation)

(ii) গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক (Coefficient of Mean Deviation)

(iii) ভেদাঙ্ক (Coefficient of Variation)

(i) চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক (Coefficient of Quartile Deviation) :

$$\text{চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{\text{চতুর্থক বিচ্যুতি (Quartile Deviation)}}{\text{মধ্যমা (Median)}} \times 100\%$$

অর্থাৎ কোনও বিভাজনের প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থক যথাক্রমে Q_1 ও Q_3 এবং মধ্যমা Q_2 হলে,

$$\text{চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{\frac{(Q_3 - Q_1)}{2}}{Q_2} \times 100\% = \frac{Q_3 - Q_1}{2Q_2} \times 100\%$$

উদাহরণ ২৪. উদাহরণ (১৭)-এর চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

$$\therefore \text{ চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{16}{65.5} \times 100\% = 24.43\%$$

(ii) গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক (Coefficient of Mean Deviation) ঃ

গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক হল বিস্তৃতির একটি আপেক্ষিক পরিমাপ এবং ইহার সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

$$\text{গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{\text{গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation)}}{\text{যৌগিক গড় বা মধ্যমা (Mean or Median)}} \times 100\%$$

উদাহরণ ২৫. উদাহরণ (২০)-এর গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ এখানে যৌগিক গড় = 59.6 ও মধ্যমা = 60.5

গড় বিচ্যুতি = 20.4

$$\therefore \text{ যৌগিক গড়ের সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{20.4}{59.6} \times 100\% = 34.23\%$$

$$\therefore \text{ মধ্যমার সাপেক্ষে গড় বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{20.4}{60.5} \times 100\% = 33.72\%$$

লক্ষণীয় যে, গড় বিচ্যুতি সমান হওয়া সত্ত্বেও যৌগিক গড় ও মধ্যমা ভিন্ন হওয়ার জন্য আপেক্ষিক গড় বিচ্যুতিদ্বয় ভিন্ন।

(iii) ভেদাঙ্ক (Coefficient of Variation) ঃ

ভেদাঙ্ক হল বিস্তৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আপেক্ষিক পরিমাপ এবং ইহার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

$$\text{ভেদাঙ্ক} = \frac{\text{সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation)}}{\text{যৌগিক গড়}} \times 100\%$$

উদাহরণ ২৬. উদাহরণ (২২)-এর ভেদাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ মধ্যক = 56 এবং সম্যক বিচ্যুতি = 6.36

$$\therefore \text{ নির্ণেয় ভেদাঙ্ক} = \frac{6.36}{56} \times 100\% = 11.36\%$$

৮৭.১০ ভ্রামক (Moment) ঃ

বলবিদ্যার ভ্রামকের সঙ্গে পরিসংখ্যান-এর ভ্রামকের সাদৃশ্য আছে। বলবিদ্যায় কোনও একটি বলের (Force) ভ্রামক বলতে কোনও বিন্দুর সাপেক্ষে উহার ঘূর্ণনের প্রবণতা বোঝায় এবং ইহার মান বলের পরিমাণ ও বিন্দু হইতে বলের ক্রিয়ারেখার দূরত্বের গুণফলের সমান। পরিসংখ্যান বল (force) বলতে পরিসংখ্যা ও বিন্দু বলতে কোনও নির্দিষ্ট বিন্দু মনে করা হয়। নির্দিষ্ট বিন্দুর বিভিন্ন রকম মানের জন্য বিভিন্ন রকমের ভ্রামক পাওয়া যায়।

যদি n সংখ্যক রাশি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_n$ হয় এবং A একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়, তবে r-তম ভ্রামক,

$$m_r'(A) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}(x_i - A)^r.$$

আবার যদি রাশিগুলি $x_1, x_2, \ldots\ldots\ldots\ldots, x_k$-এর পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \ldots\ldots\ldots, f_k$ হয়, তবে r-তম ভ্রামক, $m_r'(A) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}(x_i - A)^r f_i$, যেখানে $n = \sum fi$

এখন $r = 1, 2, \ldots\ldots\ldots$ হলে $m_1(A), m_2(A), \ldots\ldots\ldots$ কে A-এর সাপেক্ষে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়,... ভ্রামক বলে। A-বিন্দুভিত্তিক ভ্রামকগুলিকে কাঁচা ভ্রামক (Raw Moments) বলা হয়।

এখন $A = 0$ হলে ভ্রামকগুলিকে শূন্য বিন্দুভিত্তিক ভ্রামক (Moment about origin) বলে।

$m_1' = \frac{1}{n}\sum x_i$ বা, $\frac{1}{n}\sum x_i f_i$ — প্রথম শূন্য বিন্দুভিত্তিক ভ্রামক।

$m_2' = \frac{1}{n}\sum x_i^2$ বা, $\frac{1}{n}\sum x_i^2 f_i$ — দ্বিতীয় শূন্য বিন্দুভিত্তিক ভ্রামক।

অনুরূপে,

$m_r' = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i r$ বা, $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i^r f_i$ — r-তম শূন্য বিন্দুভিত্তিক ভ্রামক।

আবার, $A = \bar{x}$ যৌগিক গড় হলে, ভ্রামকগুলিকে কেন্দ্রীয় ভ্রামক (Central Moments) বলে।

$m_1 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ বা, $\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x}) = 0$ — প্রথম কেন্দ্রীয় ভ্রামক।

$m_2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2$ বা, $\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2 f_i$ — দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় ভ্রামক বা ভেদমান।

অনুরূপে,

$m_r = \frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})^r$ বা, $\frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})^r f_i$ – r তম কেন্দ্রীয় ভ্রামক।

৮৭.১০.১ কেন্দ্রীয় ভ্রামক ও কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে ভ্রামকের সম্পর্ক (Relation between central moment and moments about an arbitrary constant) ঃ

এখন, $m_r = \frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})^r$

$$= \frac{1}{n}\sum\{(x_i - A) - (\overline{x} - A)\}^r$$

$$= \frac{1}{n}\sum\{(x_i - A) - m_1'(A)\}^r \quad [\because m_1'(A) = \overline{x} - A]$$

$$= \frac{1}{n}\sum\left\{(x_i - A)^r - {}^rc_1(x_i - A)^{r-1}\ m'_1(A) + {}^rc_2(x_i - A)^{r-2}\ m_1'^2(A) ... + (-1)^r\ m_1'\ r(A)\right\}$$

$$= m'_r(A) - {}^rc_1 m'_{r-1}(A).\ m'_1(A) + {}^rc_2 m'_{r-2}(A)\ m_1'^2(A) - ..... + (-1)^r m_1'^r$$

উভয়পক্ষে r = 1, 2, 3, 4 বসিয়ে পাই,

$$m_1 = m_1'(A) - m_1'(A) = 0$$

$$m_2 = m_2'(A) - m_2'^2(A)$$

$$m_3 = m_3'(A) - 3m_2'(A)\ m_1'(A) + 2m_1'^3(A)$$

$$m_4 = m_4'(A) - 4m_3'(A)\ m_1'(A) + 6m_2'(A)\ m_1'^2(A) - 3m_1'^4(A)$$

৮৭.১০.২ কেন্দ্রীয় ভ্রামক ও শূন্য বিন্দু ভিত্তিক ভ্রামকের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between central moments and moments about origin) :

৮০.১০.১ অনুচ্ছেদের সম্পর্কে $A = 0$ বসিয়ে পাই,

$m_r = m_r^{/} - {}^rc_1\, m_{r-1}^{/} m_1^{/} + {}^rc_2\, m_{r-2}^{/}.m_1^{/2}$ ....$+ (-1)^r m_1^{/r}$

উভয়পক্ষে $r = 1, 2, 3, 4$ বসিয়ে পাই,

$m_1 = 0$

$m_2 = m_2^{/} - m_1^{/2}$

$m_3 = m_3^{/} - 3m_2^{/}m_1^{/} + 2m_1^{/2}$

$m_4 = m_4^{/} - 4m_3^{/}m_1^{/} + 6m_2^{/}m_1^{/2} - 3m_1^{/3}$

৮৭.১১ প্রতিবৈষম্য (Skewness) ঃ

দুই বা ততোধিক পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় (Mean) ও সম্যক বিচ্যুতি (Standard Deviation) সমান হলেও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এরা ভিন্ন হতে পারে। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে।

(1)		(2)		(3)	
চলক	পরিসংখ্যা	চলক	পরিসংখ্যা	চলক	পরিসংখ্যা
0 – 5	1	0 – 5	1	0 – 5	1
5 – 10	3	5 – 10	4	5 – 10	2
10 – 15	6	10 – 15	3	10 – 15	9
15 – 20	6	15 – 20	9	15 – 20	3
20 – 25	3	20 – 25	2	20 – 25	4
25 – 30	1	25 – 30	1	25 – 30	1

তিনটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের প্রত্যেকটির যৌগিক গড় 15 এবং সম্যক বিচ্যুতি 6.02। তবে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিভাজন তিনটি ভিন্ন (1) নং পরিসংখ্যা বিভাজন প্রতিসম বা সুসমঞ্জস (Symmetrical); কিন্তু (2) নং অথবা (3) নং বিভাজনের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এখানে (1) নং বিভাজনের যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান একই এবং তা 15। কিন্তু 2 নং এবং 3 নং বিভাজনের ক্ষেত্রে মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মানগুলি

ভিন্ন। তাহলে, কোনও বিভাজনে পরিসংখ্যার বন্টন প্রতিসম হবে যদি তার যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান পরস্পর সমান হয় ; অন্যথায় এটা প্রতিবিষম বা অসমঞ্জস (Asymmetrical) হবে। প্রতিবৈষম্যের পরিমাপে রাশিতথ্যমালার বিভাজনে পরিসংখ্যার বন্টনে যে অসমঞ্জসতা, তার পরিমাপ নির্ণয় করা হয় এবং ইহার নির্ণয়ে ভ্রামকের প্রয়োজন হয়।

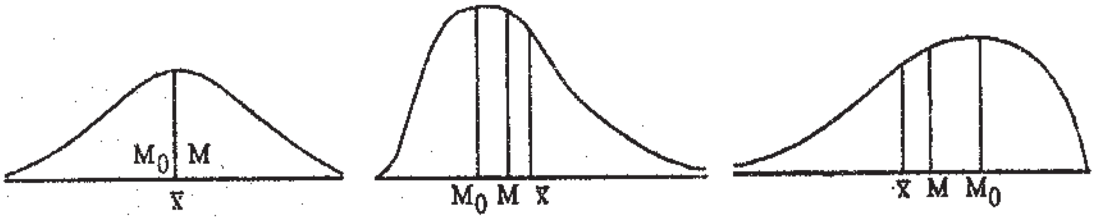

সুমঞ্জস (Symmetrical)
(শূন্য প্রতিবৈষম্য)

অসমঞ্জস (Asymmetrical)
(ধনাত্মক প্রতিবৈষম্য)

অসামঞ্জস (Asymmetrical)
(ঋনাত্মক প্রতিবৈষম্য)

যে সংখ্যাগত পরিমাপের (Quantitative measure) সাহায্যে কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের অসমঞ্জসতা প্রকাশ করা হয়, তাকে প্রতিবৈষম্য (Skewness) বলে। প্রতিবৈষম্য বলতে সুসমঞ্জসতার অভাব (lack of symmetry) বোঝায় এবং ইহার পরিমাপ বলতে কোনও সুসমঞ্জস বা স্বাভাবিক (normal) বিভাজনে পরিসংখ্যা বন্টনের তুলনায় নির্দিষ্ট বিভাজনে পরিসংখ্যার বন্টনের পার্থক্যের সংখ্যাগত প্রকাশ বোঝায়।

নিম্নে কয়েকটি প্রতিবৈষম্য পরিমাপক দেওয়া হল ঃ

(১) Karl Pearson-এর প্রথম পরিমাপক সূত্র ঃ

প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক (Coefficient of Skewness) $= \dfrac{\text{যৌগিক গড়-সংখ্যাগুরু মান}}{\text{সম্যক পার্থক্য}} \left[\dfrac{\text{Mean} - \text{Mode}}{\text{S.D}} \right]$

(২) Karl Pearson-এর পরিমাপক সূত্র ঃ

$$\text{প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক} = \frac{(Q_3 - Q_2) - (Q_2 - Q_1)}{(Q_3 - Q_2) + (Q_2 - Q_1)}$$

$$= \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

যেখানে Q_1, Q_2, Q_3 যথাক্রমে বিভাজনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থকের মান।

(৪) ভ্রামক ভিত্তিক পরিমাপক সূত্র ঃ

$$\text{প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক} = \frac{m_3}{m_2^{\frac{3}{2}}} = \frac{m_3}{s^3}$$

যেখানে m_2 ও m_3 যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কেন্দ্রীয় ভ্রামক এবং s সম্যক বিচ্যুতির মান। প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক শূন্য, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হলে যথাক্রমে সুসমঞ্জস, ধনাত্মক প্রতিবৈষম্য ও ঋণাত্মক প্রতিবৈষম্য পরিসংখ্যা বণ্টন পরিলক্ষিত হয়।

৮৭.১২ তীক্ষ্ণতা (Kurtosis) :

দুই বা ততোধিক পরিসংখ্যা বিভাজনের গড়, বিস্তৃতি ও প্রতিবৈষম্য পরস্পর সমান হলেও মানগুলির বিভাজনের তারতম্য হেতু সংখ্যাগুরু মান (Mode) বারবার একটির পরিসংখ্যারেখা (Frequency Curve) অপরটির তুলনায় অনেক সূঁচালো (peaked) বা চ্যাপ্টা (flat) হতে পারে। কোনও বিভাজনের পরিসংখ্যা রেখা কতটা সূঁচালো বা চ্যাপ্টা পরিসংখ্যানে তীক্ষ্ণতা তাই নির্দেশ করে।

পরিসংখ্যানে তীক্ষ্ণতা কোনও পরিসংখ্যা বিভাজনে পরিসংখ্যা রেখা সংখ্যাগুরু মান বরাবর কতখানি সূঁচালো (peaked) বা চ্যাপ্টা (flat) তার সংখ্যাগত পরিমাপ নির্দেশ করে। একটি বিভাজনের পরিসংখ্যা রেখার শীর্ষদেশ নর্মল বিভাজন রেখার (Normal Curve) তুলনায় কতখানি সূঁচালো বা চ্যাপ্টা তাই তীক্ষ্ণতার পরিমাপ হিসাবে ধরা হয়।

যদি কোনও পরিসংখ্যা রেখা স্বাভাবিক রেখার চেয়ে বেশি সূঁচালো হয়, তবে তাকে লেপ্টো-কার্টিক বা অতি তীক্ষ্ণ (Lepto-Kurtic) বলে। যদি স্বাভাবিক রেখার তুলনায় কোনও বিভাজনের পরিসংখ্যা রেখা বেশি চ্যাপ্টা হয়, তবে তাকে প্লেটি-কার্টিক (Platy-Kurtic) বা স্বল্প তীক্ষ্ণ বলে। নর্মাল বিভাজনের রেখাকে মেসো-কার্টিক বা মধ্যম তীক্ষ্ণ (Meso-Kurtic) বলে।

তীক্ষ্ণতা পরিমাপক সূত্র ঃ—

দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভ্রামকের সাহায্যে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা তীক্ষ্ণতা গুণাঙ্কের পরিমাপ করা হয় ঃ

$$\text{তীক্ষ্ণতা গুণাঙ্ক} \quad \frac{m_4}{m_2^2} = \frac{m_4}{s^4}$$

যেখানে m_2 ও m_4 যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ কেন্দ্রীয় ভ্রামক এবং s সম্যক বিচ্যুতি।

স্বাভাবিক বিভাজন রেখার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণতা গুণাঙ্কের মান 3। 3-এর বেশি হলে লেপ্টো-কার্টিক (Lepto-Kurtic) এবং 3-এর কম হলে প্লেটি-কার্টিক বা স্বল্প তীক্ষ্ণ। মেসো-কার্টিকের (মধ্য তীক্ষ্ণতার) ক্ষেত্রে এর মান 3।

উাহরণ ২৭. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কেন্দ্রীয় ভ্রামক নির্ণয় কর। এ থেকে একটি করে প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতার মান নির্ণয় কর।

শ্রেণী	110.0–114.9	115.0–199.9	120.0–124.9	125.0–129.9	130.0–134.9	135.0–139.9	140.0–144.9
পরিসংখ্যা	5	15	20	35	10	10	2

সমাধান ঃ

ভ্রামক নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

মধ্যমান (x)	f	$\ell = \frac{x - 127.45}{5}$	$f\ell'$	$f\ell'^2$	$f\ell'^3$	$f\ell'^4$
112.45	5	– 3	– 15	45	– 135	405
117.45	15	– 2	– 30	60	– 120	240
122.45	20	–1	–20	20	–20	20
127.45	35	0	0	0	0	0
132.45	10	1	10	10	10	10
137.45	10	2	20	40	80	160
142.45	5	3	15	45	135	405
মোট	100	—	–20	220	–50	1240

ℓ'-এর কাঁচা ভ্রামক—

$$m_1' = \frac{\sum f\ell'}{n} = -\frac{20}{100} = -0.2$$

$$m_2' = \frac{\sum f\ell'^2}{n} = \frac{220}{100} = 2.2$$

$$m_3' = \frac{\sum f\ell'^3}{n} = -\frac{50}{100} = -0.5$$

$$m_4' = \frac{\sum f\ell'^4}{n} = \frac{1240}{100} = 12.4$$

ρ-এর কেন্দ্রীয় ভ্রামক ঃ—

$\therefore\ m_2 = m'_2 - m'^2_1 = 2.2 - (-0.2)^2 = 2.16$

$m_3 = m'_3 - 3m'_3m'_1 + 2m'^3_1$

$= -0.5 - 3 \times 2.2 \times -0.2 + 2.(-0.2)^3$

$= 0.804$

$m^4 = m'_4 - 4m'_3m'_1 + 6m'_2m'^2_1 - 3m'^4_1$

$= 12.4 - 4\times -0.5 \times -0.2 + 6 \times 2.2 \times (-0.2)^2 - 3\ (-0.2)^4$

$= 12.5232$

x-এর কেন্দ্রীয় ভ্রামক ঃ—

$m_2 = 5^2 \times 2.16 \qquad = 54.0$

$m_3 = 5^3 \times 0.804 \qquad = 100.5$

$m_4 = 5^4 \times 12.5232 \qquad = 7827.0$

এবং $\bar{x} = 127.45 + 5 \times -0.2 = 126.45$

ভ্রামক প্রয়োগ করে ঃ

প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক ঃ $\dfrac{5^3 \times 0.804}{\left(5^2 \times 2.16\right)^{\frac{3}{2}}} = 0.25$

তীক্ষ্ণতা $= \dfrac{5^4 \times 12.5232}{\left(5^2 \times 2.16\right)^2} = 2.68 < 3.$

$\therefore$ প্রদত্ত বিভাজন ছক ধনাত্মক প্রতিবৈষম্য বিশিষ্ট ও স্বল্প তীক্ষ্ণ।

৮৭.১৩ অনুশীলনী ঃ

(১) নীচের প্রতি ক্ষেত্রে কোন্ প্রকারের গড় প্রয়োগ করা উচিত লেখ ঃ

(ক) কোনও পরীক্ষায় 100 জন ছাত্রের অর্জিত নম্বর।

(খ) কোনও দোকানে যে সাইজের জুতা সর্বাধিক সংখ্যায় বিক্রয় হয়।

(গ) মুক্ত-প্রান্ত শ্রেণী বিভাগযুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজন।

(ঘ) অবচয়ের বিভিন্ন হার যা অবচয়িত মূল্যের উপর ধার্য করা হয়।

(২) নিচের প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে উদাহরণ দাও ঃ

(ক) যৌগিক গড়ের পরিবর্তে মধ্যমান প্রয়োগ যথাযথ হয়।

(খ) যৌগিক গড়ের প্রয়োগ না করে বিবর্ত গড় ব্যবহার করা সঠিক।

(গ) মধ্যমার পরিবর্তে সংখ্যাগুরু মানের প্রয়োগ যথাযথ হয়।

(ঘ) গড় হিসাবে যৌগিক গড়ের চেয়ে গুণোত্তর গড়ের প্রয়োগ যথাযথ হয়।

(৩) একটি পরিসংখ্যা বিভাজনের উভয় প্রান্তিক শ্রেণীমুক্ত হলে বিবাজনটির বিস্তৃতি ও প্রতিবৈষম্যের একটি করে উপযুক্ত মাপক দাও।

(৪) (ক) কোনও চলকের সকল মানের সাথে যদি 10 যোগ করা হয়, তবে তাদের মধ্যমার কী পরিবর্তন হবে ?

(খ) কোনও চলকের মানগুলিকে যদি 10 দিয়ে ভাগ করা হয়, তবে সম্যক বিচ্যুতি কী পরিবর্তন হবে ?

(৫) সকল প্রকার মধ্যক ও বিস্তৃতের মধ্যে কোন্‌গুলি বেশি ব্যবহৃত হয় ?

(৬) আপেক্ষিক বিস্তৃতিগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী ব্যবহৃত হয় ?

(৭) যদি একট চলক x-এর দুটি মানের গাণিতিক গড় ও গুণোত্তর গড় যথাক্রমে 5 এবং 4 হয়, তবে মান দুটির বিবর্ত গড় নির্ণয় কর।

(৮) যদি $2x + 3y = 6$-এর x-এর প্রথম চতুর্থক 3 হয়, তবে y-এর তৃতীয় চতুর্থক নির্ণয় কর।

(৯) x-এর 100 টি মানের জন্য নিম্নোক্ত হিসাবগুলির সামঞ্জস্য পরীক্ষা কর।

$\sum u = 169,\ \sum u^2 = 163,$ যেখানে $u\,(x - 106)/5$

(১০) প্রদত্ত ঃ প্রতিবৈষম্য গুণাঙ্ক = -0.375, মধ্যক = 62, মধ্যমা = 65। সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

A (কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপক)

(১১) রাশিতথ্যমালার কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ বলতে কী বোঝ ?

(১২) 'ভারযুক্ত গড়' বলতে কী বোঝ ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

(১৩) কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন্ গড় ব্যবহার করবে তা আলোচনা কর।

(১৪) নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর ঃ

7, 4, 3, 5, 6, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 3.

(১৫) যৌগিক গড় নির্ণয় কর

(i) 2, 4, 6, ..., 2n

(ii) 1, 2, 3, ... 16টি পদ পর্যন্ত

(iii) 3, 6, 12, 24, ..., n-সংখ্যক পদ পর্যন্ত

(১৬) 3, 6, 24 ও 48 সংখ্যা চারটির যৌগিক গুণোত্তর ও বিবর্ত যৌগিক গড় নির্ণয় কর।

(১৭) নিম্নলিখিত ৪0-টি আপেলের ওজনের পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর।

ওজন (গ্রাম)	110–119	120–129	130–139	140–149	150–159	160–169	170–179	180–189
পরিসংখ্যা	5	7	12	20	16	10	7	3

(১৮) নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর।

শ্রেণী	0–4	5–14	15–19	20–34	35–39
পরিসংখা	2	8	6	14	5

B (বিস্তৃতির পরিমাপ)

(১৯) বিস্তৃতির পরিমাপ বলতে কী বোঝ? বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপ আলোচনা কর।

(২০) বিস্তৃতির পরম ও আপেক্ষিক পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

(২১) বিস্তৃতির পরিমাপক হিসাবে প্রসার, চতুর্থক বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি ও সম্যক বিচ্যুতির পারস্পরিক সুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(২২) প্রসার, চতুর্থক বিচ্যুতি, গড় বিচ্যুতি (যৌগিক গড় ও মধ্যমার সাপেক্ষে) এবং সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

(i) 27, 33, 48, 63, 76, 104, 126

(ii) 24, 35, 51, 65, 78, 106, 129

(২৩) ৭-নং প্রশ্নের গড় বিচ্যুতি (যৌগিক গড় সাপেক্ষে) এবং সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

(২৪) ৮-নং প্রশ্নের চতুর্থক বিচ্যুতি ও সম্যক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

C (প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতার পরিমাপ)

(২৫) 'ভ্রামক' কাকে বলে? কেন্দ্রীয় ভ্রামক কী? কীভাবে কেন্দ্রীয় ভ্রামকের সাহায্যে প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতা নির্ণয় করা যায়?

(২৬) একটি পরিসংখ্যা বিভাজন অনুধাবনের ক্ষেত্রে গড়, বিস্তৃতির পরিমাপ ও প্রতিবৈষম্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক—আলোচনা কর।

(২৭) প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতার মধ্যে তুলনা কর এবং পরিসংখ্যা বিভাজনের উহাদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

(২৮) ৭-নং প্রশ্নের প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতা নির্ণয় কর।

(২৯) ৮-নং প্রশ্নের প্রতিবৈষম্য ও তীক্ষ্ণতা নির্ণয় কর।

৮৭.১৪ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1. সৌরেন্দ্রনাথ দে (1991) : ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

2. রাজকুমার সেন (1986) : সংখ্যাতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

3. শৈলেশভূষণ চৌধুরী, অরিজিৎ চৌধুরী ও বিশ্বনাথ দাস (1976) : রাশিবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব, (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা।

4. Goon, A. M., Gupta, M. K. and Dasgupta, B. (1992) : Fundamentals of Statistics, Vol-I, The World Press Private Ltd., Calcutta.

5. Das, N. G. (1996) : Statistical Methods, M. Das & Co., Calcutta.

একক ৮৮ ❑ সহগতি ও নির্ভরন

গঠন

৮৮.০ উদ্দেশ্য

৮৮.১ প্রস্তাবনা

৮৮.২ দ্বিচলভিত্তিক রাশিতথ্য

৮৮.৩ বিক্ষেপণ চিত্র

৮৮.৪ সহগাঙ্ক

৮৮.৪.১ সহগাঙ্ক-এর কয়েকটি ধর্ম

৮৮.৫ নির্ভরন তত্ত্ব

৮৮.৫.১ নির্ভরনের কয়েকটি ধর্ম

৮৮.৬ মানক্রমিক সহগতি

৮৮.৭ অনুশীলনী

৮৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৮৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- দ্বিচল রাশিতথ্য কী
- বিক্ষেপণ চিত্র কাকে বলে
- সহগাঙ্ক কী ও তার ধর্ম ও
- নির্ভরনতত্ত্ব কাকে বলে ও তার ধর্ম কী কী

৮৮.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে একটি চলকের ভিত্তিতে কীভাবে পরিসংখ্যা বিভাজন গঠন করতে হয় এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবসা ও অন্যান্য অনুসন্ধান ক্ষেত্রে অনেক সময় দুই বা ততোধিক চলক সম্পর্কে রাশিতথ্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়। সেই রাশিতথ্যের ভিত্তিতে দুইটি চলরাশির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কী জানা যায় তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, আয়-ব্যয়, আয়-সঞ্চয়, চাহিদা-মূল্য, যোগান-দাম, মুনাফা-উৎপাদন, মুনাফা-বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয়, বিক্রয়-বিজ্ঞাপন, চাহিদা-যোগান ইত্যাদি। এ ধরনের দ্বিচল ভিত্তিক রাশিতথ্য থেকে প্রধানত দুটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

প্রথমত, এদের মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা এবং তা থাকলে তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি ও গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা করা। তাদের মধ্যে সরলরেখা ভিত্তিক বা অন্য কোনও বক্ররেখা ভিত্তিক সম্পর্ক আছে কিনা দেখা। এই ঘনিষ্ঠতার প্রকৃতি ও তা কতখানি গভীর তার বিশ্লেষণ হয় সহগতির সাহায্যে।

দ্বিতীয়ত, দুটি চলকের মধ্যে একটির কোনও কিছু মান জানা থাকলে তার ভিত্তিতে অপরটি সম্পর্কে অনুমান করা অর্থাৎ, প্রথম চলকের উপর দ্বিতীয় চলকের একপ্রকার নির্ভরতা নির্ণয় করে তার সাহায্যে প্রথম চলকটির সাহায্যে দ্বিতীয় চলকটিকে অনুমান করা হয় 'নির্ভরন'-এর সাহায্যে।

৮৮.২ দ্বিচলভিত্তিক রাশিতথ্য (Bivariate data) :

এই জাতীয় রাশিতথ্যে প্রতিটি বস্তু বা ব্যষ্টির (item) জন্য দ্বিচল অর্থাৎ, দুটি চলকের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এখানে প্রথম চলকটিকে যদি x এবং দ্বিতীয় চলককে y ধরা হয়, তবে জোড়া সংখ্যা অর্থাৎ (x, y) মান দেওয়া থাকবে প্রতিটি ব্যষ্টির জন্য। ধরা যাক, এরকম n-জোড়া মান দেওয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নে প্রদত্ত তথ্য সারণিটি (সারণি-1)। ধরা যাক, যেখানে দাম (x) এবং যোগান (y) সম্বন্ধে 10 জোড়া মান দেওয়া আছে।

সারণি—৮১.১

দাম (টাকায়/কিলোগ্রাম)	10	12	18	16	15	19	18	17	21	23
যোগান (কুইন্টাল)	30	35	45	44	42	48	47	46	51	55

অনেক সময় এরকম জোড়া সংখ্যা যদি আরও বেশি সংখ্যক হয়, তবে এ ধরনের সারণি থেকে তথ্য নিষ্কাশন সমস্যা হবে, সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিচলভিত্তিক পরিসংখ্যা বিভাজন গঠন করতে পারি। নিচের পরিসংখ্যা সারণিতে (সারণি-2) 100টি পরিবারের মোট ব্যয় y এবং খাদ্য-সামগ্রীর ব্যয় (x)-এর ভিত্তিতে গঠিত একটি পরিসংখ্যা বিভাজন দেখানো হয়েছে, যেখানে x এবং y-এর যথাক্রমে 4টি ও 5টি শ্রেণী ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে, সারণিটিতে 20টি পৃথক পৃথক কোষ ব্যবহার করা হয়েছে। এই কোষগুলির x এবং y-এর এক এক জোড়া নম্বর নিয়ে গঠিত এক একটি শ্রেণীর পরিসংখ্যা নির্দেশ করছে।

সারণি—৮৮.২

খাদ্য-সামগ্রীর ব্যয় ও পারিবারিক আয়ের বিভাজন

পারিবারিক আয় (টাকায়)

খাদ্য সামগ্রীর ব্যয় (শতাংশ)	2000–3000	3000–4000	4000–5000	5000–6000	6000–7000
10 – 15	—	—	—	3	7
15 – 20	—	4	9	4	3
20 – 25	7	6	12	5	—
25 – 30	3	10	19	8	—

৮৮.৩ বিক্ষেপণ চিত্র (Scatter Diagram) :

মনে করা যাক, দুটি চলকের সম্পর্কে n-জোড়া মান দেওয়া আছে। এখন রাশিবিজ্ঞান প্রয়োগ করে সহগতির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে বিক্ষেপণ চিত্রের অবদান যথেষ্ট। বিক্ষেপণ চিত্র আসলে n-সংখ্যক বিন্দুর একটি জ্যামিতিক চিত্র, যেখানে ঐ বিন্দুগুলি পাওয়া যাবে n সংখ্যক জোড়া মান থেকে। বিক্ষেপণ চিত্রই দুটি চলকের মধ্যে সহগতির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দেশ করে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখা যাবে সহগাঙ্ক (Correlation coefficient) r_{xy}-এর সর্ব্বনিম্ন মান—1 এবং সর্বোচ্চ মান + 1 হয়।

সাধারণভাবে একটি চলকের (x)-এর মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য চলকের (y) মান বাড়তে থাকে অথবা একটি চলকের (x) মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চলকের (y) মান কমতে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে চলদ্বয়ের মধ্যে সহগতি আছে। প্রথম প্রকারের সহগতিকে **ধনাত্মক সহগতি** ও পরের সহগতিকে **ঋণাত্মক সহগতি** বলে। পক্ষান্তরে, একটি চলকের বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যটির লক্ষণীয় বৃদ্ধি বা হ্রাসের কোন প্রবণতাই যদি না থাকে, তবে বলা হয় যে চলদ্বয়ের মধ্যে কোনও সহগতি নেই। এক্ষেত্রে চলক দুটি সহগতি মুক্ত (Uncorrelated) বলা হয়। আবার চলক দুটির মধ্যে যে ধরনের সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছে তা মোটামুটি ভাবে সরলরেখা সূত্রে প্রকাশযোগ্য। অর্থাৎ দুটি চলকের সহগতি হচ্ছে তাদের একটির পরিবর্তনে অন্যটির সরলরৈখিক পরিবর্তনশীলতা। ধনাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে r_{xy}-এর মান ধনাত্মক হয়। অনুরূপে, ঋণাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে r_{xy}-এর মান ঋণাত্মক হয়। পক্ষান্তরে, অ-সহগতির ক্ষেত্রে r_{xy}-এর মান শূন্য হয়। এই যে তিনপ্রকার সহগতির কথা বলা হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিক্ষেপণ চিত্রের আকার যে ধরনের হয় তা নিচের চিত্রে দেখান হল।

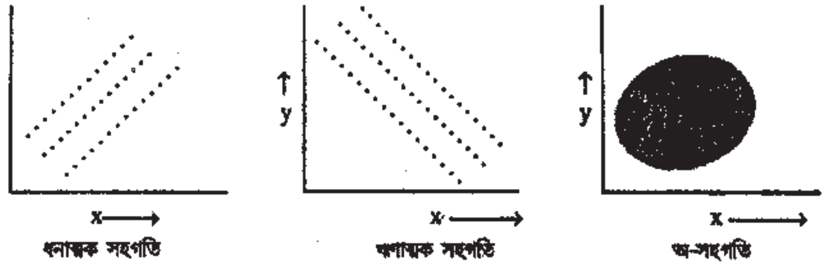

সহগতির মানের ওপর নির্ভর করে তার ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ। উদাহরণ হিসাবে ধনাত্মক সহগতির কথা ধরা যাক অর্থাৎ, r_{xy}-এর মান যখন 0 থেকে বাড়তে বাড়তে 1 পর্যন্ত হয়, তখন ঘনিষ্ঠতার যে পরিবর্তন হয় তা জ্যামিতিক চিত্রে নিচে দেখানো হল।

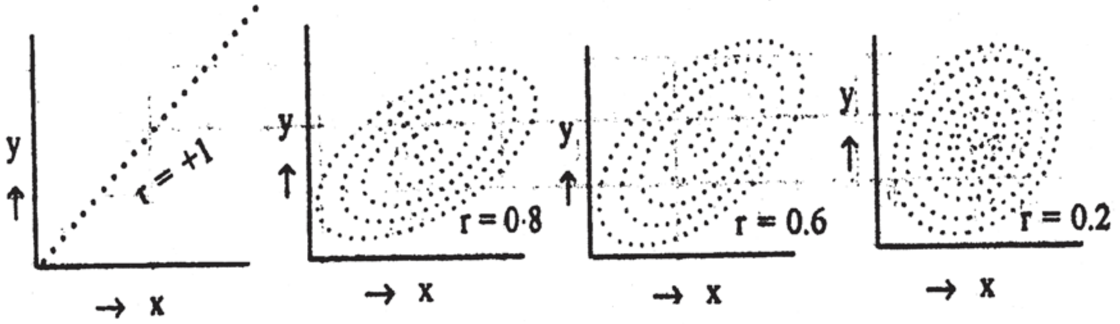

চিত্রটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, r_{xy}-এর মান যতই 0 থেকে 1-এর দিকে যাচ্ছে ততই চলরাশি দু'টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে। অনুরূপে, ঋণাত্মক সহগতির মানও যখন 0 থেকে কমতে কমতে –1-এর দিকে যায়, তখন ঘনিষ্ঠতাও ক্রমে বাড়তে থাকে। সহগতি সূচকের মান যখন + 1 অথবা –1 হয়, তখন সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিন্দুগুলি একই সরলরেখায় অবস্থান করে।

৮৮.৪ সহগাঙ্ক (Correlation) :

মনে কর, দুটি চলক (x, y) -এর প্রত্যেকের n-সংখ্যক মান হল $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots\ldots, (x_n, y_n)$। এদের মধ্যে (x_i, y_i) হচ্ছে i-তম ব্যক্তির x এবং y-এর মান। x এবং y-এর মধ্যে কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson)-এর সহগাঙ্কের সংজ্ঞা (যা r_{xy} দিয়ে চিহ্নিত করা হয়) হল,

$$\text{সহগাঙ্ক} = \frac{x \text{ ও } y\text{-এর সহভেদমান}}{\sqrt{x\text{-এর ভেদমান} \times y\text{-এর ভেদমান}}}$$

এখানে দু'টি চলরাশি x এবং y-এর সহভেদমান (Covariance) হল ভেদমান-এর অনুরূপ পরিমাপ। কিন্তু ভেদমান যেমন একটি চলকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সহভেদমান তেমন দুটি চলকের সহবিচ্যুতি পরিমাপের জন্য প্রয়োজ্য।

সুতরাং,

$$\text{সহগাঙ্ক } (r_{xy}) = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\ \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}.\bar{y}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum x_i^2 - \bar{x}^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum y_i^2 - \bar{y}^2}}$$

$$= \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}.\bar{y}}{\sqrt{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}\sqrt{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{n}\sum x_i y_i - \bar{x}.\bar{y}}{s_x . s_y}$$

৮৮.৪.১ সহগাঙ্ক (r_{xy})-এর কয়েকটি ধর্ম (Properties of Correlation Coefficient, r_{xy}) ঃ

(i) সহগাঙ্ক (r_{xy}) একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা অর্থাৎ x এবং y যে একক দিয়েই প্রকাশ করা হোক না কেন, সহগাঙ্ক তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

(ii) সহগাঙ্ক, r_{xy}-এর সর্বনিম্ন মান -1 এবং সর্বোচ্চ মান $+1$ অর্থাৎ,

$$-1 \le r_{xy} \le +1$$

প্রমাণ ঃ মনে কর, x ও y দুইটি চলক এবং $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots\ldots\ldots, (x_n, y_n)$ উহাদের n-জোড়া মান। $\bar{x}, \bar{y}$ উহাদের গড়দ্বয় এবং s_x, s_y উহাদের সম্যক বিচ্যুতিদ্বয়।

মনে কর, $u_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s_x}$ এবং $v_i = \frac{y_i - \bar{y}}{s_y}$

তাহলে, $\sum u_i^2 = \sum\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x}\right)^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})}{s_x^2} = \frac{ns_x^2}{s_x^2} = n$

অনুরূপ, $\sum v_i^2 = \sum\left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y}\right) = n$

আবার, $\sum u_i v_i = \sum\left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x}\right)\left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y}\right) = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{s_x s_y} = \frac{n r_{xy} s_x s_y}{s_x . s_y} = n . r_{xy}$

যেহেতু $(u_i + v_i)^2$ কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই

$$\sum(u_i + v_i)^2 \geq 0$$

বা, $\sum u_i^2 + \sum v_i^2 + 2\sum u_i v_i \geq 0$

বা, $n + n + 2nr_{xy} \geq 0$

বা, $r_{xy} \geq -1$ .... (*)

অনুরূপে, যেহেতু $(u_i - v_i)^2$ কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই

$$\sum(u_i - v_i)^2 \geq 0$$

বা, $\sum u_i^2 + \sum v_i^2 + 2\sum u_i v_i \geq 0$

বা, $n + n - 2nr_{xy} \geq 0$

বা, $r_{xy} \leq 1$ .... (**)

(*) ও (**) থেকে পাই,

$$-1 \leq r_{xy} \leq 1.$$

(iii) x ও y-এর মূলবিন্দু ও মাত্রার (Origin and Scale) পরিবর্তনে সহগাঙ্ক (r_{xy})-এর মানের পরিবর্তন হয় না, যদি মাত্রাদ্বয় সমচিহ্ন বিশিষ্ট হয়। যদি মাত্রাদ্বয় বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট হয়, তবে নতুন চলদ্বয়ের সহগাঙ্ক পূর্বোক্ত সহগাঙ্কের বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয়।

অর্থাৎ যদি $u = \frac{x-a}{b}$ এবং $v = \frac{y-c}{d}$ হয় তবে,

$r_{uv} = r_{xy}$ যদি b ও d একই চিহ্নবিশিষ্ট হয়।

$= -r_{xy}$ যদি b ও d বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হয়।

প্রমাণ ঃ মনে কর, x ও y দুটি চলক ও $(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)$ উহাদের n-জোড়া মান। এখন x ও y-এর মূল a ও c বিন্দুতে এবং মাত্রাদ্বয় b ও d পরিমাণ পরিবর্তন করা হল।

তাহলে, $u_i = \frac{x_i - a}{b}$ এবং $v_i = \frac{y_i - c}{d}$ ....(A)

(A) থেকে পাই, $x_i = a + bu_i$ এবং $y_i = c + dv_i$

তাহলে, $\overline{x} = a + b\overline{u}$ এবং $\overline{y} = c + d\overline{v}$.

$$s_x^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})^2 = \frac{1}{n}\sum(a + bu_i - a - b\overline{u})^2$$

$$= \frac{b^2}{n}\sum(u_i - \overline{u})^2 = b^2.s_u^2$$

$\therefore s_x = |b|s_u$

অনুরূপে, $s_y = |d|s_v$

এখন, $\frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y}) = \frac{1}{n}\sum(a + bu_i - a - b\overline{u})(c + dv_i - c - d\overline{v})$

$$= bd\frac{1}{n}\sum(u_i - \overline{u})(v_i - \overline{v})$$

$$\therefore r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{s_x s_y}$$

$$= \frac{bd}{|b|.|d|}.\frac{\frac{1}{n}\sum(u_i - \overline{u})(v_i - \overline{v})}{s_u.s_v}$$

$$= \frac{bd}{|b|.|d|}r_{uv}$$

$$\therefore r_{uv} = \frac{|b|.|d|}{bd}r_{xy}.$$

$\therefore r_{uv} = r_{xy}$ যদি b ও d সমচিহ্ন বিশিষ্ট হয়

$= -r_{xy}$ যদি b ও d বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হয়।

উদাহরণ ১. কোনও বাজারে পরপর ৪ সপ্তাহে আলুর দর (x) ও বিক্রয় পরিমাণ (y) সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া আছে। দর ও বিক্রয় পরিমাণের মধ্যে সহগাঙ্কের মান নির্ণয় কর এবং তোমার মতামত দাও।

x (টাকা/কেজি)	5.2	6.3	6.8	6.5	5.8	5.4	6.0	6.5
y (কুইন্ট্যাল)	19.4	17.0	15.1	16.2	17.8	19.5	16.5	15.2

সমাধান ঃ সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য গণনা কার্য ঃ

সপ্তাহ	কেজি প্রতি দর (টাকায়) (x_i)	বিক্রয় পরিমাণ (কুঃ) (y_i)	$u_i = x_i - 6$	$v_i = y_i - 18$	u_i^2	u_i^2	$u_i v_i$
1	5.2	19.4	−0.8	1.4	0.64	1.96	−1.12
2	6.3	17.0	0.3	-1.0	0.09	1.00	−0.30
3	6.8	15.1	0.8	−2.9	0.64	8.41	−2.32
4	6.5	16.2	0.5	−1.8	0.25	3.24	−0.90
5	5.8	17.8	−0.2	−0.2	0.04	0.04	0.04
6	5.4	19.5	−0.6	1.5	0.36	2.25	−0.90
7	6.0	16.5	0.0	−1.5	0.00	2.25	0.00
8	6.5	15.2	0.5	−2.8	0.25	7.84	−1.40
মোট	—	—	0.5	−7.3	2.27	26.99	−6.90

যদি x ও y -এর সহগাঙ্ক r_{xy} হয়, তবে

$$r_{xy} = r_{uv} = \frac{n\sum u_i v_i - (\sum u_i)(\sum v_i)}{\sqrt{\left\{n\sum u_i^2 - (\sum u_i)^2\right\}\left\{n\sum v_i^2 - (\sum v_i)^2\right\}}}$$

$$= \frac{8 \times (-6.9) - (0.5)(-7.3)}{\sqrt{\left\{8 \times 2.27 - (0.5)^2\right\}\left\{8 \times 26.99 - (-7.3)^2\right\}}}$$

$$= \frac{51.55}{4.232 \times 12.753} = -0.955$$

নির্ণেয় সহগাঙ্কের খুব বেশি, আবার উহা ঋনাত্মক বলে এটা স্পষ্ট যে, আলুর কেজি প্রতি দর বাড়লে বিক্রয় পরিমাণ কমবে এবং চলক দুটির সম্পর্ক ঋণাত্মক ঢাল সহ প্রায় ঋজুরৈখিক।

৮৮.৫ নির্ভরন তত্ত্ব (Regression Theory) :

অনেক সময় দেখা যায়, দুটি চলকের মধ্যে একটি অপরটির ওপর কোনও না কোনওভাবে নির্ভরশীল। যেমন, মুনাফার পরিমাণ নির্ভর করে বিক্রয়ের পরিমাণের ওপর ; কোনও পরিবারে ব্যয় নির্ভর করে পরিবারের মোট আয়ের ওপর, ইত্যাদি। এই নির্ভরশীলতার কথা মনে রেখে, যে চলকটি অপর চলকটির ওপর নির্ভর করছে সেটিকে নির্ভরী বা অধীন চলক (dependent variable) এবং অপরটি স্বনির্ভর বা অনপেক্ষ বা স্বাধীন চলক (independent variable) বলে। এই নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে স্বনির্ভর চলকটির মান সম্পর্কে কোনও জ্ঞাত তথ্য থেকে নির্ভরী চলকটির মান সম্পর্কে রাশিবিজ্ঞান সম্মত ও নির্ভরযোগ্য কোনও অনুমান করা যায় কিনা সেটাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মনে কর, x হচ্ছে একটি স্বাধীন বা অনপেক্ষ চলক ও y আর একটি চলক। এখন x এবং y-এর নির্ভরতা অনুমান করার উপায় হচ্ছে x-এর মানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে y-এরও মানের পরিবর্তন হচ্ছে কিনা দেখা। যদি চলকদ্বয়ের মধ্যে মোটামুটি সরলরৈখিক সম্পর্ক থাকে তবে আমরা বলি উহাদের মধ্যে সরল নির্ভরন (Simple regression) আছে। যদিও প্রকৃত নির্ভরনের স্বরূপটি অনুমান করা বেশ কঠিন, $y = a + bx$, যেখানে a ও b দুটি ধ্রুবক, রেখাটিকে x-এর উপর y-এর নির্ভরণ রেখা হিসাবে ধরা যেতে পারে।

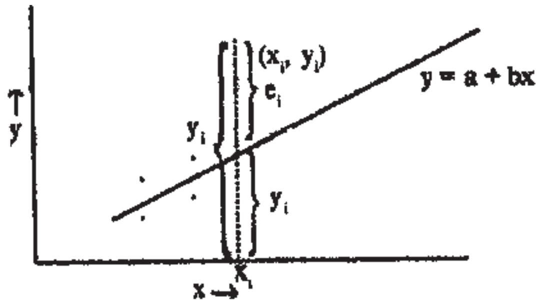

উপরোক্ত বিক্ষেপণ চিত্রটি দেখে আমরা x-এর উপর y-এর একটি নির্ভরণ সরলরেখা (Regression line) নির্ণয় করছি। $(x_i, y_i), i = 1, 2, ..., n$ লেখচিত্রের মধ্যে বিক্ষিপ্ত বিন্দুগুলি হল (x, y) জোড়া মানের সম্পর্ক জ্ঞাত রাশি।

এখানে,

y_i = x-অক্ষের x_i স্থানে y-এর জ্ঞাত রাশি

Y_i = x-অক্ষের x_i স্থানে y-এর অনুমিত রাশি

এবং

$y_i = Y_i + e_i$

$= a + bx_i + e_i$ ....(1)

যেখানে e_i হল x_i বিন্দুতে y-এর জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রাশির মধ্যে দূরত্ব।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে (1) নং সমীকরণে a এবং b দুটি অজ্ঞাত রাশি। কাজেই নমুনালব্ধ রাশিতথ্যের ভিত্তিতে এদের দুটি প্রাক্‌কলক (estimate) নির্ণয় করা দরকার। প্রাক্‌কলক নির্ণয়ে যে নীতি অনুসরণ করা হয় তাকে লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি (method of least squares) বলে। এই পদ্ধতিতে a ও b-এর মান এমনভাবে নির্ণয় করা হয় যাতে (x_i, y_i) এবং (x_i, y_i) বিন্দুগুলির দূরত্ব সামগ্রিকভাবে কম হয়। অর্থাৎ a ও b এমনভাবে বেছে নেওয়া হয় যাতে

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

সর্বাপেক্ষা কম হয়। এই হ'ল লঘিষ্ঠ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যে দুটি মৌল বা সুসম্বদ্ধ সমীকরণ (Normal equations) সমাধান করে a এবং b-এর মান নির্ণয় করা হয় সেগুলি হল ঃ

$$\sum y_i = na + b\sum x_i \text{..............(2)}$$

$$\sum x_i y_i = a\sum x_i + b\sum x_i^2 \text{...............(3)}$$

সমীকরণ (2) ও (3)-এর a এবং b ছাড়া সমস্ত রাশি জানা আছে। তাই অতি সহজেই a এবং b-এর মান বের করা যাবে এবং সেগুলি হল ঃ

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}.\bar{y}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} \text{..............(4)}$$

$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ .... (5)

$\hat{a}$ and $\hat{b}$ হল লঘিষ্ঠ গড় পদ্ধতিতে নির্ণয় করা a and b এর প্রাককলিত (estimated) মান।

অনুরূপে, x যদি y এর ওপর নির্ভরশীল চলক হয়, তবে আমরা x-এর উপর y-এর একটি নির্ভরন সরলরেখার কথা ভাবতে পারি। ধরা যাক, সেটি হল

$x = c + dy$ ....(6)

এখন x-এর জ্ঞাত রাশির সাথে অনুমিত রাশির দূরত্ব নিয়ে সেগুলির উপর লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করে c এবং d-এর প্রাক্কলক নির্ণয় করা যাবে এবং সেগুলি হল ঃ

$$\hat{d} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}.\bar{y}}{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2} \text{ ....(7)}$$

এবং $\hat{c} = \bar{x} - \hat{d}\bar{y}$

৮৮.৫.১ নির্ভরনের কয়েকটি ধর্ম ঃ

(a) (i) x-এর উপর y-এর অনুমিত নির্ভরন সরলরেখাটির সমীকরণ হল ঃ

$$Y = \bar{y} = b_{yx}(x - \bar{x}) \text{.............(9)}$$

যেখানে b_{yx} হল x-এর উপর y-এর নির্ভরাঙ্ক এবং

$$b_{yx} = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_x^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\overline{xy}}{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2} \text{ ....(10)}$$

(ii) y-এর উপর x-এর অনুমিত নির্ভরন সরলরেখার সমীকরণ হল ঃ

$$X = \bar{x} + b_{xy}(y - \bar{y}) \text{...............(11)}$$

যেখানে b_{yx} হল y-এর উপর x-এর নির্ভরাঙ্ক

এবং, $$b_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{s_y^2} = \frac{\sum x_i y_i - n\bar{x}.\bar{y}}{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2} \text{ ....(12)}$$

(b) r_{xy}, b_{xy} এবং b_{yx}-এর চিহ্ন সর্বদা একই হয়।

(c) $b_{xy} \times b_{yx} = r^2_{xy}$

(d) x-এর উপর y-এর এবং y-এর উপর x-এর নির্ভরন সরলরেখা দুটি $(\bar{x}, \bar{y})$ বিন্দুতে ছেদ করে।

(d) যখন $r_{xy} = \pm 1$, তখন নির্ভরন সরলরেখা দুটি অভিন্ন রেখাতে রূপান্তরিত হয়।

(f) যখন $r_{xy} = 0$, তখন নির্ভরন সরলরেখা দুটি পরস্পর লম্ব হয়। অর্থাৎ একটি চলক অপর চলকের দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত হয় না।

উদাহরণ ২. নিম্নলিখিত রাশিতথ্য থেকে নির্ভরন সরলরেখা দুটি নির্ণয় কর ঃ

বিক্রয়মূল্য (টাকায়)	91	97	108	121	67	124	51	73	111	57
ক্রয়মূল্য (টাকায়)	71	75	69	97	70	91	39	61	80	47

সমাধান ঃ মনে কর, বিক্রয়মূল্যকে x-চলক ও ক্রয়মূল্যকে y-চলক দ্বারা প্রকাশ করা হল।

নির্ভরন সরলরেখা নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

x	y	$u = x - \bar{x}$	$v = y - \bar{y}$	u^2	v^2	uv
91	71	1	1	1	1	1
97	75	7	5	49	25	35
108	69	18	−1	324	1	−18
121	97	31	27	961	729	837
67	70	−23	0	529	0	0
124	91	34	21	1156	441	714
51	39	−39	−31	1521	961	1209
73	61	−17	−9	289	81	153
111	80	21	10	441	100	210
57	47	−33	−23	1084	529	759
মোট 900	700	0	0	6360	2868	3900

এখন $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{900}{10} = 90$ এবং $\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{700}{10} = 70$

$$b_{yx} = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2} = \frac{\sum uv}{\sum u^2} = \frac{3900}{6360} = 0.6132$$

$$b_{xy} = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(y-\bar{y})^2} = \frac{\sum uv}{\sum v^2} = \frac{3900}{2868} = 1.361$$

এক্ষণে, x-এর উপর y-এর নির্ভরন সরলরেখাটি হল ঃ

$$Y = \bar{y} + b_{yx}(x - \bar{x})$$
$$= 70 + 0.6132\,(x - 90)$$
$$= 14.812 + 0.6132x$$

এবং y-এর উপর x-এর নির্ভরন সরলরেখাটি হল ঃ

$$X = \bar{x} + b_{xy}(y - \bar{y})$$
$$= 90 + 1.361\ (y - 70)$$
$$= -5.27 + 1.361\ y.$$

উদাহরণ ৩. নীচে 7-টি শহরে লোকসংখ্যা (x)-এর টি.ভি. সেটের চাহিদা (y)-এর তথ্য দেওয়া হল। x-এর উপর y-এর নির্ভরন সরলরেখাটি নির্ণয় কর। যে শহরের লোকসংখ্যা 30 হাজার, সেখানে অনুমিত কতকগুলি টি.ভি. সেটের চাহিদা থাকবে ?

লোকসংখ্যা (x) ('000)	11	14	14	17	17	21	25
টি.ভি. সেটের চাহিদা (y) ('00)	15	27	27	30	34	38	46

সমাধান ঃ x-এর উপর y-এর নির্ভরন সরলরেখা নির্ণয়ের জন্য গণনা কার্য ঃ

শহর	x_i	y_i	$u_i = x_i - \bar{x}$	$v_i = y_i - \bar{y}$	u_i^2	$u_i v_i$
1	11	15	6	–16	36	96
2	14	27	–3	–4	9	12
3	14	27	–3	–4	9	12
4	17	30	0	–1	0	0
5	17	34	0	3	0	0
6	21	38	4	7	16	28
7	25	46	8	15	64	120
মোট	119	217	0	0	134	268

এখন, $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{119}{7} = 17$ এবং $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{217}{7} = 31$

$$b_{yx} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum u_i v_i}{\sum u_i^2} = \frac{268}{134} = 2.$$

এক্ষেত্রে x-এর উপর y-এর নির্ভরন সরলরেখাটি হল,

$$Y = \bar{y} + b_{yx}(x - \bar{x})$$
$$= 31 + 2(x - 17)$$
$$= -3 + 2x$$

তাহলে $x = 30$ হলে, y-এর অনুমিত মান হবে,

$$y = -3 + 2\times30$$
$$= 57.$$

সুতরাং, 30 হাজার লোকসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে অনুমিত 5700 টি.ভি. সেটের চাহিদা থাকবে।

উদাহরণ ৪. x চলকের ভেদমান 9 এবং নির্ভরনের সমীকরণদ্বয় $8x - 10y + 66 = 0$ এবং

$40x - 18y = 214$ হলে, (i) x এবং y-এর গড় (ii) x ও y-এর সহগাঙ্ক এবং (iii) y চলকের প্রমাণ বিচ্যুতির মান নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ

(i) আমরা জানি, নির্ভরনের সমীকরণদ্বয় $(\bar{x}, \bar{y})$ বিন্দুতে ছেদ করে। সুতরাং, প্রদত্ত সমীকরণদ্বয় সমাধান করে x ও y-এর গড় মান অর্থাৎ $\bar{x}$ ও $\bar{y}$ -এর মান পাওয়া যাবে।

এখানে সমীকরণদ্বয় হল

$8x - 10y + 66 = 0$ বা, $4x - 5y = -33$ ....(1)

$40x - 18y = 214$ বা, $20x - 9y = 107$ .... (2)

সমীকরণ (1)-কে 5 দিয়ে গুণ করে সমীকরণ (2)- থেকে বিয়োগ করে পাই,

$$\begin{array}{l} 20x - 25y = -165 \\ 20x - 9y = +107 \\ \underline{-\quad\; +\quad\; -\qquad} \\ -16y = \; -272 \end{array}$$

বা, $y = 17$

এখন y-এর মান (1)-এ বসিয়ে পাই,

$4x - 5 \times 17 = -33$

বা, $x = 13$

সুতরাং, x ও y চলকদ্বয়ের গড় মান যথাক্রমে 13 ও 17.

(ii) সমীকরণ (1)-থেকে পাই,

$$y = \frac{4x}{5} + \frac{33}{5} \text{............(3)}$$

এবং সমীকরণ (2) থেকে পাই,

$$x = \frac{9y}{20} + \frac{107}{20} \text{............(4)}$$

মনে কর, সমীকরণ (3) হল x-এর উপর y-এর নির্ভরন সরলরেখা এবং সমীকরণ (4) হল y-এর উপর x-এর নির্ভরন সরলরেখা।

তাহলে, $b_{yx} = \frac{4}{5}$ এবং $b_{xy} = \frac{9}{20}$

সুতরাং, x এবং y-এর সহগাঙ্ক-এর বর্গ অর্থাৎ $r_{xy}^2 = b_{yx} \times b_{xy} = \frac{4}{5} \times \frac{9}{20} = \frac{9}{25}$

অর্থাৎ, $r_{xy} = \pm\frac{3}{5} = \pm 0.6$

যেহেতু b_{xy} এবং b_{yx} উভয়েই ধনাত্মক, তাই r_{xy}-এর মান ধনাত্মক হবে।

সুতরাং, নির্ণেয় সহগাঙ্ক (r_{xy})-এর মান 0.6.

(iii) x-এর ভেদমান 9, প্রদত্ত

আবার, $b_{yx} = r_{xy} . \frac{s_y}{s_x}$

বা, $\frac{4}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{s_y}{3}$ $\quad [\because s_x^2 = 9$ অর্থাৎ $s_x = 3]$

বা, $s_y = 4$

সুতরাং, y-এর প্রমাণ বিচ্যুতি হল 4.

৮৭.৬ মানক্রমিক সহগতি (Rank Correlation) ঃ

কোনও কোনও সময় দেখা যায়, যে দুটি ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেগুলি সবসময় সংখ্যা যোগে পরিমাপযোগ্য নয়, কিন্তু মানক্রমিক (rand)-এ সাজানো যায়। যেমন, শিক্ষার মান—সততা, প্রতিভা—শিল্পবোধ, শিক্ষারমান—আদর্শ ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ যোগ্য নয়, কিন্তু এগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজানো সম্ভব। এইসকল ক্ষেত্রে কার্ল পিয়াসন-এর সহগাঙ্ক-এর সাহায্যে বৈশিষ্ট্য দুটির মধ্যে সংশ্রব পরিমাণ অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা একটি নতুন ধরনের মাপনাঙ্ক (Coefficient) ব্যবহার করে এদের মধ্যে সংশ্রব পরিমাপের চেষ্টা করি। এরকম মাপনাঙ্ককে মানক্রমিক সহগাঙ্ক (Rank Correlation) বলা হয়। এই পরিচ্ছেদে, ব্রিটিশ সংখ্যাতত্ত্ববিদ স্পিয়ারম্যান (Spearman)-এর মানক্রমিক সহগাঙ্কের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

মনে কর, A ও B দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য n-সংখ্যক বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আছে, যাদের মানের ক্রমানুসারে সাজানো যায়। অর্থাৎ, n-সংখ্যক ব্যষ্টির মধ্যে A চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে, তার পরবর্তী মাত্রায় কার মধ্যে আছে ইত্যাদি এবং সবশেষে কার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প মাত্রায় আছে তা নির্ণয় করা যায়। সেইমতো সর্বোচ্চ মাত্রাধিকারীকে 1 পরবর্তী মাত্রাধিকারীকে 2 ইত্যাদি এবং সর্বনিম্ন মাত্রাধিকারীকে মানক্রম -n দেওয়া হল। তাহলে কোনও ব্যষ্টিকে মানক্রম i আরোপ করা হবে যদি $(i-1)$ সংখ্যক বষ্টির মধ্যে A-চরিত্রটি অধিকতর মাত্রায় থাকে ; $i = 1, 2, 3 ...., n$। মনে কর, A-এর চরিত্রানুযায়ী, n-সংখ্যক ব্যষ্টির অনুক্রম মান হল $u_1, u_2, ..., u_n$; এখানে u_2 $(i = 1, 2 ...., n)$ হচ্ছে $1, 2, 3, ...,$ n-এর মধ্যবর্তী যে কোনও একটি সংখ্যা এবং $i \neq j$ হলে $u_i \neq u_j$ হবে। অনুরূপভাবে, B-এর চরিত্রানুযায়ী, ঐ n-সংখ্যক ব্যক্তির মানক্রম যথাক্রমে $v_1, v_2, ...v_n$; যেখানে $v_i(i = 1, 2, ..., n)$ সংখ্যাটিও $1, 2, 3, ...,$ n-এর মধ্যবর্তী একটি সংখ্যা এবং $i \neq j$ হলে $v_i \neq v_j$ হবে। এখন A ও B বৈশিষ্ট্য দুটির মানক্রমিক সহগাঙ্ক (Rank Correlation) যদি আমরা R দিয়ে চিহ্নিত করি, তবে $R = \frac{cov(u, v)}{\sqrt{var(u). var(v)}}$ ....(13)

$$= \frac{u \text{ ও } v\text{-এর সহ ভেদমান}}{\sqrt{u\text{-এর ভেদমান}}\sqrt{v\text{-এর ভেদমান}}}$$

এখন স্পিয়ারম্যানের মানক্রমিক সহগাঙ্ক হল,

$$R = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)} \ldots\ldots\ldots\ldots(14)$$

যেখানে $d_i = u_i - v_i$; $i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots, n$.

যদি দেখা যায় $u_i = v_i$ হয়, প্রত্যেক $i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots n$,-এর জন্য, তবে $R = 1$ অর্থাৎ, A ও B বৈশিষ্ট্য দু'টি ধনাত্মকভাবে সম্পূর্ণ সংস্রবযুক্ত। পক্ষান্তরে যদি $v_i = n - u_i + 1$ হয় প্রত্যেক $i = 1, 2, \ldots\ldots\ldots, n$-এর জন্য, $R = -1$ অর্থাৎ, A ও B চরিত্র দু'টি ঋণাত্মকভাবে সম্পূর্ণ সংস্রবযুক্ত।

মানক্রমিক সহগতির যে সূত্র (2)-এ দেওয়া হয়েছে তাতে উভয় চরিত্রানুযায়ীই প্রত্যেকটির ব্যষ্টির মানক্রম পরস্পর পৃথক। কিন্তু কখনো কখনো এমন হতে পারে যে একাধিক ব্যষ্টি ঠিক সমপরিমাণে কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যষ্টির প্রত্যেককে একই অনুক্রম মান আরোপ করা উচিত। এ রকম হলে বলা হয় যে, ঐ ব্যষ্টিগুলির মধ্যে ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধিকারের ব্যাপারে সমতা বা সম মানক্রম (tie) সৃষ্টি হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্পিয়ারম্যানের মানক্রমিক সহগাঙ্ক হল,

$$R = \frac{\frac{n^2-1}{12} - \frac{T_u + T_v}{2} - \frac{1}{2n}\sum d_i^2}{\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - T_u}\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - T_v}} \ldots\ldots\ldots\ldots(15)$$

যেখানে, $T_u = \sum_{j=1}^{r} \frac{t_j(t_j^2 - 1)}{12n}$ এবং $T_v = \sum_{j=1}^{s} \frac{t'_j(t'^2_j - 1)}{12n}$

$t_1, t_2 \ldots\ldots\ldots\ldots, t_r$ হ'ল u চলকে r টি সমমানক্রমের দৈর্ঘ্য ও $t'_1, t'_2, \ldots\ldots\ldots\ldots t'_s$ হ'ল v-চলকে sটি সমমানক্রমের দৈর্ঘ্য।

উদাহরণ ৫. 15 জন ছাত্রের দুটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মানক্রমানুপাতগুলি নিম্নরূপ।

বিষয় দুটির মানক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয় কর।

ক্রমিক সংখ্যা	A বিষয়ে মানক্রম	B বিষয়ে মানক্রম
1	1	10
2	2	7
3	3	2
4	4	6
5	5	4
6	6	8
7	7	3
8	8	1

9	9	11
10	10	15
11	11	9
12	12	5
13	13	14
14	14	12
15	15	13

সমাধান ঃ মানক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয়ের গণনাকার্য ঃ

A বিষয়ে মানক্রম (u_i)	B বিষয়ে মানক্রম (v_i)	$d_i = u_i - v_i$	d_i^2
1	10	–9	81
2	7	–5	25
3	2	1	1
4	6	–2	4
5	4	1	1
6	8	–2	4
7	3	4	16
8	1	7	49
9	11	–2	4
10	15	–5	25
11	9	2	4
12	5	7	49
13	14	–1	1
14	12	2	4
15	13	2	4
মোট	—	—	272

$$\therefore\ R = 1 - \frac{6 \times 272}{15(225-1)}$$

$$= 1 - \frac{17}{35}$$

$$= \frac{18}{35}$$

$= 0.51$ (আসন্ন)

উদাহরণ ৬. নিচের সারণিতে দশজন বিক্রয়কারীর মেধা পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং তাদের সাপ্তাহিক বিক্রয় (হাজার টাকায়) দেওয়া আছে। মানক্রমিক সহগতি নির্ণয় কর।

বিক্রয়কারী	প্রাপ্ত নম্বর	বিক্রয় পরিমাণ (হাজার টাকায়)
1	50	25
2	70	60
3	50	45
4	60	50
5	80	45
6	50	20
7	90	55
8	50	30
9	60	45
10	60	30

সমাধান ঃ মানক্রমিক সহগতি নির্ণয়ের গণনাকার্য ঃ

বিক্রয়কারী	প্রাপ্ত নম্বরের মানক্রম (u)	বিক্রয়ের মানক্রম (v)	$d = u - v$	d^2
1	8.5	9	–0.5	0.25
2	3	1	2.0	4.00
3	8.5	5	3.5	12.25
4	5	3	2.0	4.00
5	2	5	–3.0	9.00
6	8.5	10	–1.5	2.25
7	1	2	–1.0	1.00
8	8.5	7.5	1.0	1.00
9	5	5	0.0	0.00
10	5	7.5	–2.5	6.25
মোট	—	—	—	40.00

দুটি চরিত্র মিলে মোট 4 টি সমানুক্রম আছে। তাদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে u-চলকে 4 এবং 3 আর v-চলকে যথাক্রমে 3 এবং 2।

অর্থাৎ, $t_1 = 4, t_2 = 3, t_1' = 3$ এবং $t'_2 = 2.$

সুতরাং, $T_u = \frac{1}{12 \times 10}(4^3 - 4 + 3^3 - 3)$

$= \frac{84}{120} = 0.7$

আর, $T_v = \frac{1}{120}(3^3 - 3 + 2^3 - 2)$

$= \frac{30}{120} = 0.25$

সুতরাং, $R = \frac{\frac{n^2-1}{12} - \frac{T_u + T_v}{2} - \frac{1}{2n}\sum d_i^2}{\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - T_u}\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - T_v}}$

$= \frac{8.25 - 0.475 - 2}{\sqrt{8.25 - 0.70}\sqrt{8.25 - 0.25}}$

$= \frac{5.775}{\sqrt{7.55 \times 8.00}} = \frac{5.775}{7.77} = 0.74$ (আসন্ন)

৮৮.৭ অনুশীলনী ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) যদি y-এর উপর x-এর নির্ভরন রেখা ও x-এর উপর y-এর নির্ভরন রেখা সমাপাতিত হয়, তবে সহগাঙ্কের মান কত ?

(২) যদি $3y - 2x = 9$ এবং $3x - 2y = 7$, দুটি নির্ভরন রেখা হয় তবে x ও y-এর মধ্যকগুলি নির্ণয় কর।

(৩) যদি $5y + 3y = 6$, y-এর উপর x-এর নির্ভরন রেখা হয়, তবে সহগতি কোন্ চিহ্নবিশিষ্ট হবে ?

(৪) নির্ভরনাঙ্কদ্বয়ের গুণফল দেওয়া থাকলে সহ পরিবর্তন গুণাঙ্ক নির্ণয় করা যাবে কি ?

(৫) নিচের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধনাত্মক সহপরিবর্তন ঋণাত্মক সহ পরিবর্তন অথবা কোনও সহপরিবর্তন নেই কিনা বল।

(ক) স্বামী ও স্ত্রীদের বয়স।

(খ) বুদ্ধি ও জুতার মাপ।

(গ) বীমা কোম্পানীর লাভ ও তাদের যতগুলি দাবি পূরণ করতে হয়।

(ঘ) শিক্ষাবর্ষ ও আয়।

(ঙ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উৎপাদিত শস্য।

(৬) নিম্নের প্রদত্ত সহ পরিবর্তন গুণাঙ্ক থেকে x ও y চলকগুলির মধ্যে সম্পর্ক বল ঃ

(ক) -1, (খ) -0.6, (গ) 0, (ঘ) 0.8, এবং (ঙ) $+1$

(৭) x ও y-এর মধ্যে সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক 0.75। $u = \frac{x-10}{5}$ এবং $v \frac{y-15}{-6}$ হলে, u ও v-এর মধ্যে সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক কত?

(৮) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন্ সহগতির সাহায্যে সম্পর্ক পরিমাপ করা হয়।

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সততা।

(খ) পদমর্যাদা এবং আয়।

(গ) মুনাফা এবং উৎপাদন।

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) বিক্ষেপণ চিত্র কী ও ইহার ব্যবহারগুলি বর্ণনা কর। কীভাবে বিক্ষেপণ চিত্রের সাহায্যে সহগতির প্রকার নির্ণয় করা যায়?

(২) সহগাঙ্ক কাকে বলে? সহগাঙ্কের ব্যবহারগুলি বর্ণনা কর। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

(৩) মানক্রমিক সহগাঙ্ক কাকে বলে? এর ব্যবহারগুলি কী কী?

(৪) নির্ভরন রেখার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর ও সহগাঙ্কের সঙ্গে-এর সম্পর্ক আলোচনা কর।

(৫) (i) $r_{xy} = +1$, (ii) $r_{xy} = -1$ এবং (ii) $r_{xy} = 0$ হলে নির্ভরন রেখাদ্বয়ের সমীকরণ কিরূপ হবে?

(৬) কোনও সমাগ্রীর দর ও যোগানের নিম্নলিখিত মানগুলি থেকে পিয়ারসনের সহগাঙ্কের মান নির্ণয় কর ও তোমার মতামত দাও।

দর (টাকায়)	ঃ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
যোগান (কেজিতে)	ঃ	30	29	29	25	24	24	24	21	18	15

(৭) নিম্নলিখিত তথ্য থেকে কার্ল পিয়ারসনের সহগাঙ্কের মান নির্ণয় কর ঃ

(i) $\sum x = 125, \sum y = 80, n = 10, \sum x^2 = 1585, \sum y^2 = 650, \sum xy = 1007$

(ii) $\sum x = 140, \sum y = 150, n = 10, \sum (x-10)^2 = 180, \sum (y-15)^2 = 215, \sum (x-10)(y-15) = 60$

(৮) 1990 – 1999 সালে কোনও প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও লাভের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল। এখান থেকে উপযুক্ত নির্ভরন সমীকরণটি চিহ্নিত করে সেটি নির্ধারণ কর।

বছর	ঃ	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99
লাভ (হাজার টাকায়)	ঃ	40	45	50	65	70	70	80	85	85	95
বিনিয়োগ (হাজার টাকায়)	ঃ	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

(৯) x ও y চলক দু'টির ক্ষেত্রে নির্ভরন রেখা দু'টির সমীকরণ হল $4x - 5y + 33 = 0$ এবং $20x - 9y = 107$। x-এর উপর y-এর ও y-এর উপর x-এর সমীকরণ দু'টিকে চিহ্নিত কর। এবং r_{xy}-এর মান নির্ণয় কর। যখন $x = 10$, তখন y-এর অনুমিত মান কত হবে? ঐ মানকে y_0 বলা হলে তখন x-এর অনুমিত মান কত হবে?

(১০) একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে ও পরে 10 জন সদস্যকে নিম্নলিখিতভাবে মানক্রম দেওয়া হয়েছে ঃ

সদস্য	ঃ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
আগের মানক্রম	ঃ	1	6	3	9	5	2	7	10	8	4
পরের মানক্রম	ঃ	6	8	3	7	2	1	5	9	4	10

উপরের তথ্য থেকে স্পিয়ারম্যানের মানক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয় কর ও তোমার মতামত দাও।

৮৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি ঃ

1. শৈলেশ ভূষণ চৌধুরী, অরিজিৎ চৌধুরী ও বিশ্বনাথ দাস (1976) : রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ব (প্রথম খণ্ড) ; কলিকাতা।
2. রাজকুমার সেন (1986) : সংখ্যাতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।
3. সৌরেন্দ্র নাথ দে (1991) : ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।
4. Gupta, S. C. (1997) : Fundamentals of Statistics, Himalaya Publishing House, Delhi.
5. Das, N. G. (1996) : Statistical Methods. M. Co. & Sons, Calcutta.

একক ৮৯ ❑ সূচক সংখ্যা

গঠন

৮৯.০ উদ্দেশ্য

৮৯.১ প্রস্তাবনা

৮৯.২ সূচক সংখ্যায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ

৮৯.৩ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্যাসমূহ

৮৯.৪ জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক

৮৯.৪.১ জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচকের ব্যবহার

৮৯.৫ সূচক সংখ্যার সীমাবদ্ধতা

৮৯.৬ অনুশীলনী

৮৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করবার পর আপনি জানতে পারবেন

- সূচক সংখ্যা কাকে বলে
- সূচক সংখ্যায় ব্যবহৃত প্রতীকগুলি কী কী
- সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্যাগুলি কী কী
- জীবিকা নির্বাহন ব্যয় কাকে বলে
- জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচকের ব্যবহার এবং
- সূচক সংখ্যার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী

৮৯.১ প্রস্তাবনা

পরিসংখ্যান গড় (Statistical average)-এর সাহায্যে একজাতীয় কতকগুলি সংখ্যার বা কোনও একটি প্রদত্ত বিভাজনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়। বাস্তবে এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যখন একটি চলকের (variable-এর) অথবা সম্পর্কযুক্ত চলক (Related variables) গুলির ভিন্ন অবস্থায় মানের গড় পরিবর্তন নির্ণয় করার দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, 1990 সালের তুলনায় 1999 সালে বিভিন্ন

পণ্যদ্রব্যের দর গড়ে কী হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। Û E (1990) সালের তুলনায় 1999 সালে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের গড় দর বৃদ্ধি বা হ্রাস যে একক সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা (Index Number) বলে। অনুরূপভাবে, দুটো বিভিন্ন সময়ে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিবর্তনের পরিমাপ, দুটো বিভিন্ন সময়ে দেশের বেকার লোকের সংখ্যার পরিবর্তনের পরিমাপ কিংবা একই শ্রেণীর লোক এক দেশ থেকে আর এক দেশে বদলী হওয়ার ফলে তাদের জীবনধারনের ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয়, তার পরিমাপ সূচক সংখ্যার সাহায্যে করা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হল, সূচক সংখ্যার সাহায্যে যে গড় প্রকাশ করা হয় তা অবস্থার ওপর নির্ভরশীল (এখানে অবস্থা বলতে সময় অথবা স্থান অথবা অন্য কিছু বোঝানো হয়)।

যে সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ সময় কিংবা স্থানের সাপেক্ষে) পণ্যদ্রব্যের দর (Price), পরিমাণ (Quantity), কিংবা মান (Value)-এর আপেক্ষিক পরিবর্তন প্রকাশ করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা (Index Number) বলে। সময়ের সাপেক্ষে পণ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক দর প্রকাশক সংখ্যাকে 'দরের সূচক সংখ্যা' (Price Index Number) বলা হয়। একইভাবে, সময়ের সাপেক্ষে পণ্যদ্রব্যের আপেক্ষিক পরিমাণ প্রকাশক সংখ্যাকে 'পরিমাণের সূচক সংখ্যা' (Quantity Index Number) এবং মান প্রকাশক সংখ্যাগুলিকে 'মানের সূচক সংখ্যা' (Value Index Number) বলা হয়।

পূর্বে সূচক সংখ্যার ব্যবহার করা হত প্রধানত পণ্যের দরের পরিবর্তন্ পরিমাপের জন্য। কিন্তু এখন এর ব্যবহার খুবই ব্যাপকভাবে করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্মচারী বা শ্রমিকদের বেতন, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়ার ভাতা ইত্যাদি পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের দরের সূচকের গতিপ্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখা শ্রমিক, মালিক, সমাজ কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কিংবা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বহুল প্রচলিত সূচক হল ভোক্তাদের দরের সূচক (Consumer Price Index or CPI), যার অপর নাম জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক (Cost of Living Index or CLI)। এছাড়া রাজ্যের বা দেশের মূল্যমান নির্দেশক পাইকারি দরের সূচক (Wholesale Price Index) বহুল ব্যবহৃত হয়।

৮৯.২ সূচক সংখ্যায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ

আপেক্ষিক পরিবর্তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সময়ের সাপেক্ষে দরের (পরিমাণ বা মানের) পরিবর্তন নির্ণয় করা হয় তাকে ভিত্তিকাল (Base Period) এবং যে সময়ের দর (পরিমাণ বা মান) ঐ ভিত্তিকালের সাপেক্ষে নির্ণয় করা হয় তাকে চলতি কাল বা বর্তমান কাল (Current Period) বলা হয়। সবসময় ভিত্তিকালে দরের (পরিমাণ বা মানের) সূচক সংখ্যা 100 ধরা হয় এবং চলতিকালের সূচক সংখ্যা দিয়ে পণ্যদ্রব্যের দরের (পরিমাণ বা মানের) গড় পরিবর্তন ভিত্তিকালের শতকরায় প্রকাশ করা হয়। ভিত্তিকালকে স্যারণত 'o' এবং চলতিকালকে সাধারণ 'n' দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।

একটি পণ্যের সূচক সংখ্যার জন্য নিম্নলিখিত প্রতীকগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে :—

P_o = পণ্যের ভিত্তিকালের দর (Base Period Price of the Commodity)

P_n = পণ্যের চলতি কালের দর (Current Period Price of the Commodity)

q_o = ভিত্তিকালে পণ্যটির ব্যবহারের পরিমাণ (Base Period Quantity used of the Commodity)

q_n = চলতিকালে পণ্যটির ব্যবহারের পরিমাণ (Current Period Quantity used of the Commodity)।

ভিত্তিকাল থেকে চলতিকালে দর-এর পরিবর্তন দুভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—

(i) প্রকৃত পরিমাপ $P_n - P_o$ অথবা (ii) আপেক্ষিক পরিমাপ $\frac{P_n}{P_o}$ দিয়ে। অনুরূপভাবে, $q_n - q_o$ পরিমাণের প্রকৃত পরিমাপ ও $\frac{q_n}{q_o}$ পরিমাণের আপেক্ষিক পরিমাপ (Quantity Relative) নির্দেশ করে। যেহেতু আপেক্ষিক পরিবর্তন কোনও একক নির্ভর নয়, তাই একে অপেক্ষাকৃত ভালো পরিমাপ ধরা হয়। ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক দর (পরিমাণ বা মান)-গুলির একটি গড় নির্ণয় করে তাকে দর (পরিমাণ বা মূল্য)-এর সূচক বলে অভিহিত করা হয়।

৮৯.৩ সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্যাসমূহ

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সময় যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। নিম্নে যে সমস্যাগুলি আলোচিত হবে সেগুলি সমগুরুত্ব সম্পন্ন নাও হতে পারে এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হতেও পারে। সমস্যাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(i) সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য (Purpose of Constructing Index Number)

(ii) ভিত্তিকাল নির্বাচন (Choice of Base Period)

(iii) পণ্যদ্রব্য নির্বাচন (Choice of Commodity)

(iv) তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data)

(v) রাশিতথ্যের একত্রীকরণ ও ভার নির্বাচন (Method of Combining Data and Choice of Weights)

(vi) নির্ণীত সূচক সংখ্যার ব্যাখ্যা (Interpretation of Index Number)

(i) সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের আগে তার নির্ণয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানতে হবে, কারণ পরবর্তী সমস্যাগুলি সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। বস্তুত এমন কোনও সূচক সংখ্যার কথা ভাবা যায় না যা সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রকারের সূচক সংখ্যার প্রয়োগ যথোপযুক্ত হবে। যথার্থ উদ্দেশ্যযুক্ত একটি সূচক সংখ্যা উপযোগী, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন একটি সূচক সংখ্যা ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ, জীবিকা নির্বাহন সূচক সংখ্যা (Cost of Living Index Number)-এর কথা ধরা যাক। এই সূচক নির্ণয়ের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য যথা—চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদির খুচরা দরের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, যেহেতু দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য লোকে এগুলি খুচরা দরে কিনে থাকে। আবার এই সব দর সাধারণভাবে দেশের মূল্যমানের গতিপ্রকৃতি জানার উদ্দেশ্যে নির্মিত পাইকারি দরের সূচক (Wholesale Price Index) নির্ণয়কালে ব্যবহার করা যাবে না। ইহা নির্ণয়ের জন্য পণ্যদ্রব্যের পাইকারি দর সংগ্রহ করতে হবে।

(ii) ভিত্তিকাল নির্বাচন

সূচক সংখ্যা ভিত্তিকালের সাপেক্ষে নির্ণয় করা হয়। সেজন্য ভিত্তিকাল নির্ণয়ের সময় বিশেষ সতর্কতা নেওয়া দরকার। মোটামুটি একটি স্বাভাবিক সময়কে ভিত্তিকাল হিসাবে ধরা উচিত। ঐ সময়ে পণ্যদ্রব্যের দর বা পরিমাণের মধ্যে যে কোনও অস্বাভাবিকতা না থাকে অর্থাৎ যেন ঐ সময়ে কোনও বিশেষ কারণে পণ্যের দর হঠাৎ খুব বেড়ে না যায় (যেমন যুদ্ধের সময়) বা কমে না যায় (যেমন মন্দার সময়)।

ভিত্তিকাল ও চলতিকালের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি হওয়া উচিত নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অবস্থা অর্থাৎ মানুষের চাহিদা ও অভ্যাসের পরিবর্তন হয়। তাই ভিত্তিকাল ও চলতিকালের মধ্যে সময়ের পার্থক্য বেশি হলে বাজারের অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথার্থ তুলনা করা যায় না। ভিত্তির কাল খুব বেশি পুরানো হলে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সময় ভিত্তিকালের অনেক পণ্য চলতিকালে বাজারে পাওয়া যায় না বা পাওয়া খুব কষ্টকর হয়। এই কারণে ভিত্তিকাল খুব পুরানো হয়ে গেলে তাকে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী কালে সরিয়ে আনতে হবে।

ভিত্তিকালের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হওয়া বা কম হওয়া উচিত নয়। খুব বেশি হলে (যেমন আট বা দশ বছর) ঐ দীর্ঘ সময়ের গড় নেওয়ার ফলে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ওঠানামা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। আবার দৈর্ঘ্য খুব কম হলে (অর্থাৎ একদিন বা একসপ্তাহ) এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের দরের অস্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। যেমন, বিয়ে, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দিন বাজারে মাছের দাম স্বাভাবিক দামের চেয়ে বেশি হতে পারে।

(iii) পণ্যদ্রব্য নির্বাচন

সময়, অর্থ ও শ্রমের বাধ্য বাধকতার জন্য বাজারের প্রত্যেকটি পণ্যকে সূচক সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সূচক সংখ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা সঙ্কলন করা হয়, নতুবা তা অর্থহীন হয়ে যায়। তাই নমুনা হিসাবে কিছু প্রতিনিধিমূলক পণ্যের দর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। পণ্যগুলি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাতে এদের গড় দরের গতিবিধি বাজারের সকল দ্রব্যের গড় দরের কাছাকাছি হয়। সেইজন্য পণ্যদ্রব্যের নির্বাচন উদ্দেশ্যমূলক বা বিচারভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি (Judgement Sampling Method)-তে করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য, যেমন চাল, গম, তেল, চিনি নিতেই হয় এবং বাকি পণ্যের চয়ন সমসম্ভব উপায়ে করতে হবে।

নমুনা সংগ্রহের জন্য পণ্যগুলিকে কয়েকটি প্রধান প্রধান গোষ্ঠীতে (Group-এ) ভাগ করা হয়। যেমন, জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সময় পণ্যগুলিকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়—খাদ্য, আলো ও জ্বালানী, বস্ত্র, বাসস্থান এবং বিবিধ। গোষ্ঠীর আবার উপগোষ্ঠী (Sub-Group) থাকতে পারে। যেমন, খাদ্যের উপগোষ্ঠীগুলি হল তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য, মাছ-মাংস, তরকারী ইত্যাদি। তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি।

নমুনা সংখ্যা (Sample Size) কত হবে তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবে সংখ্যা খুব বড় কিংবা খুব ছোট হওয়া উচিত নয়। খুব বড় নমুনা হলে বাস্তব কিছু অসুবিধা থাকে, আবার খুব ছোট হলে তা কোনও গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রতিনিধি হতে পারে না।

(iv) **তথ্য সংগ্রহ**

একজন রাশি তথ্য সংগ্রাহককে সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর বেগ পেতে হয়, যেহেতু একই পণ্যের বিভিন্ন স্থানে (এমনকি একই স্থানে) দর বিভিন্ন রকম হয়। আবার গুণগত মান (Quality)-এর তারতম্যের জন্য দরও বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন, একই বাজারে বিক্রীত চালের দাম বিভিন্ন হয়, আবার চালের গুণমান বিভিন্ন হওয়ার জন্যও দর বিভিন্ন হয়। তাছাড়া সঠিক দর যাতে সংগৃহীত হয় তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচকের জন্য খুচরা দর সংগ্রহ করা হয়, অপরপক্ষে পাইকারি দরের সূচকের ক্ষেত্রে পাইকারি দর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

(v) **রাশিতথ্যের একত্রীকরণ ও ভার নির্বাচন** (Method of Combining Data and Choice of weights) ঃ

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি বা সূত্র প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে প্রদত্ত ছকে প্রধান প্রধান পদ্ধতি বা সূত্রগুলি দেওয়া হল ঃ

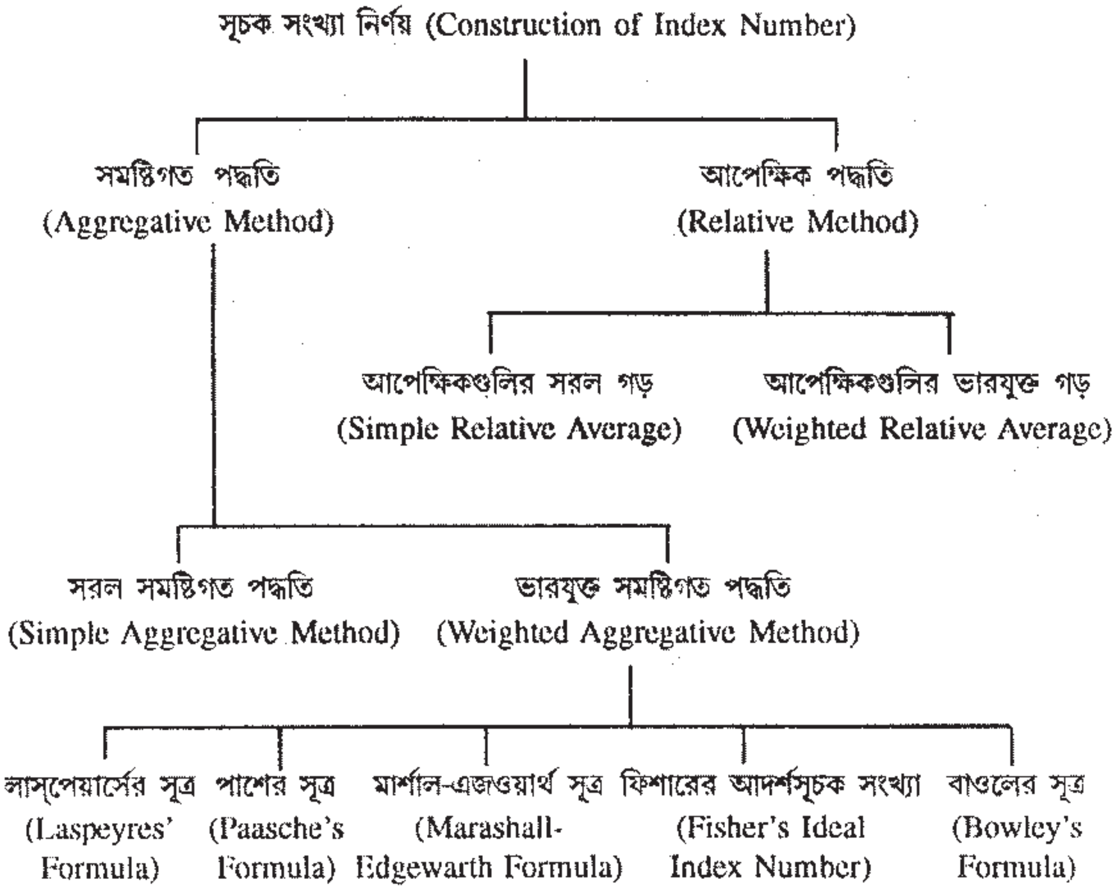

সরল সমষ্টিগত পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পণ্যগুলির দরের সরল সমষ্টির চলতিকালের মানের সঙ্গে ভিত্তিকালের মান তুলনা করা হয়। সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\text{সূচক } I_{on} = \frac{\sum p_{ni}}{\sum p_{oi}} \times 100 \ldots\ldots\ldots(1)$$

যেখানে p_{ni} হল i-তম পণ্যের চলতিকালের দর এবং p_{oi} হল i-তম পণ্যের ভিত্তিকালের দর। সকল পণ্যের জন্য সমষ্টি ($\sum$) নেওয়া হয়েছে।

একে সরল সমষ্টিগত সূচক সংখ্যা (Simple Aggregative Index Number) বলা হয়। এই সূত্রের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, এখানে প্রতিটি এককের দরের ওপর নির্ভর করা হয় এবং সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে বিভিন্ন পণ্যের গুরুত্ব (বা ভার) সমান ধরা হয়েছে যা বাস্তবে সব সময় ঠিক নয়। যেমন, ভারতে পাইকারি দরের সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সময় চাল ও গমকে তামাক ও মদ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভারযুক্ত সমষ্টিগত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ভারযুক্ত সমষ্টিগত পদ্ধতি (Weighted Aggregative Method) :

এই পদ্ধতিতে চলতি ও ভিত্তিকালে পণ্যগুলিকে যথোপযুক্ত ভারসম্পন্ন করে চলতিকালের পণ্যগুলির মোট মূল্যকে ভিত্তিকালের পণ্যগুলির মোট মূল্যের শতকরায় প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে দরের সূচক সংখ্যা হল ঃ

$$I_{on} = \frac{\sum p_{ni} w_i}{\sum p_{oi} w_i} \times 100 \ldots\ldots\ldots(2)$$

যেখানে p_{oi} ও p_{ni} পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং w_i, i-তম পণ্যের একই ভার ধরা হয়েছে।

ভারযুক্ত সমষ্টিগত পদ্ধতিতে দরের সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিমাণ (Quantity)-কে ভার হিসাবে ধরা হয়। চলতি বা ভিত্তিকালের পরিমাণকে ভার হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে নিম্নে প্রদত্ত বিভিন্ন সূত্র দরের সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে প্রয়োগ করা হয় ঃ

(ক) লাস্‌পেয়ার্সের সূত্র (Laspeyres' Formula) ঃ

এই সূত্রে ভিত্তিকালের পণ্যদ্রব্যের পরিমাণকে পণ্যদ্রব্যের দরের ভার হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ $w_i = q_{oi}$ = ভিত্তিকালে i-তম পণ্যের পরিমাণ ধরা হয়। সুতরাং লাস্‌পেয়ার্সের সূত্রানুযায়ী, পণ্যের দরের সূচক সংখ্যা I^L_{on} হলে,

$$I^L_{on} = \frac{\sum p_{ni} q_{oi}}{\sum p_{oi} q_{oi}} \times 100 \ldots\ldots\ldots(3)$$

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে এই সূত্রের ব্যবহার সবচাইতে ব্যাপক। কারণ হল, অন্যান্য সূত্রের তুলনায় এই সূত্র বাস্তবে অনেক সহজে ব্যবহার করা যায়। এই সূত্রে যেহেতু ভার হিসাবে ভিত্তিকালের পরিমাণ ব্যবহার করা হয়, এর রাশিতথ্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

এই সূচক সংখ্যা দরের স্তরের বৃদ্ধি প্রকাশ করতে পারে নির্দিষ্ট ভার q_{oi}-এর জন্য, যেখানে চলতিকালে ভোক্তা সমান সন্তুষ্টির জন্য যেসব পণ্যের দর অপেক্ষাকৃত কম সেগুলি বেশি পরিমাণে কিনে এবং যেগুলির দর আপেক্ষিকভাবে বেশি সেগুলি কম কিনে মোট খরচ কমাতে পারে। সেই অর্থে লাস্‌পেয়ার্সের সূচক সংখ্যাকে ঊর্ধ্বমুখী পক্ষপাতদুষ্ট (Upward Biased) বলা হয়।

(খ) পাশের সূত্র (Paasche's Formula) ঃ

এই সূত্রে চলতিকালের পণ্যদ্রব্যের পরিমাণকে পণ্যদ্রব্যের দরের ভার হিসাবে ধরা হয়, অর্থাৎ $w_i = q_{ni}$ = চলতিকালে i- তম পণ্যের পরিমাণ ধরা হয়। সুতরাং, পাশের সূত্রানুযায়ী, পণ্যের দরের সূচক সংখ্যা I_{on}^{P} হলে,

$$I_{on}^{P} = \frac{\sum p_{ni}q_{ni}}{\sum p_{oi}q_{ni}} \times 100 \ldots\ldots\ldots (4)$$

পাশের সূত্রে ভার হিসাবে চলতিকালের পরিমাণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চলতিকালে পরিমাণ সংক্রান্ত রাশিতথ্য সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য এই সূত্রের ব্যবহার বাস্তবে খুবই সীমিত। লাস্‌পেয়ার্সের সূচক সংখ্যার মতো পাশের সূচক সংখ্যা নিম্নমুখী পক্ষপা, দুষ্ট (Downward Biased) বলা হয়।

(গ) মার্শাল-এজওয়ার্থ সূত্র (Marshall-Edgeworth Formula) ঃ

এই সূত্রে চলতি ও ভিত্তিকালের পরিমাণের গড়কে পণ্যদ্রব্যের দরের ভার হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং, মার্শাল-এজওয়ার্থ সূত্রানুযায়ী, পণ্যের দরের সূচক সংখ্যা I_{on}^{M-E} হলে,

$$I_{on}^{M-E} = \frac{\sum p_{ni}(q_{oi} + q_{ni})}{\sum p_{oi}(q_{oi} + q_{ni})} \times 100 \ldots\ldots\ldots (5)$$

এই সূত্রটি লাস্‌পেয়ার্সের সূত্রে ঊর্ধ্বমুখী পক্ষপাত ও পাশের সূত্রের নিম্নমুখী পক্ষপাতের মধ্যে সমতা বিধানকারী। যদিও এই সূত্রের মধ্যে কোনও সাধারণ পক্ষপাত নেই, তবে এর গণনা কার্য কষ্টসাধ্য।

(ঘ) ফিশারের আদর্শ সূচক সংখ্যা (Fisher's Indeal Index Number) ঃ

লাস্‌পেয়ার্সের সূচক সংখ্যা এবং পাশের সূচক সংখ্যার গুণোত্তর গড় (G.M.)-কে ফিশারের আদর্শ সূচক সংখ্যা বলা হয়। সুতরাং, ফিশারের সূচক সংখ্যা I_{on}^{F} হলে,

$$I_{on}^{F} = \sqrt{\frac{\sum p_{ni}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times \frac{\sum p_{ni}q_{ni}}{\sum p_{oi}q_{ni}}} \times 100 \ldots\ldots (6)$$

(ঙ) লাস্‌পেয়ার্স ও পাশ-এর সূচক সংখ্যার যৌগিক গড়কে বাওলের সূচক সংখ্যা (Bowley's Index) বলা হয়, অর্থাৎ

$$I_{on}^{B} = \frac{1}{2}\left[\frac{\sum p_{ni}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} + \frac{\sum p_{ni}q_{ni}}{\sum p_{oi}q_{ni}}\right] \times 100 \ldots\ldots\ldots (7)$$

আপেক্ষিক পদ্ধতি (Relative Method) ঃ

যে সংখ্যার সাহায্যে চলতিকালের কোন দরকে ভিত্তিকালের দরের সাপেক্ষে প্রকাশ করা হয়, তাকে আপেক্ষিক দর (Price Relative or Only Relative) বলা হয়। আপেক্ষিক পরিমাণের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রকাশ করা যায়। সুতরাং, কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে,

$$\text{আপেক্ষিক দর} = \frac{\text{চলতিকালে দর}}{\text{ভিত্তিকালে দর}} = \frac{p_n}{p_o}$$

আপেক্ষিক দর পদ্ধতি দরের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয় পণ্যগুলির আপেক্ষিক দরগুলির গড়ের সাহায্যে সাধারণত সরল কিংবা ভারযুক্ত যৌগিক গড় (A.M.) অথবা গুণোত্তর গড় (G.M.) ব্যবহৃত হয়।

(ক) আপেক্ষিক দরের সরলযৌগিক গড় পদ্ধতি (Simple Averages of Price Relatives) ঃ

যদি সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে সরল যৌগিক গড় ব্যবহার করা হয়, তবে

$$I_{on} = \frac{1}{k}\sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} \times 100\ldots\ldots\ldots(8)$$

যেখানে সমষ্টি ($\sum$) সকল k পণ্যের আপেক্ষিক দরের ওপর নেওয়া হয়েছে। যদি সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে সরল গুণোত্তর গড় ব্যবহার করা হয়, তবে

$$I_{on} = \left\{\pi(p_{ni} / p_{oi})\right\}^{\frac{1}{k}} \times 100\ldots\ldots\ldots(9)$$

যেখানে গুণফল ($\prod$) সকল k পণ্যের আপেক্ষিক দরের ওপর নেওয়া হয়েছে। এছাড়া দরের আপেক্ষিক মানের সরল বিবর্ত যৌগিক গড়, সংখ্যাগুরুমান বা মধ্যমা ব্যবহার করা যায়।

(খ) আপেক্ষিক দরের ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি (Weighted Average of Price Relatives) ঃ

আপেক্ষিক দরের সরল যৌগিক গড় পদ্ধতিতে কোনও একটি আপেক্ষিক দরের দ্বারা সূচকের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভাবিত হতে পারে। তাই ভারযুক্ত সমষ্টিগত পদ্ধতির মতো আপেক্ষিক দরের ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে আপেক্ষিক দরের ভার (Weight) যুক্ত করা হয়। এখানে ভার হিসাবে বিক্রীত বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য (Value) কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে ধরা হয়।

যদি w_i, i-তম পণ্যের আপেক্ষিক দরের ভার হয়, তবে ভারযুক্ত আপেক্ষিক দরের যৌগিক গড় (Weighted Arithmetic Mean of Price Relatives) হল

$$I_{on} = \frac{\sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} w_i}{\sum w_i} \times 100\ldots\ldots\ldots(10)$$

ভারযুক্ত আপেক্ষিক দরের গুণোত্তর গড় (Weighted Geometric Mean of Price Relatives) হল,

$$I_{on} = \left\{\pi\left(\frac{p_{ni}}{p_{oi}}\right)^{w_i}\right\}^{\frac{1}{\sum w_i}} \times 100\ldots\ldots\ldots(11)$$

এবং ভারযুক্ত আপেক্ষিক দরের বিবর্ত যৌগিক গড় (Weighted Harmonic Mean of Price Relatives) হল,

$$I_{on} = \frac{\sum w_i}{\sum \frac{p_{oi}}{p_{ni}} w_i} \times 100\ldots\ldots\ldots(12)$$

(10) নং সূত্রে $w_i = p_{oi}\, q_{oi}$ এবং (12) নং সূত্রে $w_i = p_{ni}\, q_{ni}$ ধরলে যথাক্রমে লাস্‌পেয়ার্সের সূত্র এবং পাশের সূত্র পাওয়া যায়।

(vi) নির্ণীত সূচক সংখ্যার ব্যাখ্যা (Interpretation of Index Number) ঃ

সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ণীত সূচক সংখ্যার ব্যাখ্যা নির্ভর করে। ভিত্তিকাল ও চলতিকালে জীবনযাত্রার মান একই রাখতে হলে চলতিকালে জীবিকা নির্বাহ ব্যয় ভিত্তিকালের তুলনায় কতটা বেশি বা কম হবে তা জীবন নির্বাহন ব্যয়ের সূচক (Cost of Living Index) দ্বারা নির্দেশিত হয়, আবার ভিত্তিকালের তুলনায় চলতিকালের সাধারণ মূল্যমানের হেরফের পাইকারি দরের সূচক (Wholesale Price Index) দ্বারা নির্দেশিত হয়ে থাকে। ভিত্তিকালের শিল্পোৎপাদনের তুলনায় চলতি কালের শিল্পোৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ সূচক (Quantity Index of Industrial Production) দ্বারা নির্দেশিত হয়।

সাধারণত সূচক সংখ্যাকে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয় এবং I_{oo}, অর্থাৎ ভিত্তিকালের সূচক সংখ্যাকে 100 ধরা হয়। "1980-81-কে ভিত্তিকাল ধরে 1990 সালের সর্বভারতীয় পাইকারি দরের সূচক 1946"- বলতে বোঝায় 1980-81 সালের তুলনায় 1990 সালে পাইকারী মূল্যমান 1.946 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণ ১. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bureau of Applied Economics and Statistics) কর্তৃক নিম্নলিখিত রাশিতথ্য সংগৃহীত হয়েছে। 1962 সালকে ভিত্তিকাল ধরে বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী 1963 সালের সূচক নির্ণয় কর।

পণ্যের দাম	1962 (জানুয়ারি)		1963 (জানুয়ারী)	
	প্রতি 100 কেজির দর (টাকায়)	ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	প্রতি 100 কেজির দর (টাকায়)	ব্যবহারের পরিমাণ (মেট্রিক টন)
1. চাল	55.50	7391	70.20	12839
2. গম	37.52	2381	37.52	5377
3. ছোলার ডাল	56.95	50	52.26	400
4. সরিষা তৈল	256.00	6610	239.50	3380
5. চিনি	107.70	15036	117.41	15707

সমাধান ঃ গণনাকার্য ঃ

পণ্যের দাম	1962		1963					
	p_o	q_o	p_n	q_n	p_oq_o	p_nq_o	p_oq_n	p_nq_n
1. চাল	55.50	7391	70.20	12839	410200.50	518848.20	712564.50	901297.80
2. গম	37.52	2381	37.52	5377	89335.12	89335.12	201745.04	201745.04
3. ছোলার ডাল	56.95	50	52.26	400	2847.50	2613.00	2278.00	20904.00
4. সরিষা তেল	256.00	6610	239.50	3380	1692160.00	1583095.00	865280.00	809510.00
5. চিনি	107.70	15036	117.41	15707	1619377.20	1765376.76	1691643.90	18441588.87
মোট	—	—	—	—	3813920.32	3959268.08	3494013.44	3777615.71

(i) লাস্‌পেয়ার্সের সূচক $(I^L_{on}) = \frac{\sum p_{ni}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times 100 = \frac{3959268.08}{3813920.32} \times 100 = 103.8$

(ii) পাশের সূচক $(I^P_{on}) = \frac{\sum p_{ni}q_{ni}}{\sum p_{oi}q_{ni}} \times 100 = \frac{3777615.71}{3494013.44} \times 100 = 108.1$

(iii) মার্শাল-এজওয়ার্থের সূচক $(I^{M-E}_{on}) = \frac{\sum p_{ni}(q_{oi} + q_{ni})}{\sum p_{oi}(q_{oi} + q_{ni})} \times 100$

$$= \frac{\sum p_{ni}q_{oi} + \sum p_{ni}q_{ni}}{\sum p_{oi}q_{oi} + \sum p_{oi}q_{ni}} \times 100$$

$$= \frac{3959268.08 + 3777615.71}{3813920.32 + 3494013.44} \times 100 = 105.9$$

(iv) ফিশারের আদর্শ সূচক সংখ্যা $(I^F_{on}) = \sqrt{I^L_{on} \times I^P_{on}}$

$$= \sqrt{103.8 \times 108.1} = 105.9$$

উদাহরণ ২. নিম্নে প্রদত্ত তথ্য থেকে সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর—(i) আপেক্ষিক দরের সরলগড় ও (ii) আপেক্ষিক দরের গুণোত্তরগড় পদ্ধতিতে।

পণ্যদ্রব্য	A	B	C	D	E
1988 সালে দাম (টাকায়)	10	18	12	20	25
1990 সালে দাম (টাকায়)	12	16	10	8	8

সমাধান ঃ মনে কর, p_o এবং p_n যথাক্রমে 1988 সালে ও 1990 সালের দর।

গণনা কার্য ঃ

পণ্যদ্রব্য	p_o	p_n	$\frac{p_n}{p_o} \times 100$	$\log\left(\frac{p_n}{p_o} \times 100\right)$
A	10	12	120.00	2.0792
B	18	16	88.89	1.9488
C	12	10	83.33	1.9208
D	20	8	40.00	1.6021
E	25	8	32.00	1.5051
মোট	—	—	364.22	9.0560

(i) আপেক্ষিক দরের সরলগড় পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা $= \frac{364.22}{5} = 72.84$

(ii) আপেক্ষিক দরের গুণোত্তরগড় পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা $= \text{Anti } \log\left(\frac{9.0560}{5}\right)$

$$= \text{Anti } \log(1.8112) = 64.74$$

৮৯.৪ জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক (Cost of Living Index or Consumer Price Index Number) ঃ

দুটি ভিন্ন সময়ে সম পরিমাণ সার্থকতা প্রাপ্তির জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তাদের আপেক্ষিক পরিবর্তনের পরিমাপ জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক (Cost of Living Index সংক্ষেপে C.L.I. or Consumer Price Index সংক্ষেপে C.P.I.) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের (বা ভোক্তার) জীবনযাত্রার প্রণালী বিভিন্ন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কারখানার শ্রমিকশ্রেণী বা কৃষকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার উচ্চ আয়ের লোক, মধ্যম আয়ের লোক এবং নিম্ন আয়ের লোকেদের জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন। এরূপ প্রতিটি ভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য আলাদা আলাদা জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে, দুটি ভিন্ন অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর পণ্য ও পরিষেবার উপভোক্তার দর (বা খুচরা দর) তুলনা করে এই সূচক নির্ণয় করা হয়।

এই সূচক নির্ণয়ের জন্য জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যগুলিকে প্রথমে কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠী বা বিভাগে (Major Group) ভাগ করা হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রধান বিভাগ নেওয়া হয়—(1) খাদ্য (Food), (2) বস্ত্র (Clothing), (3) জ্বালানী ও আলো (Light and Fuel), (4) বাসস্থান (Housing) এবং বিবিধ (Miscellaneous)।

প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগের জন্য ঐ বিভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় (Representative) কয়েকটি ভোগ্য পণ্যের নমুনা নেওয়া হয়। যেমন খাদ্য (Food) -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় চাল, গম, তরকারি, মাছ, মাংস, ফল, তেল, লবণ, মসলা, ঘি ইত্যাদি। এদের সাহায্যে প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগের জন্য একটি করে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় ভোগ্যপণ্যগুলির আপেক্ষিক দরের ভারযুক্ত গড় নেওয়া হয়। কোনও পণ্যের ভার ভোক্তাদের কাছে ঐ পণ্যের গুরুত্ব অনুযায়ী স্থির করা হয়।

কোনও একটি পণ্যের আপেক্ষিক দর বিভিন্ন বাজার বা দোকান থেকে সংগৃহীত ঐ পণ্যের বিভিন্ন আপেক্ষিক দরসমূহের ভারহীন গড়। কোনও প্রধান গোষ্ঠীর জন্য মোট খরচের যত শতাংশ ভোক্তাগণ ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি পণ্যের জন্য খরচ করে থাকে, তাকে ঐ পণ্যের ভার হিসাবে ধরা হয়। এই প্রণালীতে প্রত্যেকটি প্রধান বিভাগের জন্য একটি করে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। সার্বিক বা মূল সূচক সংখ্যা (General Index)টি প্রধান বিভাগগুলির সূচক সংখ্যাগুলির ভারযুক্ত গড়। ভোগ্য পণ্যের জন্য মোট ব্যয়ের যত শতাংশ একটি প্রধান বিভাগের জন্য খরচ করা হয়, তাকে ঐ বিভাগের সূচক সংখ্যার ভার হিসাবে নেওয়া হয়।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভোক্তার পণ্য ব্যবহারের আপেক্ষিক গুরুত্ব যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, তাই জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক নির্ণয়ে ভার যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হয়। পাঁচটি প্রধান গোষ্ঠীর সূচক সংখ্যা নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির যে কোনও একটির সহায়ে নির্ণয় করা হয় ঃ

(i) **সমষ্টিগত ব্যয় পদ্ধতি বা সমষ্টিগত পদ্ধতি** (Aggregate Expenditure Method or Aggregate Method),

(ii) পারিবারিক আয়-ব্যয়ক সমীক্ষা বা ভারযুক্ত আপেক্ষিক পদ্ধতি (Family Budget Enquiry or Method of Weighted Relatives)।

(i) **সমষ্টিগত ব্যয় পদ্ধতি বা সমষ্টিগত পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট কোনও প্রধান বিভাগের পণ্যগুলির ভিত্তিকালে ক্রয়ের পরিমাণ বা তার খণ্ড ভগ্নাংশকে ভার হিসাবে ধরা হয় এবং ভিত্তিকালের সাপেক্ষে চলতিকালে ভারযুক্ত দরের সমষ্টিকে ঐ বিভাগের সূচক সংখ্যা হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ,

$$\text{বিভাগীয় সূচক সংখ্যা (I)} = \frac{\sum p_{ni}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times 100$$

যা লাস্‌পেয়ার্সের সূত্রের সঙ্গে সমান।

(ii) **পারিবারিক আয়-ব্যয়ক সমীক্ষা বা ভারযুক্ত আপেক্ষিক পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে, যে শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহন ব্যয়সূচক নির্ণয় করতে হবে তাদের সম্পর্কে "পারিবারিক আয় ব্যয়ক সমীক্ষা" (Family Budget Enquiry) কাজ করতে হয়। এই সমীক্ষার ফলে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত সাধারণ পরিবার (Average Family) কোন্ কোন্ পণ্যদ্রব্য কী পরিমাণে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কোন্ পণ্যের জন্য কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার তথ্য সংগ্রহ করে তা থেকে সূচকের জন্য ভার নির্ণয় করা হয়। পারিবারিক আয়-ব্যয়ক সমীক্ষায় ভিত্তিকালে সম্ভাব্য নমুনা চয়ন (Random Sampling) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে ভার হিসাবে ভিত্তিকালের মান (i.e. p_oq_o)-কে ধরা হয়। সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে আপেক্ষিক দরের ভারযুক্ত গড়কে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ,

$$\text{বিভাগীয় সূচক সংখ্যা (I)} = \frac{\sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} \times w_i}{\sum w_i} \times 100$$

$$= \frac{\sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} \times p_{oi}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times 100 \; [\text{ যেহেতু } w_i = p_{oi}\, q_{oi} \,]$$

$$= \frac{\sum p_{ni}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times 100$$

যা সমষ্টিগত পদ্ধতিতে লাস্‌পেয়ার্সের সূত্রের সঙ্গে সমান।

প্রয়োগক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত সাধারণ পরিবারে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পণ্যের ব্যয়কে ঐ শ্রেণীর মোট ব্যয়ের শতকরা হিসাবে প্রকাশ করে তাকে ভার (w) হিসাবে নেওয়া হয়, অর্থাৎ

$$w_i = \frac{p_{oi}q_{oi}}{\sum p_{oi}q_{oi}} \times 100$$

বিভাগীয় সূচক সংখ্যা $(I) = \dfrac{\sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} \times w_i}{100} \times 100 = \sum \frac{p_{ni}}{p_{oi}} \times w_i$

উপরোক্ত দুই প্রকারের যে কোনও পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণীসূচক সংখ্যা নির্ণয় করার পর সার্বিক বা মূলসূচক সংখ্যা (Cost of Living Index or Consumer Price Index) নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় ঃ

জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা $= \dfrac{\sum I_i W_i}{\sum W_i}$

যেখানে W হচ্ছে শ্রেণী সূচকের ভার যা একটি সাধারণ পরিবারের মোট ব্যয়ের মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যয়ের শতকরা পরিমাপ।

যদি শতকরা বিভাগীয় সূচক বৃদ্ধি (%) I' দেওয়া থাকে, তবে জীবিকা নির্বাহন ব্যয়সূচক সংখ্যা

$$= 100 + I' = 100 + \frac{\sum I_i W_i}{\sum W_i}$$

৮৯.৪.১ জীবিকা নির্বাহন ব্যয়ের সূচকের ব্যবহার (Uses of Cost of Living Index Number) :

(i) ভিত্তিকালের সমান জীবিকা নির্বাহের মান বজায় রাখার জন্য মহার্ঘ্য ভাতা (Dearness Allowance) ঠিক করার জন্য জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক ব্যবহার করা হয়।

(ii) বেতন, কর এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নির্ধারণে সূচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।

(iii) জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যার অন্যোন্যক (reciprocal)-কে টাকার ক্রয় ক্ষমতা (Purchasing Power of Money)-র নির্ভরযোগ্য পরিমাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ

$$\text{টাকার ক্রয় ক্ষমতা} = \frac{1}{\text{জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক}} \times 100$$

(iv) জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচককে চলতিকালের বেতন (Actual Wage) থেকে প্রকৃত বেতন (Real Wage) নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়।

$$\text{প্রকৃত বেতন (Real Wage)} = \frac{\text{চলতি কালের বেতন (Actual Wage)}}{\text{ঐ সময়ে জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক}} \times 100$$

উদাহরণ ৩. নিম্নে প্রদত্ত ছকে শ্রেণীসূচক সংখ্যা ও তাদের ভার জীবিকা নির্বাহের সাপেক্ষে দেওয়া আছে। জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর।

শ্রেণী	সূচক সংখ্যা	ভার
খাদ্য	360	60
বস্ত্র	295	5
বাসস্থান	110	8
আলো ও জ্বালানী	287	7
বিবিধ	315	20

সমাধান ঃ

জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

শ্রেণী	সূচক সংখ্যা (I)	ভার (W)	IW
খাদ্য	360	60	21500
বস্ত্র	295	5	1475
বাসস্থান	110	8	880
আলো ও জ্বালানী	287	7	2009
বিবিধ	315	20	6300
মোট	—	100	32264

$\therefore$ জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা $\frac{\sum I_i W_i}{\sum W_i} = \frac{32264}{100} = 322 \cdot 64$

উদাহরণ ৪. নিম্নে প্রদত্ত ছক থেকে 1985 সালের সাপেক্ষে 1988 সালে জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর। ইহা হইতে টাকার ক্রয় ক্ষমতা বর্ণনা কর।

পণ্য	খাদ্য	বাসস্থান	বস্ত্র	জ্বালানী	বিবিধ
দাম (1985 সালে)	250	60	80	50	200
দাম (1988 সালে)	270	80	100	50	250
ব্যয় (%)	35	20	15	10	20

একটি কারখানার যে সব শ্রমিক 1985 সালে মাসে 500 টাকা করে বেতন পায় তাদের মহার্ঘ্য ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। 1988 সালে জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক পরিবর্তনের জন্য মহার্ঘ্য ভাতা কত হওয়া উচিত?

সমাধান ঃ মনে কর, p_o এবং p_n, 1985 ও 1988 সালের দর এবং W, % ব্যয় প্রকাশ করে।

জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

পণ্য	p_o	p_n	$I = \frac{p_n}{p_o} \times 100$	W	IW
খাদ্য	250	270	108·00	35	3780·00
বাসস্থান	60	80	133·33	20	2666·60
বস্ত্র	80	100	125·00	15	1875·00
জ্বালানী	50	50	100·00	10	1000·00
বিবিধ	200	250	125·00	20	2500·00
মোট	—	—	—	100	11821·60

জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা $= \frac{\sum IW}{\sum W} = \frac{11821 \cdot 60}{100} = 118 \cdot 22$

সুতরাং, 1985 সালের তুলনায় 1988 সালে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় 18·22% বেড়েছে। 1988 সালের টাকার ক্রয় ক্ষমতা = $\frac{1}{118 \cdot 22} \times 100 = 0 \cdot 8459$ অর্থাৎ, 1985 সালে 1 টাকায় যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যেত 1988 সালে তার 84·59% পণ্য ক্রয় করা যাবে। সুতরাং, টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে 1988 সালে কোনও ব্যক্তির আয় বাড়লেও ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

যেহেতু, জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা 118·22 যে শ্রমিক 1985 সালে 100 টাকা আয় করত তার 1988 সালে 118·22 টাকা আয় করা উচিত। যেহেতু ঐ শ্রমিক 1985 সালে 500 টাকা আয় করত তাই তার 1988 সালে আয় হওয়া উচিত

$$\frac{118 \cdot 22}{100} \times 500 = 591 \cdot 10 \text{ টাকা}$$

$\therefore$ মহার্ঘ্য ভাতা $(591 \cdot 10 - 500)$ টাকা বা 91·10 টাকা হওয়া উচিত।

উদাহরণ ৫. নিম্নলিখিত ছকে একজন লোকের মাসিক আয় এবং জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা 5 বছরের জন্য দেওয়া আছে ঃ

বছর	1980	1981	1982	1983	1984
আয় (টাকায়)	3600	4200	5000	5500	6000
জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক	100	104	115	160	280

ঐ ব্যক্তির প্রকৃত বেতন নির্ণয় কর। 1980 সালের তুলনায় 1984 সালের টাকার ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ প্রকৃত বেতন = $\dfrac{\text{চলতি কালের বেতন}}{\text{ঐ সময়ের জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক}} \times 100$

প্রকৃত বেতন নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

বছর	আয় (টাকায়)	জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক	প্রকৃত বেতন (টাকায়)
1980	3600	100	3600·00
1981	4200	104	4038·46
1982	5000	115	4347·83
1983	5500	160	3437·50
1984	6000	280	2142·85

টাকার ক্রয় ক্ষমতা = $\dfrac{1}{280} \times 100 = 0 \cdot 357$ অর্থাৎ, 1980 সালে 1 টাকায় যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যেত 1984 সালে তার 35·7% পণ্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং, টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির আয় 1984 সালে বৃদ্ধি পেলেও টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় উহার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

উদাহরণ ৬. নিম্নলিখিত ছক থেকে খাদ্যশ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় কর যখন 1980 সালের সাপেক্ষে 1985 সালের জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা 175 দেওয়া আছে।

শ্রেণী	খাদ্য	বস্ত্র	জ্বালানী	বিবিধ	বাসস্থান
ব্যয়ের শতকরা বৃদ্ধি	65	90	20	70	150
ভার	?	12	18	10	20

সমাধান ঃ মনে কর, খাদ্যশ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব x.

গণনা কার্য ঃ

শ্রেণী	ব্যয়ের % বৃদ্ধি (I')	ভার (W)	$I'W$
খাদ্য	65	x	65x
বস্ত্র	90	12	1080
জ্বালানী	20	18	360
বিবিধ	70	10	700
বাসস্থান	150	20	3000
মোট	—	60+x	5140 + 65x

এখন জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচকের % বৃদ্ধি = $\frac{\sum I'W}{\sum W}$

অর্থাৎ, $75 = \frac{5140 + 65x}{60 + x}$ [যেহেতু জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা = 175]

অর্থাৎ, $x = 64$

সুতরাং, খাদ্যশ্রেণীর আপেক্ষিক গুরুত্ব 64

৮৯.৫ সূচক সংখ্যার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Index Number)

সুতরাং সংখ্যার নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি রয়েছে :

(i) সূচক সংখ্যা সাধারণত নমুনার ওপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয়। বিভিন্ন পণ্য ও তাদের পরিমাণ নমুনা চয়নের ওপর ভিত্তি করে সংগ্রহ করা হয় এবং নমুনা চয়ন যেহেতু পক্ষপাতহীন হয় না, তাই তথ্য ভ্রমযুক্ত হয়। কেবলমাত্র ভ্রম কমানোর চেষ্টা করা হয়।

(ii) যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভ্যাস ও রুচি পরিবর্তন হয়, তাই সব সময় পণ্যের গুণমান পরিবর্তনের ঝুঁকি থাকে। নতুন পণ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পুরাতন পণ্যের বহিষ্কার করা প্রয়োজন হয়। তাই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তুলনামূলক আলোচনা তেমন নির্ভরযোগ্য হয় না।

(iii) একই রাশিতথ্যের উপর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সূচক সংখ্যার মান বিভিন্ন হয়।

(iv) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে ইচ্ছাকৃত পক্ষপাত দেখানো যায়। ভিত্তিকালের লাভকে অস্বাভাবিক বেশি নিয়ে চলতিকালের লাভকে কম দেখানো যায়। আবার ভিত্তিকালের দর অস্বাভাবিক কম নিয়ে চলতি কালের দরকে বেশি দেখানো যায়।

তথ্য সংগ্রহের উৎস সবসময় নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, কারণ সব অনুসন্ধানকারীর গুণমান, সততা ও বুদ্ধিমত্তা কখনই সমান নয়। যদি স্বাভাবিক ভিত্তিকাল পাওয়া না যায়, তাও সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় সীমাবদ্ধতা।

৮৯.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১. ল্যাসপেয়ার্সের দর সূচককে আপেক্ষিক দরের ভারযুক্ত যৌগিক গড় হিসাবে লিখলে ভারগুলি কী হবে?

২. ল্যাসপেয়ার্স, পাশ ও মার্শাল-এজওয়ার্থ-এর সূত্রে কী ভার হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

৩. বাওলের ও ফিশারের সূত্র নির্ণয়ে ল্যাসপেয়ার্স ও পাশের সূচক সংখ্যার কোন্ কোন্ গড় ব্যবহৃত হয়?

৪. কোন সূত্রকে আদর্শ সূচক সংখ্যা বলা হয়?

৫. জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচকের ভার কোন্ পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়?

৬. জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সচকের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১. সূচক সংখ্যা বলতে কী বোঝ?

২. সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা আলোচনা কর।

৩. সূচক সংখ্যা নির্ণয়ে বিভিন্ন সূত্র বর্ণনা কর।

৪. জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যা বলতে কী বোঝ? ইহা কীভাবে নির্ণয় করা হয়? ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫. টাকার ক্রয় ক্ষমতা ও প্রকৃত বেতন নির্ণয়ে জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক সংখ্যার ব্যবহার আলোচনা কর।

৬. নিম্নে প্রদত্ত তথ্য থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে দর সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর।

পণ্য (Commodity	ভিত্তিকালের দর (Base Price)	চলতিকালের দর (Current Price)
A	39	58
B	49	69
C	23	37
D	29	44
E	31	47

৭. নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর।

পণ্য	ভিত্তিকাল		চলতিকাল	
	দর	পরিমাণ	দর	পরিমাণ
চাল	2	8	4	6
ডাল	5	10	6	5
মাছ	4	14	5	10
তেল	2	19	2	13

৮. একটি শিল্পপ্রধান শহরের শ্রমিকদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য দেওয়া আছে।

পণ্য	জীবিকা নির্বাহন ব্যয় সূচক 1990 সালে (1980 = 100)	আনুপাতিক ব্যয় (%)
খাদ্য	225	52
বস্ত্র	175	8
জ্বালানী	155	10
বাসস্থান	250	14
বিবিধ	150	16

1980 সালে মাসিক গড় বেতন ছিল 600 টাকা। ঐ শহরে শ্রমিকদের মাথাপিছু মাসিক গড় বেতন 1990 সালে কত টাকা হলে তাদের জীবনযাত্রার মান 1980 সালের জীবনযাত্রার মানের সমান হবে?

৯. বিভিন্ন বছরের গড় মাসিক বেতন নিম্নরূপ ঃ

বছর ঃ	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
বেতন (টাকায়) ঃ	1000	1040	1150	1160	1160	1180	2000
সূচক ঃ	100	150	200	220	230	250	250

বিভিন্ন বছরে প্রকৃত বেতনগুলি ও 1993 সালে টাকার ক্রয় ক্ষমতা নির্ণয় কর।

৮৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ব্রজেন্দ্র কুমার গুহঠাকুরতা, ভাগবত দাশগুপ্ত ও বাসুদেব অধিকারী (1976) ঃ রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষাৎ, কলিকাতা।

(২) সৌরেন্দ্রনাথ দে (1984) ঃ ব্যবসায় পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

(৩) Goon, A. M. Gupta, M. and Dasgupta, B. (1992) : Fundamentals of Statistics, Vol II, The World Press Private Ltd. Calcutta.

(৪) Maity, J. C. and Chakrabarti, J. (1995) : Elementary Level Business Mathematics & Statistics, Eureka Publishers, Calcutta.

(৫) Das, N. G. (1996) : Statistical Methods, M. Das & Co., Calcutta.

একক ৯০ ❑ কালীন সারি বিশ্লেষণ

গঠন

৮৩.০ উদ্দেশ্য

৮৩.১ প্রস্তাবনা

৮৩.২ কালীন সারি বিশ্লেষণের উপযোগিতা

৮৩.৩ কালীন সারির বিভিন্ন অংশ

৮৩.৪ প্রবণতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ

৮৩.৫ ঋতুজ সূচক নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ

৮৩.৫.১ ঋতুজ ভেদ দূরীকরণ

৮৩.৬ অনুশীলনী

৮৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৯০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করার পর আপনি বুঝতে পারবেন

- কালীন সারির বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলি কী
- কালীন সারি বিশ্লেষণের উপযোগিতা কী
- কালীন সারির বিভিন্ন অংশগুলি কী কী
- প্রবণতা নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি কী
- ঋতুজ সূচক নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি কী কী
- ঋতুজ ভেদ কীভাবে দূর করা যায়

৯০.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান অধ্যায়ে রাশিবিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাশিতথ্যকে কালীন সারি (Time Series) বলা হয়। যে যে সময়ে এই তথ্যগুলি দেওয়া হয়, সাধারণত সেগুলি সম-অন্তরযুক্ত হয়। অর্থাৎ কালীন সারির তথ্য বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক, প্রতি ঘণ্টায় ইত্যাদি হতে পারে। কালীন সারির ক্ষেত্রে যে

দুটি চলকের ব্যবহার একসঙ্গে করা হয়, সবসময় তাদের মধ্যে একটি হল সময় ও অপরটি অন্য যে কোনও চলক। যেমন, তাপমাত্রা, কোনও দ্রব্যের উৎপাদন, চাহিদা, যোগান, বিক্রয়, জনসংখ্যা, মূল্যসূচক, শ্রমিকের বেতন, আয়, ব্যয় ইত্যাদি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন চলক (y) সবসময় সময় (t)-এর অপেক্ষক। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কালীন সারির মধ্যে কেবলমাত্র y-এর প্রকৃতিই বিশ্লেষণ করা হয়। কারণ t-এর পরিবর্তনের ধরন আমাদের জানা থাকে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এটি অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলে। লেখচিত্রে কালীন সারির সময়কে অনুভূমিক অক্ষে নেওয়া হয়। t বিভিন্ন সময়ে বিন্দু হতে পারে। যদি কালীন সারি বিভিন্ন সময় শ্রেণী (time period) হয়, তাহলে t ঐ সময়ে শ্রেণীর মধ্যবিন্দু।

৯০.২ কালীন সারি বিশ্লেষণের উপযোগিতা

অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্যের একটি বড় অংশ কালীন সারির অন্তর্গত। সুতরাং, অর্থনীতির যথাযথ রূপরেখা পেতে হলে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে সফল হতে হলে কালীন সারির বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কালীন সারির অন্তর্গত কোনও চলকের মান সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তন শীলতা নানা কারণে পারস্পরিক সম্পর্কের ফল। কালীন সারির যথাযথ বিশ্লেষণের ফলে এই কারণগুলি আলাদা করা যায় এবং চলকের মান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কারণগুলির প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়। এরকম বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে ব্যবসায়-পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করা সহজ হয়। কালীন সারির বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যের অতীত আচরণ সম্বন্ধে মূল্যায়ন করা যায়। অতীতে কোনও চলকের মানের পরিবর্তন কী পরিমাণে হয়েছিল এবং এই পরিবর্তনে কোন্ কোন্ বিষয় কার্যকরী ছিল কালীন সারির বিশ্লেষণ থেকে তা বোঝা যায়। অতীতের ওপর নির্ভর করে চলকের ভবিষ্যৎ মানের প্রবণতা বা পরিমাণ বোঝা যায়। কোনও ব্যবসায়ীকে কোনও একটি সামগ্রীর উৎপাদন এমনভাবে করতে হবে যাতে এর পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম না হয় এবং অবিক্রীত সামগ্রী বেশি পরিমাণে না থাকে। সুতরাং, তার ব্যবসারসাফল্য অনেকাংশে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। যদি পরিসংখ্যান পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগে কালীন সারির যথাযথ বিশ্লেষণ করা যায়, তবে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ প্রবণতা সম্পর্কে যথোপযুক্ত অনুমান করা যায়। এবং তার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করা যায়। অনেক সময় দুই বা ততোধিক কালীন সারির মধ্যে তুলনা করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

৯০.৩ কালীন সারির বিভিন্ন অংশ ঃ

যে কোনও কালীন সারির ক্ষেত্রে চারটি অংশ (Component) দেখা যায়। এগুলি হল দীর্ঘকালীন প্রবণতা [Secular Trend (T)], ঋতুজ ভেদ [Seasonal Variation (S)], চক্রীল ভেদ [Cyclical Variation (C)], এবং অনিয়মিত ভেদ [Irregular Variation (I)], কালীন সারির চলকের মানকে এই চারটি অংশের মোট যোগফল বা গুণফল হিসাবে ধরা হয়।

যৌগিক কাঠামো (Additive Model)-এ কালীন সারির ক্ষেত্রে,

$$Y_t = T_t + S_t + C_t + I_t$$

এবং গুণসূচক কাঠামো (Multiplicative Model)-এ কালীন সারির ক্ষেত্রে,

$$Y_t = T_t \times S_t \times C_t \times I_t$$

সাধারণত গুণসূচক কাঠামোই কালীন সারিতে বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ হিসাবে দেখা যায় যে, S, C, I প্রভৃতি অংশগুলি T-এর অনুপাতে মোটামুটি স্থির থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অংশ যখন অন্যদের অনুপাতে প্রকাশ করা হয়, তখন এগুলির অর্থ আরও বেশি পরিষ্কার হয়। সমস্ত কালীন সারিতেই এই চারটি অংশ সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে না। কোনও একটি বা একাধিক অংশ অন্যগুলির থেকে বেশি প্রকট হতে পারে। বিভিন্ন কারণে কালীন সারির অংশগুলির পৃথকীকরণের প্রয়োজন হয়। কোনও দোকানের মালিক তার বিক্রয়ের ঋতুজ ভেদ জানতে ইচ্ছুক হতে পারেন। চক্রীল ভেদের পরিমাণ আগে জানা থাকলে, ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক গতি সম্পর্কে পূর্বাভাষ দেওয়া বা সেই বিষয়ে কোনও নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অনেক সময় অনিয়মিত ভেদের জন্য অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর সময় দ্রব্যমূল্যের সূচক অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ক) প্রবণতা ঃ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সাধারণত দীর্ঘকালীন প্রবণতাই কালীন সারির সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ অংশ। যদি কোনও কালীন সারি দীর্ঘদিন ধরে বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, যে, চলকের মানগুলির মরিমাণ হয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে নয়তো হ্রাস পাচ্ছে বা স্থির আছে। এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকেই প্রবণতা বলা যায় ও এটি পরিমাপযোগ্য। যদি আমরা প্রবণতা নির্ণয় করতে পারি, তবে কালীন সারির প্রতি সময়ের মান থেকে অনুমিত প্রবণতার মান বাদ দিয়ে অন্যান্য অংশের জন্য যে বিভিন্নতা আছে তা নির্ণয় করতে পারি। প্রবণতার প্রকৃতি ঋজুরৈখিক (Linear) কিংবা বক্ররৈখিক (Curvilinear) হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ সামগ্রীর দরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়।

(খ) ঋতুজ ভেদ ঃ কোনও কালীন সারির চলকের পর্যায়ক্রমিক স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ঋতুজ ভেদের প্রভাবে হয়। ঋতুজ ভেদের পর্যায়কাল কখনো একবছরের বেশি হয় না। চলকের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যকে ঋতুজ ভেদ বলে। সাধারণ মাসিক বা ত্রৈমাসিক ঋতুজ ভেদ নিয়ে আমরা বেশি আগ্রহী হলেও সাপ্তাহিক, এমনকি দৈনিক ঋতুজ ভেদও দেখা যায়। মানুষের রুচি, অভ্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার প্রভাবের জন্যই কালীন সারিতে ঋতুজ পরিবর্তন হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন পূর্বাভাষ

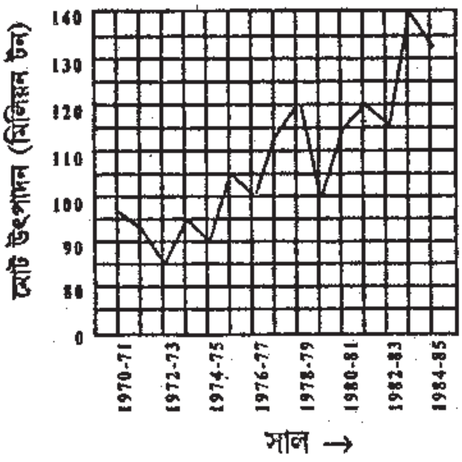

1970-71 সাল থেকে 1984-85 সাল পর্যন্ত ভারতে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন

পাওয়ার জন্য ঋতুজ সূচক (Seasonal Index) বিশেষ সাহায্যকারী। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক বিক্রেতাদের যদি পূজার সময় পোশাক বিক্রীর ঋতুজ সূচক জানা থাকে, তবে তাদের পক্ষে ঐ সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য আগে থেকে প্রয়োজনীয় মজুত করে রাখতে সুবিধা হয়। অনুরূপ, গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখা ও ঠাণ্ডা পানীয়ের চাহিদা মেটানো যায়।

(গ) চক্রীল ভেদ ঃ কালীন সারিতে ঋতুজ ভেদের মতই আরও একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এটিকে বলা হয় চক্রীল ভেদ (Cyclical Variation)। তবে এই ভেদটি দীর্ঘকালীন এবং প্রতিটি চক্রের দৈর্ঘ্য এক বছরের বেশি হয়। তবে, ঋতুজ ভেদের মতো এর পরিবর্তনের পর্যায়কাল (period) ও ভেদত্ব (amplitude) ততখানি নিয়মিত নয়। আয়, উৎপাদন, বেতন, বিনিয়োগ, সূচক দর, নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবয়সায়িক চক্রের (business cycle) প্রভাবে দীর্ঘকালীন ওঠানামা দেখা যায়। এক-একটি ওঠা ও নামা নিয়ে একটি চক্র বা পর্যায়কাল সম্পূর্ণ হয়। চক্রীল ভেদ নিয়ে সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক চক্রের পর্যায়কালের ধাপগুলি অর্থাৎ উন্নতি (Prosperity), পশ্চাদ্‌গতি (Decline), মন্দা (Depressions) এবং পুনরোন্নয়ন (Recovery) বিভিন্ন ভেদে প্রতিফলিত হয়। দুটি ব্যবসায়িক চক্রের পর্যায়কাল পরস্পর সমান নাও হতে পারে। এই কারণে চক্রীলভেদ নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি বেশ কষ্টকর।

যে কোনও ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে জানার জন্য চক্রীল ভেদের ধারণা খুব উপযোগী। কারণ, ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে জানা সম্ভব হলে প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকল্পনা নির্ধারণ করে ব্যবসায়ে সুস্থিরতা আনা যায়।

(ঘ) অনিয়মিত ভেদ ঃ বহুবিধ কারণে কালীন সারিতে ভেদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী, বন্যা, ধর্মঘট, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বা সামাজিক পরব বা উৎসব ইত্যাদি কারণে কালীন সারিতে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এরকম ঘটনার কোনও পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয় বলে কালীন সারিতে এই অংশটি সম্পূর্ণ অনিয়মিতভাবে বিদ্যমান থাকে। সাধারণভাবে কালীন সারির যে পরিবর্তন প্রবণতা, ঋতুজ ভেদ অথবা চক্রীল ভেদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই অনিয়মিত ভেদ (Irregular Variation)।

৯০.৪ প্রবণতা নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ ঃ

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় ঃ

(ক) মুক্ত-হস্ত পদ্ধতি (Free hand method)

(খ) অর্ধ-গড় পদ্ধতি (Semi-average method)

(গ) চলমান গড় পদ্ধতি (Moving average method)

(ঘ) লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি (Least square method)

(ক) মুক্ত-হস্ত পদ্ধতি ঃ

যদি কালীন সারির তথ্যগুলি লেখচিত্রের দ্বারা পরিবেশন করা হয়, তবে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে লেখচিত্রে অঙ্কিত বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে এমনভাবে একটি মসৃণ রেখা টানা যেতে পারে যাতে প্রকৃত বিন্দুগুলি এই প্রবণতা রেখার যতটা সম্ভব নিকটে থাকে। এই মসৃণ রেখা টানার পদ্ধতিকে মুক্ত-হস্ত পদ্ধতি বলে। কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতিটি ব্যক্তি-সাপেক্ষ (Subjective), তাই এখানে প্রবণতা রেখা পর্যবেক্ষণকারীর ঝোঁকের বা পক্ষপাতের (bias) ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সেজন্য যেখানে নির্ভুলভাবে প্রবণতা রেখা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে না। তবে এই পদ্ধতিতে প্রবণতা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়।

উদাহরণ ১. লেখচিত্রের সাহায্যে প্রবণতার মানগুলি নির্ণয় কর ঃ

বছর ঃ	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'69	'70	'71	'72	'73	'74
মান ঃ	64	82	97	71	78	112	115	132	80	100	146	150	120

সমাধান ঃ

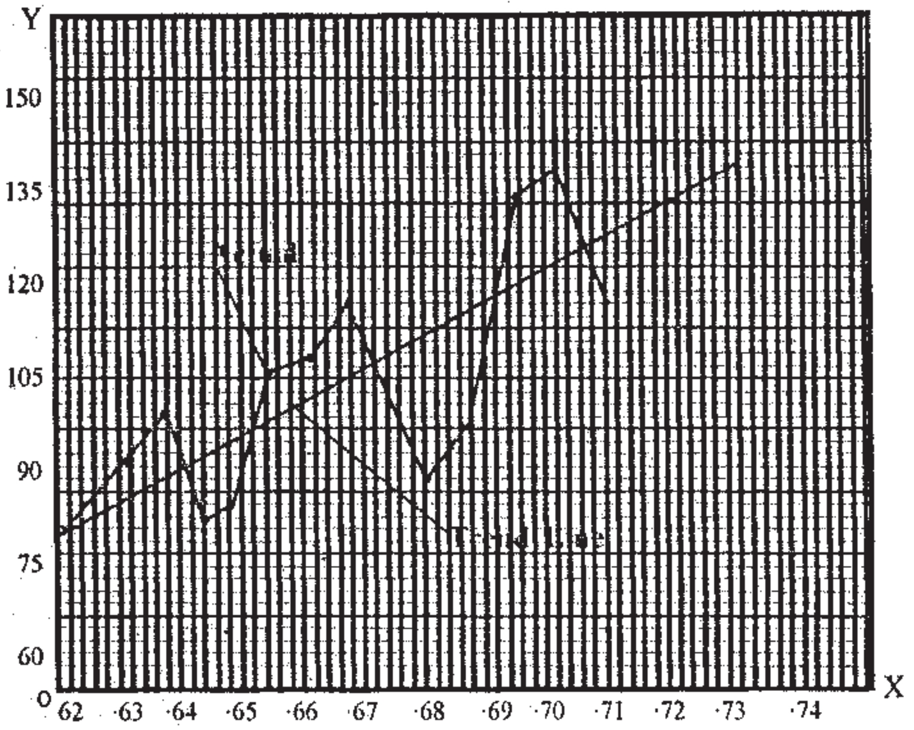

মুক্ত-হস্ত পদ্ধতিতে প্রবণতা

লেখচিত্র বা মুক্তহস্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত কালীন সারির প্রবণতা রেখা চিত্রে দেখানো হয়েছে। x-অক্ষরেখা থেকে প্রবণতা রেখার দুরত্ব y-অক্ষরেখার সমান্তরাল দিক বরাবর মেপে বিভিন্ন বছরের প্রবণতা মানগুলি দেওয়া হল। প্রদত্ত কালীন সারিতে স্বল্পমেয়াদী সময়ের ওঠানামা থাকলেও দীর্ঘমেয়াদী সময়ের তথ্যের বৃদ্ধির প্রবণতা আছে।

বছর ঃ	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'69	'70	'71	'72	'73	'74
প্রবণতার মান ঃ	66	72	78	84	90	96	102	105	114	120	126	132	138

(খ) অর্ধ-গড় পদ্ধতি ঃ

এই পদ্ধতিতে কালীন সারির রাশিতথ্য প্রথম অর্ধ ও দ্বিতীয় অর্ধ এই হিসাবে দুটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। জোড় সংখ্যক তথ্যের কালীন সারির ক্ষেত্রে দুটি সমান ভাগে ভাগ করতে অসুবিধা হয় না। বিজোড় সংখ্যক তথ্যের ক্ষেত্রে মধ্যম তথ্যটিকে বাদ দিয়ে দুটি সমান ভাগে ভাগ করতে হয়, অথবা মধ্যম তথ্যকে দুটি ভাগের মধ্যে অন্তর্গত করেও সমান ভাগে ভাগ করা যায়।

এরপর প্রত্যেক অর্ধের অন্তর্গত তথ্যসমূহের মানের যৌগিক গড় নির্ণয় করতে হয়। এইভাবে প্রাপ্ত গড় দুটির প্রথমটি প্রথম অর্ধের সময়সীমার মধ্যবিন্দুতে এবং দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় অর্ধের সময়সীমার মধ্যবিন্দুতে লেখচিত্রে স্থাপন করতে হয়। এই দুটি বিন্দুর সংযোগ সরলরেখাই প্রদত্ত তথ্যের অর্ধ-গড় পদ্ধতিতে প্রবণতা রেখাকে নির্দেশ করে। x-অক্ষরেখা (ভুজ) থেকে প্রবণতা রেখার দূরত্ব দ্বারা বিভিন্ন সময়ে প্রবণতার পরিমাপ করা যায়। এই পদ্ধতির ত্রুটি এই যে, যদি কালীন সারির তথ্য সরলরৈখিক না হয় তবে এই পদ্ধতির দ্বারা প্রবণতা সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়।

উদাহরণ ২. নিম্নে প্রদত্ত রাশিতথ্যের অর্ধ-গড় পদ্ধতিতে প্রবণতা সরলরেখা নির্ণয় কর ঃ

বছর ঃ	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98
রপ্তানি ঃ	20·5	21·8	20·7	23·0	24·0	22·8	25·0	24·5	26·0	24·0	25·0

(কোটি টাকায়)

সমাধান ঃ প্রদত্ত তথ্যে 11 বছরের রপ্তানি দেওয়া আছে। সুতরাং, অর্ধ-গড় পদ্ধতিতে প্রবণতার পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য মধ্যম তথ্য অর্থাৎ 1993 সালকে বাদ দিয়ে 1988 থেকে 1992 সাল পর্যন্ত এই 5 বছরকে প্রথম অর্ধ এবং 1994 থেকে 1998 সাল পর্যন্ত এই 5 বছরকে দ্বিতীয় অর্ধে ভাগ করা হলে,

$$\bar{y}_1 = \frac{20\cdot5+21\cdot8+20\cdot7+23\cdot0+24\cdot0}{5}$$

$= 22$ কোটি টাকা

এবং $\bar{y}_2 = \frac{25\cdot0+24\cdot5+26\cdot0+24\cdot0+25\cdot0}{5}$

$= 24\cdot9$ কোটি টাকা

এখন লেখচিত্রে প্রথম অর্ধের সময়সীমার মধ্যবিন্দুতে অর্থাৎ 1990 সালে রপ্তানি মান 22 কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় অর্ধের সময়সীমার মধ্য বিন্দুতে অর্থাৎ 1996 সালে রপ্তানির মান 24·9 কোটি টাকা চিহ্নিত করে দুটি বিন্দুর সংযোগকারী সরলরেখা দ্বারা প্রবণতার মান নির্ণয় করা যাবে।

(গ) চলমান গড় পদ্ধতি

কালীন সারির লৈখিক রূপায়ণের পর বিন্দুগুলি যদি পর্যায়ক্রমে সরলরেখা দিয়ে যোগ করা যায় তবে সাধারণত একটি আঁকাবাঁকা সরলরেখা গোষ্ঠী পাওয়া যায়। এই আঁকাবাঁকা রেখা গোষ্ঠীর ওঠানামা দূর করে প্রবণতা অংশটিকে আলাদা করার পদ্ধতিকে চলমান গড় পদ্ধতি বলে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে সাধারণত যে প্রবণতা পাওয়া যায়, তার লৈখিক আকৃতিও একই প্রকার। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রথম কয়েকটি মানের গড় নির্ণয় করা হয় ও সেই গড়কে ঐ মানগুলির ঠিক মধ্যস্থানে রাখা হয়। যদি প্রথমে নির্দিষ্ট মানগুলির সংখ্যা বিজোড় হয়, তবে ঐ গড়কে সহজেই মধ্যমানটির সম্পর্কিত স্থানে বসানো চলে। এর পর কালীন সারির প্রথম মানটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় থেকে পরবর্তী ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যক মানের গড় নির্ণয় করা হয় ও আগের মতই ঐ মানগুলির মধ্যস্থানে বসানো হয়। এইভাবে এই

পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাতটি মানের একসঙ্গে জলমান গড় নির্ণয় করা হয়। চলমান গড়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক মানের সংখ্যা যদি জোড় হয়, তবে পরপর গড়গুলি মধ্যবর্তী দুটি পদের মাঝখানে বসানো হয়। কিন্তু কালীন সারির কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ের (t) পরিপ্রেক্ষিতে গড়কে বসানোর প্রয়োজন থাকায় সাধরণত আবার দুটি মানের চলমান গড় হিসাব করা হয়। অবশ্য চলমান গড়ের ক্ষেত্রে প্রথমে নির্দিষ্ট মানের সংখ্যা কত হবে তা তথ্যের প্রকৃতি ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যদি ঐ পদের সংখ্যা তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনও চক্রীল ভেদের চক্র-দৈর্ঘ্যের সমান কিংবা তার গুণিতক হয়, তবে চলমান গড়ের দ্বারা কালীন সারির তথ্যের ওঠানামা সবচেয়ে ভালোভাবে দূর করা যায়। এই পদ্ধতিটি কেবল প্রবণতার পরিমাপই নয়, কালীন সারির অন্যান্য অংশগুলি যথা, ঋতুজ ভেদ, চক্রীল এভেদ ও অনিয়মিত ভেদের বিশ্লেষণেও প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, প্রদত্ত কালীন সারির প্রত্যেক সময়ের জন্য প্রবণতা মান নির্ণয় করা যায় না। প্রথম ও শেষ দিকের প্রবণতার কয়েকটি মান অনির্ণীত থাকে। চলমান গড়গুলি পরিবর্তনশীলতার কোনও সূত্র মেনে চলে না, সেজন্য পদ্ধতিটির প্রয়োগে ভবিষ্যতবাণী করা যায় না।

উদাহরণ ৩. নিম্নে প্রদত্ত উৎপাদনের রাশিতথ্য থেকে পাঁচটি পদের চলমান গড় নির্ণয় করে প্রবণতার মান প্রদর্শন কর।

বছর ঃ	1988	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99
উৎপাদন ঃ (হাজার)	42	44	57	45	49	53	65	55	47	51	62	50

সমাধান ঃ নিম্নলিখিত সারণিতে চলমান গড়ের মান দেওয়া হল ঃ

বছর	উৎপাদন (হাজার)	পাঁচটি মানের চলমান যোগফল (S)	প্রবণতার মান = চলমান গড় = S/5
1988	42	—	—
89	42	—	—
90	57	237	47·4
91	45	248	49·6
92	49	269	53·8
93	53	267	53·4
94	65	269	53·8
95	55	271	54·2
96	47	280	56·0
97	51	265	53·0
98	62	—	—
99	50	—	—

উদাহরণ ৪. প্রদত্ত রাশিমালার ক্ষেত্রে একটি 4 বছরের আবর্তকালযুক্ত বাণিজ্য চক্রের অস্তিত্ব জানা আছে এখানে উপযুক্ত পদবিশিষ্ট চলমান গড় পদ্ধতিতে প্রবণতা মান নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1988	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98
বিক্রয় ঃ (হাজার)	54·0	40·5	47·0	48·5	42·9	42·1	36·6	42·7	45·7	45·1	37·8

সমাধান ঃ প্রশ্নানুসারে চলমান গড় পদ্ধতিতে প্রবণতা মান নির্ণয় করতে হলে আমাদের অবশ্যই চারটি পদ-বিশিষ্ট চলমান গড় নিতে হবে, কারণ সমদৈর্ঘ্যের চক্রীল ভেদ রাশিমালায় বর্তমান।

বছর	বিক্রয়		চারটি পদের চলমান যোগফল		পুনরায় দুটি পদের চলমান যোগফল (S)	প্রবণতার মান = চলমান গড় = S/(2×4)
1988	54·0		—		—	—
89	40·5		—		—	—
		→	190·0			
90	47·0			→	368·9	46·11
		→	178·9			
91	48·5			→	359·4	44·92
		→	180·5			
92	42.9			→	350.6	43.82
		→	170·1			
93	42·1			→	334·4	41·80
		→	164·3			
94	36·6			→	331·4	41·42
		→	167·1			
95	42·7			→	337·2	42·15
		→	170·1			
96	45·7			→	341·4	42·68
		→	171·3			
97	45·1		—		—	—
98	37·8		—		—	—

(ঘ) লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে কালীন সারির চলকের প্রবণতার মানগুলি নির্ণয়ে চলকের মানের পরিবর্তনশীলতার সাথে সময়ের গাণিতিক সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়। গাণিতিক সম্পর্কের আকার

সাধারণত প্রদত্ত কালীন সারির তথ্যের উপযোগী করে স্থির করতে হয়। তবে প্রবণতা রেখা নির্ধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি। সময়ের সাথে প্রবণতার বহুরকমের গাণিতিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তবে এখানে সাধারণ তিনটি গাণিতিক সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হবে।

(i) যদি সময়ের সাথে কালীন সারিরপ্রবণতার সরলরৈখিক (linear) সম্পর্ক হয় অর্থাৎ $T_t = a + bt$ সম্পর্ক থাকে, তবে লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত a ও b -এর মান নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণ দুটি হল ঃ

$$\sum y_t = na + b\sum t$$

এবং

$$\sum ty_t = a\sum t + b\sum t^2$$

যেখানে y_t, $t = 1, 2, \ldots\ldots\ldots\ldots n$ হল n সংখ্যক বিভিন্ন সময়ে কালীন সারির তথ্য।

(ii) যদি সময়ের সাথে প্রবণতার অধিবৃত্তাকার (Parabolic) বা দ্বিঘাত (Quadratic) সম্পর্ক হয় অর্থাৎ,

$$T_t = a + bt + ct^2$$

তবে লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত a, b ও c-এর মান নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণ তিনটি হল ঃ

$$\sum y_t = na + b\sum t + c\sum t^2$$

$$\sum ty_t = a\sum t + b\sum t^2 + c\sum t^3$$

$$\sum t^2y_t = a\sum t^2 + b\sum t^3 + c\sum t^4$$

(iii) যদি সময়ের সাথে প্রবণতার সূচকাকৃতি (Exponential) সম্পর্ক হয় অর্থাৎ,

$T_t = ab^t$ হয়, সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের লগারিদ্‌ম্‌ নিয়ে পাই,

$$\log T_t = \log a + t \log b$$

$= A + Bt$, যেখানে $A = \log a$ ও $B \log b$

সুতরাং, A ও B -এর মান নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণ দুটি হল ঃ

$$\sum \log y_t = nA + B\sum t$$

এবং $\sum t \log y_t = A\sum t + B\sum t^2$

এই সমীকরণ দুটি সমাধান করে A ও B -এর মান পাওয়া যাবে এবং তা থেকে a = Antilog (A) এবং b = Antilog (B) পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ৫. একটি কারখানায় 1990 সাল থেকে 1996 সাল পর্যন্ত চিনির উৎপাদন দেওয়া আছে। তথ্যের উপযুক্ত সরলরৈখিক প্রবণতা নির্ণয় কর এবং 1997 সালের প্রত্যাশিত উৎপাদন নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
উৎপাদন ঃ (হাজার টন)	76	87	95	81	91	96	90

সমাধান ঃ মনে কর, প্রদত্ত তথ্যের উপযুক্ত সরলরৈখিক প্রবণতার সমীকরণ হল

$T_t = a + bt,$

সুতরাং, লঘিষ্ঠ বর্গনীতিতে a ও b নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণ দুটি হল ঃ

$\sum y_t = na + b\sum t$.......(1)

$\sum ty_t = a\sum t + b\sum t^2$.......(2)

বছর (x)	t = x – 1993	উৎপাদন (y_t)	t^2	ty_t
1990	–3	76	9	–228
1991	–2	87	4	–174
1992	–1	95	1	–95
1993	0	81	0	0
1994	1	91	1	91
1995	2	96	4	192
1996	3	90	9	270
মোট	0	616	28	56

রাশিতথ্যের সংখ্যা (n) = 7

সুতরাং, (1) ও (2) থেকে পাই,

$616 = 7a + 0.b$ বা, $a = \frac{616}{7} = 88$

এবং, $56 = 0.a + 28b$ বা, $b = \frac{56}{28} = 2$

সুতরাং, প্রবণতা সরলরেখাটির সমীকরণ হল ঃ

$T_t = 88 + 2t$

(যেখানে মূলবিন্দু 1993 সালে এবং t-এর এক একক = 1 বছর)

এখন 1997 সালের (অর্থাৎ t = 1997 – 1993=4) প্রত্যাশিত উৎপাদন হবে,

$T_4 = 88 + 2 \times 4 = 96$ হাজার টন।

উদাহরণ ৬. নিম্নলিখিত চাহিদার তথ্য থেকে উপযুক্ত দ্বিঘাত প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
চাহিদা ঃ (হাজারে)	84	82	76	72	69	68	70	72	73

সমাধান ঃ প্রদত্ত তথ্যের উপযোগী দ্বিঘাত প্রবণতার সমীকরণ হল

$T_t = a + bt + ct^2$

এখন a, b এবং c-এর মান নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণ তিনটি হল

$\sum y_t = na + b\sum t + c\sum t^2$............(1)

$\sum ty_t = a\sum t + b\sum t^2 + c\sum t^3$.........(2)

$\sum t^2y_t = a\sum t^2 + b\sum t^3 + c\sum t^4$.........(3)

দ্বিঘাত প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

বছর (x)	t = x – 1994	চাহিদা (y_t) (হাজারে)	t^2	t^3	t^4	ty_t	t^2y_t
1990	–4	84	16	–64	256	–336	1344
1991	–3	82	9	–27	81	–246	748
1992	–2	76	4	–8	16	–152	304
1993	–1	72	1	–1	1	–72	72
1994	0	69	0	0	0	0	0
1995	1	68	1	1	1	68	68
1996	2	70	4	8	16	140	280
1997	3	72	9	27	81	216	648
1998	4	73	16	64	256	292	1168
মোট	0	666	60	0	708	–90	4622

(1), (2) ও (3) নং থেকে পাই,

$666 = 9a + 0.b + 60c$

$-90 = 0.a + 60b + 0.c$

$4622 = 60a + 0.b + 708.c$

উপরের সমীকরণগুলি সমাধান করে পাই,

$a = 70.06$, $b = -1.50$ এবং $c = 0.59$

সুতরাং, দ্বিঘাত প্রবণতা সমীকরণটি হল,

$T_t = 70.06 - 1.50\,t + 0.59t^2$

(যেখানে মূলবিন্দু 1994 সাল এবং t-এর এক একক = 1 বছর)

উদাহরণ ৭. প্রদত্ত তথ্য থেকে $t_t = ab^t$ ধরনের একটি প্রবণতা সমীকরণ নির্ণয় কর ঃ

বছর (x) ঃ	1994	1995	1996	1997	1998
চাহিদা (y) ঃ	16	.45	13.8	40.2	135.0

(হাজার টাকায়)

সমাধান ঃ এখন a ও b নির্ণয়কারী সমীকরণ দুটি হল,

$$\sum \log y_t = nA + B\sum t ....(1)$$

$$\sum t \log y_t = A\sum t + B\sum t^2 ....(2)$$

যেখানে $A = \log a$ এবং $B = \log b$

গণনা কার্য ঃ

বছর (x)	$t = x - 1993$	বিক্রয় (y_t)	$\log_{10} y_t$	t^2	$t \log_{10} y_t$
1994	1	16	0·2041	1	0·2041
1995	2	4·5	0·6532	4	1·3064
1996	3	13·8	1·1399	9	3·41197
1997	4	40·2	1·6042	16	6·4168
1998	5	125·0	2·0969	25	10·4845
মোট	15	—	5·69834	55	21·8315

এখন (1) ও (2) থেকে পাই,

$$5{\cdot}6983 = 5A + 15B$$

$$21{\cdot}8315 = 15A + 55B$$

সমীকরণ দুটি সমাধান করে পাই,

$$A = -0{\cdot}2814$$

এবং $B = 0{\cdot}4737$

সুতরাং, $a = \text{antilog } A = \text{antilog } (-0{\cdot}2814)$

$$= 0{\cdot}5231$$

এবং $b = \text{antilog } B = \text{antilog } (0{\cdot}4737)$

$$= 2{\cdot}977$$

নির্ণেয় সূচক প্রবণতার সমীকরণটি হল,

$T_t = (0{\cdot}5231)\ (2{\cdot}977)^t$

(যেখানে মূলবিন্দু 1993 সাল এবং t-এর একক = 1 বছর)।

৯০.৫ ঋতুজ সূচক নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ ঃ

প্রধানত ঋতুজ সূচক নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ঃ

(ক) সাধারণ গড় পদ্ধতি (Method of Simple Average)

(খ) চলমান গড়-অনুপাত পদ্ধতি (Ratio to moving Averages Method)

(গ) প্রবণতা অনুপাত পদ্ধতি (Ratio to Trend Method)

(ঘ) পরস্পরীণ আপেক্ষিক পদ্ধতি (Link Relative Method)

(ক) সাধারণ গড় পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি কালীন সারিতে কোনও প্রবণতা বা চক্রীল ভেদ বিদ্যমান না থাকলে তবে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন বছরের তথ্য থেকে প্রতিমাসের বা প্রতি ত্রৈমাসিকের গড় নির্ণয় করা হয় ও এই গড়গুলি থেকে একটি সাধারণ গড় হিসাব করা হয়। প্রতিটি প্রাথমিক গড় সাধারণ গড়ের কত শতাংশ (গুণসূচক কাঠামোর কালীন সারির ক্ষেত্রে) বা সাধারণ গড় থেকে কতখানি বিচ্যুত (যৌগিক কাঠামোর কালীন সারির ক্ষেত্রে) তার পরিমাপ করলে ঋতুজ সূচক সংখ্যা বা Seasonal Index (গুণসূচক কাঠামোতে) এবং ঋতুজ প্রভেদসূচক মান বা Seasonal Value (যৌগিক কাঠামোতে) পাওয়া যাবে। A_i যদি কোন মাসের গড় হয় ও G সাধারণ গড় হয় $\frac{A_i}{G} \times 100$ ঐ মাসের ঋতুজ সূচক সংখ্যা এবং $A_t - G$ ঐ মাসের ঋতুজ প্রভেদসূচক মান।

উদারণ ৮. নিম্নলিখিত কালীন সারি তথ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ধারণ কর ঃ

বছর	ত্রৈমাসিক উৎপাদন			
	I	II	III	IV
1995	39	21	52	81
1996	45	23	63	76
1997	44	26	69	75
1998	53	23	64	84

সমাধান ঃ প্রদত্ত কালীন সারির তথ্য স্বল্পমেয়াদী এবং বিভিন্ন চতুর্থাংশের অন্তর্গত মানগুলির মধ্যে প্রবণতা অতিমাত্রায় অনুপস্থিত। সুতরাং, সূচক নির্ণয়ে সাধারণ গড় পদ্ধতিই উপযুক্ত। গুণিতক কাঠামো প্রয়োগ করে পাই,

বছর	ত্রৈমাসিক উৎপাদন				সমষ্টি
	প্রথম চতুর্থাংশ	দ্বিতীয় চতুর্থাংশ	তৃতীয় চতুর্থাংশ	চতুর্থ চতুর্থাংশ	
1995	39	21	52	81	—
1996	45	23	63	76	—
1997	44	26	69	75	—
1998	53	23	64	84	—
মোট	181	93	248	316	—
গড় সমূহ	45·25	23·25	62·00	79·00	209·50
ঋতুজ সূচক	86·4	44·4	118·4	150·8	400·00

এখানে সাধারণ গড় $G = 209.5/4$ সুতরাং,

প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক $= \dfrac{45 \cdot 25}{209 \cdot 50} \times 400 = 86 \cdot 4$। একইভাবে অন্যান্য চতুর্থাংশগুলির ঋতুজ সূচক গণনা করা হয়েছে।

(খ) চলমান গড়-অনুপাত পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি দ্বারা ঋতুজ সূচকের সবচেয়ে নির্ভরশীল পরিমাপ করা যায়। প্রথমত চলমান গড় পদ্ধতির সাহায্যে কালীন সারির মূল তথ্যের প্রবণতা নির্ণয় করা হয়। গুণিতক কাঠামোর কালীন সারির ক্ষেত্রে প্রবণতা মানের শতকরায় প্রকাশ করে তথ্যসমূহকে প্রবণতা মুক্ত করা হয়। তারপর চলমান গড়সমূহের অনুপাতসমূহকে সাধারণ গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যৌগিক কাঠামোর কালীন সারির ক্ষেত্রে নির্ণীত প্রবণতামানগুলি মূলতথ্য থেকে বিয়োগ করে তথ্যকে প্রবণতামুক্ত করা হয়। পরে সাধারণ গড় পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ধারণ করা হয়।

উদাহরণ ৯. নিম্নলিখিত কালীন সারি তথ্য থেকে চলমান গড় অনুপাত পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর ঃ

ত্রৈমাসিক ঠাণ্ডা পানীয়ের (y) ব্যবহার (100 বোতলে)

বছর	I	II	III	IV
1994	68	61	61	63
1995	65	58	66	61
1996	68	63	63	67

সমাধান ঃ প্রদত্ত কালীন সারিকে গুণিতক কাঠামোর আকারে প্রকাশ করে প্রথমত চলমান গড়-অনুপাত নির্ণয় করা হয়েছে।

চলমান গড়-অনুপাত নির্ণয় কার্য ঃ

বছর	চতুর্থাংশ	পানীয়ের ব্যবহার (y)	চারটি মানের চলমান গড় (T)	চলমান গড় অনুপাত $\left(\frac{V}{T} \times 100\%\right)$
1994	প্রথম	68	—	—
	দ্বিতীয়	61	—	—
	তৃতীয়	61	62.875	97.02
	চতুর্থ	63	62.125	101.41
1995	প্রথম	65	62.375	104.21
	দ্বিতীয়	58	62.750	92.43
	তৃতীয়	66	62.875	104.97
	চতুর্থ	61	63.875	95.50
1996	প্রথম	68	64.125	106.04
	দ্বিতীয়	63	64.509	97.67
	তৃতীয়	63	—	—
	চতুর্থ	67	—	

ঋতুজ সূচকের গণনাকার্য ঃ

বছর	ত্রৈমাসিক চলমান গড়-অনুপাত (শতকরায়)				সমষ্টি
	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	
1994	—	—	97.02	101.41	
1995	104.21	92.43	104.97	95.50	
1996	106.04	97.67	—	—	
সমষ্টি	210.25	190.10	201.99	196.91	—
গড়	105.125	95.05	100.995	98.455	399.625
ঋতুজ সূচক	105.22	95.14	101.09	98.55	400

প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক $= \frac{105 \cdot 125}{399 \cdot 625} \times 400 = 105 \cdot 22$

অনুরূপভাবে, অন্যগুলি নির্ণয় করা হয়েছে।

(গ) **প্রবণতা-অনুপাত পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে কালীন সারির তথ্যের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক আছে এই অনুমান করে লঘিষ্ঠ বর্গ নীতিতে প্রবণতার মান নির্ণয় করা হয়। অতঃপর চলমান গড় অনুপাত পদ্ধতির মতো

কালীন সারির তথ্যসমূহ অনুরূপ প্রবণতা মানের শতকরায় প্রকাশ করা হয়। এই শতকরা মানগুলির উপর সাধারণ গড় পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঋতুজ সূচকগুলি পাওয়া যায়।

উদাহরণ ১০. 1996 সাল থেকে 1998 সাল পর্যন্ত কলকাতায় যানবাহনের ত্রৈমাসিক দুর্ঘটনাসমূহ দেওয়া আছে। সরলরৈখিক প্রবণতা ধরে প্রবণতা-অনুপাত পদ্ধতি প্রয়োগে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর।

	ত্রৈমাসিক দুর্ঘটনা			
বছর	I	II	III	IV
1996	165	135	140	180
1997	152	121	127	163
1998	140	100	105	158

সমাধান ঃ প্রথমত উপরোক্ত তথ্যের উপযোগী সরলরৈখিক প্রবণতার সমীকরণ

$$T_t = a + bt$$

সুতরাং, লঘিষ্ঠ বর্গ নীতির a ও b নির্ণয়কারী মৌল সমীকরণদ্বয়

$$\sum y_t = na + b\sum t$$

এবং $\sum ty_t = a\sum t + b\sum t^2$

সমাধান করে T_t পাওয়া যায়।

প্রবণতা-অনুপাত নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

বছর	চতুর্থাংশ	কালীনসারি (y_t)	t	t^2	ty_t	$T_t = 104.5 - 1.38t$	$\frac{y_t}{T_t} \times 100$
1996	প্রথম	165	–11	121	–1815	1557	106
	দ্বিতীয়	135	–9	81	–1215	1529	88
	তৃতীয়	140	–7	49	–980	150.2	93
	চতুর্থ	180	–5	25	–900	147.4	122
1997	প্রথম	152	–3	9	–456	144.6	105
	দ্বিতীয়	121	–1	1	–121	141.9	85
	তৃতীয়	127	1	1	127	139.1	91
	চতুর্থ	163	3	9	489	136.4	120
1998	প্রথম	140	5	25	700	133.6	105
	দ্বিতীয়	100	7	49	700	130.8	76
	তৃতীয়	105	9	81	945	128.1	82
	চতুর্থ	158	11	121	1738	125.3	126
মোট	—	1686	0	572	–788	—	—

নৌল সমীকরণ দুটি সমাধান করে পাই,

$$a = \frac{1686}{12} = 140 \cdot 5, \;\; b = \frac{788}{572} = -1 \cdot 38$$

সুতরাং, প্রবণতা সমীকরণ হল $T_t = 140{\cdot}5 - 1{\cdot}38t$

(যেখানে 1997 সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থাংশের মধ্যবিন্দু হল মূলবিন্দু এবং এক একক = অর্ধ চতুর্থাংশ)।

ঋতুজ সূচকের গণনা কার্য ঃ

বছর	ত্রৈমাসিক দুর্ঘটনা				সমষ্টি
	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	
1996	106	88	93	122	
1997	105	85	91	120	
1998	105	76	82	126	
মোট	316	249	266	368	—
গড়	105	83	89	123	400
ঋতুজ সূচক	105	83	89	123	400

(ঘ) পরম্পরীন আপেক্ষিক পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে প্রতিমাসের (বা ত্রৈমাসিক) মান পূর্ববর্তীমাসের (বা ত্রৈমাসিক) মানের শতকরা অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এই অনুপাতগুলিকেই পরম্পরীন আপেক্ষিক (Lind relative) বলা হয়। পরে বিভিন্ন বছরের তথ্য থেকে প্রতিমাসের (বা ত্রৈমাসিক) জন্যে পরম্পরীন অপেক্ষকগুলির গড় নির্ণয় করা হয়। এরপর প্রতি সময়ন্তরের এককের জন্য শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক (Chain relative) হিসাবে করা হয়। এটি পাওয়া যায় কোন সময়ন্তরের পরম্পরীন আপেক্ষিক ও তার পূর্ববর্তী সময়ন্তরের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিকের গুণফলকে 100 দিয়ে ভাগ করে। কিন্তু প্রথম মাস বা ত্রৈমাসিকের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিককে 100 ধরা হয় কারণ, প্রথম সময়ন্তরের পূর্বের এককের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক জানা সম্ভব নয়। এজন্য শেষ সময়ন্তরের পরেও আর একটি কল্পিত সময়ন্তরের জন্য শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক হিসাব করা হয়। যেহেতু প্রতি বছরেই একই ধরনের ঋতুজ ভেদের দেখা পাওয়ার কথা, সেজন্য আমরা মনে করতে পারি যে, এই শৃঙ্খলিত আপেক্ষিকের মান প্রথম সময়ন্তরের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক মানের সমান হবে। কিন্তু সাধারণত তা না হওয়ায় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রবণতার জন্য হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রতি সময়ন্তরে এই প্রবণতার অংশ নির্ণয় করে বাদ দেওয়ার জন্য মোট পার্থক্যকে এক বছরের সময়ন্তরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে একটি সংশোধন অংক (adjustment factor) নির্ণয় করা হয়। প্রথম শৃঙ্খলিত অপেক্ষকটির কোনও রকম পরিবর্তন করা হয় না, কিন্তু পরবর্তী শৃঙ্খলিত অপেক্ষকগুলি থেকে ঐ অংকের যথাক্রমে 1গুণ, 2গুণ,..... ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রতি সময়ন্তরের শৃঙ্খলিত আপেক্ষকগুলিকে প্রবণতার অংশ থেকে মুক্ত করে কিছুটা পরিবর্তিত করা হয়। এবার সব মাসগুলির (বা ত্রৈমাসিকগুলির) সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিকগুলির (adjusted chain relatives) যোগফল যাতে 1200 হয় (বা 400 হয়), এইভাবে পরিবর্তিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিকগুলিকে পরিবর্তিত করলে ঋতুজ সূচক সংখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ ১১. পরস্পরীন আপেক্ষিক পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত তথ্যের ঋতুজ সূচক সংখ্যা নির্ণয় কর।

বছর	ত্রৈমাসিক চাহিদা (হাজারে)			
	I	**II**	**III**	**IV**
1995	78	62	56	69
1996	84	64	61	84
1997	92	70	65	86
1998	98	81	72	95

সমাধান ঃ ঋতুজ সূচক নির্ধারণ নিম্নলিখিত ধাপগুলির মধ্য দিয়ে করা হয়।

(ক) 1995 সালের দ্বিতীয় চতুর্থাংশের পরস্পরীন আপেক্ষিক

$$= \frac{62}{78} \times 100 = 79 \cdot 58$$

1995 সালের তৃতীয় চতুর্থাংশের পরস্পরীন আপেক্ষিক

$$= \frac{56}{62} \times 100 = 90 \cdot 32$$

অনুরূপে অন্যান্যগুলিও গণনা করা যায়

ঋতুজ সূচক নির্ণয়ের গণনা কার্য ঃ

বছর	পরস্পরীন আপেক্ষিক সমূহ				সমষ্টি
	I	**II**	**III**	**IV**	
1995	—	79.58	90.32	121.21	
1996	121.74	76.09	95.31	137.71	
1997	109.52	76.9	92.86	132.31	
1998	113.95	82.65	88.89	137.95	
পরস্পরীন আপেক্ষিক গড়	115.07	78.63	91.85	131.50	
শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক	100	78.63	72.22	94.97	
সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক	100	76.31	67.58	86.01	329.9
ঋতুজ সূচক সংখ্যা	121.3	92.5	81.9	104.3	400

(খ) প্রথম চতুর্থাংশের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = 100

দ্বিতীয় চতুর্থাংশের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $\frac{100 \times 78.63}{100} = 78.63$

তৃতীয় চতুর্থাংশের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $\frac{78 \cdot 63 \times 91 \cdot 85}{100} = 72 \cdot 22$

চতুর্থ চতুর্থাংশের শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $\frac{72 \cdot 22 \times 131 \cdot 50}{100} = 94 \cdot 97$

প্রথম চতুর্থাংশের দ্বিতীয় শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $\frac{94 \cdot 97 \times 115 \cdot 9}{100} = 109 \cdot 28$

সংশোধন অংক (adjustment factor) = $\frac{109 \cdot 28 - 100}{4} = 2 \cdot 32$

(গ) প্রথম চতুর্থাংশের সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = 100

দ্বিতীয় চতুর্থাংশের সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $78.63 - 2.32 = 76.31$

তৃতীয় চতুর্থাংশের সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $72.22 - 2 \times 2.32 = 67.58$

চতুর্থ চতুর্থাংশের সংশোধিত শৃঙ্খলিত আপেক্ষিক = $94.97 - 3 \times 2.32 = 86.0$

(ঘ) প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক = $\frac{400}{329 \cdot 9} \times 100 = 121 \cdot 3$

দ্বিতীয় চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক = $\frac{400}{329 \cdot 9} \times 76 \cdot 31 = 92 \cdot 5$

তৃতীয় চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক = $\frac{400}{329 \cdot 9} \times 67 \cdot 58 = 81 \cdot 9$

চতুর্থ চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচক = $\frac{400}{329 \cdot 9} \times 86 \cdot 01 = 104 \cdot 3$

৯০.৫.১ ঋতুজ ভেদ দূরীকরণ (Deseasonalisation) ঃ

ঋতুজ ভেদ দূরীকরণ বলতে বোঝায় কালীন সারির তথ্যকে ঋতুজ ভেদ মুক্ত করা। যৌগিক কাঠামোর জন্য ঋতুজ ভেদ মুক্ত তথ্য হবে।

$$Y_t - S_t = T_t + C_t + I_t$$

আবার গুণিতক কাঠামোর ক্ষেত্রে ঋতুজ ভেদ মুক্ত তথ্য হবে

$$\frac{y_t}{S_t} = T_t \times C_t \times I_t$$

ঋতুজ ভেদ মুক্ত তথ্য চক্রীল ভেদ ও অনিয়মিত ভেদ পরিমাপের সাহায্য করে।

উদাহরণ ১২. নিম্নলিখিত বিক্রয়ের তথ্যকে ঋতুজ প্রভাবমুক্ত কর এবং ফলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থাংশ	বিক্রয় (হাজার টাকায়)	ঋতুজ সূচক
প্রথম	23.7	78
দ্বিতীয়	25.2	124
তৃতীয়	21.4	50
চতুর্থ	65.4	48

সমাধান ঃ বিভিন্ন চতুর্থাংশের বিক্রয়মানগুলি ঋতুজ প্রভাবমুক্ত করতে গুণিতক কাঠামো প্রয়োগ করা হল।

এখানে ঋতুজ সূচক = ঋতুজ ভেদ × 100

ঋতুজ ভেদমুক্ত কালীন সারির গণনা কার্য ঃ

চতুর্থাংশ	বিক্রয় (y) (হাজার টাকায়)	ঋতুজ ভেদ (S)	ঋতুজ ভেদমুক্ত বিক্রয় $\left(\frac{Y}{S}\right)$
প্রথম	23.7	0.78	30.4
দ্বিতীয়	25.2	1.24	20.3
তৃতীয়	21.4	0.50	42.8
চতুর্থ	65.4	0.48	44.2
মোট	—	4.00	—

শেষ স্তম্ভে ঋতুজ প্রভাবমুক্ত তথ্যের দ্বারা বছরের বিভিন্ন চতুর্থাংশে বিক্রির পরিমাণ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বিক্রির তথ্য ঋতুজভেদ নিরপেক্ষ।

৯০.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১. নিচের প্রত্যেকটি কালীন সারির কোন্ অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বল ঃ

(ক) ছোট গাড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়া।

(খ) 1999 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় পাঁচ দিনব্যাপী বৃষ্টিপাত

(গ) নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আইসক্রিম বিক্রিতে মন্দাভাব

(ঘ) উন্নতির সোপান।

(ঙ) অক্টোবর মাসে পোশাক-পরিচ্ছদের বিক্রি বেড়ে যাওয়া।

(চ) কোনও কারখানায় অগ্নিকাণ্ড জনিত ক্ষতি।

(ছ) দূরদর্শন সেট বিক্রয়ে সাধারণ বৃদ্ধি।

২. বাৎসরিক তথ্যের ক্ষেত্রে কোন্ অংশ থাকতে পারে না?

৩. ত্রৈমাসিক তথ্যের ঋতুজ সূচক সংখ্যাগুলির বাৎসরিক যোগফল কত হবে?

৪. ঋতুজ ভেদের পরিমাপের জন্য গতিধারা অনুপাত (Ratio-to-trend) পদ্ধতিটি কখন উপযুক্ত হয়।

৫. মুক্ত হস্ত পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি কী?

৬. মাসিক তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যায়কাল কত?

৭. প্রবণতা নিরূপণে চলমান গড় পদ্ধতির থেকে গাণিতিক রেখা পদ্ধতির সুবিধা কী?

৮. কালীন সারির লেখতে ভূজ ও কোটি কী কী নির্দেশ করে?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১. কালীন সারি কী? একটি কালীন সারির অংশগুলি কী কী?

২. কোনও কালীন সারির বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

৩. সংক্ষেপে কালীন সারির বিভিন্ন অংশগুলি বর্ণনা কর এবং উদাহরণ দাও।

৪. প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলি বর্ণনা কর।

৫. ঋতুজ ভেদ পরিমাপের পদ্ধতিগুলি বর্ণনা কর।

৬. অর্ধ-গড় পদ্ধতিতে প্রবণতা নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
বার্ষিক উৎপাদন ঃ (হাজার টন)	179	190	196	187	194	202	198	204	200

৭. প্রদত্ত তথ্যে এমন একটি চক্রীল ভেদ আছে যার আবর্তকাল হল পাঁচ বছর। একটি উপযুক্ত পদবিশিষ্ট চলমান গড় পদ্ধতিতে প্রবণতার মান নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1988	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
বার্ষিক বিক্রয় ঃ (হাজার টাকায়)	3.6	4.3	4.3	3.4	4.4	5.4	3.4	2.4	1.4	2.3

৮. নিম্নলিখিত কালীন সারির তথ্যের চার পদবিশিষ্ট চলমান গড় নির্ণয় কর।

বছর ঃ	1986	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
লাভ ঃ (হাজার টাকায়)	201	193	179	198	206	196	183	203	210	201	188	205

৯. নিম্নলিখিত তথ্যের লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতিতে একটি সরলরৈখিক প্রবণতা রেখা নির্ণয় করে 2000 সালে উৎপাদনমাত্রা কত লক্ষ টন হবে নির্ণয় কর ঃ

বছর ঃ	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
বার্ষিক উৎপাদন ঃ (লক্ষ টন)	50.3	52.7	59.3	57.3	56.8	60.7	62.1	58.6

১০. প্রদত্ত তথ্যের একটি দ্বিঘাত অধিবৃত্তাকার প্রবণতা রেখা নির্ণয় কর এবং প্রাপ্ত ফলের উপর আপনার মতামত দিন ঃ

বছর ঃ	1990	1991	1992	1993	1994	1995
দর ঃ (টাকায়)	200	207	228	240	281	392

১১. নিম্নে প্রদত্ত রপ্তানী (y)-র ক্ষেত্রে $\log y_t = a + bt$ আকারের প্রবণতা রেখা নির্ণয় কর ঃ

t :	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y_t :	197	213	229	302	295	293	292	337	335

১২. সাধারণ গড় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত তথ্য থেকে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর ঃ

ত্রৈমাসিক কাগজের উৎপাদন (লক্ষ টন)

বছর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
1994	72	68	80	70
1995	76	70	82	74
1996	74	66	84	80
1997	76	74	84	78
1998	78	74	86	82

১৩. নিম্নে প্রদত্ত ত্রৈমাসিক বিক্রয়ের তথ্য থেকে চলমান গড়-অনুপাত পদ্ধতিতে ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর ঃ

ত্রৈমাসিক উপজাত বস্ত্রের বিক্রয়মূল্য (হাজার টাকায়)

বছর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
1995	197	188	176	194
1996	202	193	179	198
1997	206	196	183	203
1998	210	201	188	206

১৪. নিম্নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ক্ষেত্রে কোনও কারখানায় ত্রৈমাসিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়) দেওয়া আছে। গুণিতক কাঠামোয় কালীন সারি প্রয়োগ করে প্রবণতা-অনুপাত পদ্ধতিতে (সরলরৈখিক প্রবণতা অনুমান করে) ঋতুজ সূচক নির্ণয় কর এবং অবশেষে তথ্যকে ঋতুজ-ভেদ প্রভাবমুক্ত কর ঃ

চতুর্থাংশ

বছর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
1996	78	62	56	71
1997	84	64	61	82
1998	92	70	63	85
1999	100	81	72	96

১৫. নিম্নে প্রদত্ত তথ্য থেকে পরম্পরীন আপেক্ষিক পদ্ধতির সাহায্যে ঋতুজ ভেদ নির্ণয় কর ঃ

ত্রৈমাসিক ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবহার (হাজার বোতল)

বছর	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ
1994	160	180	172	168
1995	168	204	200	188
1996	180	216	208	196
1997	108	252	236	224

৯০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ব্রজেন্দ্র কুমার গুহঠাকুরতা, ভাগবত দাশগুপ্ত ও বাসুদেব অধিকারী (1976) ঃ রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

(২) রাজকুমার সেন (1986) ঃ সংখ্যাতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

(৩) সৌরেন্দ্র নাথ দে (1991) ঃ ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

(৪) Gupta, S. C. (1997) : Fundamental of Statistics, Himalaya Publishing Housing, Delhi.

(৫) Goon, A. M., Gupta, M. K. and Dasgupta, B (1992) : Fundamentals of Statistics, Vol-II, The World Press Private Ltd, Calcutta.

একক ৯১ ❑ অন্তঃ প্রক্ষেপণ

গঠন

৮৪.০ উদ্দেশ্য

৮৪.১ প্রস্তাবনা

৮৪.২ অন্তঃপ্রক্ষেপণে ব্যবহৃত অনুমানসমূহ

৮৪.২.১ স্থানান্তরণ প্রয়োজক

৮৪.২.২ সসীম প্রভেদ প্রয়োজক

৮৪.২.৩ E এবং Δ-এর মধ্যে সম্পর্ক

৮৪.৩ নিউটনের সম্মুখগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র

৮৪.৪ নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র

৮৪.৫ কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র

৮৪.৬ লাগরাঞ্জ-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র

৮৪.৭ অনুশীলনী

৮৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৯১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- অন্তঃপ্রক্ষেপণ কাকে বলে
- অন্তঃপ্রক্ষেপণে ব্যবহৃত অনুমানগুলি কী কী
- স্থানান্তকরণ ও সসীম প্রভেদ প্রয়োজক কী
- নিউটনের সম্মুখগামী ও পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্রগুলি কী কী
- কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র ও তার উদাহরণ ও
- লাগরাঞ্জ-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্রটি কী প্রকার

৯১.১ প্রস্তাবনা

অন্তঃপ্রক্ষেপণ রাশিবিজ্ঞানে প্রচুর ব্যবহার হয়। এই আলোচনার আগে সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা করা যাক। আমরা অঙ্কশাস্ত্রে আপেক্ষক (function) জানি। যদি একটি চলক y আর একটি চলক x-এর সঙ্গে সম্পর্ক-

সম্পর্ক-যুক্ত হয় এবং x-এর কয়েকটি নির্দিষ্ট মানের জন্য y-এর এক বা একাধিক মান থাকে, তবে y-কে x-এর অপেক্ষক বলা হয়। এখানে x-কে স্বাধীন চালক (Independent Variable)ও y-কে অধীন চলক (Dependent Variable) বলা হয় এবং $y = f(x)$ রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন, $y = x^2 + 5x + 6$ একটি অপেক্ষক যেখানে x-এর মান উল্লেখ করলে y-এর মান নির্ণয় করা যাবে।

কিন্তু রাশিভিত্তিক বিশ্লেষণের (Numerical Analysis) ক্ষেত্রে সাধারণত x এবং y-এর মধ্যে প্রকৃত অপেক্ষীয় সম্পর্কটি অজানা থাকে অথবা জানা থাকলেও তা খুব জটিল। শুধু কয়েক জোড়া স্বাধীন ও তার অনুসারী অধীন চলকের মান দেওয়া থাকে। ঐগুলিকে ব্যবহার করে প্রদত্ত স্বাধীন চলকের প্রসারের মধ্যের কোনও নির্দিষ্ট মানের জন্য অধীন চলকের মান অথবা স্বাধীন চলকের প্রসারের বাইরে কাছাকাছি কোনও নির্দিষ্ট মানের জন্য অধীন চলকের মান নিণয় করা হয়। সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণে এই স্বাধীন চলককে **নিধান** (Argument) এবং অধীন চলককে **নির্ভরক** (Entry) বলা হয়।

প্রদত্ত নিধানগুলির প্রসারের (range-এর) মধ্যবর্তী কোনও নির্দিষ্ট নিধানের মানের জন্য নির্ভরক নির্ণয় করার পদ্ধতিকে অন্তঃপ্রক্ষেপণ (Interpolation) বলে।

প্রদত্ত নিধানগুলির প্রসারের বাইরে অথচ কাছাকাছি (Slightly outside) কোনও নির্দিষ্ট নিধানের জন্য নির্ভরক নির্ণয় করার পদ্ধতিকে **বহিঃপ্রক্ষেপণ** (Extrapolation) বলে।

উদাহরণ হিসাবে প্রদত্ত নিধান ও নির্ভরকের মানগুলি নেওয়া যাক।

x	2	3	5	7	8
y	14	19	28	30	38

এখন $x = 4$-এর জন্য y-এর মান নির্ণয়কে অন্তঃপ্রক্ষেপণ ও $x = 1$ বা $x = 9$-এর জন্য) y-এর মান নির্ণয় পদ্ধতিকে বহিঃপ্রক্ষেপণ বলা হয়। এই অধ্যায়ে কেবলমাত্র অন্তঃপ্রক্ষেপণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৯১.২ অন্তঃপ্রক্ষেপণে ব্যবহৃত অনুমানসমূহ (Assumptions for interpolation) :

(i) চলকগুলির গতিবিধি হঠাৎ পরিবর্তিত হবে না, অর্থাৎ চলকগুলির চলাচলে হঠাৎ কোনও উত্থান বা পতন (sudden jump) থাকবে না।

(ii) চলকের মানগুলির পরিবর্তনের ঝোঁকের মধ্যে একটি নির্দিষ্টতা (consistency) থাকবে, অর্থাৎ মানগুলির বিচ্যুতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা (regularity) থাকবে এবং উত্থান-পতন সমরূপ (uniform) হবে।

(iii) চলকগুলিকে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

৯১.২.১ স্থানান্তরণ প্রয়োজক (Shifting Operator) :

ধরা যাক $y = f(x)$ অপেক্ষকে, যদি পরপর দুটি নিধানের মধ্যে পার্থক্য সমান, h হয়, তবে স্থানান্তর প্রয়োজককে $E\,f(x)$ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং ইহা ঠিক পরবর্তী উচ্চ নিধানের জন্য নির্ভরকের সমান হয়। তাহলে,

$E\,f(x) = f(x\ \ h)$, যেখানে h সমপার্থক্যের মান।

অথবা, $E\,y_0 = y_1, E\,y_1 = y_2$, ...

ইহাকে প্রথম ঘাত (first order) স্থানান্তরণ বলে। একইভাবে,

দ্বিতীয় ঘাত (second order) স্থানান্তরণ হল,

$E^2 f(x) = E\,[E\,f(x)] = Ef\,(x + h) = f\,(x + 2h)$

তৃতীয় ঘাত (Third order) স্থানান্তরণ হল,

$E^3 f(x) = E\,[E^2 f(x)] = Ef\,(x+2h) = f\,(x+3h)$

এবং শেষপর্যন্ত, n-ঘাত (nth order) স্থানান্তরণ হল,

$E^n f(x) = f(x+ nh)$

উদাহরণ ১. $y + x^3$ অপেক্ষকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-ঘাত স্থানান্তরণ মান নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ ধরা যাক পরপর নিধানের মধ্যবর্তী পার্থক্য h.

তবে, $E\,f(x) = f(x+h) = (x + h)^3$

$E^2 f(x) = f(x+2h) = (x+2h)^3$

এবং $E^3 f(x) = f(x + 3h) = (x + 3h)^3$

৯১.২.২ সসীম প্রভেদ প্রয়োজক (Finite Difference Operator) ঃ

এই প্রয়োজককে Δ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এটা কোনও অপেক্ষককে নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্তিত করে। নিধানের পরপর মানের পার্থক্য সমান হতে হবে এবং তা h ধরা যাক।

প্রথম ঘাত সসীম প্রভেদ মান,

$$\Delta f(x) = f(x+h) - f(x)$$

অথবা, $\Delta y_0 = y_1 - y_0, \Delta y_1 = y_2 - y_1$, ...

দ্বিতীয় ঘাত সসীম প্রভেদ মান,

$$\begin{aligned}\Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x)) &= \Delta\,\{f(x+h) - f(x)\}\\ &= \Delta\,f(x+h) - \Delta f(x)\\ &= f\,\{x + 2h) - f(x + h) - f(x + h) + f(x)\,\}\\ &= f\,(x + 2h) - 2f\,(x + h) + f(x)\end{aligned}$$

অথবা, $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$

$\Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1 = y_3 - 2y_2 + y_1$, ইত্যাদি

একইভাবে তৃতীয় ঘাত $\Delta^3 f(x)$, চতুর্থ ঘাত $\Delta^4 f(x)$ ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া যাবে।

নিম্নে প্রভেদ ছক (Difference Table) দেখান হল ঃ

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	...	$\Delta^n y$
x_0	y_0				
		$y_1 - y_0 = \Delta y_0$			
x_1	y_1		$\Delta y_1 - \Delta y_0 = \Delta^2 y_0$		
		$y_2 - y_1 = \Delta y_1$			
x_2	y_2		$\Delta y_2 - \Delta y_1 = \Delta^2 y_1$		
		$y_3 - y_2 = \Delta y_2$			
x_3	y_3				
					$\Delta^n y_0$
x_{n-2}	y_{n-2}				
		$y_{n-1} - y_{n-2} = \Delta y_{n-2}$			
x_{n-1}	y_{n-1}		$\Delta y_{n-1} - \Delta y_{n-2} = \Delta^2 y_{n-2}$		
		$y_n - y_{n-1} = \Delta y_{n-1}$			
x_n	y_n				

যদি $(n + 1)$ জোড়া নিধান ও নির্ভরকের মান দেওয়া থাকে, তবে $\Delta^n y$ নির্দিষ্ট (Constant) ও $(n+1)$ –ঘাত বা তার বেশি ঘাত সসীম প্রভেদ শূন্য (0) হবে।

উদাহরণ ২. নিম্নলিখিত তথ্যের প্রভেদ ছক তৈরি কর ঃ

x	4	6	8	19	12
y	7	10	14	19	26

সমাধান ঃ

প্রভেদ ছক					
x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
4	7				
		3			
6	10		1		
		4		0	
8	14		1		1
		5		1	
10	19		2		
		7			
12	26				

৯১.২.৩ E এবং Δ এর মধ্যে সম্পর্ক (Relation of E and Δ) ঃ

আমরা জানি, $\Delta f(x) = \Delta f(x + h) - f(x)$, যেখানে h সমপার্থক্যের মান

$= Ef(x) - f(x)$

$= (E - 1) f(x)$

$\therefore \Delta \equiv E - 1$

অথবা, $E \equiv 1 + \Delta$

উদাহরণ ৩. $\Delta y, \Delta^2 y, \Delta^2 y, \Delta^4 y$ নির্ণয় কর, যেখানে $y = x^3$.

সমাধান ঃ ধরা যাক, সমপার্থক্যের মান h.

এখন, $\Delta y = \Delta f(x) = f(x + h) - f(x) = (x + h)^3 - x^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3$

$= 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

$\Delta^2(x) = \Delta f(x + h) - \Delta f(x)$

$= 3(x+ h)^2 . h+3 (x + h) h^2 + h^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3$

$= 3x^2h + 6xh^2 + 3h^3 + 3xh^2 + 3h^3 + h^3 - 3x^2h - 3xh^2 - h^3$

$= 6xh^2 + 6h^3$

$$\Delta^3 y = \Delta^3 f(x) = \Delta^2 f(x+h) - \Delta^2 f(x)$$
$$= 6(x+h)h^2 + 6h^3 - 6xh^2 - 6h^3$$
$$= 6h^3$$
$$\Delta^4 y = \Delta^4 f(x) = \Delta^3 f(x+h) - \Delta^3 f(x)$$
$$= 6h^3 - 6h^3$$
$$= 0$$

উদাহরণ ৪. নিম্নে প্রদত্ত তথ্য থেকে $x = 2$-এর জন্য y-এর মান নির্ণয় কর ঃ

x	0	1	3	4
y	5	6	50	105

সমাধান ঃ যেহেতু কেবলমাত্র y-এর চারটি মান দেওয়া রয়েছে, তাই y-কে তিন-ঘাত বিশিষ্ট ঘাতজক (polynomial in x of degree 3) অনুমান করলে চতুর্থ ঘাত প্রভেদ $\Delta^4 y$ শূন্য (0) হবে। ধরা যাক, $x = 0, 1, 2, 3, 4$-এর জন্য y-এর মানগুলি যথাক্রমে y_0, y_1, y_2, y_3, y_4

এখন $\Delta^4 y_0 = 0$

বা, $(E-1)^4 y_0 = 0$

বা, $(E^4 - 4E^3 + 6E^2 - 4E + 1) y_0 = 0$

বা, $E^4 y_0 - 4E^3 y_0 + 6E^2 y_0 - 4Ey_0 + y_0 = 0$

বা, $y_4 - 4y_3 + 6y_2 - 4y_1 + y_0 = 0$

বা, $105 - 4 \times 50 + 6y_2 - 4 \times 6 + 5 = 0$

বা, $y_2 = 19$

$\therefore$ নির্ণেয় y-এর মান 19.

৯১.৩ নিউটনের সম্মুখগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র (Newton's Forward Interpolation Formula)

মনে করা যাক, $y = f(x)$ অপেক্ষকের $(n+1)$টি নিধান $x_0, x_1, ...x_n$-এর অনুরূপ নির্ভরক $y_0, y_1, ... y_n$ দেওয়া আছে যেখানে নিধানগুলি পরপর সমদূরত্ব বিশিষ্ট, অর্থাৎ $x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = ... = x_n - x_{n-1} = h$। নিধানের প্রসারের অন্তর্গত কোনও নির্দিষ্ট মানের জন্য যা ছকের উপরিভাগে বা নিধান সারির প্রথমভাগে

রয়েছে নির্ভরক y-এর প্রাককলক (estimate) নিউটনের সম্মুখগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র দিয়ে নির্ণয় করা হয় যা নিম্নরূপঃ

$$y = y_0 + u\Delta y_0 + \frac{u(u-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \ldots + \frac{u(u-1)(u-2)..(u-n+1)}{n!}\Delta^n y_0$$

যেখানে, $u = \frac{x - x_0}{h}$

এই সূত্র কেবলমাত্র সমদূরত্ব বিশিষ্ট নিধানের জন্য প্রযোজ্য এবং ছকের শুরুর দিকের নিধানের জন্য খুবই উপযুক্ত। ইহা শুরুর দিকের নিধানের বহিঃপ্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদাহরণ ৫. এক ব্যক্তির বিভিন্ন বয়সে জীবন বীমায় প্রদেয় টাকার পরিমাণ নিম্নলিখিত ছকে দেওয়া আছে। উহা থেকে 22 বছর বয়সে প্রদেয় টাকার পরিমাণ নির্ণয় কর।

বয়স (বছর)	20	25	30	35	40
প্রদত্ত টাকা	25	28	32	37	43·50

সমাধান ঃ

প্রভেদ ছক

বয়স (বছর) (x)	প্রদত্ত টাকা (y)	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
20	25				
		3			
25	28		1		
		4		0	
30	32		1		0.50
		5		0.50	
35	37		1.50		
		6.50			
40	43.50				

নিউটনের সম্মুখগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র,

$$yf(x) = y_0 + u\Delta y_0 + \frac{u(u-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \frac{u(u-1)(u-2)(u-3)}{4!}\Delta^4 y_0$$

যেখানে $u = \frac{22-20}{5} = 0.4,\ y_0 = 25,\ \Delta y_0 = 3,\ \Delta^2 y_0 = 1,\ \Delta^3 y_0 = 0$ এবং $\Delta^4 y_0 = 0\cdot 50$

$$\therefore\ f(22) = 25 + 0\cdot4\times3 + \frac{0.4(0.4-1)}{2.1}\times1 + \frac{0.4(0.4-1)(0.4-2)}{3.2.1} + \frac{0.4(0.4-1)(0.4-2)(0.4-3)}{4.3.2.1}\times0$$

$= 26\cdot0592$

$\therefore$ 22 বছর বয়সে ঐ ব্যক্তির প্রদেয় টাকার পরিমাণ ছিল 26·06 টাকা।

উদাহরণ ৬. নিম্নলিখিত তথ্য থেকে f(3.5) নির্ণয় কর ঃ

x	3	4	5	6
y	4	13	26	43

সমাধান ঃ যেহেতু নিধান x-এর মানগুলি সমদূরত্ব বিশিষ্ট এবং 3.5 নিধানের শুরু দিকের মান, তাই নিউটনের সম্মুখগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র দ্বারা f(3·5)-এর মান নির্ণয় করা যাবে।

প্রভেদ ছক

x	f(x)	$\Delta f(x)$	$\Delta^2 f(x)$	$\Delta^3 f(x)$
3	4			
		9		
4	13		4	
		13		0
5	26		4	
		17		
6	43			

এখানে, $u = \frac{3.5-3}{1} = 0.5,\ f(3) = 4, \Delta f(3) = 9, \Delta^2 f(3) = 4$ এবং $\Delta^3 f(3) = 0$

$$\therefore\ f(3.5) = 4 + 0.5\times9 + \frac{0.5(0.5-1)}{2.1}\times4 + \frac{0.5(0.5-1)(0.5-2)}{3.2.1}\times0 = 8$$

৯১.৪ নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র (Newton's Backward Interpolation Formula) :

মনে কর, $y_0, y_1, \ldots. y_n$, $y = f(x)$ অপেক্ষকের মানগুলির সমদূরত্ব বিশিষ্ট অনুরূপ মান যথাক্রমে $x_0, x_1, \ldots,$ x_n দেওয়া আছে। নিধানের প্রসারের শেষের দিকের কোনও নির্দিষ্ট মানের জন্য নির্ভরকের মান নির্ণয় করতে হলে নিম্নলিখিত নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করা যায়।

$$y = y_n + w\Delta y_{n-1} + \frac{w(w+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{w(w+1)(w+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3} + \ldots + \frac{w(w+1)\ldots(w+n-1)}{n!}\Delta^n y$$

যেখানে, $w = \frac{x - x_n}{h}$

দ্রষ্টব্য ঃ এই সূত্র কেবলমাত্র সমদূরত্ব বিশিষ্ট নিধানের জন্য প্রযোজ্য এবং ছকের নিচের দিকে নিধানের জন্য উপযুক্ত। ইহা শেষের দিকের নিধানের বহিঃপ্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদাহরণ ৭. x-এর মান যখন 2, 4, 6 এবং y-এর মান যথাক্রমে 7, 21, 43 এবং 73 উপযুক্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে x-এর মান যখন 7 তখন y-এর মান নির্ণয়কর।

সমাধান ঃ $x = 7$ প্রদত্ত x -এর মানগুলির মধ্যে শেষের দিকে এবং মানগুলি সমদূরত্ব বিশিষ্ট, তাই নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র ব্যবহার করে y-এর মান নির্ণয় করা উপযুক্ত।

প্রভেদ ছক

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
2	7			
		14		
4	21		8	
		22		0
6	43		8	
		30		
8	73			

এখানে $w = \frac{7-8}{2} = -\frac{1}{2} = -0.5$, $y_3 = 73$, $\Delta y_2 = 30$, $\Delta^2 y_1 = 8$, $\Delta^3 y_0 = 0$

নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র থেকে পাই,

$$y = y_3 + w\Delta y_2 + \frac{w(w+1)}{2!}\Delta^2 y_1 + \frac{w(w+1)(w+2)}{3!}\Delta^3 y_0$$

$$= 73 + (-0.5)\times 30 + \frac{(-0.5)(-0.5+1)}{2.1}\times 8 + \frac{(-0.5)(-0.5+1)(-0.5+2)}{3.2.1}\times 0$$

$$= 57$$

$\therefore$ নির্ণেয় y-এর মান 57.

উদাহরণ ৮. নিম্নলিখিত শ্রমিকদের আয়ের বিভাজন ছক থেকে প্রতিদিন 36 টাকার বেশি অথচ 40 টাকার কম আয়ের কর্মীর সংখ্যা নির্ণয় কর ঃ

প্রতিদিনের আয় (টাকায়) (নিচ থেকে)	20	25	30	35	40
কর্মী সংখ্যা	20	45	115	210	225

36 টাকার কম আয়ের কর্মী সংখ্যা নির্ণয় করা যাক।

প্রভেদ ছক

আয় (টাকায়)	কর্মী সংখ্যা (ক্রমযোগিক)	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
x	y				
20 (x_0) টাকার নিচে	20 (y_0)				
		25			
25 (x_1) টাকার নিচে	45 (y_1)		45		
		70		–20	
30 (x_2) টাকার নিচে	115 (y_2)		25		–85
		95		–105	
35 (x_3) টাকার নিচে	210 (y_3)		–80		
		15			
40(x_4) টাকার নিচে	225 (y_4)				

x = 36 মানটি ছকের নিচের দিকে আছে, তাই নিউটনের পশ্চাদগামী অন্তঃপনরক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে $w = \frac{x - x_4}{h} = \frac{36 - 40}{5} = -\frac{4}{5} = -0.8$

$y_4 = 225, \Delta y_3 = 15, \Delta^2 y_2 = -80, \ \Delta^3 y_1 = -105, \Delta^4 y_0 = -85$

এখন,

$$y = y_4 + w\Delta y_3 + \frac{w(w+1)}{2.1}\Delta^2 y_2 + \frac{w(w+1)(w+2)}{3.2.1}\Delta^3 y_1 + \frac{w(w+1)(w+2)(w+3)}{4.3.2.1}\Delta^4 y_0$$

$$= 22.5 + (-0.8)\times 15 + \frac{(-0.8)(-0.8+1)}{2.1}\times(-80) + \frac{(-0.8)(-0.8+1)(-0.8+2)}{3.2.1}\times(-105)$$

$$+ \frac{(-0.8)(-0.8+1)(-0.8+2)(-0.8+3)}{4.3.2.1}\times(-85)$$

$= 224{\cdot}256$

$\therefore$ 36 টাকা অথবা বেশি, অথচ 40 টাকার কম আয়ের কর্মীর সংখ্যা $= (225 - 224.256)$

$= 0.744$

$= 1$ জন।

৯১.৫ কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র (Central Interpolation Formula) :

ছকের মধ্যবর্তী কোনও নিধানের জন্য নির্ভরকের মান নির্ণয় করতে হলে হলে কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করা হয়। তবে মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রেও নিধানের পরপর মানগুলি সমদূরত্ব বিশিষ্ট হতে হবে। এইক্ষেত্রে সাধারণত দুটি সূত্র ব্যবহার করা হয়—স্টারলিং এবং ব্যাসেলের সূত্র। মধ্যবর্তী নিধানের মানের ক্ষেত্রে এই দুটি সূত্র নিউটনের সম্মুখগামী বা পশ্চাদগামী অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র থেকে অধিক অনুসারী (Converge more rapidly) হয়।

(i) স্টারলিং-এর সূত্র (Stirling's Formula) ঃ

যদি নিধানের মান..... $x_{-3}, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, x_3, \ldots$-এর অনুরূপ নির্ভরকের মানগুলি.....$y_{-3}, y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2, y_3, \ldots$ হয়, তবে স্টারলিং-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র হল ঃ

$$y = y_0 + u.\frac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} + \frac{u^2}{2!}y_{-1} + \frac{u(u^2-1^2)}{3!}\frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2}$$

$$+\frac{u^2(u^2-1^2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \frac{u(u^2-1^2)(u^2-2^2)}{5!}\frac{\Delta^5 y_{-2} + \Delta^5 y_{-3}}{2} + \ldots\ldots$$

যেখানে, $u = \dfrac{x - x_0}{h}$

যখন u-এর মান -0.25 থেকে $+0.25$-এর মধ্যে থাকে, তখন স্টারলিং-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র যুক্তিযুক্ত।

বেসেল-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র (Bessel's Interpolation Formula) :

সূত্রটি হল ঃ

$$y = \frac{y_0 + y_1}{1} + v.\Delta y_0 + \frac{\left\{v^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}}{2!}\frac{\Delta^2 y_0 + \Delta^2 y_{-1}}{2} + \frac{v\left\{v^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}}{3!}\Delta^3 y_{-1}$$

$$+\frac{\left\{v^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}\left\{v^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right\}}{4!}\frac{\Delta^4 y_{-1} + \Delta^4 y_{-2}}{2} + \frac{v\left\{v^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right\}\left\{v^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right\}}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \ldots$$

যেখানে, $u = \dfrac{x - x_0}{h}$ এবং $v = u - \dfrac{1}{2}$

যখন u-এর মান +0.25 থেকে +0.75 অথবা v-এর মান –0.25 থেকে +0.25-এর মধ্যে থাকে, তখন বেসেল-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র যুক্তিযুক্ত।

উদাহরণ ৯. 4টি সংখ্যার লগারিদমের অংশক নিচে দেওয়া হল। ছক থেকে 4213-এর লগারিদম-এর অংশক নির্ণয় কর।

সংখ্যা	4200	4210	4220	4230
অংশক	6232493	6242821	6253125	6263404

সমাধান ঃ যেহেতু নিধানের মানগুলি সমদূরত্ব বিশিষ্ট এবং 4213 ছকের মধ্যবর্তী অংশে আছে, তাই কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ উপযুক্ত।

মনে কর, $x_0 = 4210$

তাহলে, $u = \frac{x - x_0}{h} = \frac{4213 - 4210}{10} = 0.3$

এক্ষেত্রে বেসেল-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রযোজ্য।

প্রভেদ ছক

সংখ্যা (x)	অংশক (y)	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
4200 (x_{-1})	6232493 (y_{-1})			
		10328 (Δy_{-1})		
4210 (x_0)	6242821 (y_0)		–24 ($\Delta^2 y_{-1}$)	
		10304 (Δy_0)		–1 ($\Delta^3 y_{-1}$)
4220 (x_1)	6253125 (y_1)		–25 ($\Delta^2 y_0$)	
		10279 (Δy_1)		
4230 (x_2)	6263404 (y_2)			

এখানে $v = 0.3 - 0.5 = -0.2$

এক্ষণে বেসেলের অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র থেকে পাই,

$$y = \frac{6242821 + 6253125}{2} + (-0.2) \times 10304 + \frac{(0.04 - 0.25)}{2} \times \frac{(-24 - 25)}{2}$$

$$+ \frac{(-0.2)(0.04 - 0.25)}{6} \times -1$$

$= 6245914.8$

$= 6245915$

$\therefore$ নির্ণেয় অংশকের মান 6245915.

উদাহরণ ১০. নিম্নলিখিত ছক থেকে $x = 68$-এর জন্য y-এর মান উপযুক্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় কর।

x	3	5	7	9	11
y	20	23	27	29	32

সমাধান ঃ যেহেতু x-এর মানগুলি সমদূরত্ব বিশিষ্ট এবং $x = 68$ ছকের মধ্যবর্তী অংশে আছে, তাই কেন্দ্রীয় অন্তঃপ্রেক্ষপণ সূত্র প্রয়োগ উপযুক্ত।

মনে কর, $x_0 = 7$

তাহলে, $u = \dfrac{x - x_0}{h} = \dfrac{6.8 - 7}{2} = \dfrac{0.2}{2} = -0.1$

এক্ষেত্রে স্টারলিং-এর সূত্র প্রযোজ্য।

প্রভেদ ছক

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
3 (x_{-2})	20 (y_{-2})				
		3 (Δy_{-2})			
5 (x_{-1})	23 (y_{-1})		1 $(\Delta^2 y_{-2})$		
		4 (Δy_{-1})		-3 $(\Delta^3 y_{-2})$	
7 (x_0)	27 (y_0)		-2 $(\Delta^2 y_{-1})$		6 $(\Delta^4 y_{-2})$
		2 (Δy_0)		3 $(\Delta^3 y_{-1})$	
9 (x_1)	29 (y_1)		1 $(\Delta^2 y_0)$		
		3 (Δy_1)			
11 (x_2)	32 (y_2)				

এক্ষণে, স্টারলিং-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$y = 27 + (-0.1) \times \frac{2+4}{2} + \frac{(-0.1)^2}{2_{\cdot}1} \times (-2) + \frac{(-0.1)\left\{(-0.1)^2\right\}}{3.2.1} \times \frac{3+(-3)}{2}$$

$$+ \frac{(-0.1)^2\left\{(-0.1)^2 - 1\right\}}{4.3.2.1} \times 6 \;= 26.687525$$

৯১.৬ লাগরাঞ্জ-এর অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র (Lagrange's Interpolation Formula) :

নিধানের পরপর দূরত্ব সমান বা অসমান যাই হোক না কেন, এই সূত্র প্রয়োগ করে নির্ভরকের মান নির্ণয় করা যাবে। লাগরাঞ্জের অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$y = \frac{(x - x_1)(x - x_2)\ldots\ldots(x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)\ldots\ldots\ldots(x_0 - x_n)} y_0 + \frac{(x - x_0)(x - x_2)\ldots\ldots(x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)\ldots\ldots(x_1 - x_n)} y_1 + \ldots\ldots$$

$$\ldots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\ldots\ldots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\ldots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\ldots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\ldots(x_i-x_n)} y_i + \ldots +$$

$$\frac{(x-x_0)(x-x_1)\ldots\ldots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\ldots\ldots(x_n-x_{n-1})} y_n$$

যেখানে, y হল অন্তঃপ্রক্ষেপিত মান,

x হল যে মানের জন্য y-এর মান নির্ণয় করতে হবে,

$x_0, x_1, x_2, \ldots.. x_n$ হল নিধান x-এর প্রদত্ত মানসমূহ,

$y_0, y_1, y_2, \ldots.. y_n$ হল নির্ভরক y-এর প্রদত্ত মানসমূহ।

উদহরণ ১১. নিম্নলিখিত ছকে বিভিন্ন বয়সে একজন শিশুর স্বাভাবিক ওজন দেওয়া আছে। উহা থেকে শিশুটির 4 মাস বয়সে কত ওজন ছিল নির্ণয় করুন।

বয়স (মাসে)	0	2	3	5	6
ওজন (পাউন্ডে)	5	7	8	10	12

সমাধান ঃ মনে কর, $x_0 = 0, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 5, x_4 = 6$

এবং $y_0 = 5, y_1 = 7, y_2 = 8, y_3 = 10, y_4 = 12$

যেহেতু পরপর নিধানের মানগুলির দূরত্ব অসমান, তাই লাগরাঞ্জের অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$y = \frac{(4-2)(4-3)(4-5)(4-6)}{(0-2)(0-3)(0-5)(0-6)} \times 5 + \frac{(4-0)(4-3)(4-5)(4-6)}{(2-0)(2-3)(2-5)(2-6)} \times 7 +$$

$$\frac{(4-0)(4-2)(4-5)(4-6)}{(3-0)(3-2)(3-5)(3-6)} \times 8 + \frac{(4-0)(4-2)(4-3)(4-6)}{(5-0)(5-2)(5-3)(5-6)} \times 10 +$$

$$\frac{(4-0)(4-2)(4-3)(4-5)}{(6-0)(6-2)(6-3)(6-5)} \times 12 = \frac{80}{9} = 8\frac{8}{9} = 89$$

$\therefore$ শিশুটির 4 মাস বয়সে ওজন 8.9 পাউন্ড ছিল।

বিবর্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ (Inverse Interpolation) ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্রের সাহায্যে (n+1)-জোড়া নিধান নির্ভরকের মান $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট কোনও নিধান x-এর জন্য নির্ভরক y কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। এখন $y_0, y_1, \ldots\ldots y_n$-এর মধ্যবর্তী কোনও নির্ভরক y দেওয়া থাকলে নিধান x কীভাবে নির্ণয় করা হয় তার সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে। যেহেতু লাগরাঞ্জ-এর সূত্র অসমান শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই লেখা যায়,

$$x = \frac{(y-y_1)(y-y_2)\ldots(y-y_n)}{(y_0-y_1)(y_0-y_2)(y_0-y_n)} x_0 + \frac{(y-y_0)(y-y_2)\ldots(y-y_n)}{(y_1-y_0)(y_1-y_2)\ldots(y_1-y_n)} x_1 + \ldots$$

$$+ \frac{(y-y_0)(y-y_1)\ldots(y-y_{i-1})(y-y_{i+1})\ldots(y-y_n)}{(y_i-y_0)(y_i-y_1)\ldots\ldots(y_i-y_{i-1})(y_i-y_{i+1})\ldots(y_i-y_n)} x_i + \ldots\ldots +$$

$$\frac{(y-y_0)(y-y_1)\ldots\ldots(y-y_{n-1})}{(y_n-y_0)(y_n-y_1)\ldots\ldots(y_n-y_{n-1})}x_n$$

উদাহরণ ১২. নিম্নলিখিত ছক থেকে $y = 12$ হলে, x-এর মান নির্ণয় কর ঃ

x	2	4	7
y	7	10	16

সমাধান ঃ মনে কর, $x_0 = 2, x_1 = 4, x_2 = 7$

এবং $y_0 = 7, y_1 = 10, y_2 = 16$

এখানে, $y = 12$

লাগরাঞ্জের বিবর্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$x = \frac{(12-10)(12-16)}{(7-10)(7-16)}\times 2 + \frac{(12-7)(12-16)}{(10-7)(10-16)}\times 4 + \frac{(12-7)(12-10)}{(16-7)(16-10)}\times 7 = 5\cdot 1481$$

$\therefore$ নির্ণেয় x এর মান $5\cdot 1481$

৯১.৭ অনুশীলনী

১। প্রদত্ত ছক থেকে নিম্নলিখিত মানগুলি কোন্ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হবে লেখ ঃ

x	0	1	2	3	4
y	3	4	6	10	18

$x = 0\cdot 5, 3\cdot 5, 2\cdot 2$ এবং $2\cdot 8$-এর জন্য y-এর মান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে।

২. একটি ছক দেওয়া আছে ঃ

x	0	2	3	5
y	0	3	7	31

কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য

(ক) $x = 1$-এর জন্য y-এর মান নির্ণয়ের জন্য।

(খ) $y = 5$-এর জন্য x-এর মান নির্ণয়ের জন্য।

৩. $\left(\frac{\Delta}{E}\right)^2 U_x$ এবং $\left(\frac{\Delta^2 U_x}{E^2 U_x}\right)$-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

৪. $\Delta^3 x^4$-এর মান নির্ণয় কর।

৫. $y_0 = 5.6, y_1 = 8.3$ এবং $y_2 = 15.6$ হলে, Ey_1 এবং Δy_1-এর মান কত ?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১. অন্তঃপ্রক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? বহিঃপ্রক্ষেপণেণ সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

২. অন্তঃপ্রক্ষেপণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কী কী? কোন্ কোন্ অবস্থায় এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয়?

৩. Δ এবং E প্রয়োজকের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, $E = 1 + \Delta$

৪. বিবর্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? লাগরাঞ্জ-এর বিবর্ত অন্তঃপ্রক্ষেপণ সূত্র বর্ণনা কর।

৫. নিম্নলিখিতগুলি লেখ (Write down the following):

(i) $\Delta \log x$-এর মান নির্ণয় কর, অন্তর-এর দৈর্ঘ্য 'h' ধর।

(ii) $\Delta^5 y_1$-কে y-এর বিভিন্ন মানের আকারে প্রকাশ কর।

(iii) পার্থক্যের অন্তর 1 ধরে $\Delta^2 e^x$ নির্ণয় কর।

(iv) নিধানের পার্থক্যের অন্তর 1 হলে $\Delta^4 e^x$ নির্ণয় কর।

(v) যদি $f(x) = (a-x)(b+cx)(d-cx)(f+gx)(h-kx)$ হয়, তবে $\Delta^5 f(x)$ নির্ণয় কর।

৬. প্রদত্ত ছক থেকে $U_{0.5}$, $U_{2.1}$ এবং $U_{3.8}$ নির্ণয় কর ঃ

x	0	1	2	3	4
u_x	1	0	5	22	57

৭. নিম্নলিখিত ছক থেকে অজানা পদটি নির্ণয় কর ঃ

x	0	1	2	3	4
y	1	3	9	–	81

৮. নিম্নপ্রদত্ত ছক থেকে $x = 18$-এর জন্য y-এর মান নির্ণয় কর ঃ

x	10	12	15	19
y	22	35	35	90

৯. নিম্নলিখিত ছক থেকে $f(x) = 100$ হলে x-এর মান নির্ণয় কর ঃ

x	3	7	9	10
f(x)	168	120	72	63

৯১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. Goon. A. M., Gupta, M. K. and Dasgupta, B. (1992) : Fundamentals of Statistics, Vol-1

২. Nag, N. K. (1993) : Business Mathematics and Statistics, Kalyani Publishers.

৩. Maity, J. C. and Chakrabarti, J. (1995) : Elementary Level Business Mathematics & Statistics, Eureka Publishers

৪. Freeman, H. (1962) : Finite Differences for Actuarial Students, Cambridge University Press.

৫. Scarborough, J. B. (1966) : Numerical Mathematical Analysis, Oford & IBH Publishing Co.

একক ৯২ ❑ সেট তত্ত্ব

গঠন

৯২.০	উদ্দেশ্য
৯২.১	প্রস্তাবনা
৯২.২	সেটের উপস্থাপনা
৯২.২.১	সেটের প্রকারভেদ
৯২.২.২	ভেন চিত্র
৯২.৩	সেটের কয়েকটি ধর্ম
৯২.৪	সেট প্রক্রিয়া
৯২.৫	সেটের বীজগাণিতিক সূত্রাবলী
৯২.৬	অনুশীলনী
৯২.৭	গ্রন্থপঞ্জী

৯২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করার পর আপনি বুঝতে পারবেন

- সেট তত্ত্ব কাকে বলে
- সেটের প্রকারভেদ কী কী
- সেটের ধর্মগুলি কী কী ও তার প্রক্রিয়া এবং
- সেটের বীজগাণিতিক সূত্রাবলী

৯২.১ প্রস্তাবনা

সেট বা গুচ্ছ (Set) কথাটি আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি। যেমন চাবিছড়া, বই-এর সেট, ফুটবল দল, রান্নার সেট, ছাত্রের শ্রেণী, তাসের সেট, চায়ের সেট ইত্যাদি। উদাহরণে, সবক্ষেত্রে এক একটি সমষ্টি বা সংকলনকে নির্দেশ করে। গণিতশাস্ত্রে সেট তত্ত্বের আলোচনা করা হয় আধুনিক গণিত (Modern Mathematics) অংশে। জার্মান গণিতজ্ঞ জর্জ কান্টির (George Cantor) সেট বা গুচ্ছতত্ত্বের উদ্ভাবক।

স্বতন্ত্র বস্তুসমূহের (distinct objects) সুসংজ্ঞাত (well-defined) সংকল (collection)-কে সেট বা গুচ্ছ বলে। সেটের প্রত্যেকটি বস্তুকে পদ বা সদস্য (element বা member) বলা হয়। সেটকে সাধারণত

A,B,C অথবা X, Y, Y অথবা P, Q, R ইত্যাদি এবং সেটের পদকে a, b, c অথবা x, y, z ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

'$\in$' চিহ্নটি দিয়ে অন্তর্ভুক্তি (belongs to or is an element of or is member of) বোঝায়। যেমন, $x \in A$ বলতে বোঝায় যে x পদটি A সেটের অন্তর্গত। আবার 'অন্তর্গত নয়' বোঝাতে $\in$ চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। যেমন $y \notin A$ বলতে বোঝায় যে, y পদটি A সেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, V যদি ইংরাজী স্বরবর্ণের সেট হয় তবে $i = \in V$, কিন্তু $h \notin V$. যদি $x \in A$ হয় তবে 'x, A সেটের অন্তর্গত' অথবা, 'x, A সেটের একটি পদ' হিসাবে পড়তে হবে। একইভাবে যদি '$y \notin A$ হয় তবে y, A সেটের অন্তর্গত নয়' অথবা 'y, A সেটের পদ নয়' হিসাবে পড়তে হবে। কোনও একটি সেটের পদগুলি ক্রম-নিরপেক্ষ (independent of order) হয়।

৯২.২ সেটের উপস্থাপনা ঃ

সেট উপস্থাপনা সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে করা হয় ঃ

(i) ছক বা সারণি পদ্ধতি (Tabudar or Roster Method)

(ii) ধর্মভিত্তিক পদ্ধতি (Selector or Rule or Property Method)

(i) **ছক বা সারণি পদ্ধতি ঃ** যখন কোনও সেটের পদগুলি স্পষ্টভাবে জানা থাকে, তখন ঐ পদগুলিকে একটি বন্ধনীর ({ } বা ( ) বা [ ]) মধ্যে কমা দিয়ে পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন, ইংরাজি স্বরবর্ণের সেট V হলে, $V = \{a, e, i, o, u\}$ অথবা $V = \{i, o, a, e, u\}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আবার কোনও সেট A-এর পদগুলি 1 থেকে 81 পর্যন্ত অযুগ্ম সংখ্যা হলে, $A = \{1, 3, 5, ..., 81\}$ দিয়ে এবং স্বাভাবিক সংখ্যাগুলির সেট N হলে, $N = \{1, 2, 3, ...\}$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

(ii) **ধর্মভিত্তিক পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে কোনও সেটের পদগুলির তালিকা প্রকাশ করার পরিবর্তে উহারা যে নির্দিষ্ট ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তা উল্লেখ করে সেটটি উপস্থাপিত করা হয়। কোনও সেট A-এর যে কোনও পদ x যদি f(x) ধর্ম (বা বৈশিষ্ট্য) মেনে চলে, তবে $A = \{x \mid f(x)\}$ অথবা $A = \{x : f(x)\}$ আকারে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, (i) 5 ও 75-এর মধ্যবর্তী যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যার সেট A হলে, $A = \{x|x$ একটি যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা এবং $5 < x < 75\}$, (ii) $x = \{y : y \in N$ এবং $y \leq 65\}$, যেখানে N হল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট, (iii) 6 ও 8 -এর মধ্যবর্তী বাস্তব সংখ্যার সেট R হলে, $R = \{x : 6 < x < 8\}$

৯২.২.১ সেটের প্রকারভেদ ঃ

(ক) সসীম সেট (Finite Set) ঃ যে সেটের পদগুলির সংখ্যা গণনার দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব অর্থাৎ যে সেটের পদগুলির সংখ্যা সসীম তাকে সসীম সেট বলে। উদাহরণস্বরূপ, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{a, e, i, o, u\}$, $C = \{x : x$ একটি মৌলিক সংখ্যা ও $2 \leq x \leq 13\}$.

(খ) অসীম সেট (Infinite Set) ঃ যে সেটের পদগুলির সংখ্যা সসীম নয় অর্থাৎ যে সেটের পদগুলির সংখ্যা অসীম তাকে অসীম সেট বলে। উদাহরণস্বরূপ, $A = \{1, 2, 3, ...\}$, $B = \{2, 4, 6, ...\}$, $C = \{x \mid x$ হল আকাশের সব তারা $\}$.

(গ) একপদী সেট (Singleton Set) : যে সেটে একটি মাত্র পদ থাকে, তাকে একপদী সেট বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, $A = \{8\}$, $B = \{x : x$ একটি অখণ্ড সংখ্যা এবং $5 < x < 7\}$।

(ঘ) শূন্য সেট (Null or Empty or Void Set) : যে সেটের অন্তর্গত কোনও পদই নেই, তাকে শূন্য সেট বলে। ইহা সাধারণত গ্রীক অক্ষর ϕ অথবা { } দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, $x = \{x : x$ একটি পূর্ণবর্গ অখণ্ড সংখ্যা, $5 < x < 8\}$, $y = \{y : y$ একটি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যার বর্গ হল $-1\}$, $Z = \{a : a$ একটি অখণ্ড সংখ্যা, $2 < x < 3\}$।

(ঙ) উপসেট (Subset) : যদি দুটি সেট A ও B এমন হয় যে, A সেটের প্রত্যেকটি পদ B সেটের অন্তর্গত হয়, তবে A সেটকে B সেট-এর উপসেট বলে এবং উহাকে $A \subseteq B$ অথবা $B \supseteq A$ আকারে প্রকাশ করা হয়। যদি $x \in A$ হয় তবে $x \in B$ অর্থাৎ $x \in A \Rightarrow x \in B$। উদাহরণস্বরূপ, (i) মনে কর, $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ ও $B = \{3, 7, 11\}$, তাহলে $B \subseteq A$; (ii) $A = \{x \mid x$ হল ইংরাজি বর্ণমালার অক্ষর $\}$ এবং $B = \{x \mid x$ হল ইংরেজি স্বরবর্ণ $\}$, তাহলে $B \subseteq A$.

যদি দুটি সেট A ও B এমন হয় যে, A সেটের প্রত্যেকটি পদ B সেটের পদও কিন্তু কমপক্ষে B-তে একটি পদ আছে যা A সেটের পদ নয়, তাহলে A সেটকে B সেটের যথার্থ উপসেট (Proper Subset) বলে। উহাকে $A \subset B$ বা $B \supset A$ আকারে প্রকাশ করা হয়। আবার B সেটকে A সেটের অধিসেট (Superset) বলে। উদাহরণ (i) এবং (ii)-তে B সেট A সেটের যথার্থ সেট এবং A সেট B সেটের অধিসেট।

(চ) সমান সেট (Equal Set) : দুটি সেট A ও B কে সমান সেট বলা হবে যদি A-এর প্রত্যেকটি পদ B-তে এবং B-এর প্রত্যেকটি পদ A-তে থাকে এবং $A = B$ আকারে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ :

(i) যদি $A = \{1, 2, 3, 4\}$ এবং $B = \{3, 2, 1, 4\}$ হয়, তাহলে $A = B$

(ii) যদি $A = \{b, c, d\}$ এবং $B = \{c, c, b, d, d, d\}$ হয়, তাহলে $A = B$

(iii) যদি $A = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, $B = \{3, 4\}$ ও $C = \{3, 3, 4, 3, 4\}$ হয়, তাহলে $A = B = C$.

(iv) $A = \{x : x$ হল STRAND শব্দের একটি অক্ষর $\}$

$B = \{x : x$ হল STANDARD শব্দের একটি অক্ষর $\}$

$C = \{x : x$ হল STANDING শব্দের একটি অক্ষর $\}$

এখানে $A = B$, $B \neq C$, $A \neq C$.

(ছ) সমতুল সেট (Equivalent Set) : যদি দুটি সেট A ও B এমন হয় যে, A সেটের পদসংখ্যা ও B সেটের পদসংখ্যা সমান, তাহলে A ও B সেট দুটিকে সমতুল সেট বলে। A ও B সেটের পদগুলি সমান হবে এমন কোনও বাধ্যকতা নেই। এদের $A = B$ আকারে প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ঃ (i) A = {8, 9, 10, 11}, B = {d, d, e, k }

(ii) A = {5, 8, 11, 14}, B = {5, 5, 8, 11, 14, 11, 11, 14}, C = {0, 0, b, k}

C = {0, 0, b, x }

এখানে A = B কিন্তু A ≡ C.

(জ) সূচক সেট (Power Set) ঃ যে সেটের পদগুলি একটি প্রদত্ত সেট A-এর উপসেট তাকে প্রদত্ত সেটের সূচক সেট বলে এবং P (A) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $P(A) = \{x : x \supseteq A\}$। উদাহরণস্বরূপ, যদি A = {1, 2, 3} হয় তবে, P(A) = {ϕ, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}। সাধারণভাবে, কোনও সেটের পদসংখ্যা n হলে উহার সূচক সেটের পদসংখ্যা 2^n.

(i) সার্বিক সেট (Universal Set) ঃ সেট তত্ত্বের আলোচনায় কোনও বিশেষ সংজ্ঞাধীন আলোচ্য সেটগুলিকে একটি নির্দিষ্ট কোনও সেটের উপসেট হিসাবে ধরা হয়। এই নির্দিষ্ট সেটটিকে আলোচ্য সেটগুলির সাপেক্ষে সার্বিক সেট বলে এবং ইহা U বা S অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, (i) A = {0, 1, 2, 3}, B = {1, 3, 5, 7, 9, 11}, C = {0, 1, 2, 3,.....}, D = {0, −1, −2, −3, ...}, সেটগুলির সাপেক্ষে সার্বিক সেট হল অখণ্ড সংখ্যাগুলির সেট N, (ii) একটি পূর্ণ তাসের সেট ইস্কাবনের বা রুইতনের সেটের সার্বিক সেট।

৯২.২.২ ভেন চিত্র

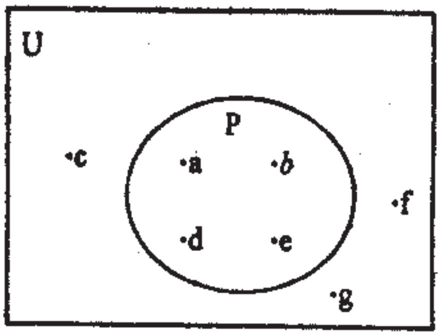

চিত্র ৮৫.১ P ও U সেটের ভেন চিত্র

যে চিত্রের সাহায্যে সেট প্রক্রিয়াগুলি উপস্থাপিত করা হয়, তাকে ভেন চিত্র (Venn Diagram) বলে। বিভিন্ন সেটের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের মাধ্যমে সহজবোধ্য হয়। চিত্রের মাধ্যমে সেট ও সেট প্রক্রিয়ার উপস্থাপনা প্রথমে করেন অয়লার (Euler) এবং ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জন ভেন এর প্রচুর উন্নতি সাধন করেন। সীমাবদ্ধ সামতলিক ক্ষেত্র দ্বারা যে কোনও সেট ভেন চিত্রে প্রকাশ করা হয়। সাধারণত একটি আয়তক্ষেত্রের বিন্দুগুলি দ্বারা সার্বিক সেট U-এর পদগুলি সূচিত করা হয় এবং সার্বিক সেটের উপসেটগুলির পদগুলি ঐ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে একট বদ্ধ বক্ররেখা বা বৃত্ত দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে কর, P = {a, b, d, e} এবং P সেটের সার্বিক সেট U = { a, b, c, d, e, f, g }

৯২.৩ সেটের কয়েকটি ধর্ম ঃ

(i) **শূন্য সেট যে কোনও সেটের উপসেট।**

প্রমাণ ঃ মনে কর, A একটি প্রদত্ত সেট। প্রমাণ করতে হবে যে, $\phi \subseteq A$।

যদি সম্ভব হয়, মনে কর, $\phi \not\subseteq A$ যেহেতু ϕ, A সেটের উপসেট নয় তাই, ϕ-তে কমপক্ষে একটি পদ আছে যা A-এর পদ নয়। আবার সংজ্ঞানুযায়ী, ϕ সেটে কোনও পদ নেই। তাই $\phi \not\subseteq A$ এই কল্পনা সত্য হতে পারে না। সুতরাং, $\phi \subseteq A$।

(ii) **শূন্য সেট অদ্বিতীয়।**

প্রমাণ ঃ মনে কর, ϕ_1 ও ϕ_2 হল দুটি শূন্য সেট। যেহেতু শূন্য সেট যে কোনও সেটের উপসেট, তাই $\phi_1 \subset \phi_1$ আবার একইভাবে $\phi_2 \subset \phi_1$। সুতরাং, $\phi_1 = \phi_2$

দ্রষ্টব্য ঃ (ক) { 0 } একটি শূন্য সেট নয় ; ইহা একটি একপদী সেট যার পদটি হল 0।

(খ) $\{\phi\}$ একটি একপদী সেট যার পদটি হল শূন্য সেট ϕ।

(গ) $\phi \neq \{\phi\}$ কিন্তু $\phi \in \{\phi\}$; $6 \neq \{6\}$ কিন্তু $6 \phi \{6\}$।

(iii) **প্রত্যেক সেট উহার নিজের উপসেট।**

প্রমাণ ঃ প্রদত্ত সেট A-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে, $A \subseteq A$।

যদি সম্ভব হয়, মনে কর, $A \not\subseteq A$। সুতরাং, A সেটে কমপক্ষে একটি পদ আছে যা A সেটের পদ নয়—যা অসম্ভব। অতএব, $A \subseteq A$।

(iv) **যদি $\subseteq B$ এবং $B \subseteq C$ হয়, তবে $A \subseteq C$ হবে।**

প্রমাণ ঃ যেহেতু $A \subseteq B$, তাই $x \in A \Rightarrow x \in B$ ......(1)

আবার, $B \subset C$, তাই $x \in B \Rightarrow x \in C$ .... (2)

(1) ও (2) থেকে পাই, $x \in A \Rightarrow x \in C$ অর্থাৎ, $A \subseteq C$.

(v) **$A \subseteq B$ এবং $B \subseteq A$ হলে $A = B$ হবে এবং বিপরীতক্রমেও ইহা সত্য।**

প্রমাণ ঃ $\therefore A \subseteq B \therefore x \in A \Rightarrow x \in B$ .....(1)

অর্থাৎ A সেটের প্রত্যেকটি পদ B সেটেরও পদ।

আবার, $B \subseteq A \therefore y \in B \Rightarrow y \in A$ ..... (2)

অর্থাৎ B সেটের প্রত্যেকটি পদ A সেটেরও পদ।

সমান সেটের সংজ্ঞানুযায়ী (1) ও (2) থেকে পাই, $A = B$.

বিপরীতক্রমে, $A = B$ হলে,

$x \in A \Rightarrow x \in B$ অর্থাৎ, $A \subseteq B$

এবং $y \in B \Rightarrow y \in A$ অর্থাৎ, $B \subseteq A$.

৯২.৪ সেট প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট সংজ্ঞাধীনে দুই বা ততোধিক সেটের সংযুক্তিকরণ দ্বারা নতুন সেট গঠন পদ্ধতিকে সেট প্রক্রিয়া (Operations on Sets) বলা হয়। নিম্নে বিভিন্ন সেট প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হল :

(i) দুটি সেটের মিলন (Union of Two Sets) : যদি A ও B দুটি প্রদত্ত সেট হয় এবং একটি সেট এমনভাবে গঠন করা হয় যে তার পদগুলি হয় A অথবা B অথবা A ও B উভয় সেটেরই পদ, তাহলে গঠিত সেটটিকে A ও B-এর মিলিত সেট বলা হয় এবং একে $A \cup B$ আকারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, $A \cup B = \{x \mid x \in A$ বা $x \in B\}$।

উদাহরণস্বরূপ, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ হলে

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ হবে।

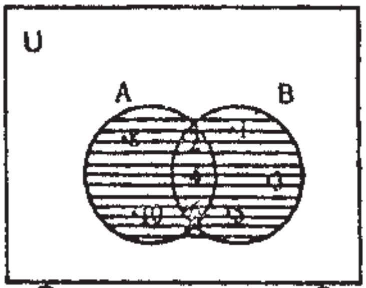

চিত্র ৮৫.২ $A \cup B$-এর ভেন চিত্র

(ii) দুটি সেটের ছেদ (Intersection of Two Sets) : যদি A ও B দুটি প্রদত্ত সেট হয় এবং একটি সেট এমনভাবে গঠন করা হয় যে তার পদগুলি A ও B -এর সাধারণ পদগুলি, তাহলে গঠিত সেটটিকে A ও B-এর ছেদ বলা হয় এবং একে $A \cap B$ আকারে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, $A \cap B = \{x \mid x \in A$ এবং $x \in B\}$। উদাহরণস্বরূপ, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ হলে $A \cap B = \{2, 4, 6\}$ হবে।

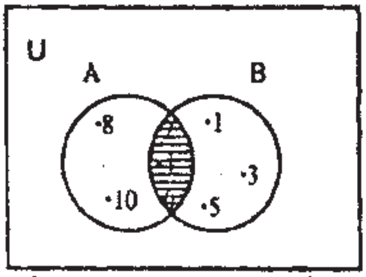

চিত্র ৮৫.৩ $A \cap B$-এর ভেন চিত্র

(iii) বিচ্ছিন্ন সেট (Disjoint Sets) : দুটি প্রদত্ত সেট A ও B-এর কোনও সাধারণ পদ না থাকলে সেট দুটিকে বিচ্ছিন্ন সেট বলে।

উদাহরণস্বরূপ, $A = \{x : 0 \le x \le 3\}$ এবং $B = \{x : -2 < x \le -1\}$ সেট দুটির মধ্যে কোনও সাধারণ পদ নেই। অর্থাৎ এখানে $A \cap B = \phi$.

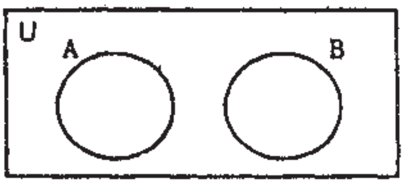

চিত্র ৮৫.৪ A ও B দুটি বিচ্ছিন্ন সেট

(iv) পূরক সেট (Complement of a Set) : যদি একটি সেট A-এর সার্বিক সেট U হয় এবং একটি সেট এমনভাবে গঠন করা হয় যে উহার পদগুলি U-এর পদ কিন্তু A-এর পদ নয়, তবে ঐ গঠিত সেটটিকে A সেটের পূরক সেট বলা হয় এবং ইহাকে A^C বা $\overline{A}$ বা A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, $A^C = \{x : x \in U$ এবং $x \notin A\}$। উদাহরণস্বরূপ, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ এবং $A = \{1, 3, 5, 7\}$ হলে, $A^C = \{2, 4, 6, 8\}$ হবে।

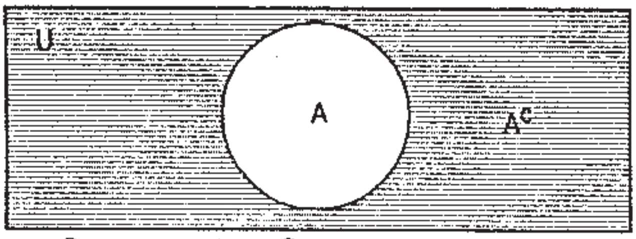

চিত্র ৮৫.৫ A^C রেখাঙ্কিত অঞ্চল দ্বারা দেখান হয়েছে

দ্রষ্টব্য : (a) $A \cup A^C = U$, (b) $A \cap A^C = \phi$, (c) $A^C = U - A$, (d) $\phi^C = U$, (e) $U^C = \phi$, (f) $(A^C)^C = A$.

(v) দুটি সেটের অন্তর (Difference of Two Sets) : যদি A ও B দুটি প্রদত্ত সেট হয় এবং একটি সেট এমনভাবে গঠন করা হয় যে এর পদগুলি A সেটের পদ কিন্তু B সেটের পদ নয়, তবে ঐ গঠিত সেটটিকে A ও B-এর অন্তর সেট বলা হয় এবং ইহাকে $A \sim B$ (বা, $A - B$) আকারে সূচিত করা হয়। অর্থাৎ, $A \sim B = \{x : x \in A$ এবং $x \notin B\}$।

উদাহরণস্বরূপ, $A = \{a, b, c, d, f, h\}$ এবং $B = \{c, d, e, g, h, k\}$ হলে, $A \sim B = \{a, b, f\}$।

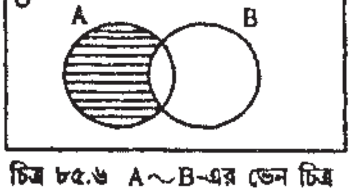

চিত্র ৮৫.৬ A∼B-এর ভেন চিত্র

দ্রষ্টব্য : (a) $B \sim A$ দ্বারা এরূপ সেট সূচিত করে যার পদগুলি B সেটের পদ কিন্তু A সেটের পদ নয়। অর্থাৎ, $B \sim A = \{x : x \in B$ এবং $x \notin A\}$।

(b) $A \sim B \subseteq A$ এবং $B - A \subseteq B$।

(c) $A \sim B$, $A \cap B$ এবং $B \sim A$ পরস্পর বিচ্ছেদ সেট।

(d) $A \sim B = A \sim (A \cap B) = (A \cup B) \sim B$

(e) $A \sim B = A \cap B^C$ এবং $B \sim A = B \cap A^C$

৯২.৫ সেটের বীজগাণিতিক সূত্রাবলী

যোগ ($\cup$), ছেদ ($\cap$) এবং পূরক (C) প্রক্রিয়া সাপেক্ষে সেটের যে সকল বীজগাণিতীয় সম্পর্ক সিদ্ধ করে তাদের সেটের বীজগাণিতিক সূত্রাবলী বলে। নীচে সূত্রগুলি দেওয়া হল ঃ

(i) **ইডেমপোটেন্ট সূত্র (Idempotent law) :**

A যে কোনও একটি সেট হলে,

(a) $A \cup A = A$, (b) $A \cap A = A$

(ii) **বিনিময় সূত্র (Commutative law) :**

A ও B যে কোনও দুটি সেট হলে,

(a) $A \cup B = B \cup A$, (b) $A \cap B = B \cap A$

(iii) **সংযোগ সূত্র (Associative law) :**

A, B ও C যে কোনও তিনটি সেট হলে,

(a) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, (b) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

(iv) **বিভাজনী সূত্র (Distributive law) :**

A, B ও C যে কোনও তিনটি সেট হলে,

(a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(v) **অভেদ সূত্র (Identity law) :**

সার্বিক সেট $\cup$ শূন্যসেট ϕ এবং A যে কোনও সেট হলে,

(a) $A \cup U = U$, (b) $A \cap U = A$, (c) $A \cup \phi = A$, (d) $A \cap \phi = \phi$

(vi) **পূরক সূত্র (Complement law) :**

সার্বিক সেট U, শূন্য সেট ϕ এবং যে কোনও একটি সেট A হলে,

(a) $A\cup A^C = U$, (b) $A\cap A^C = \phi$, (c) $(A^C)^C = A$, (d) $U^C = \phi$, (e) $\phi^C = U$.

(vii) **ডি-মর্গানের সূত্র (De-Morgan's law) :**

A ও B যে কোন দুটি সেট হলে,

(a) $(A\cup B)^C = A^C\cap B^C$, (b) $(A\cap B)^C = A^C\cup B^C$.

ভেন চিত্রের সাহায্যে বা সাধারণ যুক্তির সাহায্যে উপরোক্ত সূত্রগুলি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

উদাহরণ ১. A ও B যে কোনও দুটি সেটের জন্য প্রমাণ কর যে,

(i) $A\cap(B \sim A) = A\cup B$

(ii) $A\cap(B \sim A) = \phi$

(iiii) $A \sim (B \sim A) = A$

(iv) $A \sim (A \sim B) = A\cap B$

সামধান :

(i) বামপক্ষ $= A\cup(B\sim A)$

$= A \cup(B\cap A')$ $\quad (\therefore B \sim A = B\cap A')$

$= (A\cup B)\cap(A\cup A')$, বিচ্ছেদ সূত্রানুসারে

$= (A\cup B)\cap U$, পূরক সূত্রানুসারে

$= A\cup B$, অভেদ সূত্রানুসারে

= ডানপক্ষ

(ii) বামপক্ষ $= A\cap(B \sim A)$

$= A\cap(B\cap A')$

$= A\cap(A'\cap B)$, বিনিময় সূত্রানুসারে

$= (A\cap A')\cap B$, সংযোগ সূত্রানুসারে

$= \phi \cap B$, পূরক সূত্রানুসারে

$= \phi$, অভেদ সূত্রানুসারে

(iii) বামপক্ষ $= A \sim (B \sim A)$

$= A \sim (B \cap A')$, $(\because B \sim A = B \cap A')$

$= A \cap (B \cap A')'$, $(\because A \sim C = A \cap C')$

$= A \cap (B' \cup A)$, ডি-মর্গানের সূত্র ও পূরক সূত্রানুসারে

$= A \cap (A \cup B')$, বিনিময় সূত্রানুসারে

$= (A \cup \phi) \cap (A \cup B')$, অভেদ সূত্রানুসারে

$= A \cup (\phi \cap B')$, বিভাজন সূত্রানুসারে

$= A \cup \phi$, অভেদ সূত্রানুসারে

$= A$, অভেদ সূত্রানুসারে

= ডানপক্ষ

(iv) বামপক্ষ $= A \sim (A \sim B)$

$= A \sim (A \cap B')$, $(\because A \sim B = A \cap B')$

$= A \cap (A \cap B')'$, $(\because A \sim C = A \cap C')$

$= A \cap (A' \cup B)$, ডি-মর্গানের সূত্র ও পূরক সূত্রানুযায়ী

$= (A \cap A') \cup (A \cap B)$, বিভাজন সূত্রানুযায়ী

$\phi \cup (A \cap B)$, পূরক সূত্রানুযায়ী

$= A \cap B$, অভেদ সূত্রানুযায়ী

= ডানপক্ষ

উদাহরণ ২. A, B ও C যে কোনও তিনটি সেটের জন্য দেখাও যে,

$A \cap (B \sim C) = (A \cap B) \sim (A \cap C)$

সমাধান ঃ ডানপক্ষ $= (A \cap B) \sim (A \cap C)$

$= (A \cap B) \cap (A \cap C)'$ $(\because A \sim B = A \cap B')$

$= (A \cap B) \cap (A' \cup C')$; ডি-মর্গানের সূত্রানুযায়ী

$= [(A \cap B) \cap A'] \cup [(A \cap B) \cap C']$, বিচ্ছেদ সূত্রানুযায়ী

এখন $(A \cap B) \cap A' = A' \cap (A \cap B)$, বিনিময় সূত্রানুযায়ী

$= (A' \cap A) \cap B$, সংযোগ সূত্রানুযায়ী

$= \phi \cap B$, পূরক সূত্রানুযায়ী

$= \phi$ অভেদ সূত্রানুযায়ী

$\therefore$ ডানপক্ষ $= (A\cap B) \sim (A\cap C)$

$= \phi\cup [(A\cap B)\cap C']$

$= (A\cap B)\cap C'$, অভেদ সূত্রানুযায়ী

$= A\cap(B\cap C')$, সংযোগ সূত্রানুযায়ী

$= A \cap (B \sim C)$

= বামপক্ষ

উদাহরণ ৩. তিনটি সেট A, B ও C এমন যে $A\cup B = A\cup C$ এবং $A\cap B = A\cap C$ হলে প্রমাণ কর যে $B = C$.

সমাধান : $B = B\cap B\cup A$

$= B\cap(B\cup A)$

$= B\cap (B\cup C)$ [$\therefore A \cup B = A\cup C$ প্রদত্ত]

$= (B\cap A)\cup(B\cap C)$ বিচ্ছেদ সূত্রানুযায়ী

$= (A\cap B)\cup(B\cap C)$

$= (A\cap C)\cup(B\cap C)$ [$\therefore A\cap B = A\cap C$ প্রদত্ত]

$= (C\cap A) \cup(C\cap B)$

$= C\cap(A\cup B)$ বিচ্ছেদ সূত্রানুযায়ী

$= C\cap(A\cup C)$ [$\therefore A\cup B = A\cup C$, প্রদত্ত]

$= (C\cap C\cup A$

$= C$ [$\therefore B = B\cap B\cup A$]

দ্রষ্টব্য : $B = B\cap B\cup A$- এর প্রমাণ :

ডানপক্ষ $= B\cap B\cup A$

$= (B\cup\phi) \cap(B\cup A)$ [$\therefore \dot{B} = B\cup\phi$]

$= B\cup(\phi\cap A)$, বিভাজন সূত্রানুযায়ী

$= B\cup\phi$ [$\therefore \phi\cap A = \phi$]

$= B$ অভেদ সূত্রানুযায়ী

৯২.৬ অনুশীলনী

সেট তত্ত্ব

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) সেটের উপস্থাপনা কী কী উপায়ে করা হয়?

(২) মনে কর, $A = \{1, 2, 3\}$ এবং $B = \{3, 1, 5\}$।

$A \cap B$ এবং $A \cup B$ নির্ণয় কর।

(৩) $A = \{a, b, c\}$ হলে উহার উপসেটের সংখ্যা কত?

(৪) $A = \{a, b, c, d\}$ এবং $B = \{c, b, e, f\}$ হলে $A \sim B$ এবং $B \sim A$ নির্ণয় কর।

(৫) নিম্নোক্ত সেটগুলি সসীম/অসীম নির্দেশ কর ঃ

(ক) $A = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$

(খ) $P = \{a, b, c, d\}$

(গ) $B = \{x : x^2 - 5x + 6 = 0\}$

(ঘ) Q = {x/ আকাশে তারার সংখ্যা }

(৬) মনে কর, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ এবং A = {x / x একটি যুগ্ম সংখ্যা }। A^C নির্ণয় কর। $A \cup A^C$ এবং $A \cap A^C$ কত?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১. (i) সেট $A = \{x : x < x\}$ কি শূন্য সেট?

(ii) সেট $B = \{x : x + 4 = 4\}$ কি শূন্য সেট?

(iii) সেট C = {x : x একটি ধনাত্মক সংখ্যা যা শূন্যের চেয়ে ছোট} কি শূন্য সেট?

২. উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও ঃ

(i) সেট, (ii) সসীম ও অসীম সেট, (iii) শূন্য সেট, (iv) একপদী সেট, (v) সমান সেট, (vi) সমতুল সেট, (vii) উপসেট ও যথার্থ উপসেট, (viii) সার্বিক সেট, (ix) সেটের যোগ, (x) সেটের ছাদ, (xi) বিচ্ছেদ সেট, (xii) পূরক সেট, (xiii) দুটি সেটের অন্তর, (xiv) সূচক সেট।

৩. যুক্তিসহ নিম্নলিখিত বক্তব্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই কর ঃ

(i) $\{1\} \in \{1, 2, 3\}$, (ii) $1 \in \{1, 2, 3\}$, (iii) $\{1\} \subset \{1, 2, 3\}$, (iv) $1 \subset \{1, 2, 3\}$, (v) $\{1, 2\} \in \{1, 2, 4\}$, (vi) $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$, (vii) $\{1, 2, 3\} = \{2, 4, 5\}$, (viii) $\{1,2,3\} = \{3,2,4,1,2,1\}$, (ix) $\{4,5,6\} \in \{4,5,6\}$, (x) $\{1,2,3\} \subset \{3,1,2\}$ (xi) $\phi \in \{1,2,3\}$, (xii) $4 \notin \{1\{2,3\}\}$, (xiii) $\{5,6\} \in \{1, \{1,3\}, \{5,6\}\}$.

৪. ভেন চিত্র কী? সেট তত্ত্বে ইহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫. প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক সেট উহার নিজের উপসেট।

৬. দেখাও যে, শূন্য সেট সকল সেটের উপসেট।

৭. সেটের বীজগাণিতিক সূত্রগুলি বিবৃত কর।

৮. (i) মনে কর, $U = \{x|x < 20, x \in N\}$

$A = \{x|x$ একটি মৌলিক সংখ্যা 23-এর থেকে ছোট $\}$

$B = \{x|x, 3$ দ্বারা বিভাজ্য একটি সংখ্যা, $x \leq 15\}$

$C = \{x|x, 18$-এর চেয়ে ছোট অযুগ্ম সংখ্যা $\}$।

সেট $[A \cap B] \cup [A \cap C]$ নির্ণয় কর।

(ii) যদি সার্বিক সেট $U = \{x : x \in N, 1 \leq x \leq 12\}$ এবং $A = \{1, 9, 10\}, B = 3, 4, 6, 11, 12\}$ এবং $C = \{2, 5, 6\}$ সেটগুলি U-এর উপসেট, তবে নিম্নলিখিত সেটগুলি নির্ণয় কর ঃ

(a) $[A \cap B] \cap [A \cup C]$, (b) $A \cup (B \cap C)$, (c) $(A \cup B \cup C)'$

৯. যদি সার্বিক সেট $U = \{1, 2, 3,4,5\}$ এবং $A = \{3,4,5\}$ ও $B = \{1, 4, 5\}$, U-এর উপসেট হয়, দেখাও যে $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

১০. যদি $A \cup B = U$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $A' \subset B$।

১১. প্রমাণ কর যে, $A \sim B = A \sim (A \cap B)$

৯২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. Das, N. G. : Set Theory, M. Das & Co., Calcutta.

২. দে, সৌরেন্দ্রনাথ (1984) : ব্যবসায় পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা

৩. Nag, N. K. (1993) : Business Mathematics and Statistics, Kalyani Publishers, Calcutta.

৪. Singh, S. and Zameeruddin, Q (1994) : Modern Algebra, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.

৫. Kim, K. H. and Rough, F. W. (1983) : Applied Abstract Algebra, Ellis Horwood Ltd., England.

একক ৯৩ ❑ প্রাথমিক সম্ভাবনা তত্ত্ব

গঠন

৯৩.০ উদ্দেশ্য

৯৩.১ প্রস্তাবনা

৯৩.২ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

৯৩.৩ সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞা

৯৩.৩.১ সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

৯৩.৩.২ সম্ভাবনার সেট তত্ত্বীয় আলোচনা

৯৩.৪ সম্ভাবনার পরিসংখ্যানভিত্তিক সংজ্ঞা

৯৩.৫ সম্ভাবনার স্বীকার্যভিত্তিক সংজ্ঞা

৯৩.৫.১ সম্ভাবনার উপপাদ্য

৯৩.৫.২ যৌগিক সম্ভাবনার উপপাদ্য

৯৩.৬ স্বতন্ত্র ঘটনা

৯৩.৭ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল

৯৩.৮ বেইসের উপপাদ্য

৯৩.৯ অনুশীলনী

৯৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৯৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি বুঝতে পারবেন

- প্রাথমিক সম্ভাবনা তত্ত্বের সংজ্ঞা ও পুরাতনী সংজ্ঞা ও তার সীমাবদ্ধতা কী কী
- সম্ভাবনার সেট তত্ত্বীয়, পরিসংখ্যানভিত্তিক ও স্বীকার্যভিত্তিক সংজ্ঞাগুলি কী
- সম্ভাবনার ও যৌগিক সম্ভাবনার উপপাদ্য এবং
- বেইজের উপপাদ্য

৯৩.১ প্রস্তাবনা

অনিশ্চয়তা মানুষের জীবনে নিত্যসঙ্গী। আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী, শেয়ার বাজারের দর কিংবা পণ্যের গুণমান

ইত্যাদি নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। দৈনন্দিন কথাবার্তায় 'আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, 'রজতের পরীক্ষায় পাশ করার সম্ভাবনা নেই' ইত্যাদি বাক্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। কোনও ঘটনা সম্পর্কে ধারণায় অনিশ্চয়তা থাকলে সম্ভাবনার মাধ্যমে সেই অনিশ্চয়তার মাত্রা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। ফলে কেবলমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রে সম্ভাবনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়, যে সকল ক্ষেত্রে কোনও না কোনও উপায়ে অনিশ্চয়তা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রাশিবিজ্ঞানে এই সম্ভাবনা শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তা প্রচলিত ধারণার থেকে অনেক সুনির্দিষ্ট। প্রচলিত ধারণায় যিনি উক্তিটি করছেন, তার ঐ উক্তির প্রতি বিশ্বাসের মাত্রাকে বোঝায়। এই সম্ভাবনাকে ব্যক্তিনির্ভর (Subjective) সম্ভাবনা বলা যায়। অন্য দিকে, রাশিবিজ্ঞানে সাধারণত যে 'সম্ভাবনা' নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বস্তুনির্ভর (Objective) সম্ভাবনা বলা যায়। এখানে সম্ভাবনায় এমন কোনও পরীক্ষার (Experiment) ফল (Outcome) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় যে পরীক্ষাকে মোটামুটি একই অবস্থার মধ্যে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করা যায়। এই দু ধরনের সম্ভাবনাকে যথাক্রমে সম্ভাবনা$_1$ ও সম্ভাবনা$_2$ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। গাণিতিক সম্ভাবনার বা সম্ভাবনা$_2$-এর ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে বিবেচনা করা হয় এবং এই পরীক্ষার মোট সংঘটনের সংখ্যার মধ্যে ঈপ্সিত বিশেষ ফলটি কী অনুপাতে পাওয়া যায় তার সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

মনে কর (i) পক্ষপাতহীন (unbiased) একটি মুদ্রাকে যথেচ্ছভাবে উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল ; 'হেড' পড়বার সম্ভাবনা কত ? (ii) একটি বাক্সে সবুজ, লাল, সাদা ও হলুদ রঙের একটি করে বল আছে ; বাক্স থেকে একটি বল তোলা হলে তা সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত ? (iii) এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত এক প্যাকেট তাস থেকে একটি তাস টানা হল ; তাসটি ইস্কাবন হওয়ার সম্ভাবনা কত ? অভিজ্ঞতার (intuition or experience) ভিত্তিতে বলা যায় (i)-এর উত্তর 50% ও (ii)-এর উত্তর 25% কিন্তু (iii)-এর উত্তর 25%। (i), (ii) ও (iii) -এর প্রশ্নগুলির উত্তরের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার মাত্রা প্রকাশ করা হয়। কোনও ঘটনা ঘটার (অথবা না ঘটার) সম্ভাবনার সঠিক মাত্রা নির্ধারণের জন্য সাধারণ সম্ভাবনাকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। ঘটনা ঘটার নিশ্চয়তার (Certainty) ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পরিমাপ 1 এবং এটা ঘটনার পূর্ণ অসম্ভবতার (Impossibility) ক্ষেত্রে সম্ভাবনার পরিমাপ শূন্য ধরা হয়। সুতরাং, অন্য কোনও ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার পরিমাপ শূন্য ও 1 এর মধ্যবর্তী ধনাত্মক প্রকৃত ভগ্নাংশ (Proper fraction) হবে। এই অধ্যায়ে এই সম্ভাবনা তত্ত্বের আলোচনা করা হবে।

৯৩.২ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ

(i) সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা বা সম্ভাব্য পরীক্ষা বা সম-সম্ভব পরীক্ষা (Random Experiment) :

পরীক্ষা (Experiment) শব্দটি সম্ভাবনাতত্ত্বে, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার চেয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কোনও কাজ তা মুদ্রা নিক্ষেপন হোক বা গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য দ্রব্যের পরিমাপ হোক বা বাজারে একটি নতুন দ্রব্য ছাড়া হোক, সব কিছুকেই সম্ভাবনাতত্ত্বে একটি পরীক্ষা হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই জাতীয় পরীক্ষাগুলির নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে ঃ

(১) প্রত্যেকটি পরীক্ষার দুই বা ততোধিক ফল (out come) থাকে।

(২) পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলগুলি সম্বন্ধে আগে থেকে ধারণা থাকে।

(৩) একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোন্ ঘটনা ঘটবে বা কোন্ ফল পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

এই ধরনের পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণকে সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা বা সম্ভাব্য পরীক্ষা বা সম সম্ভব পরীক্ষা (Random Experiment) বলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে 'হেড' বা 'টেল' দুটি ফল পাওয়া যাবে যা পূর্ব নির্ধারিত, কিন্তু কোনও একটি নিক্ষেপণে কোন্ ফল পাওয়া যাবে তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। একইভাবে, যদি একটি দ্রব্যের পরিমাপ নেওয়া হয় তবে তা নিম্ন মাপের বা অধিক মাপের বা সঠিক মাপের হবে যার ধারণা আগে থেকে আছে, কিন্তু মাপ নেওয়ার পর ঠিক কোন্‌টি হবে তা আগে থেকে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। একটি নতুন দ্রব্য বাজারে ছাড়লে সফল বা অসফল অভিযানের কোন্‌টি হবে তা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। লক্ষ্য করা যায় যে, সমসম্ভব পরীক্ষাটি মোটামুটি একই অবস্থায় বারবার করা সম্ভব।

(ii) **ঘটনা (Event) :** সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার সাথে যুক্ত যে কোনও একটি ফলকে একটি ঘটনা (even) বলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি মুদ্রা নিক্ষেপণের ফল হেড বা টেল দুই-ই হতে পারে। এক্ষেত্রে 'হেড', 'টেল' এবং 'হেড বা টেল' প্রত্যেকটি মুদ্রা নিক্ষেপণরূপ সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার ঘটনা। অনুরূপে, একটি ছক্কাকে যদি মেঝেতে গড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে এক, দুই, ..., ছয়, যুগ্ম সংখ্যাগুলি, তিন-এর গুণিতক ফলগুলির প্রত্যেকটিকে এক একটি ঘটনা বলা যাবে। ঘটনা দু প্রকার হয়—সরল (Elementary) ও যৌগিক (Compound)। যে সব ঘটনাকে আরও ছোট ঘটনায় বিশ্লেষণ করা যায় না তাদের সরল ঘটনা (Elementary Event) বলে। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপনে হেড, টেল, ছক্কা নিক্ষেপণে এক, দুই, ..., ছয়-এর প্রত্যেকটি এক একটি সরল ঘটনা। যে সব ঘটনাকে কয়েকটি সরল ঘটনায় বিশ্লেষণ করা যায় তাদের যৌগিক ঘটনা (Compound Event) বলে। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণে 'হেড বা টেল', ছক্কা নিক্ষেপণে ফল যুগ্মসংখ্যা হবে যদি 2,4 অথবা 6 পাওয়া যায় ; একইভাবে, ফল তিন-এর গুণিতক হবে যদি পরীক্ষার ফল 3 অথবা 6 হয়। 'এই ঘটনাগুলিকে যৌগিক ঘটনা বলে।

(iii) **পরস্পর ব্যতিরেকী বা পরস্পর বর্জনকারী ঘটনা** (Mutually Exclusive Events) : দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি এমন হয় যে তাদের কোনও দুটি ঘটনা কখনও একসঙ্গে ঘটা সম্ভব নয়, তাহলে ঘটনাগুলিকে পরস্পর ব্যতিরেকী বা পরস্পর বর্জনকারী ঘটনা বলা হয়। সরল ঘটনাগুলি সবসময় পরস্পর ব্যতিরেকী। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণে ফল 'হেড' ও 'টেল' পরস্পর ব্যতিরেকী, যেহেতু হেড পড়লে টেল পড়া ঐ পরীক্ষাতে কখনওই সম্ভব নয়। ছক্কা নিক্ষেপণের সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষাতে 'যুগ্ম ফল' ও 'অযুগ্ম ফল' পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা। আবার 'যুগ্মফল' ও 'তিনের গুণিতক' ঘটনা দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী নয়, যেহেতু পরীক্ষা ফল 'ছয়' হলে ঘটনা দুটি একসঙ্গে ঘটবে কারণ ছয় যুগ্ম ও তিনের গুণিতক।

(iv) **সম্পূর্ণ ঘটনাসমূহ (Exhaustive Events) :** সম্ভাবনাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই বা ততোধিক ঘটনা যদি এমন হয় যে, পরীক্ষার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘটনাগুলির মধ্যে কমপক্ষে একটি অবশ্যই ঘটবে, তবে ঐ ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণ বলা হয়। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় হেড ও টেল ঘটনা দুটি সম্পূর্ণ। ছক্কা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় 1,2,3,4,5,6 পড়ার প্রত্যেকটি ঘটনার যে কোনও একটি ঘটবেই, তাই এগুলি সম্পূর্ণ। আবার ঐ একই পরীক্ষায় 'যুগ্ম অঙ্ক' ও 'তিনের গুণিতক' ঘটনা দুটি সম্পূর্ণ নয় কারণ 5 পড়লে এই দুই ঘটনার কোনওটির মধ্যে থাকবে না।

(v) **সমসম্ভব ঘটনা (Equally Likely Events) :** দুই বা ততোধিক ঘটনাকে সমসম্ভব বলা হয়, যদি সকল প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি হিসাবের মধ্যে নেওয়ার পর এগুলির মধ্যে কোনওটিরই ঘটবার ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে বেশি প্রত্যাশা করা যায় না। অন্যভাবে বললে, প্রদত্ত অবস্থায় সমস্ত ঘটনাগুলিরই ঘটনার সমান সম্ভাবনা আছে। উদাহরণস্বরূপ, পক্ষপাতহীন মুদ্রা নিক্ষেপের সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষতে 'হেড পড়ার' ও 'টেল পড়ার' ঘটনাদুটি সম সম্ভব ঘটনা। ছক্কা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে 'এক', 'দুই', ..., 'ছয়' ঘটনা ছয়টি সম সম্ভব ঘটনা, আবার 'যুগ্ম সংখ্যা' ও 'অযুগ্ম সংখ্যা' ঘটনা দুটি সম সম্ভব, কিন্তু 'যুগ্ম সংখ্যা' ও 'তিনের গুণিতক' ঘনা দুটি সমসম্ভব নয়।

(vi) **নিশ্চিত ঘটনা ও অসম্ভব ঘটনা (Sure Event and Impossible Event) :** যে কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি এমন কোনও ঘটনা পাওয়া যায় যা পর্যবেক্ষণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ঘটবে, তবে ঐ রূপ ঘটনাকে নিশ্চিত ঘটনা (Sure event) বলে। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় 'হেড বা টেল', ছক্কা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় 'যুগ্ম বা অযুগ্ম' ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত ঘটবে, তাই এগুলি নিশ্চিত ঘটনা।

যে কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি এমন কোনও ঘটনা কল্পনা করা হয় যা পর্যবেক্ষণের কোনও ক্ষেত্রে আদৌ ঘটতে পারে না, তবে ঐ রূপ কল্পিত ঘটনাকে অসম্ভব ঘটনা (Impossible event) বলে। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় 'হেড এবং টেল', ছক্কা নিক্ষেপণ পরীক্ষায় 'আট' সংখ্যা পাওয়ার ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে না, তাই এগুলি অসম্ভব ঘটনা (Impossible event)।

(vii) **পূরক ঘটনা (Complementary Event) :** একটি নির্দিষ্ট ঘটনার নেতিবাচক ঘটনাকে নির্দিষ্ট ঘটনার পূরক ঘটনা বলে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বিকল্প ঘটনাই ঐ ঘটনার পূরক ঘটনা। যেমন, মুদ্রা নিক্ষেপণে 'হেড' ঘটনার পূরক ঘটনা হল 'হেড না পাওয়া' অর্থাৎ 'টেল' ঘটনা। ছক্কা নিক্ষেপণে 'যুগ্ম ফল' ঘটনার পূরক ঘটনা হল 'যুগ্ম ফল না পাওয়া' অর্থাৎ 'অযুগ্ম ফল' ঘটনা।

৯৩.৩ সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞা (Classical Definition of Probability)

সম্ভাবনার প্রাচীন ধারণা সব সম্ভব ঘটনার ওপর নির্ভর করে। কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষায় যদি মোট n-সংখ্যক (সসীম) পরস্পর ব্যতিরেকী সম্পূর্ণ এবং সম সম্ভব সরল ঘটনা থাকে এবং m-টি সরল ঘটনা কোনও একটি ঘটনা A-এর অনুকূলে (favourable) হয়, তবে সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞা, P(A)-কে নিম্নলিখিত উপায়ে লেখা হয় ঃ

$$P(A) = \frac{m}{n} \text{.........}(1)$$

এখানে অনুকূল সরল ঘটনা বলতে বোঝানো হয়েছে যে, এই সরল ঘটনাগুলির যে কোনও একটি ঘটলে ঘটনাটি ঘটবে। আবার ঘটনাটি ঘটলেও এই উপায়গুলির যে কোনও একটি ঘটবে। (1)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাকে সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞা (Classical Definition of Probability) বলা হয়। একে অনেক সময় প্রাথমিক (a-priori) সংজ্ঞা হিসাবেও বলা হয়।

সংজ্ঞা অনুযায়ী, $P(A)=\frac{m}{n}$ সবসময় শূন্য (0) থেকে 1-এর মধ্যে থাকে, যেহেতু $0\le m\le n$। যদি $m=n$ হয় অর্থাৎ ঘটনাটি নিশ্চিত ঘটনা হয়, তবে $P(A)=1$ এবং যদি $m=0$ হয় অর্থাৎ ঘটনাটি অসম্ভব ঘটনা হয়, তবে $P(A)=0$। সুতরাং, $0\le P(A)\le 1$। যেমন, 'আগামীকাল সূর্য উঠবে না' ঘটনাটির সম্ভাবনা 0 এবং 'মানুষ মরণশীল' ঘটাটির সম্ভবনা 1

দ্রষ্টব্য : (i) A ঘটনার অনুকূলে সরল ঘটনার সংখ্যা যদি m হয়, তবে A ঘটনার পূরক ঘটনার অনুকূলে (n–m)-টি সরল ঘটনা থাকবে। তা A ঘটনার পূরক ঘটনা $\overline{A}$ হলে, সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞানুযায়ী,

$$P(\overline{A})=\frac{n-m}{n}=1-\frac{m}{n}=1-P(A)$$

বা, $P(A)+P(\overline{A})=1$

অর্থাৎ, A ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা = 1 – A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা।

(ii) A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা $\frac{m}{n}$ হলে, $m:(n-m)$ অনুপাতকে A ঘটনার অনুকূলে সুযোগ (Odds in favour of the event A) এবং $(n-m):m$ অনুপাতকে A ঘটনার প্রতিকূলে সুযোগ (Odds against the event A) বলা হয়।

$$\text{A ঘটনার অনুকূলে সুযোগ}=\frac{m}{n-m}=\frac{\frac{m}{n}}{1-\frac{m}{n}}=\frac{P(A)}{P(\overline{A})}$$

$$\text{আবার, A ঘটনার প্রতিকূলে সুযোগ}=\frac{n-m}{m}=\frac{1-\frac{m}{n}}{\frac{m}{n}}=\frac{P(\overline{A})}{P(A)}$$

৯৩.৩.১ সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Classical Definition of Probability) :

(i) সম্ভাবনার পুরাতনী সংজ্ঞা মূলত পরস্পর ব্যতিরেকী, সম্পূর্ণ ও সম সম্ভব সরল ঘটনার ওপর নির্ভর করে গঠিত। পরীক্ষাটিকে এইভাবে ভাগ না করা গেলে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

(ii) সংজ্ঞাটি সম সম্ভব সরল ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম সম্ভব এবং সম সম্ভাবনাময় শব্দ দুটি সমার্থক। অর্থাৎ সম্ভাবনার সংজ্ঞা দেওয়ার আগেই ঘটনাগুলি সম সম্ভাবনাময় ধরে নিচ্ছি। এই অর্থে সংজ্ঞাটিকে পুনরাবৃত্তীয় (circular) ধরা হয়। এরূপ পুনরাবৃত্তীয় সংজ্ঞা যুক্তিবিদ্যায় (logic) গ্রহণযোগ্য নয়।

(iii) যদি মোট সম্ভাব্য সরল ঘটনা অসীম হয় অথবা যদি সকল সম্ভাব্য সরল ঘটনা গণনাযোগ্য না হয়, তবে এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

৯৩.৩.২ সম্ভাবনার সেট তত্ত্বীয় আলোচনা (Set Theoretic Approach of Probability) :

এই আলোচনা বোঝার জন্য ও প্রয়োগের জন্য সেট তত্ত্বের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা প্রয়োজন।

(i) **নমুনা দেশ বা ঘটনা দেশ (Sample Space or Event Space) :** কোনও একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা E -র সকল সম্ভাব্য ফলের গুচ্ছ বা সেট-কে পরীক্ষাটির নমুনা দেশ বা ঘটনা দেশ বলে এবং একে S দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। পরীক্ষার প্রত্যেকটি ফলকে একটি পদ (Element) বা নমুনা বিন্দু (Sample point) বলে। অন্য কথায় বলা যায়, পরীক্ষা E-এর ফলগুলির সার্বিক সেট (Universal set)-কে নমুনা দেশ বলা হয়। নমুনা দেশ সসীম ও অসীম হতে পারে যদি এতে যথাক্রমে সসীম বা অসীম সংখ্যক নমুনা বিন্দু থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, (ক) একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা নিক্ষেপণের সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষাতে 'হেড' ও 'টেল' দুটি ফল থাকে। তাই এই পরীক্ষা সংক্রান্ত নমুনা দেশটি দুটি নমুনা বিন্দু সম্বলিত এবং একে প্রকাশ করা হয় :

$S = \{H, T\}$, যেখানে H, 'হেড' ও T 'টেল'-কে নির্দেশ করে।

(খ) দুটি বা তিনটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা নিক্ষেপনের সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নমুনা দেশগুলি হল যথাক্রমে :

$S_1 = \{HH, HT, TH, TT\}$

$S_2 = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$,

(গ) একটি ছক্কা নিক্ষেপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছয়টি নমুনা বিন্দু থাকে এবং নমুনা দেশটি হল :

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(ঘ) দুটি ছক্কা নিক্ষেপণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 36টি নমুনা বিন্দু থাকে এবং নমুনা দেশটি হল :

$$S = \{ \begin{array}{llllll} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6), \\ (2,1), & (2,2) & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6), \\ (3,1), & (3,2), & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6), \\ (4,1), & (4,2), & (4,3), & (4,4), & (4,5), & (4,6), \\ (5,1), & (5,2), & (5,3) & (5,4), & (5,5) & (5,6), \\ (6,1), & (6,2), & (6,3), & (6,4), & (6,5), & (6,6) \} \end{array}$$

(ঙ) একটি মুদ্রাকে 10 বার উৎক্ষেপণ করে 'হেড' পড়ার সংখ্যা নির্ণয়ের পরীক্ষাতে নমুনা দেশকে প্রকাশ করা যায় :

$S = \{0, 1, 2, ..., 10\}$

(চ) একটি মুদ্রা উৎক্ষেপণ পরীক্ষা যদি এমন হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত না 'হেড' পড়ে তা চালিয়ে যাওয়া হবে এবং প্রথম 'হেড' পড়া পর্যন্ত উৎক্ষেপণের সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নমুনা দেশ হল, $S = \{1, 2, 3, \ldots\ldots\}$

যদি নমুনা দেশ S-এর গণনা যোগ্য সসীম বা অসীম সংখ্যক নমুনা বিন্দু থাকে তবে তাকে বিচ্ছিন্ন বা অসন্তত নমুনা দেশ (Discrete Sample Space) বলা হয়। পক্ষান্তরে, গণনা-অযোগ্য অসীম নমুনা দেশকে অবিচ্ছিন্ন বা সন্তত নমুনা দেশ (Continuous Sample Space) বলা হয়।

(ii) **ঘটনা (Event) :** কোনও একটি পরীক্ষার ফলগুলির একটি সেটকে ঘটনা বলে। তাই, কোনও পরীক্ষার নমুনা দেশের একটি উপসেট-ই হল একটি ঘটনা।

নমুনা দেশের নমুনা বিন্দুগুলির প্রত্যেক সেটই হল একটি ঘটনা। যেহেতু শূন্য সেট ϕ এবং সার্বিক সেট S হল S-এর উপসেট, তাই ϕ ও S হল ঘটনা। শূন্যসেট ϕ দ্বারা **অসম্ভব ঘটনা** (Impossible event) এবং সার্বিক সেট S দ্বারা **নিশ্চিত ঘটনা** (Certain or Sure event) প্রকাশ করা হয়।

একটি ঘটনা A-তে যদি কেবলমাত্র নমুনা দেশের একটি নমুনা বিন্দু থাকে, তবে ইহাকে **একপদী ঘটনা** বা **সরল ঘটনা** (Elementary event) বলে। সুতরাং, একপদী ঘটনা হল পরীক্ষার একটি ফল বা নমুনা দেশের অন্যান্য একপদী ঘটনার যোগ হিসাবে প্রকাশ করা যাবে না।

একটি ঘটনা যা কয়েকটি একপদী ঘটনার যৌগ হিসাবে প্রকাশ করা যায় তাকে **যৌগিক ঘটনা** (Compound event) বলে। উদাহরণস্বরূপ, দুটি পক্ষপাতহীন মুদ্রা উৎক্ষেপণের পরীক্ষায় চারটি একপদী ঘটনা যথা HH, HT, TH ও TT, কিন্তু 'একটি হেড ও একটি টেল' ঘটনাটি যৌগিক ঘটনা যা দুটি একপদী ঘটনা HT ও TH-এর সমন্বয়ে গঠিত।

(iii) **পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা (Mutually Exclusive Events) :** কয়েকটি ঘটনা পরস্পর ব্যতিরেকী বা পরস্পর বর্জনকারী ঘটনা যদি তাদের মধ্যে কোনও সাধারণ বিন্দু না থাকে। অর্থাৎ, $A_1, A_2, \ldots\ldots A_n$ পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা হলে $A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n = \phi$। দুটি বর্জনকারী ঘটনা A ও B -এর জন্য $A \cap B = \phi$.

(iv) **পূরক ঘটনা (Complementary Event) :** একটি ঘটনা $\overline{A}$ -কে A ঘটনার পূরক বলা হবে যদি $\overline{A}$ -এর প্রত্যেকটি পদ S-এর পদ হয় যা A-এর পদ নয়। অর্থাৎ, $\overline{A} = \{x : x \in S, x \notin A\}$।

যদি কোনও পরীক্ষার সমস্ত নমুনা বিন্দু বা একপদী ঘটনাগুলির সংখ্যাকে n(S) দ্বারা এবং ঘটনা A-তে নমুনা বিন্দু বা একপদী ঘটনার সংখ্যাকে n(A) দ্বারা প্রকাশ করা হয় তবে সেটতত্ত্বীয় পদ্ধতিতে সম্ভাবনার পরিমাপ হল ঃ

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

P(A)-এর ধর্ম ঃ

(i) $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S)}$ - এর মান 0 ও 1-এর মধ্যবর্তী যেহেতু $0 \le n(A) \le n(S)$।

(ii) $P(A) = 1$, যখন $n(A) = n(S)$, অর্থাৎ যখন A একটি নিশ্চিত ঘটনা।

(iii) $P(A) = 0$, যখন $n(A) = 0$, অর্থাৎ যখন A একটি অসম্ভব ঘটনা।

উদাহরণ ১. একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা উৎক্ষেপণ করলে দুটি সম্ভাব্য ফল হতে পারে, যথা—'হেড' ও 'টেল'। এই ফল দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী ও পরিপূর্ণ। যেহেতু মুদ্রাটি পক্ষপাতশূন্য, তাই ফলগুলি সম-আশংসিত। সুতরাং, এই দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী, পরিপূর্ণ ও সম সম্ভব ফলের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ফল 'হেড' ঘটনার পক্ষে। সম্ভাবনার পুরাতন সংজ্ঞার সাহায্যে 'হেড' ঘটনার সম্ভাবনা $= \frac{m}{n} = \frac{1}{2}$

উদাহরণ ২. দুটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা উৎক্ষেপণ করা হল। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর ঃ

(ক) দুটোতেই 'হেড' পড়বে।

(খ) একটি 'হেড' ও একটি 'টেল' পড়বে।

(গ) দুটিই 'টেল' পড়বে।

(ঘ) কমপক্ষে একটি 'হেড' পড়বে।

সমাধান ঃ পরীক্ষাতে সম্ভাব্য চারটি ফল আছে, যথা—HH, HT, TH, TT (প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুটি অক্ষর যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রার ফল নির্দেশ করছে)। এগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী, সম্পূর্ণ ও সম সম্ভব ফল। তাই $n = 4$ ঘটনাগুলির পক্ষের ফল নিম্নরূপ ঃ

ঘটনা	পক্ষের ঘটনা	পক্ষের ঘটনার সংখ্যা
(ক) দুটো 'হেড'	HH	1
(খ) একটি 'হেড' ও একটি 'টেল'	HT, TH	2
(গ) দুটো 'টেল'	TT	1
(ঘ) কমপক্ষে একটি 'হেড'	HH, HT, TH	3

সম্ভাবনায় পুরাতন সংজ্ঞার সাহায্যে,

(ক) দুটো-ই 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা $= \frac{1}{4}$

(খ) একটি 'হেড' ও একটি 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা $= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

(গ) দুটো-ই 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা $= \frac{1}{4}$

(ঘ) কমপক্ষে একটি 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা $= \frac{3}{4}$

উদাহরণ ৩. একটি ছক্কাকে গড়িয়ে দেওয়া হল এবং উহার উপরিভাগের নম্বরটিকে লক্ষ্য করা হল। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর ঃ

(ক) একটি যুগ্ম সংখ্যা হবে।

(খ) একটি অযুগ্ম সংখ্যা হবে।

(গ) 3-এর চেয়ে ছোট সংখ্যা হবে।

(ঘ) একটি 'ছয়' হবে।

সমাধান ঃ এই পরীক্ষায় 6টি সম্ভাব্য ফল হল 1,2,3,4,5,6। এগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী ও সম্পূর্ণ ফল। ছক্কাটি পক্ষপাতশূন্য হলে এই 6টি ফল সম সম্ভব, এখানে $n = 6$.

(ক) যুগ্ম সংখার পক্ষে 3টি (যথা—2,4,6) ফল।

(খ) অযুগ্ম সংখ্যার পক্ষে 3টি (যথা—1,3,5) ফল।

(গ) 3-এর চেয়ে ছোট সংখ্যার পক্ষে 2টি (যথা—1,2) ফল।

(ঘ) একটি 'ছয়'-এর পক্ষে 1টি (6) ফল।

সুতরাং,

(ক) একটি যুগ্ম সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(খ) একটি অযুগ্ম সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(গ) 3-এর চেয়ে ছোট সংখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

(ঘ) একটি 'ছক্কা' হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{1}{6}$

উদাহরণ ৪. একটি ব্যাগে 6টি সাদা ও 4টি কালো বল আছে। একটি বল তোলা হল। বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ ব্যাগটিতে মোট 10টি বল আছে। যেহেতু রঙ ছাড়া বলগুলি একই রকম মনে করা হলে, একটি বল তোলার ফল সম আশংসিত হবে। তাই এই 10টি পরস্পর ব্যতিরেকী, সম্পূর্ণ ও সম সম্ভব ফলের মধ্যে 6টি ফল সাদা বলের পক্ষে (যেহেতু ঐ বলটি 6টি সাদা বলের মধ্যে একটি)। সুতরাং, বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

উদাহরণ ৫. একটি পরিবারের 3টি শিশুর সকলের জন্মদিন ভিন্ন হবে তার সম্ভাবনা কত? (মনে কর, 1 বছর = 365দিন)।

সমাধান ঃ প্রথম শিশুটি বছরের 365 দিনের যে কোনও দিন জন্মাতে পারে, একইভাবে দ্বিতীয় শিশুটি বছরের 365 দিনের যে কোন দিন ও তৃতীয় শিশুটি বছরের 365 দিনের যে কোনও দিনও জন্মাতে পারে। তাহলে শিশুগুলির জন্মদিন মোট সম্ভাব্য উপায় 365×365×365। এই উপায়গুলির পরস্পর ব্যতিরেকী, সম্পূর্ণ ও সম-সম্ভব। জন্মদিনের ভিন্ন হওয়ার পক্ষে সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম শিশুটির জন্মদিন বছরের 365 দিনের যে কোনও একদিন। দ্বিতীয় শিশুটির জন্মদিন প্রথমটি থেকে ভিন্ন হবে যদি দ্বিতীয়টির জন্মদিন বাকি 364 দিনের যে কোনও একদিন হয়। তৃতীয় শিশুর জন্মদিন, প্রথম ও দ্বিতীয় শিশুর জন্মদিন থেকে ভিন্ন হবে যদি বাকি 363 দিনের যে কোনও একদিন হয়। সুতরাং, 'ভিন্ন জন্মদিন' ঘটনার অনুকূল সংখ্যা হল $365 \times 364 \times 363$

$\therefore$ শিশু 3টির জন্মদিন ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা = $\dfrac{365 \times 364 \times 363}{365 \times 365 \times 365} = 0 \cdot 992$

উদাহরণ ৬. 52টি তাসের একটি পূর্ণ প্যাকেট থেকে 2টি তাস তোলা হল। নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলি নির্ণয় কর ঃ

(ক) দুটি তাস-ই লাল রঙের,

(খ) একটি তাস হরতন ও অন্যটি রুইতন।

সমাধান ঃ দুটো তাস তোলার মোট সম্ভাব্য সংখ্যা = $52_{C_2} = \dfrac{52!}{2!\,50!} = 1326$ । এই ফলগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী, সম্পূর্ণ ও সমসম্ভব।

(ক) উভয় তাস-ই লাল হওয়ার পক্ষের সংখ্যা $= 26_{C_2} = 325$, কারণ প্যাকেটটিতে কেবলমাত্র 26টি লাল তাস থাকে।

$\therefore$ উভয় তাস লাল হওয়ার সম্ভাবনা = $\dfrac{325}{1306} = \dfrac{25}{102}$

(খ) যেহেতু ইস্কাবন, হরতন, রুইতন ও চিড়িতন প্রত্যেকটি 13টি করে থাকে তাই 'একটি হরতন ও অন্যটি রুইতন'-এর পক্ষের সংখ্যা $^{13}C_1 \times {}^{13}C_1 = 13 \times 13 = 1619$। সুতরাং, একটি হরতন ও অন্যটি রুইতন হওয়ার সম্ভাবনা = $\dfrac{169}{1326} = \dfrac{13}{102}$ ।

উদাহরণ ৭. 5টি ছক্কাকে একবার গড়িয়ে দিলে উপরিভাগে প্রাপ্ত নম্বরগুলির যোগফল 10 হবে তার সম্ভাবনা কত?

সমাধান ঃ যখন n-টি ছক্কা গড়নো হয়, তখন 6^n-টি সম্ভাব্য ফল থাকে, যাদের মধ্যে যতগুলির যোগফল r হবে তা হল x^r-এর সহগ নিম্নলিখিত প্রসারণ থাকে।

$$\left(x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6\right)^n=\frac{x^n\left(1-x^6\right)^n}{(1-x)^n}=x^n\left(1-x^6\right)^n(1-x)^{-n}$$

অর্থাৎ, $(1-x^6)^n(1-x)^{-n}$-এ x^{r-n}-এর সহগ।

এখানে $r=10$ এবং $n=5$ উপরিভাগের সংখ্যাগুলির যোগফল 10 হওয়ার পক্ষের সংখ্যা

$=(1-x^6)^5(1-x)^{-5}$-এ x^{10-5}-এর সহগ।

$=(1-5x^6+.....)(1+5x+.....+{}^9C_5x^5+.....)$-এ x^5-এর সহগ।

$$={}^9C_5=\frac{9\times8\times7\times6}{1\times2\times3\times4}=126$$

সুতরাং, নির্ণেয় সম্ভাবনা $=\dfrac{126}{6^5}=\dfrac{126}{7776}=\dfrac{7}{432}$

৯৩.৪ সম্ভাবনার পরিসংখ্যানভিত্তিক (বা আবেক্ষণভিত্তিক বা পরিসংখ্যানীয় সংজ্ঞা) ঃ

যদি একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রাকে উৎক্ষেপণ করলে পরীক্ষার ফল 'হেড' বা 'টেল' হবে তা সঠিক বলা যায় না যেহেতু পরীক্ষাটি সম্ভাবনাশ্রয়ী (random)। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যদি মুদ্রাটি 1000 বার প্রায় একই পরিস্থিতিতে উৎক্ষেপণ করা যায়, তাহলে 'হেড' প্রায় 500 বার পড়বে। অর্থাৎ, 'হেড' পড়ার সঙ্গে মোট পরীক্ষার সংখ্যার অনুপাত প্রায় $\frac{1}{2}$ হবে। যদি পরীক্ষা সংখ্যা বাড়ানো হয় (ধরা যাক, 100000 বার), তবে অধিকতর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে এই অনুপাত $\frac{1}{2}$ হবে।

মনে কর, একই শর্তসাপেক্ষে একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা E, n বার করা হয় এবং ঐ পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনা A যদি $n(A)$ বার ঘটে তবে $n(A)$-কে A ঘটনার পরিসংখ্যা এবং $\frac{n(A)}{n}$ অনুপাতকে A-ঘটনার আপেক্ষিক পরিসংখ্যা (relative frequency) বলে এবং একে $p(A)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, $P(A)=\dfrac{n(A)}{n}$.

n-এর মান যত বাড়তে থাকে ততই $p(A)$-এর মান একটি ধ্রুবক সংখ্যার কাছাকাছি হয়, অর্থাৎ n-এর মান সীমাহীনভাবে বাড়াতে থাকলে আপেক্ষিক অনুপাত $p(A)$-এর ক্রমশ সুস্থির (stable) হতে থাকে। একই শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষা সংখ্যার মান বাড়ার সাথে সাথে আপেক্ষিক অনুপাতের এই সুস্থিতার সম্পর্ককে পরিসংখ্যাভিত্তিক নিয়মানুবর্তিতা (Statistical regularity) বলে।

যদি একই শর্তসাপেক্ষে একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা (random experiment) n-বার পুনরাবৃত্তি (repeated trials) করা হয় এবং ঐ পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনা A যদি n(A)-বার ঘটে, তবে $p(A) = \frac{n(A)}{n}$ হল আপেক্ষিক পরিসংখ্যা। যদি n-এর মান সীমাহীনভাবে বাড়তে বাড়তে অসীমের দিকে ধাবিত হলে f(A)-এর একটি নির্দিষ্ট সসীম সীমা পাওয়া যায় এবং ঐ সীমান্ত মানকে A-ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বলা হয় ও ইহা P(A) প্রতীক আকারে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং,

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} p(A) = \lim_{n\to\infty} \frac{n(A)}{n}$$

সম্ভাবনার এই সংজ্ঞাকে পরিসংখ্যা ভিত্তিক বা আবেক্ষণ ভিত্তিক বা পরিসংখ্যানীয় সংজ্ঞা (Frequentist or Empirical or Statistical Definition) বলে।

এই সংজ্ঞায় একই শর্তসাপেক্ষে সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা অসীম সংখ্যক পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এই একটিই শর্ত রয়েছে। নমুনা দেশ অসীম কিংবা অসমঞ্জস হলেও সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করা যায়। সম্ভাবনার পুরাতন সংজ্ঞার তুলনায় এই সংজ্ঞা ভালো হলেও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। এই সংজ্ঞার আনুপাতিক পরিসংখ্যা আবেক্ষণভিত্তিক (empirical) ও সীমার ধারণা বিশ্লেষণাত্মক (analytical)। ঐরূপ সীমার অস্তিত্ব (existence) সম্পর্কেও গণিতবিদরা নানারকম আপত্তি তুলেছেন।

৯৩.৫ সম্ভাবনার স্বীকার্যভিত্তিক সংজ্ঞা ঃ

আধুনিক সম্ভাবনাতত্ত্বের আলোচনায় রুশ গণিতজ্ঞ কল্‌মগরভের দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। গণিতের অন্য অনেক শাখার মতোই সম্ভাবনাতত্ত্বকে কল্‌মগরভ কয়েকটি স্বীকার্য (axiom) এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একে সম্ভাবনার স্বীকার্য ভিত্তিক সংজ্ঞা (Axiomatic Definition of Probability) বলে।

কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা E-এর নমুনা দেশ S হলে এবং এই পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও ঘটনা A অর্থাৎ $A \subseteq S$ হলে, A-ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি বাস্তব সংখ্যা P(A)-কে A ঘটনার সম্ভাবনা বলা হবে যদি নিচের স্বীকার্যগুলি সিদ্ধ হয় ঃ

প্রথম স্বীকার্য ঃ যে কোনও ঘটনা A-এর ক্ষেত্রে $P(A) \geq 0$,

দ্বিতীয় স্বীকার্য ঃ নিশ্চিত ঘটনা S-এর জন্য $P(S) = 1$,

তৃতীয় স্বীকার্য ঃ যদি A_1, A_2, A_3.......সসীম বা অসীম সংখ্যক পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা হলে,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \ldots\ldots$$

৯৩.৫.১ সম্ভাবনার উপপাদ্য ঃ

সম্ভাবনার সমষ্টি-বিষয়ক উপপাদ্য (বা সম্ভাবনার যোগসূত্র [Theorem of Total Probability (or Additive Law of Probability)] :

যদি $A_1, A_2 \ldots A_m$ পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা হয় তবে,

$P(A_1 \cup A_2 \cup, ... \cup A_m) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_m)$

অর্থাৎ, $P\left(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right) = \sum_{i=1}^{m} P(A_i)$

প্রমাণ ঃ মনে কর, সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার সম-আশংসিত ফলগুলির সসীম নমুনা দেশ S। ঐ নমুনা দেশে ধরা যাক n(S) নমুনা বিন্দু রয়েছে যার মধ্যে $n(A_1)$ নমুনা বিন্দু ঘটনা A_1 এবং $n(A_2)$ নমুনা বিন্দু ঘটনা A_2-এর পক্ষে। যেহেতু A_1 ও A_2 ঘটনা দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী তাই A_1 অথবা A_2-এর পক্ষে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা $n(A_1) + n(A_2)$। সুতরাং সম্ভাবনার সংজ্ঞানুযায়ী,

$$P(A_1 \cup A_2) = \frac{n(A_1) + n(A_2)}{n(S)}$$

$$= \frac{n(A_1)}{n(S)} + \frac{n(A_2)}{n(S)}$$

$$= P(A_1) + P(A_2) \text{ ....(1)}$$

পুনঃপুনঃ (1)-এর প্রয়োগ করলে পাওয়া যাবে,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_n) &= P(\{A_1 \cup A_2 \cup ...... \cup A_{m-1}\} \cup A_m) \\ &= P(A_1 \cup A_2 \cup, ... \cup A_{m-1}) + P(A_m) \\ &= P(A_1 \cup A_2 \cup ..... \cup A_{m-2}) + P(A_{m-1}) + P(A_m) \\ &= ...... \\ &= P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_m) \end{aligned}$$

যেখানে, $A_1, A_2, ... A_m$ ঘটনাগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ ১. যদি $A_1, A_2 .... A_m$ পরস্পর ব্যতিরেকী ও সম্পূর্ণ হয় তবে, $A_1 \cup A_2 \cup ...... \cup A_m = S$। তাহলে $P(A_1 \cup A_2 ..... \cup A_m) = P(S) = 1$.

অনুসিদ্ধান্ত ঃ ২. ঘটনা A ও পূরক ঘটনা A^C পরস্পর ব্যতিরেকী এবং $A \cup A^C = S$। তাই

$P(A \cup A^C) = P(S) = 1$

বা, $P(A) + P(A^C) = 1$

বা, $P(A^C) = 1 - P(A)$.

অনুসিদ্ধান্ত ঃ ৩. ডি-মর্গান-এর সূত্রানুযায়ী, $A^C \cup B^C = (A \cap B)^C$

$\therefore P(A^C \cup B^C) = P[(A \cap B)^C] = 1 - P(A \cap B)$.

উপপাদ্য ঃ যদি নমুনাদেশ S-এর যে কোনও দুটি ঘটনা A ও B হয় তবে,

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

ইহাকে সমষ্টি সূত্রের সাধারণ আকার বলা হয়।

প্রমাণ ঃ মনে কর, সম্ভাবনাশ্রয়ী সসীম নমুনা দেশ S-এ নমুনা বিন্দুর সংখ্যা n(S) এবং $n(A \cup B)$ হল $(A \cup B)$-তে মোট নমুনা বিন্দু। তাহলে সম্ভাবনার সংজ্ঞানুযায়ী,

$$P(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)}$$

এখন $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$

$$\therefore\ P(A \cup B) = \frac{n(A) + n(B) - n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$= \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

সাধারণভাবে, যদি নমুনা দেশ S-এ $A_1, A_2, \ldots\ldots A_n$-যে কোনও ঘটনা হয় তবে,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i \le j \le n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \le i \le j \le k \le n} P(A_i \cap A_j \cap A'_k) - \ldots + (-1)^{n-1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right)$$

অনুসিদ্ধান্ত ঃ ১. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\le P(A) + P(B)$ $[\because P(A \cap B) \ge 0]$

'=' প্রযোজ্য হয় যদি A ও B পরস্পর ব্যতিরেকী হয়।

সাধারণভাবে $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \le \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$। এই অসমতাকে বুলের অসমতা (Boole's inequality) বলে।

অনুসিদ্ধান্ত ঃ ২. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

অর্থাৎ, $P(A) + P(B) - P(A \cap B) \le 1$ $[\because P(A \cup B) \le 1]$

অর্থাৎ $P(A \cap B) \ge P(A) + P(B) - 1$

সাধারণভাবে ঘটনা $A_1, A_2, \ldots.., A_n$-এর জন্য

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) \ge \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - (n-1)$$

ইহাকে বন্‌ফেরনীর অসমতা (Bonferroni's inequality) বলা হয়।

৯৩.৫.২ যৌগিক সম্ভাবনার উপপাদ্য (Theory of Compound Probability) :

এই উপপাদ্য আলোচনার আগে শর্তাধীন সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। মনে কর, কোন সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা E-এর নমুনা দেশ S এবং E পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনা A ও B এমন যে $P(A) > 0$। এখন A ঘটনা ঘটেছে এই শর্তসাপেক্ষে B ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে B ঘটনার শর্তাধীন সম্ভাবনা (Conditional probability of B) বলা হয় এবং ইহাকে $P(B/A)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাহলে, $P(B/A)$ দ্বারা নমুনা দেশ S-এ B ঘটনার যতগুলি নমুনাবিন্দু A ঘটনার অন্তর্গত তার সঙ্গে A ঘটনার অন্তর্গত নমুনা বিন্দুগুলির সংখ্যার অনুপাত প্রকাশিত হয়। যেমন, কোনও ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উচ্চতা $5'4''$ থেকে $5'6''$-র মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ও ঐ ব্যক্তি পূর্বাঞ্চলের (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলা, বিহার বা উড়িষ্যার) অধিবাসী হলে তার উচ্চতা এই দুই সীমার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা একই নয়। কারণ, এই দুই সীমার মধ্যবর্তী উচ্চতা-বিশিষ্ট পূর্বভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের আনুপাতিক পরিসংখ্যা অনুরূপ উচ্চতাবিশিষ্ট সর্বভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের আনুপাতিক পরিসংখ্যা একই নাও হতে পারে।

উপপাদ্য ঃ সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা E-তে A ও B যে কোনও দুটি ঘটনা হলে, A ও B ঘটনাগুলি একসঙ্গে ঘটার সম্ভাবনা A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ও B ঘটনা ঘটার শর্তাধীন সম্ভাবনার গুণফলের সমান হবে। অর্থাৎ, $P(A \cap B) = P(A).\, P(B/A)$। ইহাকে **সম্ভাবনার যৌগিক উপপাদ্য** বলে।

প্রমাণ ঃ মনে কর, কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী সসীম নমুনা দেশ S-এর ফলগুলি সম-সম্ভব এবং n(S)-টি নমুনা বিন্দু নমুনা দেশে রয়েছে। মনে কর, S-এর অন্তর্গত একটি ঘটনা A-তে n(A)-টি নমুনা বিন্দু আছে। n(A)-টি নমুনা বিন্দুর মধ্যে $n(A \cap B)$-টি নমুনা বিন্দু রয়েছে যা একই সঙ্গে A ও B-তে রয়েছে। তাহলে, অনুপাত $\dfrac{n(A \cap B)}{n(A)}$ হল A-এর নমুনা বিন্দুর মধ্যে B-এর নমুনা বিন্দুর অনুপাত এবং A-এর সাপেক্ষে B-এর শর্তাধীন সম্ভাবনা। অর্থাৎ,

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} \cdot \frac{n(S)}{n(A)}$$

$$= \frac{n(A \cap B)}{n(S)} \bigg/ \frac{n(A)}{n(S)} = P(A \cap B) / P(A)\,।$$

সুতরাং, $P(A \cap B) = P(A).\, P(B/A)$.

দ্রষ্টব্য ঃ (ক) যৌগিক উপপাদ্যকে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা যায় ঃ

$P(A \cap B) = P(B).\, P(A/B)$; যেখানে $P(B) > 0$.

(খ) $P(A \cap B)\, P(A).\, P(B/A) = P(B).\, P(A/B)$; $P(A).\, P(B) > 0$ সম্পর্কটিকে সম্ভাবনার গুণন (Multiplication rule)-ও বলা হয়।

(গ) যে কোনও সংখ্যার ঘটনার ক্ষেত্রে উপপাদ্যটি প্রযোজ্য।

তিনটি ঘটনা A, B ও C-এর ক্ষেত্রে,

$P(A \cap B \cap C) = P(A).\ P(B/A).\ P(C/A \cap B)$

সাধারণভাবে, n সংখ্যক ঘটনা $A_1, A_2, \ldots\ldots\ldots\ldots A_n$-এর ক্ষেত্রে

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = P(A_1).P(A_2 / A_1).\ P(A_3 / A_1 \cap A_2)\ldots P(A_n / A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{n-1}).$$

উদাহরণ ৮. কোনও রাশিবিজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা 0.19, গবেষক হওয়ার সম্ভাবনা 0.34 এবং শিক্ষক-গবেষক হওয়ার সম্ভাবনা 0.13 তাহলে কোনও রাশিবিজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষক বা গবেষক হওয়ার সম্ভাবনা কত হবে ?

সমাধান ঃ মনে কর, A হল শিক্ষকের ও B হল গবেষকের সেট, তাহলে

$P(A) = 0.19, P(B) = 0.34$ এবং $P(A \cap B) = 0.13$

এখন $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= 0.19 + 0.34 - 0.13$

$= 0.40$

সুতরাং, রাশিবিজ্ঞানীর পক্ষে শিক্ষক বা গবেষক হওয়ার সম্ভাবনা 0.40.

উদাহরণ ৯. 1 থেকে 13 পর্যন্ত চিহ্নিত 13টি সম আকারের বল একটি পাত্রে আছে। একটি বলকে সম-সম্ভব উপায়ে নির্বাচন করা হলে, নির্বাচিত বলটির ক্রমিক সংখ্যা 3বা 4-এর গুণিতক হবে তার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ এখানে নমুনা দেশটিতে 13টি নমুনা বিন্দু আছে। যদি A ঘটনাটি এমন হয় যে নির্বাচিত বলটির ক্রমিক সংখ্যা 3-এর গুণিতক, তবে A-তে 4টি (3, 6, 9, 12) নমুনা বিন্দু থাকবে।

সুতরাং, $P(A) = \frac{4}{13}$

একইভাবে, যদি B ঘটনাটি এমন হয় যে নির্বাচিত বলটির ক্রমিক সংখ্যা 4-এর গুণিতক, তবে B-তে 3টি (4,8,12) নমুনা বিন্দু থাকবে।

সুতরাং, $P(B) = \frac{3}{13}$

কিন্তু $A \cap B$ ঘটনাতে কেবলমাত্র একটি নমুনা বিন্দু আছে তা হল 12, যেটি 3 ও 4-এর গুণিতক।

সুতরাং $P(A \cap B) = \frac{1}{13}$

$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$= \frac{4}{13} + \frac{3}{13} + \frac{1}{13}$$

$$= \frac{6}{13}$$

$\therefore$ নির্বাচিত বলটির ক্রমিক সংখ্যা 3 বা 4-এর গুণীতক হবে তার সম্ভাবনা $\frac{6}{13}$

৯৩.৬ স্বতন্ত্র ঘটনা (Independent Events) :

শর্তাধীন সম্ভাবনার ধারণাটি স্বাভাবিকভাবেই দুই বা ততোধিক ঘটনার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য (mutual independence)-এর ধারণার সাথে যুক্ত।

দুটি ঘটনাকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ঘটনা বলা হবে যদি একটি ঘটনার ঘটা বা না-ঘটা অন্য ঘটনাটির ঘটা বা না-ঘটাকে প্রভাবিত না করে। উদাহরণস্বরূপ, পর্যায়ক্রমে একটি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা উৎক্ষেপণের ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র। যদি একটি পক্ষপাত শূন্য মুদ্রা দু'বার উৎক্ষেপণ করা হয়, তবে প্রথম উৎক্ষেপণে 'হেড' পড়ার ঘটনা দ্বিতীয় উৎক্ষেপণে 'হেড' পড়ার ঘটনা স্বতন্ত্র, কারণ কোনও একটি উৎক্ষেপণে 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা প্রথম উৎক্ষেপণে 'হেড' পড়েছে কি না পড়েছে তার ওপর নির্ভর করে না।

যদি দুটি ঘটনা A ও B এমন হয় যে,

$P(A/B) = P(A)$

তখন ঘটনা B-এর ঘটা A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে পরিবর্তিত করে না এবং এক্ষেত্রে ঘটনা A-কে ঘটনা B-এর থেকে স্বতন্ত্র বলা হয়।

যদি ঘটনা A, ঘটনা B-এর থেকে স্বতন্ত্র হয়, তবে ঘটনা B ও ঘটনা A-এর থেকে স্বতন্ত্র হবে।

এখন A ও B স্বতন্ত্র হলে, $P(A \cap B) = P(A/B).\ P(B) = P(A).\ P(B)$

আবার, $P(A \cap B) = P(B/A).\ P(A) = P(A).\ P(B)$

$\therefore P(A \cap B) = P(A).\ P(B)$. যদি A ও B স্বতন্ত্র হয়।

বিপরীতক্রমে, $P(A \cap B) = P(A).\ P(B)$ হলে, $P(A/B) = P(A)$ এবং $P(B/A) = P(B)$ এবং তাহলে A ও B ঘটনা দুটি স্বতন্ত্র।

সুতরাং, A ও B দু'টি ঘটনাকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বলা হবে যদি $P(A \cap B) = P(A).\ P(B)$ হয়।

যদি A ও B ঘটনা দু'টির ক্ষেত্রে $P(A\cap B) = P(A). P(B)$ না হয়, তবে ঘটনা দু'টিকে পরস্পর অধীন বা নির্ভরশীল (Dependent) ঘটনা বলা হয়। এক্ষেত্রে $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ এবং $P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)}$ হবে।

সাধারণভাবে সসীম সংখ্যক ঘটনা $A_1, A_2 ...... A_n$ স্বতন্ত্র হবে যদি,

$P(A_1\cap A_2\cap ...\cap A_n) = P(A_1) . P(A_2)$ হয়।

n সংখ্যক ঘটনা $A_1, A_2, ..., A_n$কে প্রতি জোড়ায় স্বতন্ত্র (pairwise independent) বলা হয় যদি,

$P(A_1\cap A_2) = P(A_1). P(A_2), P(A_2\cap A_3) = P(A_2). P(A_3), ..., P(A_{n-1}\cap A_n) = P(A_{n-1}). P(A_n).$

অর্থাৎ, $P(A_i\cap A_j) = P(A_i), P(A_j) : i \neq j$ and $i, j = 1, 2, ..., n.$

n সংখ্যক ঘটনা $A_1, A_2, ..., A_n$, পরস্পর স্বতন্ত্র (mutuallyindependent) হলে উহারা প্রতি জোড়ায় স্বতন্ত্র (pairwise independent), কিন্তু প্রতি জোড়ায় স্বতন্ত্র হলে উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নাও হতে পারে।

৯৩.৭ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল (Some Important Results) :

(ক) A ও B দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা হলে,

(i) A^C ও B^C, (ii) A ও B^C, (iii) A^C ও B ঘটনাগুলিও স্বতন্ত্র।

প্রমাণ ঃ (i) আমরা জানি, $P(A^C) = 1 - P(A)$ .....(1)

এবং ডি-মর্গানের সূত্রানুযায়ী, $A^C\cap B^C = (A\cup B)^C$ .....(2)

$P(A^C\cap B^C) = P(A\cup B)^C$

$= 1 - P(A\cup B)$

$= 1 - [P(A) + P(B) - P(A\cap B)]$

$= 1 - [P(A) + P(B) - P(A). P(B)]$ [$\therefore$ A ও B ঘটনা দুটি স্বতন্ত্র]

$= [1 - P(A)]. [1 - P(B)]$

$= P(A^C. P(B^c)$

সুতরাং, A^C ও B^C ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র।

(ii) $(A\cap B)$ ও $(A\cap B^C)$ ঘটনা দু'টি পরস্পর ব্যতিরেকী।

$A= (A\cap B)\cup(A\cap B^C)$

বা, $P(A\cap B^C) = P(A) - P(A\cap B)$

$= P(A) - P(A). P(B)$ [যেহেতু A ও B ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র]

$= P(A) [1 - P(B)]$

$= P(A). P(B^C)$

সুতরাং, A ও B^C ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র।

(iii) $(B\cap A)$ এবং $(B\cap A^C)$ ঘটনা দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী।

$\therefore B = (B\cap A) \cup (B\cap A^C)$

$\therefore P(B) = P(B\cap A) + P(B\cap A^C)$

বা, $P(A^C\cap B) = P(B) - P(B\cap A)$

$= P(B) - P(B).\, P(A)$ [যেহেতু A ও B ঘটনা দুটি স্বতন্ত্র]

$= P(B)\, [\, 1 - P.\,(A)\,]$

$= P(B)\,.\, P.(A^C)$

$= P(A^C)\,.\, P(B)$

সুতরাং, A^C ও B ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র।

(খ) A ও B দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা হলে, $P(A\cup B) = 1 - P(A^C)\,.\, P(B^C)$

প্রমাণ ঃ A ও B দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা।

তাহলে A^C ও B^C দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা।

এখন $P(A\cup B) = 1 - P(A\cup B)^C$

$= 1 - P(A^C\cap B^C)$ [ডি-মর্গ্যানের সূত্রানুযায়ী]

$= 1 - P(A^C)\,.\, P(B^C)$ [$\therefore A^C$ ও B^C দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা]

(গ) দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা A ও B-এর ক্ষেত্রে $P(A) \neq 0$ এবং $P(B) \neq 0$ হলে, A ও B ঘটনা দু'টি পরস্পর ব্যতিরেকী হতে পারে না।

প্রমাণ ঃ A ও B ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র।

$\therefore P(A\cap B) = P(A)\,.\, P(B)$

বা, $P(A\cap B) \neq 0$ [$\therefore P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$]

অর্থাৎ $A\cap B \neq \phi$

অর্থাৎ A ও B ঘটনা দু'টি পরস্পর ব্যতিরেকী নয়।

উদাহরণ ১০. (ক) (i) $P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$ এবং $P(A\cap B) = \frac{1}{6}$ হলে $P(A\cup B), P(A/B), P(B/A), P(A\cap B^C), P(A^C\cap B^C)$ এবং $P(A^C\cup B^C)$-এর মান নির্ণয় কর।

(ii) এক্ষেত্রে A ও B ঘটনা দু'টি (ক) সম-আশংসিত, (খ) পরস্পর ব্যতিরেকী, (গ) পরিপূর্ণ এবং (ঘ) স্বতন্ত্র কি না বল।

সমাধান ঃ (i) $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$$

$$= 1$$

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} = \frac{1/6}{2/3} = \frac{1}{4}$$

যেহেতু $(A\cap B)$ ও $(A\cap B^C)$ ঘটনা দু'টির পরস্পর ব্যতিরেকী এবং $(A\cap B)\cup(A\cap B^C) = A$, তাই $P(A\cap B) + P(A\cap B^C) = P(A)$

বা, $P(A\cap B^C) = P(A) - P(A\cap B) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

এখন, $P(A^C\cap B^C) = P(A\cup B)^C$ [ডি-মর্গ্যানের সূত্রানুযায়ী]

$= 1 - P(A\cup B)$

$= 1 - 1$

$= 0$

$P(A^C \cup B^C) = P(A\cap B)^C$ [ডি-মর্গ্যানের সূত্রানুযায়ী]

$= 1 - P(A\cup B)$

$= 1 - \frac{1}{6}$

$= \frac{5}{6}$

(ii) (ক) যেহেতু $P(A) \neq P(B)$, তাই A ও B ঘটনা দু'টি সমসম্ভব নয়।

(খ) যেহেতু $P(A\cap B) \neq 0$, তাই A ও B ঘটনা দু'টি পরস্পর ব্যতিরেকী নয়।

(গ) $P(A\cup B) = 1$

$\therefore A\cup B = S$

সুতরাং, A ও B ঘটনা দু'টি সম্পূর্ণ (exhaustive)।

(ঘ) এখানে $P(A) . P(B) = \frac{2}{3} . \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ এবং $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$

$\therefore P(A \cap B) \neq P(A). P(B)$

সুতরাং, ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র নয়।

উদাহরণ ১১. দুটি ঘটনা A ও B-এর জন্য প্রমাণ কর যে,

$P(A \cap B) \leq P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

সমাধান ঃ সম্ভাবনার যৌগিক উপপাদ্য অনুযায়ী,

$P(A \cap B) = P(A) . P(B/A)$

আবার, $0 \leq P(B/A) \leq 1$ তাই $P(A \cap B) \leq (P(A)$ .....(i)

এখন, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= P(A) + P[(A \cap B) \cup (A^C \cap B)] - P(A \cap B)$ [$\therefore B = (A \cap B) \cup (A^C \cap B)$ এবং $A \cap B$ ও $A^C \cap B$ পরস্পর ব্যাতিরেকী]

$= P(A) + P(A \cap B) + P(A^C \cap B) - P(A \cap B)$

$= P(A) + P(A^C \cap B)$

যেহেতু $P(A^C \cap B)$ ঋণাত্মক হতে পারে না তাই, $P(A) \leq P(A \cup B)$ ...... (ii)

আবার, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$\leq P(A) + P(B)$ [$\therefore (A \cap B) \geq 0$] ......(iii)

(i), (ii) এবং (iii) থেকে পাই,

$P(A \cap B) \leq P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

উদাহরণ ১২. দুজন লোকের বয়স 30 বছর ও 36 বছর 30 বছর বয়স্ক লোকটি আরও 35 বছর বাঁচবে তার সম্ভাবনা 0.67 এবং 36 বছর বয়স্ক লোকটি আরও 35 বছর বাঁচবে তার সম্ভাবনা 0.60। কমপক্ষে একজন লোক এখন থেকে 35 বছর বাঁচবে তার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ মনে কর, A, 30 বছর বয়স্ক লোকটি ঐ সময় থেকে 35 বছরের মধ্যে মরবে এই ঘটনাকে নির্দেশ করে এবং B, 36 বছর বয়স্ক লোকটি ঐ সময় থেকে 35 বছরের মধ্যে মরবে এই ঘটনাকে নির্দেশ করে।

তাহলে $P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - 0.67 = 0.33$

এবং $P(B) = 1 - P(B^C) = - 0.60 = 0.40$

যেহেতু A ও B ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র তাই উভয়েই 35 বছরের মধ্যে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা,

$P(A \cap B) = P(A) . P(B) = 0.33 \times 0.44 = 0.132$

$\therefore$ কমপক্ষে একজন লোক আরও 35 বছর বাঁচবে তার সম্ভাবনা হল,

$1 - P(A \cap B) = 1 - 0.132 = 0.868$

উদাহরণ ১৩. একটি ব্যাগে 5টি লাল বল ও 4টি কালো বল আছে। ব্যাগ থেকে সমসম্ভব উপায়ে একটি বল তোলা হয় এবং উহা অপর একটি ব্যাগে রাখা হয় যার মধ্যে 3টি লাল ও 7টি কালো বল আছে। দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে এখন সমসম্ভব উপায়ে একটি বল তোলা হল। উত্তোলিত বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ মনে কর, উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রথম ব্যাগ থেকে তুলে দ্বিতীয় ব্যাগে রাখা বলটি লাল হওয়ার ঘটনা R_1 দ্বারা এবং কালো হওয়ার ঘটনা B_1 দ্বারা প্রকাশ করা হল।

এখন $P(R_1) = \frac{5}{9}$ এবং $P(B_1) = \frac{4}{9}$

আবার, মনে কর, দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে তোলা বলটি লাল হওয়ার ঘটনা R_2 দ্বারা প্রকাশ করা হল।

এখন R_2 ঘটনা ঘটবে যদি $(R_1 \cap R_2)$ পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা দু'টির যে কোনও একটি ঘটনা ঘটে অর্থাৎ,

$$R_2 = (R_1 \cap R_2) \cup (B_1 \cap R_2)$$

এখন, $P(R_2 / R_1) = \frac{4}{11}$ এবং $P(R_2 / B_1) = \frac{3}{11}$

$$\therefore P(R_2) = P(R_1 \cap R_2) + P(B_1 \cap R_2)$$
$$= P(R_1) \,.\, P(R_2/R_1) + P(B_1) \,.\, P(R_2 / B_1)$$
$$= \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{11} + \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{11}$$
$$= \frac{32}{99}$$

$\therefore$ উত্তোলিত বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{32}{99}$

উদাহরণ ১৪. দুটি বাক্স I ও II তে যথাক্রমে 4টি সাদা ও 3টি লাল ও 3টি নীল এবং 5টি সাদা, 4টি লাল ও 3টি নীল বল আছে। যদি সমসম্ভব উপায়ে একটি করে বল প্রত্যেকটি বাক্স থেকে তোলা হয়, তবে উত্তোলিত উভয় বলই একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ মনে কর, W_1 হল বাক্স I থেকে একটি সাদা বল তোলার ঘটনা।

W_2 হল বাক্স II থেকে একটি সাদা বল তোলার ঘটনা।

R_1 হল বাক্স I থেকে একটি লাল বল তোলার ঘটনা।

R_2 হল বাক্স II থেকে একটি লাল বল তোলার ঘটনা।

B_1 হল বাক্স I থেকে একটি নীল বল তোলার ঘটনা।

B_2 হল বাক্স II থেকে একটি নীল বল তোলার ঘটনা।

একই রঙের দুটি বল পেতে হলে হয় বল দু'টি সাদা অথবা দু'টি বলই লাল অথবা দু'টি বলই নীল হবে অর্থাৎ $W_1 \cap W_2$ বা $R_1 \cap R_2$ বা $B_1 \cap B_2$ ঘটনাগুলি হবে। এই ঘটনাগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী, পরিপূর্ণ ও সম-আশংসিত।

$\therefore P[(W_1 \cap W_2) \cup (R_1 \cap R_2) \cup (B_1 \cap B_2)] = P(W_1 \cap W_2) + P(R_1 \cap R_2) + P(B_1 \cap B_2)$.

আবার W_1 ও W_2 ঘটনা দু'টি স্বতন্ত্র। R_1, R_2 এবং B_1, B_2-এর ক্ষেত্রেও তাই, যেহেতু বাক্স I থেকে তোলা বল বাক্স II থেকে বল তোলার ঘটনাকে প্রভাবিত করে না।

তাই $P(W_1 \cup W_2) = P(W_1).\, P(W_2)$

$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1).\, P(R_2)$

এবং $P(B_1 \cap B_2) = P(B_1).\, P(B_2)$

এখন $P(W_1) = \frac{4}{10}$, $P(R_1) = \frac{3}{10}$, $P(B_1) = \frac{3}{10}$

এবং $P(W_2) = \frac{5}{12}$, $P(R_2) = \frac{4}{12}$, $P(B_2) = \frac{3}{12}$

$\therefore$ উভয় বলই একই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা $= P(W_1) . P(W_2) + P(R_1). P(R_2) + P(B_1) . P(B_2)$

$$= \frac{4}{10} \cdot \frac{5}{12} + \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{12} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{12}$$

$$= \frac{41}{120}$$

উদাহরণ ১৫. কোনও পরীক্ষার সম্ভাব্য চারটি ফল e_1, e_2, e_3 ও e_4 সম-আশংসিত। A, B ও C ঘটনাকে নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ করা হল ঃ

$A = \{e_1, e_4\}, B = \{e_2, e_4\}, C = \{e_3, e_4\}$

A, B, C ঘটনা তিনটির স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে কী বলা যাবে?

সমাধান ঃ পরীক্ষাটির নমুনা দেশে সম-আশংসিত সম্ভাব্য নমুনাবিন্দুর সংখ্যা = 4

আবার A, B ও C ঘটনা তিনটির প্রত্যেকটিতে সম-আশংসিত সম্ভাব্য নমুনাবিন্দুর সংখ্যা = 2.

$\therefore P(A) = P(B) = P(C) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

আবার, $A \cap B = B \cap C = C \cap A = \{e_4\}$

$\therefore P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A).\, P(B)$

$P(B \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(B).\, P(C)$

এবং $P(C \cap A) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} . \frac{1}{2} = P(C). P(A)$

সুতরাং, ঘটনা তিনটি প্রতি জোড়ায় স্বতন্ত্র (pairwise independent).

আবার, $A \cap B \cap C = \{ e_4 \}$

$\therefore P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$

এবং $P(A) . P(B) . P(C) = \frac{1}{2} . \frac{1}{2} . \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

$\therefore P(A \cap B \cap C) \neq P(A). P(B). P(C)$

সুতরাং, A, B, C ঘটনা তিনটি পরস্পর স্বতন্ত্র (mutually independent) নয়।

৯৩.৮ বেইসের উপপাদ্য (Bayes' Theorem) :

মনে কর, একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার নমুনা দেশ S-এ $A_1, A_2, ..., A_n$ হল পরস্পর ব্যতিরেকী ও সম্পূর্ণ ঘটনা এবং B ঐ নমুনা দেশে যে কোনও একটি ঘটনা এমন যে $P(B) \neq 0$। এছাড়া $P(A_1), P(A_2) ...., P(A_n)$ এবং শর্তাধীন সম্ভাবনা $P(B/A_1), P(B/A_2), ..., P(B/A_n)$ দেওয়া আছে। তাহলে,

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i).P(B / A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j) . P(B / A_j)} \quad i = 1, 2, ... n.$$

ইহাকে বেইসের উপপাদ্য (Bayes' Theorem) বলে।

প্রমাণ ঃ যেহেতু $A_1 ...... A_2 ....., A_n$ ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ, তাই

$A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = S$,

আবার B যে কোনও ঘটনা হওয়ায়,

$$B = S \cap B = (A_1 \cup A_2 \cup ...... \cup A_n) \cap B$$
$$= (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup .... \cup (A_n \cap B)$$

যেহেতু $A_1, A_2 ....., A_n$ ঘটনাগুলি পরস্পর ব্যতিরেকী, তাই

$A_1 \cap B, A_2 \cap B, ..., A_n \cap B$ ঘটনাগুলিও পরস্পর ব্যতিরেকী।

সুতরাং, $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + ... + P(A_n \cap B)$

$= P(A_1) . P(B/A_1) + P(A_2) . P(B/A_2) .... + P(A_n) . P(B/A_n)$

$= \sum_{j=1}^{n} P(A_j) . P(B / A_j)$

$$\therefore\ P(A_j / B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A_j).\,P(B / A_j)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)\,.\,P(B / A_j)}$$ [P(B)-এর মান বসিয়ে]

(প্রমাণিত)

উদাহরণ ১৬. দুটি পাত্রের মধ্যে প্রথমটিতে 2টি লাল ও 3টি সাদা এবং দ্বিতীয়টিতে 3টি লাল ও 5টি সাদা বল আছে। প্রথম পাত্র থেকে সমসম্ভব উপায়ে একটি বল তুলে দ্বিতীয় পাত্রে রাখা হয় ও তারপর দ্বিতীয় পাত্র থেকে একটি বল তোলা হল। যদি উত্তোলিত বলটি লাল হয়, তবে প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় পাত্রে স্থানান্তরিত বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ মনে কর, উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় পাত্রে স্থানান্তরিত বলটি যথাক্রমে সাদা ও লাল হওয়ার ঘটনা A_1 ও A_2 দ্বারা এবং তারপর দ্বিতীয় পাত্র থেকে উত্তোলিত বলটি লাল হওয়ার ঘটনা B দ্বারা সূচিত করা হল। তাহলে B ঘটনা ঘটবে যদি পরস্পর ব্যতিরেকী ও পরিপূর্ণ ঘটনা A_1 ও A_2-এর মধ্যে যে কোনও একটি ঘটে।

এখন প্রথম পাত্র থেকে স্থানান্তরিত বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা $= P(A_1) = \frac{3}{5}$ এবং প্রথম পাত্র থেকে স্থানান্তরিত বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা $= P(A_2) = \frac{2}{5}$ । আবার $P(B / A_1) = \frac{3}{3+5+1} = \frac{3}{9}$ এবং $P(B / A_2) = \frac{3+1}{3+5+1} = \frac{4}{9}$

এখন $B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$

$\therefore P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)$

$= P(A_1)\,.\,P(B/A_1) + P(A_2)\,.\,P(B/A_2)$

$= \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{9} + \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{17}{45}$

সুতরাং, বেইসের সূত্রানুযায়ী,

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1) . P(B / A_1)}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{3}{5} . \frac{3}{9}}{\frac{17}{45}}$$

$$= \frac{9}{17}$$

∴ দ্বিতীয় পাত্র থেকে উত্তোলিত বলটি লাল হলে, প্রথম পাত্র থেকে দ্বিতীয় পাত্রে স্থানান্তরিত বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{9}{17}$ ।

উদাহরণ ১৭. একটি বোল্ট তৈরির কারখানায়, মোট উৎপাদনের 25%, 35%, 40% যথাক্রমে তিনটি মেশিন M_1, M_2 ও M_3-তে হয়। তিনটি মেশিনের উৎপাদনের যথাক্রমে 5%, 4%, 2% ত্রুটিযুক্ত বোল্ট। কোনও একদিনের উৎপাদন থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটি বোল্ট নেওয়া হল এবং দেখা গেল এটি ত্রুটিযুক্ত। M_3 মেশিন দ্বারা উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?

সমাধান ঃ মনে কর, A ঘটনাটি নির্বাচিত বোল্টটি ত্রুটিযুক্ত হওয়া নির্দেশত করে। B_1, B_2, B_3 ঘটনাগুলি যথাক্রমে মেশিন M_1, M_2ও M_3-তে উৎপাদিত বোল্ট নির্দেশ করে। তাহলে, $P(B_3/A)$ নির্ণয় করতে হবে। এখন $P(B_1) = 25\% = 0.25$, $P(B_2) = 35\% = 0.35$, $P(B_3) = 40\% = 0.40$ / $P(A/B_1)$ = মেশিন M_1-এ উৎপাদিত বোল্টের ত্রুটিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা = 0.05.

একইভাবে $P(A/B_2) = 0.04$, $P(A/B_3) = 0.02$

ঘটনা	P(Bi)	P(A/Bi)	P(Bi).P(A/Bi)
B_1	0.25	0.05	0.0125
B_2	0.35	0.04	0.0140
B_3	0.40	0.02	0.0080
মোট	1.00	—	0.0345

বেইসের উপপাদ্য অনুযায়ী,

$$P(B_3 / A) = \frac{P(B_3).P(A / B_3)}{\sum P(Bi).P(A / Bi)} = \frac{0.0080}{0.0345} = \frac{16}{69}$$

সুতরাং, M_3 মেশিন দ্বারা উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা = $\frac{16}{69}$ ।

৯৩.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

(১) নমুনা দেশ অসীম হলে সম্ভাবনার কোন্ তত্ত্ব প্রযোজ্য ?

(২) মনে কর, $A = \{x : x$ একটি ধনাত্মক সংখ্যা ও $x < 0\}$ তাহলে (A) কত ?

(৩) A ও B ঘটনা দু'টি স্বাধীন হলে A^C ও B^C ঘটনা দু'টি কি স্বাধীন ?

(৪) একটি যুগ্ম ধনাত্মক সংখ্যা 2 দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

(৫) দুটি ঘটনা A ও B -এর জন্য নিম্নোক্ত সম্পর্ক সঠিক কিনা বল :

(ক) $P(A/B) \le P(A)/P(B)$

(খ) $P(A \cup B) \le P(A) + P(B)$

(৬) মনে কর দু'টি সন্তানের পরিবারে চারটি মৌলিক ঘটনা সমসম্ভব। পরিবারের একটি সন্তান বালক হলে অপরটিরও বালক হওয়ার সম্ভাবনা কত ?

(৭) দু'টি ঘটনা পরস্পর ব্যতিরেকী হলে, উহাদের পূরক ঘটনাগুলি কি পরস্পর ব্যতীরেকী হবে ?

(৮) দু'টি ঘটনা পরস্পর ব্যতিরেকী হলে উহারা কি স্বাধীন হবে ?

রচনাত্মক প্রশ্ন :

(১) উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও :

(i) পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা, (ii) পরিপূর্ণ ঘটনা, (iii) স্বতন্ত্র ঘটনা, (iv) পূরক ঘটনা।

(২) সম্ভাবনার পুরাতন সংজ্ঞা লেখ এবং ইহার সমীবদ্ধতাগুলি আলোচনা কর।

(৩) সম্ভাবনার সমষ্টি বিষয়ক উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

(৪) সম্ভাবনা তত্ত্বে যৌগিক ঘটনা বলতে কী বোঝায় ? সম্ভাবনার যৌগিক উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

(৫) B ঘটনা ঘটেছে এই শর্তে A ঘটনার শর্তাধীন সম্ভাবনার সংজ্ঞা দাও।

(৬) স্বতন্ত্র ও পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনাগুলির সংজ্ঞা দাও। দু'টি ঘটনা একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও পরস্পর ব্যতিরেকী হতে পারে কি ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(৭) R_1 ও R_2 দু'টি প্রদত্ত ঘটনা ; নিম্নের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটনা দু'টি সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত করা যায় :

(i) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, (ii) $P(A \cap B) = 0$, (iii) $P(A) \le P(B)$, (iv) $P(A \cup B) = 1$

(v) $P(A \cap B) \ne 0$, (vi) $P(A/B) = P(A)$, (vii) $P(A \cap B) = P(A). P(B)$.

(৮) সম্ভাবনার আবেক্ষণভিত্তিক (বা পরিসংখ্যানীয়) সংজ্ঞা বিবৃত কর।

(৯) সম্ভাবনার স্বীকার্যগুলি আলোচনা কর।

(১০) যদি A ও B দুটি পরস্পর ব্যতিরেকী ঘটনা এবং $P(B) \neq 1$ হয়, তবে দেখাও যে,

$$P(A/B^C) = \frac{P(A)}{1 - P(B)}$$

(১১) বেইসের (Bayes') উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

(১২) 52টি তাসের একটি প্যাকেট থেকে সমসম্ভব উপায়ে একটি তাস তুলে নেওয়া হল। তাসটি একটি হরতন বা রানী হবে তার সম্ভাবনা কত?

(১৩) পক্ষপাতশূন্য একটি মুদ্রাকে 2 বার উৎক্ষেপণ করলে ঠিক একবার 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা কত?

(১৪) কোনও ব্যাগে 6টি লাল ও 5টি সাদা বল আছে। এদের মধ্যে থেকে 3টি বল তুলে নিলে সেগুলি সবই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(১৫) সমসম্ভব উপায়ে নির্বাচিত কোন অধিবর্ষ (leapyear)-এ 53টি রবিবার থাকার সম্ভাবনা কত?

(১৬) গণিত শাস্ত্রের একটি প্রশ্ন তিনজন ছাত্র A, B ও C-কে দেওয়া হয়েছে যাদের উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ও $\frac{1}{5}$ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হবে তার সম্ভাবনা কত?

(১৭) (i) যদি $P(A) = \frac{1}{4}, P(AB) = \frac{2}{5}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ হয়, তবে $P(A \cup B), P(A/B)$ ও $P(B/A)$ নির্ণয় কর।

(ii) যদি $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{3}{5}, P(A \cap B) = \frac{1}{3}$ হয়, তবে $P(A \cup B), P(A^C \cap B^C), P(A^C \cup B^C)$ এবং $P(A \cap B^C)$ নির্ণয় কর।

(iii) যদি A ও B স্বতন্ত্র ঘটনা এবং $P(A) = \frac{2}{3}$ ও $P(B) = \frac{3}{5}$ হয়, তবে $P(A \cup B), P(A^C/B)$ এবং $P(A^C \cap B)$ নির্ণয় কর।

(১৮) দু'টি ঘটনা A ও B এমন যে, $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.7$ এবং $P(B) = p$। p-এর কোন্ মানের জন্য A ও B ঘটনা দু'টি (i) পরস্পর ব্যতিরেকী ও (ii) স্বতন্ত্র হবে?

(১৯) একটি পরিবারে 4টি শিশু আছে। (i) 4 জনের জন্ম তারিখ বিভিন্ন দিনে হওয়ার, (ii) 4 জনের মধ্যে 2 জনের একই জন্ম তারিখে হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(২০) কোনও কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলীর পদের জন্য দুটি দলের প্রার্থীরা প্রতিযোগিতা করে। প্রথম ও দ্বিতীয় দলের জয়লাভ করার সম্ভাবনা যথাক্রমে 0.6 এবং 0.4। যদি প্রথম দল জয়লাভ করে, তবে নতুন 'প্রোডাক্ট' চালু করার সম্ভাবনা 0.8 এবং দ্বিতীয় দল জয়লাভ করলে অনুরূপ সম্ভাবনা 0.3। নতুন 'প্রোডাক্ট' চালু হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(২১) A ও B এই দুই অংশের সমন্বয়ে কোনও কোম্পানীর একটি বস্তু উৎপাদিত হয়। A-অংশের উৎপাদন পদ্ধতিতে 100টির মধ্যে প্রায়শই 9টি ত্রুটিযুক্ত হয়। আবার, B-অংশের উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রায়শই 100টির মধ্যে 5টি ত্রুটিযুক্ত হয়। সংগৃহীত অংশ দু'টি ত্রুটিযুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(২২) একটি পাত্র A-র মধ্যে 3টি সাদা ও 5টি লাল মার্বেল আছে। অন্য একটি পাত্র B-র মধ্যে 5টি সাদা ও 3টি লাল মার্বেল আছে। A পাত্র থেকে B পাত্রে 2টি মার্বেল স্থানান্তরিত করা হয় ও অতঃপর B পাত্র থেকে 1টি মার্বেল তোলা হয়। উত্তোলিত মার্বেলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(২৩) দেখতে একই রকম তিনটি বাক্সে সাদা ও কালো বলের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

বাক্স I : 1টি সাদা ও 2টি কালো ; বাক্স II : 2টি সাদা ও 1টি কালো ; বাক্স III : 2টি সাদা ও 2টি কালো। উদ্দেশ্যহীনভাবে একটি বাক্স নির্বাচন করা হল এবং উহার মধ্যে থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে একটি বল তোলা হল। উত্তোলিত বলটি দেখা গেল সাদা। তৃতীয় বাক্সটি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(২৪) এক ব্যক্তিকে তিনটি পদের জন্য মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয়েছে। প্রথম পদের জন্য 3 জন পরীক্ষার্থী, দ্বিতীয় পদের জন্য 4 জন পরীক্ষার্থী এবং তৃতীয় পদের জন্য 2 জন পরীক্ষার্থী আছে। ঐ ব্যক্তির কমপক্ষে একটি পদ পাওয়ার সম্ভাবনা কত?

৯৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. গুন, অতীন্দ্রমোহন (1973) : সম্ভাবনাতত্ত্ব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

২. সেন, রাজকুমার (1986) : সংখ্যাতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

৩. দে, সৌরেন্দ্রনাথ (1984) : ব্যবসায় পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

৪. Das, N. G. (1996) : Statistical Methods, M. Das & Co. Calcutta.

৫. Nag N. K. (1993) : Business Mathematics and Statistics, Kalyani Publishers, Calcutta.

একক ৯৪ ❑ সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক ও তত্ত্বগত বিভাজন

গঠন

৯৪.০ উদ্দেশ্য

৯৪.১ প্রস্তাবনা

৯৪.২ সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক

৯৪.৩ বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন

৯৪.৪ অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন

৯৪.৫ গাণিতিক প্রত্যাশা

৯৪.৫.১ গাণিতিক প্রত্যাশার বৈশিষ্ট্যসমূহ

৯৪.৬ সম্ভাবনা চলকের ভেদমান ও সমক বিচ্যুতি

৯৪.৬.১ ভেদমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৯৪.৭ একচলক তত্ত্বগত বিভাজন

৯৪.৮ দ্বিপদ বিভাজন

৯৪.৮.১ দ্বিপদ বিভাজনের শর্তসমূহ

৯৪.৮.২ দ্বিপদ বিভাজনের ধর্মাবলী

৯৪.৯ পোয়াসঁ বিভাজন

৯৪.৯.১ পোয়াসঁ বিভাজনের উদাহরণ

৯৪.৯.২ পোয়াসঁ বিভাজনের ধর্মাবলী

৯৪.১০ নর্মাল বিভাজন

৯৪.১০.১ প্রমাণ নর্মাল চলক

৯৪.১০.২ স্বাভাবিক বিভাজনের ধর্মাবলী

৯৪.১১ অনুশীলনী

৯৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৯৪.০. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি বুঝতে পারবেন

সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক কাকে বলে

গাণিতিক প্রত্যাশা কী ও তার বৈশিষ্ট্য কী কী

একচলক তত্ত্বগত বিভাজন ও দ্বিপদ বিভাজন কী

পোয়াসঁ বিভাজন কাকে বলে ও তার ধর্ম কী কী

নর্মাল বিভাজনের সংজ্ঞা ও প্রমাণ নর্মাল চলক কাকে বলে

৯৪.১ প্রস্তাবনা

কোনও ঘটনাকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হলে তার যথাযথ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার দরকার। তা করতে হলে গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ। সম্ভাবনাতত্ত্বে গাণিতিক তত্ত্বের প্রয়োগ করতে হলে কোনও ঘটনাকে বাস্তব সংখ্যার আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, কোনও সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার (Random experiment) নমুনা দেশের নমুনা বিন্দুগুলির গাণিতিক তত্ত্বের বিকাশের জন্য নমুনা বিন্দুগুলি বাস্তব সংখ্যার আকারে প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। এক কথায় বলা যায়, নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার নমুনা দেশকে বাস্তব সংখ্যার সেটে রূপান্তরিত করা হয়। ফলে বীজগণিতের নিয়মাবলী বা তত্ত্বের প্রয়োগ অনেক সহজ হয়। সম্ভাবনাতত্ত্বে সম্ভাবনাশ্রয়ী চলকের (Random variable) ধারণা প্রয়োগ করা হয়। এই অধ্যায়ে সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক, উহার তত্ত্বগত বিভাজন ও গাণিতিক প্রত্যাশা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

৯৪.২. সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক ঃ

কোনও সম্ভাবনাভিত্তিক পরীক্ষা (Random experiment)-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক ঘটনাগুলির বিভিন্নতা অনুযায়ী যদি একটি প্রকৃতমাত্রাশ্রয়ী (Real valued) চলক x-এ বিভিন্ন মান আরোপ করা হয়, তাহলে x-এর মান কোনও প্রকৃত রাশিগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটিকে একটি ঘটনা বলা যায়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই ঘটনা হচ্ছে সে সমস্ত মৌলিক ঘটনার জন্যে x-এর ঐরকম মান গ্রহণ করার যে ঘটনা নির্দেশ করে তার সাথে অভিন্ন। এখন এই ঘটনার যা সম্ভাবনা, x-এর ঐ মান গ্রহণ করার সম্ভাবনা একই। এক্ষেত্রে, x-কে একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী চলক বা সম্ভাবনা চলক Random variable) বলা হয়। সংক্ষেপে, x-এর মান বিভিন্ন গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যদি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তাহলেই x-কে সম্ভাবনা চলক বলা হবে। কোনও সম্ভাবনা চলক x যদি বিচ্ছিন্ন বা অসন্তত (Discrete) হয়, তাহলে x-কে বিভিন্ন সম্ভাবনা চলক (Discrete random variable) বলা হয়। আবার কোনও সম্ভাবনা চলক x যদি অবিচ্ছিন্ন বা সন্তত হয়, তাহলে x-কে অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক (Continuous random variable) বলা হয়।

একটি উদাহরণ দিয়ে সম্ভাবনা চলকের ধর্ম আলোচনা করা যাক। একটি সুসমঞ্জস (unbiased or fair) মুদ্রা উৎক্ষেপণের পরীক্ষায় দুটি লক্ষ্যণীয় ফলাফল 'হেড' ও 'টেল' দৃষ্ট হলে যথাক্রমে ধরা যাক একটি চলক x-এর মান 1 ও 0 আরোপ করা হ'ল। অর্থাৎ, উৎক্ষিপ্ত মুদ্রায় যতবার 'হেড' দেখা যাবে x হচ্ছে তারই সংখ্যা। তাহলে x-এর মান গ্রহণ করা এবং মুদ্রায় 'হেড' দৃষ্ট হওয়া হচ্ছে একই ঘটনা। এই ঘটনাকে (x = 1) সংকেত সূত্রে প্রকাশ করলে P(x = 1) = P ['হেড' দৃষ্ট হওয়া] = $\frac{1}{2}$ । তেমনি P(x=0) = P ['টেল' দৃষ্ট হওয়া] = $\frac{1}{2}$ । কাজেই x-এর মান 1 ও 0 হওয়ার একটি করে নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, এই x চলকটিকে একটি সম্ভাবনা চলক বলা হবে এবং 1 ও 0-কে x-এর দুটি সম্ভাব্য মান বলে উল্লেখ করা হবে।

৯৪.৩ বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন (Discrete Probability Distribution) :

কোনও বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক X-এর পক্ষে কোনও একটি নির্দিষ্ট মান x গ্রহণ করার সম্ভাবনা সাধারণত একটি গাণিতিক অপেক্ষক p(x) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

p(x) = X-এর পক্ষে 'x' মান গ্রহণ করার সম্ভাবনা

$= p(X = x)$

এক্ষেত্রে p(x) অপেক্ষককে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলকের সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক (Probability Mass Function, সংক্ষেপে p.m.f) বলা হয়।

p(x) অপেক্ষকের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি শর্ত সিদ্ধ হওয়া আবশ্যিক ঃ

(i) $0 \leq p(x) \leq 1$; x-এর সকল মানের জন্য

(ii) $\sum_{x} p(x) = 1$

উদাহরণ ১. একটি সুসমঞ্জস মুদ্রা বার বার উৎক্ষেপণ করা হল যতক্ষণ পর্যন্ত না 'টেল' পড়ে। যদি প্রথম 'টেল' পড়ার আগে যতবার 'হেড' পড়ে তার সংখ্যা x দ্বারা সূচিত হয়, তবে x-এর সম্ভাবনা বিভাজন নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ এখানে, x-দ্বারা প্রথম 'টেল' পড়ার আগে যতগুলি 'হেড' পড়ে তার সংখ্যা সূচিত হয়। সুতরাং,

p(0) = P(x = 0) = প্রথম উৎক্ষেপণে 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা = $\frac{1}{2}$

p(1) = P(x = 1) = দ্বিতীয় উৎক্ষেপণে 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

p(2) = P(x = 2) = তৃতীয় উৎক্ষেপণে 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা = $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

সুতরাং সাধারণভাবে,

$p(r) = P(x = r) = (r + 1)$-তম উৎক্ষেপণে 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা = $\left(\frac{1}{2}\right)^{r+1}$

সুতরাং x-এর সম্ভাবনা বিভাজন হল ঃ

x	:	0	1	2	3	4	.....	r	.....	সমষ্টি
p(x)	:	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^2$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3$	$\left(\frac{1}{2}\right)^4$	$\left(\frac{1}{2}\right)^5$	.....	$\left(\frac{1}{2}\right)^{r+1}$	....	1

এই সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নলিখিত আকারেও প্রকাশ করা যায় ঃ

$$p(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1};\ x = 0, 1, 2, ...$$

১৪.৪ অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন (Continuous Probability Distribution) :

বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজনে সম্ভাবনা চলক সসীম সংখ্যক অথবা গণনাযোগ্য অসীম সংখ্যক বিচ্ছিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি x দ্বারা উচ্চতা, ওজন, বয়স ইত্যাদি সম্ভাবনা চলক সূচিত হয়, তাহলে, x-এর পক্ষে গণনাযোগ্য নয় এরূপ অসীম সংখ্যক মান গ্রহণ করা সম্ভব। অর্থাৎ, x-এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিসর (a,b)-এর মধ্যবর্তী যে কোনও মান গ্রহণ করা সম্ভব। এরূপ চলককে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন চলক ও এর বিভাজনকে অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন বলা হয়।

এরকম বিভাজনে সম্ভাবনা চলকের মানসংখ্যা গণনা করা যায় না। এখানে সম্ভাবনা চলক x অসীম সংখ্যক মান গ্রহণ করতে পারে বলে চলকের প্রত্যেকটি মানের সাথে একটি সসীম সম্ভাবনা যুক্ত করা যায় না। এজন্য অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজনে চলকের প্রদত্ত পরিসরের অন্তর্গত কোনও উপ-পরিসরে ইহার মান থাকার সাথে সম্ভাবনাকে যুক্ত করা হয়। যদি f(x) একটি অবিচ্ছিন্ন অপেক্ষক হয় এবং অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক x-এর মান অতি ক্ষুদ্র পরিসর $\left(x - \frac{1}{2}dx,\ x + \frac{1}{2}dx\right)$-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা f(x)dx আকারে প্রকাশ করা যায়, তবে f(x)-কে সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক (Probability Density Function, সংক্ষেপে p.d.f.) বলা হয়। প্রসার dx অতি ক্ষুদ্র নেওয়ার কারণ dx পরিসরে f(x)-এর মান অপরিবর্তিত ধরা হয় এবং f(x) হ'ল dx পরিসরে সম্ভাবনা ঘনত্ব। f(x)-এর নিম্নলিখিত দুটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

(i) $f(x) \geq 0$; x-এর সকল মানের জন্য

(ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

৯৪.৫ গাণিতিক প্রত্যাশা (Mathematical Expectation) :

কোনও বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক X যদি $x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ মানগুলি গ্রহণ করে ও মানগুলি গ্রহণ করার সম্ভাবনা যথাক্রমে $p(x_1), p(x_2), \ldots\ldots, p(x_n)$ হয়, যেখনে $p(x)$ হল একটি সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক (p.m.f), তাহলে $E(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i p(x_i)$ রাশিটিকে X চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা (Mathematical Expectation) বলা হয়। যদি x চলকটির অসীম সংখ্যক মান নেওয়া হয় এবং f_i $x = x_i$-এর পরিসংখ্যা হয়, তাহলে $\lim_{x \to \infty n} \frac{f_i}{n} = p(x_i)$ এবং যৌগিক গড় $\bar{x}$ এবং সীমা $E(x)$ হবে, কারণ

$$\lim_{n \to \infty} \bar{x} = \lim_{n \to \infty} \sum \frac{f_i x_i}{n} = \sum x_i p(x_i) = E(x)$$

অনুরূপভাবে, বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক X যদি ${x^2}_1, {x^2}_2, \ldots\ldots, {x^2}_n$ মানগুলি গ্রহণ করে এবং মান গ্রহণের সম্ভাবনা যদি $p(x_1), p(x_2), \ldots\ldots, p(x_n)$ হয়, তাহলে; $E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 p(x_i)$;

এবং একইভাবে,

$$E(X^r) = \sum_{i=1}^{n} x_i^r p(x_i) \text{ হবে।}$$

সাধারণভাবে,

$$E\{g(X)\} = \sum_{i=1}^{n} g(x_i).\ p(x_i)$$

এখন X যদি অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক হয় এবং $f(x)$ একটি সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক (p.d.f.) হয়, তাহলে X-এর গাণিতিক প্রত্যাশা হবে,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x.f(x)dx$$

এবং সাধারণভাবে,

$$E\{g(X)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\ f(x)dx$$

৯৪.৫.১ গাণিতিক প্রত্যাশার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) $E(C) = C$, যেখানে C একটি ধ্রুবক রাশি।

(ii) $E(CX) = C.E(X)$, যেখানে C একটি ধ্রুবক।

(iii) $E\{X - X(X)\} = 0$

(iv) $E(X \pm Y) E(X) \pm E(Y)$, যেখানে X ও Y দুটি সম্ভাবনা চলক।

(v) $E(XY) = E(X) . E(Y)$, যদি X ও Y স্বতন্ত্র সম্ভাবনা চলক হয়।

উদাহরণ ২. একটি সুষম ছক্কা নিক্ষেপণ করা হলে উপরিভাগে যে সংখ্যাগুলি দেখা যাবে তাদের গাণিতিক প্রত্যাশা কত ?

সমাধান ঃ যেহেতু ছক্কাটি সুষম, তাই এতে যে কোনও সংখ্যা নির্দেশক চিহ্ন দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে $\frac{1}{6}$। এখন x যদি ছক্কার সংখ্যা নির্দেশক সম্ভাবনা চলক হলে উহার সম্ভাবনা মানগুলি 1, 2, 3, 4, 5 ও 6। সুতরাং,

x :	1	2	3	4	5	6
p(x) :	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

এবং গাণিতিক প্রত্যাশা,

$$E(X) = 1.\frac{1}{6} + 2.\frac{1}{6} + 3.\frac{1}{6} + 4.\frac{1}{6} + 5.\frac{1}{6} + 6.\frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)$$

$$= \frac{21}{6}$$

$$= 3.5$$

৯৪.৬ সম্ভাবনা চলকের ভেদমান ও সমক বিচ্যুতি ঃ

মনে কর, X একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক এবং এর গাণিতিক প্রত্যাশা $E(X) = \mu$। তাহলে V(x)-কে ভেদমান বলা হবে যেখানে $V(X) = E(X - \mu)^2 = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$

এখন, $E(X - \mu)^2 = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2)$

$$= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

$= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$ [$\therefore E(X) = \mu$]

$= E(X^2) - \mu^2$

$= \sum x^2 p(x) - \mu^2$

আবার X চলকের ভেদমানের ধনাত্মক বর্গমূলকে ইহার সম্যক বিচ্যুতি বা প্রমাণ বিচ্যুতি বলা হয়। অর্থাৎ সমক বিচ্যুতি, $\sigma = \sqrt{v(X)}$

$= \sqrt{E(X^2) - \mu^2}$

অনুরূপভাবে, X যদি অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক হয় তবে,

ভেদমান, $\sigma^2 = V(X) = E(X-\mu)^2$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2$$

এবং, সম্যক বিচ্যুতি, $\sigma = \sqrt{v(X)} = \sqrt{E(X)^2 - \mu^2}$

৯৪.৬.১ ভেদমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

(i) $v(cX) = c^2 v(X)$, যেখানে c একটি ধ্রুবক।

(ii) $v(aX + by) = a^2 v(X) + b^2 v(Y)$, যদি X ও Y স্বতন্ত্র সম্ভাবনা চলক হয় এবং a, b দুটি ধ্রুবক।

উদাহরণ ৩. একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলকের সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ। চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা ও সমক বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

x	:	4	5	6	8
p(x)	:	0.1	0.3	0.4	0.2

সমাধান ঃ গাণিতিক প্রত্যাশার সংজ্ঞানুযায়ী,

$\mu = E(X) = \sum xp(x)$

$= 4 \times 0.1 + 5 \times 0.3 + 6 \times 0.4 + 8 \times 0.2$

$= 0.4 + 1.5 + 2.4 + 1.6$

$= 5.9$

$E(X^2) = \sum x^2 p(x)$

$= 4^2 \times 0.1 + 5^2 \times 0.3 + 6^2 \times 0.4 + 8^2 \times 0.2$

$= 1.6 + 7.5 + 14.4 + 12.8$

$= 6.3$

সুতরাং,

ভেদমান, $\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - \mu^2$

$= 36.3 - (5.9)^2$

$= 36.3 - 34.81$

$= 1.49$

$\therefore$ সমক বিচ্যুতি, $\sigma = \sqrt{v(X)} = \sqrt{1.49} = 1.22$

উদাহরণ ৪. a-এর কোন মানের জন্য

$p(x) = ax \; ; \; x = 1, 2, \ldots\ldots, n$

একটি সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক (p.m.f.) হবে ? X চলকের গাণিতিক প্রত্যাশা ও ভেদমান নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ p(x) একটি সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক হওয়ার শর্তগুলি হল ঃ

(i) $0 \le p(x) \le 1$ এবং (ii) $\sum p(x) = 1$

(i) থেকে পাই, $a > 0$, যেহেতু X-এর মানগুলি ধনাত্মক।

(ii) থেকে পাই,

$$1 = \sum p(x) = \sum_{x=1}^{n} ax = a\sum_{x=1}^{n} x = a(1 + 2 + 3 + \ldots\ldots + n) = \frac{a.n(n+1)}{2}$$

$$\therefore \; a = \frac{2}{n(n+1)}$$

এখন গাণিতিক প্রত্যাশা,

$$E(X) = \sum_{x=1}^{n} xp(x) = a \sum_{x=1}^{n} x^2$$

$$= a(1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2)$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{2n+1}{3}$$

আবার,

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{n} x^2 . p(x)$$

$$= a\sum_{x=1}^{n} x^3$$

$$= a(1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3)$$

$$= \frac{2}{n(n+1)} \left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

$$= \frac{n(n+1)}{2}$$

সুতরাং,

ভেদ মান, $\sigma^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

$$= \frac{n(n+1)}{2} - \left(\frac{2n+1}{3}\right)^2$$

$$= \frac{(n-1)(n+2)}{18}$$

৯৪.৭ এক-চলক তত্ত্বগত বিভাজন (Univariate Theoretical Distribution) :

রাশিবিজ্ঞানের চর্চায় যে কোনও তথ্য আমাদের হাতে আসে, অনেক সময় তা বহু তথ্যাবলীর একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা সমগ্রকের অংশ বা নমুনা বলে ধরা হয়। আমাদের প্রকৃত পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হ'ল ঐ বৃহত্তর গোষ্ঠীটি যা থেকে সাধারণ সম্পূর্ণ তথ্যসংগ্রহ সম্ভব হয় না। আমাদের সংগ্রহে যা আছে তা ঐ বৃহত্তর গোষ্ঠীর একটি অংশ মাত্র। যে কোনও রাশিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সূত্রে এই যে কেবলমাত্র অংশতে সংগৃহীত তথ্যাবলীর সাহায্যে সমগ্র গুচ্ছ বা গোষ্ঠীর সম্বন্ধে অনুমান করা হয় বা সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়। সেই সামগ্রিক তথ্যসম্ভারকে বলা হয় পূর্ণক বা সমগ্রক (Population বা Universe)। এই সমগ্রক বা পূর্ণক সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান নির্ভর পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তা থেকে একটি বিশেষ অংশ চয়ন করে নিয়ে থাকি এবং এই অংশের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের কাজে আমাদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করি। সমগ্রকের এরূপ প্রতিনিধি স্থানীয় অংশকে বলা হয় নমুনা বা অংশক (Sample)।

অংশকটির বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে থাকি, তা থেকে সমগ্রকটির অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুমান বা ধারণা করার উদ্দেশ্যে। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে যে পরিসংখ্যা বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বাস্তবিক সেগুলি সবই এক একটি অংশক এবং এদের অন্তরালে এক একটি সমগ্রক বা পূর্ণকের অস্তিত্ব রয়েছে। অংশকের আলোচনার সাহায্যে পূর্ণকের ধর্ম নিরূপণ করার উপায় হিসাবে পদ্ধতি হচ্ছে কতগুলি তত্ত্বগত বিভাজন (Theoretical Distribution)-এর পরিকল্পনা এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ। যে কোনও সংগৃহীত তথ্যকেই একটি অজ্ঞাত বা জ্ঞাত কোনও পূর্ণকের প্রতিনিধিরূপ অংশক হিসাবে ধরা হবে এবং ঐ পূর্ণক সম্বন্ধে ধরা হবে যে তার একটি বিভাজন আছে যা আমরা সম্ভাবনা তত্ত্বের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি। অংশক হিসাবে আলোচিত তথ্য যদি পরিমাণ ভিত্তিক হয়, তবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণকের তথ্যাবলীও পরিমাণ ভিত্তিক হবে এবং পূর্ণকের বিভাজনটিকে একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী চলকের সাহায্যে প্রকাশ করা যাবে। ফলে, পূর্ণকের বিভাজনটিকে একটি সম্ভাবনা চলকের বিভাজন দ্বারা সূচিত করা যাবে। এরূপ সম্ভাবনা চলকের বিভাজনকেই তত্ত্বগত বিভাজন বলা হয়।

৯৪.৮ দ্বিপদ বিভাজন (Binomial Distribution) :

মনে কর, n সংখ্যক প্রচেষ্টা (Trial) স্বতন্ত্রভাবে পুনরাবৃত্ত হলে এবং পরীক্ষার প্রতিটিতে 'সার্থকতা' বা 'সাফল্য' (Success) লাভের সম্ভাবনা হচ্ছে p এবং 'ব্যর্থতা' (Failure) লাভের সম্ভাবনা হচ্ছে $q = 1 - p$. এখন এরকম প্রচেষ্টায় মোট x-সংখ্যক 'সার্থকতা' লাভের সম্ভাবনা $(x = 0, 1, 2, 3, ...n - 1, n)$ হল ঃ

$$p(x) = {}^nc_x\, p^x q^{n-x}\ ;\ x = 0, 1, 2, ..., n,\ 0 < p < 1.$$

যেখানে n একটি অখণ্ড ধনাত্মক সংখ্যা।

x-এর বিভিন্ন মানের জন্য p(x)-এর মানগুলির যে বিভাজন সূচিত হয়, তাকে দ্বিপদ বিভাজন বলে। স্পষ্টত $x = 0, 1, 2, ..., n$-এর জন্য $p(x) \geq 0$ এবং

$$\sum_{x=0}^{n} p(x) = \sum_{x=0}^{n} {}^{n}c_x p^x q^{n-x} = (q+p)^n = 1$$

সুতরাং, $p(x)$ হল x বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলকের সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক।

৯৪.৮.১ দ্বিপদ বিভাজনের শর্তসূমহ

(i) সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষার নমুনা দেশ (Sample space)-এ কেবলমাত্র 'সফলতা' ও 'বিফলতা' এই দুটি নমুনা বিন্দু থাকে।

(ii) একই শর্তসাপেক্ষে সম্ভাবনাশ্রয়ী পরীক্ষা সসীম সংখ্যক (n) বার পুনরাবৃত্ত হয়, যেখানে n-এর মান খুব বড় হবে না।

(iii) পুনরাবৃত্ত পরীক্ষাগুলির প্রতি ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা ধ্রুবক বা অপরিবর্তিত হবে।

(iv) পরীক্ষাগুলি স্বতন্ত্র হবে।

৮৭.৮.২ দ্বিপদ বিভাজনের ধর্মাবলী

(i) দ্বিপদ বিভাজন সম্পূর্ণভাবে জানা থাকে যদি n এবং p-এর মান দেওয়া থাকে।

(ii) এই বিভাজনের গড় তথা গাণিতিক প্রত্যাশা হল $X(E) = np$

(iii) এই বিভাজনের ভেদমান, $\mu_2 = V(X) = npq$ এবং সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{npq}$ ।

(iv) বিভাজনের তৃতীয় কেন্দ্রীয় ভ্রামক $\mu_3 = npq\,(q-p)$

(v) বিভাজনের চতুর্থ কেন্দ্রীয় ভ্রামক $\mu_4 = 3n^2p^2q^2 + npq\,(1-6pq)$।

(vi) প্রতিবৈষম্য $= \dfrac{\mu_3}{\mu_2^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{q-p}{\sqrt{npq}}$

(vii) তীক্ষ্ণতা $= \dfrac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = \dfrac{1-6pq}{npq}$

(viii) দ্বিপদ বিভাজনের একটি বা দুটি সংখ্যাগুরু মান থাকতে পারে।

যদি $(n+1)p$ একটি অখণ্ড সংখ্যা হয়, তবে বিভাজনের দুটি সংখ্যাগুরু মান থাকবে এবং মান দুটি হবে $(n+1)p$ এবং $\{(n+1)p-1\}$, যদি $(n+1)p$-এর মান অখণ্ড না হয়। তবে $(n+1)p$-এর অন্তর্গত বৃহত্তম অখণ্ড সংখ্যাই বিভাজনের সংখ্যাগুরু মান হবে।

উদাহরণ ৫. ৪টি পক্ষপাতশূন্য মুদ্রা উৎক্ষেপণ করা হল। (i) ঠিক তিনটি 'হেড', (ii) কমপক্ষে তিনটি 'হেড' এবং (iii) অনধিক তিনটি 'হেড' পাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ মনে কর, পক্ষপাত শূন্য 'হেড' পড়ার ঘটনা 'সফলতা' হিসাবে প্রকাশ করা হল। x-হল যতগুলি 'হেড' পড়েছে তার সংখ্যা। এখানে $x = 0, 1, 2, ..., 8.$

এখন 'হেড' পড়ার সম্ভাবনা, $p = \frac{1}{2}$

এবং 'টেল' পড়ার সম্ভাবনা, $q = 1 - p = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

x-এর সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক হবে $p(x)$, যেখানে

$p(x) = {}^nc_x p^x q^{n-x}$

$= {}^8c_x \left(\frac{1}{2}\right)^8 ; x = 0, 1, 2, \ldots\ldots, 8$

(i) তিনটি মুদ্রায় 'হেড' পাওয়ার সম্ভাবনা হল

$$p(3) = {}^8c_3 \left(\frac{1}{2}\right)^8 = 56 \times \frac{1}{2^8} = \frac{7}{32}$$

(ii) কমপক্ষে তিনটি মুদ্রায় হেড পড়ার সম্ভাবনা

$= p\ (X \geq 3)$

$= p(3) + p(4) + p(5) + p(6) + p(7) + p(8)$

$= 1 - [p(0) + p(1) + p(2)\ ]$

$$= 1 - \frac{1}{2^8}\left[\ {}^8c_0 + {}^8c_1 + {}^8c_2\right] = 1 - \frac{1}{2^8}\left[1 + 8 + 28\right] = \frac{219}{256}$$

(iii) অনধিক তিনটি মুদ্রায় হেড পড়ার সম্ভাবনা

$= p\ (X \leq 3)$

$= p(0) + p(1) + (2) + p(3)$

$$= \frac{1}{2^8}\left[\ {}^8c_0 + {}^8c_1 + {}^8c_2 + {}^8c_3\right]$$

$$= \frac{1}{2^8}\left[1 + 8 + 28 + 56\right]$$

$$= \frac{93}{256}$$

উদাহরণ ৬. একটি পরীক্ষায় পাশের হার 60%। একটি দলে 6 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কমপক্ষে 4 জন পাশ করার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান এখানে X হল এমন একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক যা 6 জনের মধ্যে কজন পাশ করে তাকে সূচিত করে।

$\therefore X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

এখন $p =$ পাশের সম্ভাবনা $\frac{60}{100} = \frac{3}{5}$

$q =$ ফেল করার সম্ভাবনা $= 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

X-এর বিভাজনটি হল

$$p(x) = {}^nc_x \, p^x \, q^{n-x}$$

$$= {}^6c_x \left(\frac{3}{5}\right)^x \left(\frac{2}{5}\right)^{n-x} ; \; x = 0,1,2,\ldots\ldots,6$$

সুতরাং, কমপক্ষে 4 জন পাশ করার সম্ভাবনা

$$= P(X \geq 4)$$

$$= p(4) + p(5) + p(6)$$

$$= {}^6c_4 \left(\frac{3}{5}\right)^4 \left(\frac{2}{5}\right)^2 + {}^6c_5 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \left(\frac{2}{5}\right) + {}^6c_6 \left(\frac{3}{5}\right)^6$$

$$= \frac{4860}{15625} + \frac{2916}{15625} + \frac{729}{15625}$$

$$= \frac{1701}{3125}$$

উদাহরণ ৭. একটি দ্বিপদ বিভাজনের মধ্যক ও সমক-বিচ্যুতি হল যথাক্রমে 4 এবং $\sqrt{3}$ । বিভাজনটি নির্ণয় কর।

সমাধান ঃ দ্বিপদ বিভাজনটি $p(x)$ হলে,

$$p(x) = {}^nc_x p^x \, q^{n-x} ; \; x = 0, 1, 2, \ldots\ldots, n.$$

এক্ষেত্রে n এবং p-এর মান নির্ণয় করতে হবে।

এখন মধ্যক $= np = 4$

এবং সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{npq} = \sqrt{3}$

অর্থাৎ ভেদমান $= npq = 3$

সুতরাং, $\frac{npq}{np} = \frac{3}{4}$

বা, $q = \frac{3}{4}$

$\therefore\ p = 1 - q = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$

আবার, $np = 4$

বা, $n.\frac{1}{4} = 4$

$\therefore n = 16$

সুতরাং দ্বিপদ বিভাজনটি হল,

$$p(x) = {}^{16}c_x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{16-x}\ ;\ x = 0, 1, 2, \ldots.., 16$$

৯৪.৯ পোয়াসঁ বিভাজন (Poisson Distribution) :

দ্বিপদ বিভাজনে n এবং p-এর মধ্যে যদি n-এর মান-খুব বড় ও p-এর মান খুব ছোট কিন্তু $np = \lambda$-এর মান সসীম হয়, তবে দ্বিপদ বিভাজনের সম্ভাবনা অপেক্ষক পোয়াসঁ বিভাজনের আকার নেয়।

পোয়াসঁ বিভাজনের সম্ভাবনা ভর অপেক্ষকটির আকার হল,

$$p(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}\ ;\ {}^{x}_{\lambda>0} = 0,1,2, \ldots..\infty$$

স্পষ্টতই সকল x-এর জন্য $p(x) \geq 0$ এবং

$$\sum_{x=0}^{\infty} p(x) = e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{\infty}\frac{\lambda^x}{x!} = \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \ldots..\right)e^{-\lambda} = e^{\lambda}.e^{-\lambda} = e^0 = 1$$

৯৪.৯.১ পোয়াসঁ বিভাজনের উদাহরণ ঃ

(i) কোনও বইয়ের প্রতি পাতায় মুদ্রণ-জনিত ত্রুটির সংখ্যা।

(ii) কোনও ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে চলাচল করা প্রতি মিনিটে গাড়ির সংখ্যা।

(iii) কোনও শহরে প্রত্যহ ঘটা দুর্ঘটনা সংখ্যা।

(iv) একটি ফুটবল খেলায় গোলের সংখ্যা।

(v) কোনও অফিসে প্রতি বৎসর অবসর গ্রহণকারীর সংখ্যা।

(vi) আত্মহত্যার সংখ্যা।

(vii) কাগজে, কাপড় বা ধাতব পাতের প্রতি এককে ত্রুটির সংখ্যা।

(viii) ব্যস্ত সময়ে কোনও দূরভাষ কেন্দ্রে প্রতি মিনিটে আগত দূরভাষের সংখ্যা।

(ix) পেট্রোল পাম্পে আগত প্রতি ঘণ্টায় গাড়ির সংখ্যা।

(x) হাসপাতালে আগত প্রতি ঘণ্টায় রোগীর সংখ্যা।

৯৪.৯.২ পোয়াসঁ বিভাজনের ধর্মাবলী ঃ

(i) পোয়াসঁ বিভাজন সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে যদি λ-এর মান দেওয়া থাকে।

(ii) এই বিভাজনের গড় তথা গাণিতিক প্রত্যাশা হল $E(X) = \lambda$.

(iii) এই বিভাজনের ভেদমান, $\mu_2 = v(X) = \lambda$ এবং সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{\lambda}$

(iv) বিভাজনের তৃতীয় কেন্দ্রীয় ভ্রমক $\mu_3 = \lambda$

(v) বিভাজনের চতুর্থ কেন্দ্রীয় ভ্রামক $\mu_4 = 3\lambda^2 + \lambda$

(vi) প্রতি বৈষম্য $= \dfrac{\mu_3}{\mu_2^{\frac{3}{2}}} = \dfrac{1}{\sqrt{\lambda}}$

(vii) তীক্ষ্ণতা $= \dfrac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = \dfrac{1}{\lambda}$

(viii) পোয়াসঁ বিভাজনের একটি বা দুটি সংখ্যাগুরু মান থাকতে পারে। যদি λ-এর মান অখণ্ড সংখ্যা হয়, তবে বিভাজনের দুটি সংখ্যাগুরু মান হবে λ এবং $(\lambda - 1)$। যদি λ এর মান অখণ্ড না হয়, তবে λ-এর অন্তর্গত বৃহৎ অখণ্ড সংখ্যাটি কেবলমাত্র সংখ্যাগুরু মান হবে।

উদাহরণ ৮. একটি যন্ত্র দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রীর 2% হল ত্রুটিযুক্ত। 100টি সামগ্রীর মধ্যে তিনটি বা তার বেশি ত্রুটিযুক্ত সামগ্রী পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনা কত ? $(e^{-2} = 0.135)$

সমাধান ঃ মনে কর, X হল এমন একটি বিচ্ছিন্ন চলক যা ত্রুটিযুক্ত সামগ্রীর সংখ্যা সূচিত করে।

এখানে n-এর মান গড় অর্থাৎ 100 এবং p-এর মান ছোট অর্থাৎ 0.02। সুতরাং, $\lambda = np = 100\times0.02=2$. এখানে X-এর বিভাজনটি হল পোয়াসঁ বিভাজন।

অর্থাৎ, $p(x) = e^{-\lambda}.\dfrac{\lambda^x}{x!}; x = 0,1,2,.....\infty$

সুতরাং, 3 বা তার বেশি সামগ্রী ত্রুটিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা

$= p(X \geq 3)$

$= 1 - P(X \leq 2)$

$= 1 - [p(0) + p(1) + p(2)]$

$$= 1 - e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right)$$

$= 1 - 0.135 \times 5$

$= 0.325$

উদাহরণ ৯. অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, একটি কারখানায় বছরে গড়ে চারটি দুর্ঘটনা ঘটে। কোনও একটি বছরে (i) কোনও দুর্ঘটনা না ঘটার এবং (ii) 4-টির কম দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কত ?

সমাধান ঃ মনে কর, X হল বছরে মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা।

X-এর বিভাজন হবে পোয়াসঁ বিভাজন অর্থাৎ,

$$p(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!};\ x = 0, 1, 2.....$$

যেখানে $\lambda = 4$.

(i) কোনও বছরে দুর্ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা $= P(X = 0) = p(0) = e^{-\lambda} = e^{-4} = 0.0183$

(ii) দুর্ঘটনার সংখ্যা 4-এর কম হওয়ার সম্ভাবনা।

$= P(X \leq 3)$

$= p(0) + p(1) + p(2) + p(3)$

$$= e^{-4}\left\{1 + 4 + \frac{4^2}{2!} + \frac{4^3}{3!}\right\}$$

$= e^{-4}\,(1 + 4 + 8 + 10.67)$

$= 0.0183 \times 23.67$

$= 0.4332$

৯৪.১০ নর্মাল বিভাজন (Normal Distribution) :

রাশিবিজ্ঞানে সর্বাধিক আলোচিত বিভাজনটি হচ্ছে নর্মাল বিভাজন। এটি একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের বিভাজন। নানা কারণে রাশিবিজ্ঞানের চর্চায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নিম্নলিখিত সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক দ্বারা স্বাভাবিক বিভাজনকে সূচিত করা হয় ঃ

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} ; -\infty < x < \infty - \infty < \mu < \infty, \sigma > 0$$

যেখানে μ ও σ দ্বারা যথাক্রমে বিভাজনের গড় ও সমক বিচ্যুতি সূচিত হয় এবং $\pi = \frac{22}{7}$ এবং $e = 2.718$ (প্রায়) দুটি গাণিতিক ধ্রুবক। এই বিভাজনের সম্ভাবনা লেখ (Probability Curve) নিম্নরূপ

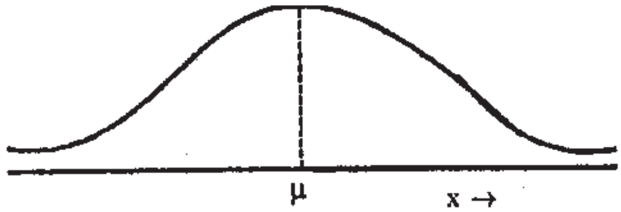

এই লেখটি μ–এর সাপেক্ষে প্রতিসম (Symmetric)।

৯৪.১০.১ প্রমাণ নর্মাল চলক (Standard Normal Variable) :

যদি X অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক নর্মাল বিভাজন মেনে চলে এবং X-এর গড় ও সমক বিচ্যুতি যথাক্রমে μ ও σ হয়, তবে $\tau X = \frac{X-\mu}{\sigma}$। এই অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলককে প্রমাণ নর্মাল চলক বলা হয়। প্রমাণ নর্মাল চলকের গড় 0 (শূন) এবং সমক বিচ্যুতি 1 হয় এবং এর সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষক হল,

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2}\tau^2} ; -\infty < z < \infty$$

দ্রষ্টব্য ঃ $\phi(\tau) = \phi(-\tau)$

$\phi(\tau)$–এর রেখাচিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

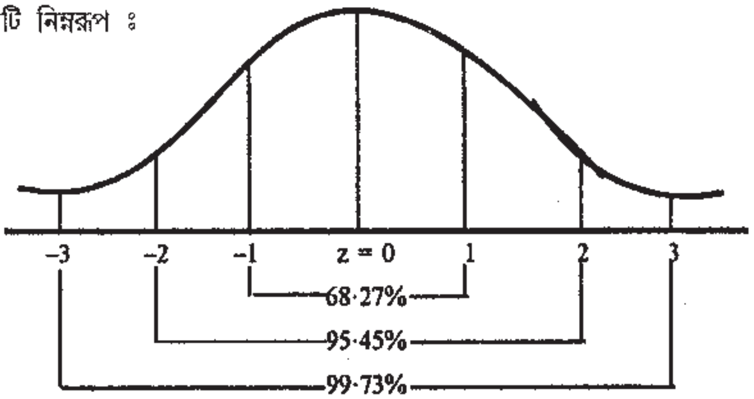

যেখানে লেখ-এর নিচে ক্ষেত্রফলের শতকরা বিভাজন দেখানো হয়েছে। প্রমাণ স্বাভাবিক লেখ-এর $z = \pm 1$, $z = \pm 2$ এবং $z = \pm 3$ রেখা দু'টির মধ্যবর্তী ক্ষেত্রফল তিনটি মোট ক্ষেত্রফল 1-এর যথাক্রমে 68.27%, 95.45% এবং 99.73%। যদি প্রমাণ নর্মাল বিভাজনের বিভাজন অপেক্ষক (Distribution function) $\Phi(\tau)$ হয়, তবে

$$\Phi(\tau) = p\{-\infty \le t \le \tau\}$$

= প্রমাণ নর্মাল বিভাজনের রেখার τ-র বামপাশের ক্ষেত্রফল।

যদিও এই ক্ষেত্রফল সমাকলন পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায় তবু এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে z-এর ধনাত্মক মানগুলির জন্য $\Phi(z)$-এর মান দেওয়া হল।

সম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে $\Phi(z)$-কে ব্যবহার করা যায় ঃ

(i) $\Phi(-\tau) = 1 - \Phi(\tau)$

(ii) $$P[X \le a] = P\left[\frac{x-\mu}{\sigma} \le \frac{a-\mu}{\sigma}\right]$$

$$= P\left[z \le \frac{a-\mu}{\sigma}\right]$$

$$= \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

(iii) $$P[X \ge b] = 1 - P[X < b]$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

(iv) $$P[a \le X \le b] = P[X \le b] - P[X \le a]$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

৯৪.১০.২ স্বাভাবিক বিভাজনের ধর্মাবলী ঃ

(i) স্বাভাবিক বিভাজন সম্পূর্ণভাবে জানতে গেলে μ ও σ জানা থাকা চাই।

(ii) বিভাজনের গড় তথা গাণিতিক প্রত্যাশা $E(X) = \mu$ এবং সমক বিচ্যুতি = $\sqrt{v(X)} = \sigma$।

(iii) এই বিভাজনের গড়, মধ্যমা এবং সংখ্যাগুরু মান পরস্পর সমান ও ইহা μ।

(iv) বিভাজনের সকল অযুগ্মক্রমের কেন্দ্রীয় ভ্রামকের মান শূন্য।

(v) বিভাজনের সকল যুগ্ম ভ্রামক নিম্নলিখিত সম্পর্ক থেকে নির্ণয় করা যায়,

$\mu_{2r} = 1.3.5...... (2r - 1)\sigma^{2r}$; r = 1, 2, 3......

(vi) প্রতিবৈষম্য = 0

(vii) তীক্ষ্ণতা = 0

(viii) বিভাজনের চতুর্থকগুলি হল ঃ

$\theta_1 = \mu - 0.67\sigma$

$\theta_2 = \mu$

$\theta_3 = \mu + 0.67\sigma.$

(ix) $\mu - 3\sigma$ এবং $\mu + 3\sigma$–এর মধ্যে X চলকের প্রায় সমস্ত মান বর্তমান।

(x) নর্মাল বিভাজনের রেখাটি $X = \mu$ রেখার সাপেক্ষে প্রতিসম এবং এর আকার একটি উল্টানো ঘণ্টার মতো (bell-shaped).

উদাহরণ ১০. একজন বিক্রয়কর আধিকারিকের কাছে 500টি ফার্মের বাৎসরিক বিক্রয় তথ্য আছে। তাদের গড় বিক্রয় ও সমক বিচ্যুতি যথাক্রমে 36,000 টাকা এবং 10,000 টাকা। তথ্যগুলি যদি স্বাভাবিক বিভাজন মেনে চলে তবে,

(i) প্রত্যাশিত কতগুলি ফার্মের বিক্রয় 45,000 টাকার বেশি ?

(ii) শতকরা কতগুলি ফার্মের বিক্রয় 30,000 টাকার মধ্যবর্তী হবে ?

সমাধান ঃ এখানে X হল একটি ফার্মের বার্ষিক বিক্রয় (টাকায়)। X চলকটি স্বাভাবিক বিভাজন মেনে চলে যেখানে $\mu = 36{,}000$ টাকা এবং $\sigma = 10{,}000$ টাকা।

(i) একটি ফঅর্মের বার্ষিক বিক্রয় 40,000 টাকার বেশি হওয়ার সম্ভাবনা হল,

$P[X > 40{,}000]$

$= P\left[\tau > \frac{40{,}000 - 36{,}000}{10{,}000}\right]$

$= p[\tau > 0.4]$

$= 1 - P[\tau \leq 0.4]$

$= 1 - \Phi(0.4)$

$= 1 - 0.6554$ [প্রদত্ত ছক থেকে পাই $\Phi(0.4)$-এর মান]

$= 0.3446$

সুতরাং, প্রত্যাশিত ফার্মের সংখ্যা যাদের বার্ষিক বিক্রয় 40,000 টাকার বেশি

$= 500 \times P[X > 40,000]$

$= 500 \times 0.3446$

$= 172$ (প্রায়)

(ii) একটি ফার্মের বার্ষিক বিক্রয় 30,000 টাকা ও 40,000 টাকার মধ্যবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা হল $P(30,000 \le X \le 40,000)$

$$= P\left(\frac{30,000 - 36,000}{10,000} \le \frac{X - 36,000}{10,000} \le \frac{40,000 - 36,000}{10,000}\right)$$

$= P(-0.6 \le \tau \le 0.4)$

$= \Phi(0.4) - \Phi(-0.6)$

$= \Phi(0.4) + \Phi(0.6) - 1$

$= 0.6554 + 0.7257 - 1$

$= 0.3811$

$\therefore$ 38.11% ফার্মের বার্ষিক বিক্রয় 30,000 টাকা এবং 40,000 টাকার মধ্যবর্তী।

উদাহরণ ১১. আয়ুষ্কাল নির্ণয়ের জন্য 100 টি ব্যাটারি কোষের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় গড় আয়ুষ্কাল 12 ঘণ্টা এবং সমক বিচ্যুতি 3 ঘণ্টা। তথ্যগুলি যদি নর্মাল বিভাজন মেনে চলে তবে শতকরা কতগুলি ব্যাটারি কোষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (i) 15 ঘণ্টার বেশি, (ii) 6 ঘণ্টার কম এবং (iii) 10 ঘণ্টা ও 14 ঘণ্টার মধ্যবর্তী হবে ?

সমাধান ঃ ব্যাটারি কোষের আয়ুষ্কা (X) স্বাভাবিক বিভাজন মেনে চলে এবং এর গড়, $\mu = 12$ ঘণ্টা ও সমক বিচ্যুতি, $\sigma = 3$ ঘণ্টা

(i) আয়ুষ্কাল 15 ঘণ্টার বেশি হওয়ার সম্ভবানা

$= P(X > 15)$

$$= P\left[\tau > \frac{15 - 12}{3}\right]$$

$= P[\tau > L\ 1]$

$= 1 - P[\tau < 1]$

$= 1 - \Phi(1)$

$= 1 - 0.8413$

$= 0.1587$

সুতরাং, 15.8% ব্যাটারি কোষের আয়ুষ্কাল 15 ঘণ্টার বেশি হবে।

(ii) আয়ুষ্কাল 6 ঘণ্টার কম হওয়ার সম্ভাবনা

$= P(X < 6)$

$= P\left(\tau < \frac{6-12}{3}\right)$

$= P(\tau < -2)$

$= \Phi(-2)$

$= 1 - \Phi(2)$

$= 1 - 0.9772$

$= 0.0228$

সুতরাং, 2.28% ব্যাটারি কোষের আয়ুষ্কাল 6 ঘণ্টার কম হবে।

(iii) আয়ুষ্কাল 10 ঘণ্টা ও 14 ঘণ্টার মধ্যবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা

$= P[10 \leq X \leq 14]$

$= P\left[\frac{10-12}{3} \leq \frac{X-12}{3} \leq \frac{14-12}{3}\right]$

$= P[-0.67 \leq \tau \leq 0.67]$

$= \Phi(0.67) - \Phi(-0.67)$

$= \Phi(0.67) - \{1 - \Phi(0.67)\}$

$= 2\Phi(0.67) - 1$

$= 2 \times 0.7487 - 1$

$= 0.4974$

সুতরাং, 49.74% ব্যাটারি কোষের আয়ুষ্কাল 10 ঘণ্টার ও 14 ঘণ্টার মধ্যে হবে।

৯৪.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) একটি সম্ভাবনা বিভাজন $f(x) = kx^2, x < x < 2$ হলে, k-এর মান নির্ণয় কর।

(২) নিম্নোক্তগুলি বিচ্ছিন্ন/অবিচ্ছিন্ন বিভাজন বল ঃ

(ক) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$; $x = 0, 1, 2, \ldots\ldots$

(খ) $f(x) = x$; $0 < x < 1$

(৩) 2 গাণিতিক গড় বিশিষ্ট একটি দ্বিপদ চলক $4P(X = 0) = P(X = 1)$ শর্ত সিদ্ধ করলে $P(X = 0)$ নির্ণয় কর।

(৪) কোনও দ্বিপদ চলকের প্রত্যাশা $\frac{8}{3}$ এবং ভেদমান $\frac{16}{9}$ হলে বিভাজন লেখ।

(৫) কোনও দ্বিপদ বিভাজনের পূর্ণকাঙ্ক p-এর কোন্ মানের জন্য বিভাজনটি প্রতিসম।

(৬) কোন্ শর্তে দ্বিপদ বিভাজন পোয়াসঁ বিভাজনে রূপান্তরিত হয়?

(৭) $\frac{9}{4}$ পূর্ণকাঙ্ক বিশিষ্ট পোয়াসঁ বিভাজনের সমক বিচ্যুতি ও সংখ্যাগুরু মান লেখ।

(৮) পোয়াসঁ চলকের দু'টি উদাহরণ দাও।

(৯) প্রমাণ স্বাভাবিক চলকের ক্রমযৌগিক বিভাজন অপেক্ষক $\Phi(x)$ হলে, $\Phi(0)$-এর মান কত?

(১০) স্বাভাবিক চলকের কোন বিস্তারের মধ্যে প্রায় সমস্ত মান বর্তমান থাকে?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

(১) একটি সম্ভাবনাশ্রয়ী চলকের সংজ্ঞা দাও। ইহার গাণিতিক প্রত্যাশা বলতে কী বোঝ?

(২) সম্ভাবনা ভর অপেক্ষক ও সম্ভাবনা ঘনত্ব অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও।

(৩) একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক X-এর E(X) এবং V(X)-এর সংজ্ঞা দাও।

(৪) একটি বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা চলক X-এর সম্ভাবনা বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

x	:	0	1	2	3	4	5	6	7
p(x)	;	a	4a	3a	7a	8a	10a	6a	9a

(i) a-এর মান নির্ণয় কর।

(ii) $P(X < 3), P(X \geq 4)$-এর মান নির্ণয় কর।

(iii) $E(X)$ এবং $V(X)$-এর মান নির্ণয় কর।

(৫) নিম্নলিখিত বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা অপেক্ষকের ক্ষেত্রে $K, E(X)$ এবং $V(X)$ নির্ণয় কর ঃ

(ক) $$p(x) = \begin{cases} \frac{k}{2} \text{ if } x = 0 \\ \\ \frac{k}{2} \text{ if } x = 2 \end{cases}$$

(খ) $$p(x) = \begin{cases} kx \text{ if } x = 1, 2, \ldots\ldots, 5 \\ \\ 0 \end{cases}$$

(৬) দেখা গেছে একটি কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে 2% যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়। 5 জন শ্রমিকের একটি নমুনায় কমপক্ষে 2 জনের যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(৭) একটি বোমার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার সম্ভাবনা 0.2, একটি সেতু ধ্বংস করতে হলে দু'টি বোমার আঘাত যথেষ্ট। যদি সেতুটি লক্ষ্য করে 6টি বোমা ফেলা হয়, তবে সেতুটি ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(৮) একজন লোকের উপর নির্দিষ্ট একটি ঔষধের খারাপ প্রতক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা 0.001 হলে 2000 জনের মধ্যে (i) ঠিক তিনজনের এবং (ii) 2 জনের বেশি লোকের খারাপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

(৯) কোনও কারখানায় প্রতি বাক্সে 10টি করে কলম উৎপাদিত হয়। একটি কলম ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা 0.2%। পোয়াসঁ বিভাজন প্রয়োগ করে 20,000 বাক্সের মধ্যে 2টি ত্রুটিপূর্ণ কলম সম্বলিত বাক্সের সংখ্যা কত?

(১০) কোনও কারখানায় উৎপাদিত ইস্পাত দণ্ডের গড় দৈর্ঘ্য 10 মিটার এবং সমক বিচ্যুতি 20 সে.মি.। একজন গৃহনির্মাতা কারখানা থেকে 1000টি দণ্ড ক্রয় করে। দণ্ডগুলির মধ্যে কতগুলির দৈর্ঘ্য 9.75 মিটারের কম হবে? ইস্পাত দণ্ডের দৈর্ঘ্যের বিভাজন নর্মাল বিভাজন মেনে চলে।

(১১) কোনও শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতা নর্মাল বিভাজন মেনে চলে। উচ্চতার গড় ও সমক বিচ্যুতি যথাক্রমে 64.5″ এবং 4.5″। যদি 25 জন ছাত্রের উচ্চতা 70.5″-এর বেশি হয়, তবে মোট ছাত্রসংখ্যা কত?

(১২) 10,000 জন লোকের মাসিক আয়ের গড় 1750 টাকা এবং সমক বিচ্যুতি 150 টাকা। যদি আয়ের বিভাজনটি নর্মাল বিভাজন মেনে চলে, তাহলে (i) প্রত্যাশিত কত লোকের আয় 1700 টাকার কম এবং (ii) প্রত্যাশিত লোকসংখ্যা কত যাদের আয় 1700 টাকা এবং 1800 টাকার মধ্যবর্তী?

৯৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

নির্বাচিত পাঠ্যসমূহ ঃ

১. চৌধুরী, শৈলেশভূষণ, চৌধুরী, অরিজিৎ ও দাস, বিশ্বনাথ (1976) : রাশিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

২. দে সৌরেন্দ্রনাথ (1984) : ব্যবসায় পরিসংখ্যান, ছায়া প্রকাশনী, কলিকাতা।

৩. Das N. G. (1996) : Statistical Methods, M. Das & Co. Calcutta.

৪. Gupta, S. C. (1997) : Fundamentals of Statistics, Himalaya Publishing House, Delhi.

৫. Mathai, A. M. and Rathie, P. N. (1992) : Probability & Statistics, Macmillan India Ltd, Madras.